SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal.

Chief Editor : Dr. Jaygopal Mandal

Abhisek Tower, Block-A, 4th Floor, Flat No. 2,
Kolakushma, P.S.-Saraidhela, Dhanbad-826008, Jharkhand

ISSN : 2394 4889 Vol : VII, Issue : XV, 31 December 2021

Published by : Dr. Jaygopal Mandal
Abhisek Tower, Block-A, 4th Floor, Flat No. 2,
Kolakushma, P.S.-Saraidhela, Dhanbad-826008, Jharkhand
Mobile No. 9830633202 / 7003488354
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, jaygopal_1969@rediffmail.com
sahityaangan@gmail.com, Website : www.sahityaangan.com

কেন্দ্রবিন্দুতে শঙ্খ ঘোষ বুদ্ধদেব গুহ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত আফসার আমেদ ● সাহিত্য অঙ্গন

সাহিত্য অঙ্গন

ISSN:2394 4889
Vol : VII, Issue : XV
31 December 2021

কেন্দ্রবিন্দুতে

শঙ্খ ঘোষ

বুদ্ধদেব গুহ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আফসার আমেদ

সম্পাদক : জয়গোপাল মণ্ডল

সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889 Vol : VII, Issue : XV 31 December 2021

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ

শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual

Peer-reviewed Journal

ISSN : 2394 4889 Vol. VII, Issue : XV, 31 December 2021

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal

© Publisher

Cover Picture :
Krishnadhan Acharyya

Type Setting & Cover Design :
Manik Sahu
Mob : 9830950380 / 9433157172

Printing and Binding :
Ekush Satak

Price : 300.00

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-826008
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com,
sahityaangan@gmail.com
Website : www.sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof (Dr) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
Prof. Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata
Amar Mitra, (Katha Sahityik : Bankim & Sahitya Academy Awarded)
Nalini Bera (Katha Sahityik. Bankim & Ananda Awarded)
Professor (Dr.) Bikash Chandra Paul, Dept. of Bengali, University
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata
Prof. (Dr.) Barendu Mandal, Jadavpur University

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh) Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Assistant Editor :

Dr. Samaresh Bhowmik, Associate Professor, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata
Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia
Dr. Kutub Uddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College, W.B.

Working Editorial Board :

Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Sampa Basu, Associate Professor, Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Dipankar Arosh, Dept. of Bengali, B. C. College, Asansol
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Swapan Kumar Paramanik, SACT, Magrahat College, Bankura

শঙ্খ ঘোষ
(১৯৩২—২০২১)

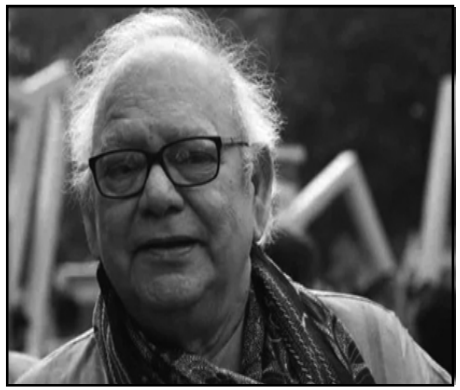

বুদ্ধদেব গুহ
(১৯৩৬—২০২১)

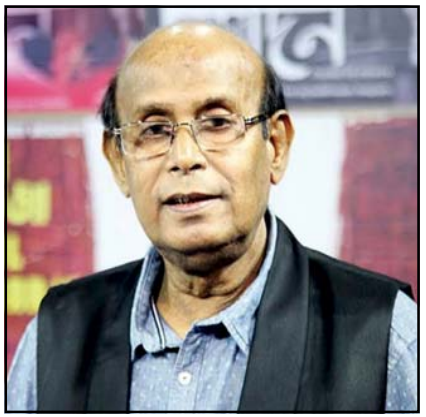

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
(১৯৪৪—২০২১)

আফসার আমেদ
(১৯৫৯—২০১৮)

সূচি

ভণিতা ৯
স্মৃতিকথায়—রামকুমার মুখোপাধ্যায় ১১

কবিতা

বদল—শঙ্খ ঘোষ ১৩
বঙ্গভূম—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪
জীবন—বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ১৫
স্বেচ্ছাচারিতায়—গণেশ বসু ১৬
শঙ্খ ঘোষকে—কালিদাস ভদ্র ১৬
মাস্টারমশাই—সুশীল মণ্ডল ১৭
অগ্নিস্নান (কবি শঙ্খ ঘোষ স্মরণে)—রবীন বসু ১৭
কবি শঙ্খ ঘোষের স্মরণে বটবৃক্ষ—জয়গোপাল মন্ডল ১৮
চাঁদ লাগা বাংলা—কানাইলাল জানা ১৯
অপার্থিব—বীথি চট্টোপাধ্যায় ২০
বুড়িয়ে গেছে যে বেলা—পার্থ সরকার ২০
অনির্ণেয়—খগেশ্বর দাস ২০
আমি তোমাকে নিয়ে যাব—অজিত বাইরী ২১
আসবাব—মণিদীপা সান্যাল ২১
কবিতায় সুরে তালে—কৃষ্ণা বসু ২২
ভোর—তাজিমুর রহমান ২২
ফেরিওলার ঘুঙুরের পাশে দু'বেণীর লাল ফিতে ওই—তাপস রায় ২৩
কবির প্রয়োজন—অমরেশ বিশ্বাস ২৪
পাথর জীবন—উদয়ন ভট্টাচার্য্য ২৪
তুমি তা জানো না—শঙ্কর ঘোষ ২৫
নাগপাশে—জয়ন্তী দেবনাথ ২৫
ছুঁয়ে থেকো স্মৃতিরোদ—স্নেহাংশু বিকাশ দাস ২৬
রবিবার ও কবরখানা—গোলাম রসুল ২৬
সদর্থক—সুস্মেলী দত্ত ২৭
মৃত্তিকা ছুঁয়ে আছে রাতের কৃষ্ণচূড়া—সুচরিতা চক্রবর্তী ২৭
ভবিতব্য এক অনাধুনিক মিথ—কুমারেশ চক্রবর্তী ২৮
পাড় ভাঙা সনেট—বেবী সাউ ২৯
একটি কিশোর—শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায় ৩০

প্রবন্ধ

নিহিত পাতাল ছায়া—অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১
আয়নায় মানুষ নাই—যশোধরা রায়চৌধুরী ৩৪
কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতারাজ্যে :
'এও এক ব্যথা উপশম'—জয়গোপাল মন্ডল ৪০
আদ্যন্ত এক জীবনশিল্পী : শঙ্খ ঘোষ—অঞ্জনা দেব রায় ৪৭
সম্পর্ক ৪৪—শুভঙ্কর দে ৫১
নন্দনভাবনার আলোকে শঙ্খ ঘোষের
স্মৃতিলেখা ও জার্নাল—আরিফ বিন ইসলাম ৫৫
কবি শঙ্খ ঘোষ ও শিশু সাহিত্য—অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ৭৫
ছড়ার নির্মাণ আর সৃষ্টি : শঙ্খ ঘোষ—অভীক ঘোষ ৯২

কবিতা

রাই তুমি অনিন্দিতা—শঙ্খ অধিকারী ১০৩
বৃষ্টি মাখি গায়ে —মৌসুমী মন্ডল ১০৩
নাও—অরবিন্দ সরকার ১০৩
মেঘকথা—অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪
অনিশ্চিত প্রেম—দিশা চট্টোপাধ্যায় ১০৪
সুজন গ্রহে—নির্মল সামন্ত ১০৫
স্বপ্নভুক—খেয়া সরকার ১০৫
বারণ—মঞ্জুশ্রী সরকার ১০৫
অ-সুখ—তনুজা চক্রবর্তী ১০৬

সময় দাঁড়িয়ে—স্বপন শর্মা ১০৬
বুদ্ধদেব গুহ—নীলাঞ্জনা হাজরা ১০৬
অলৌকিক যাপন—বিমল রায় ১০৭
পানপাত্র—ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য ১০৭
ঈশ্বর—সমরেশেন্দু বৈদ্য ১০৮
ভস্ম—পাপড়ি দাস সরকার ১০৮
ড্রোন—নিশা ঘোষ ১০৮
কবি গণেশ বসুকে লেখা
বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের পত্র ১০৯
প্রবন্ধ
কবিতার মন্তাজ, মন্তাজের কবিতা ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত—সৃজনী মণ্ডল ১১১
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র কবিতা :
যাপিত জীবনের মেধাবী উচ্চারণ—অনিরুদ্ধ বিশ্বাস ১২০
সন্ত্রাসকালের বীর্য নয়, কবিতার শরীর জুড়ে সময়ের
জ্বালা-ঘৃণা-কারুণ্য : বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতা—পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৩৩
কাঙাল কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়—সোমা মুখার্জি ১৩৮
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : চিরনিঃশব্দ চিহ্নহীন
এক অনিঃশেষ উপসংহার—বিক্রম দাস ১৪১
জীবনের ভাঙা-গড়া : কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়—স্বপন প্রামাণিক ১৫৬
কবি গণেশ বসুর জীবন :
এক ছিন্নমূল মানুষের লড়াই—নিখিল চন্দ্র মাহাতো ১৬৪
ছোটগল্প
কাযান শহরে এলেন তিনি—অমর মিত্র ১৭৯
জল নেই—গৌতম দে ১৮৩
রাম কিলা—সৌমিত্র চৌধুরী ১৮৫
মৌসুমীদের পাড়া—সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ১৯১
মরণকাঠি—অনিন্দিতা গোস্বামী ১৯৬
অনুভবে তোমাকে যে চাই—দেবযানী বসু কুমার ২০২
ধারা—বিবরণ—অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৫
মিষ্টিমাসির বৌমা—চুমকি চট্টোপাধ্যায় ২১০
ডিভোর্স।। ক্রাইম থ্রিলার—অভিজিৎ চৌধুরী ২১৩
প্রবন্ধ
নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানামাত্রা :
বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস—মহম্মদ সামসুর রহমান ২৩০
বুদ্ধদেব গুহর ছোটগল্প ঃ
আধুনিক বাঙালির বিবর্তননামা—সমরেশ ভৌমিক ২৪৩
'গামহারডুংরী' : বুদ্ধদেব গুহ'র পরিবেশচিন্তার
একটি 'ইকোক্রিটিক্যাল' পাঠ—অরিত্রী দে ২৫৭
অণুগল্পকার বুদ্ধদেব গুহ—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮
সঙ্গ নিঃসঙ্গতার আখ্যানকার আফসার আমেদ—তরুণ মুখোপাধ্যায় ২৭৪
আফসার আমেদের গল্প : নারীর কথা—নিরুপম আচার্য্য ২৭৮
আফসার আমেদের ছোটোগল্প :
স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে যাত্রা—পঞ্চানন নস্কর ২৮৫
প্রেমে অপ্রেমে আফসার আমেদের গল্প—সুবোধ মণ্ডল ২৯০
বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চায়েতিরাজ :
আফসার আমেদের 'ধ্যানজ্যোৎস্না'—অসীম হালদার ২৯৯
আফসার আমেদের ছোটগল্পে অন্তঃপুরের উদভাস—মনোরঞ্জন নস্কর ৩০৪
বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা :
ধর্মমোহ জনশ্রুতি ও মুসলমান সমাজের অন্তরমহল—চিত্তরঞ্জন নস্কর ৩১৯
স্থির পৃথিবীর খোঁজ : বদলি বসত—দীপঙ্কর আরশ ৩২৫
জঙ্গলমহলের লোকজীবন ও সংস্কৃতি :
প্রসঙ্গ নলিনী বেরার গল্প—উজ্জ্বল প্রামাণিক ৩৩০

ভণিতা

একটার পর একটা আছড়ে পড়ছে ঢেউ মানবসমুদ্রে। ফিরে যাবার কালে কাউকে কাউকে নিচ্ছে মৃত্যুর মহাকাল। কেউ যাচ্ছেন সময়ে, কেউ বা অসময়ে। বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টারাও শোকার্ত—তাঁরা হারিয়েছেন একে একে অনেককে। এই কালবৃত্তে গেছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, বুদ্ধদেব গুহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায় পথে প্রান্তরের কবি শম্ভু রক্ষিত এবং আরো অনেকে। এখনও যাঁরা আছেন ভয়ে ভ্রান্তিতে। তবুও সাহিত্যচর্চা থেমে নেই। অলিতে-গলিতে যখন তৃতীয় ঢেউ ঝাপটাচ্ছে—তখনও 'কলমচিরা' এবং তাঁদের পাঠকগণ মন ও মননে সময়ের কালাতিপাতকে চুলচেরা বিশ্লেষণে মগ্ন, কখনোবা দগদগে ঘা-এর চিত্রাঙ্কনে ইতিহাসের এই অদ্ভুত মায়াকাননকে রূপ দিচ্ছেন।

এর মধ্যেই চলছে রাধার প্রেম, কৃষ্ণের চতুরতা-বিরহ, দাম্পত্য কলহের নগ্নতা-আধুনিকতা। বুদ্ধদেব গুহ'-র 'যাওয়া আসা' উপন্যাসের সবুজ-হাসি এবং কুমুদ-কমলার মতো মনোস্ক্রিয়ার ভ্রান্ত কাহিনী— অন্তর্বাস্তবতার নিরিখে ঘটে যাচ্ছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় মনমাঝি দিশেহারা। অবশেষে হাহাকার চিত্তে বলতেই হয়—'আজ থেকে তোর জন্যে, তোর মায়ের জন্যে ঐ ফণীদার, ফণীমামার বুকে যত ভালোবাসা ছিল তার সঙ্গে আমার সব ভালোবাসা যোগ করে তোকে ভালোবাসব, তোদের ভালোবাসব।' (বুদ্ধদেব গুহ)

অথবা স্বকীয়া-পরকীয়ার দ্বন্দ্বে যখন এ জগত সারাজীবন মৃত্যুর গৌরব বহন করে বেড়াবে, তখন কবির-ভাষ্যে ধ্বনিত হবে ঃ

হয়তো অচিন পান্থেরা ঠিক এপথে বাঁক নিয়ে
এমনি হত দিনান্ত পার,
বিরুজিয়া নাম্নী পাহাড়
বসে থাকত নির্বাপিত কাহিনী আগলিয়ে;
হয়তোবা ঈশ্বরের নামে অর্চনানির্ঝরে
এই গাঁয়ে সমস্ত ভিটা
আর সমস্ত পৃথিবীটা
কাঁপত গৌরী রোদ্দুরে বা মহাদেবের ঝড়ে;'

—কবির এই মৌল কণ্ঠ আজও স্বনিত হয়। চোখে ভাসে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের অগণিত কবিতা ও চলচ্চিত্র অথবা শঙ্খ ঘোষের অজস্র সাহিত্য সম্ভার যেন 'এও এক ব্যথা উপশম'।

তাঁর অনুভবের আলোয় আমাদেরও মনে হবে—'ভেবে দেখতে গেলে আমরা হয়তো এতদিন ধরে/কেউ কারো ভাষাই বুঝিনি—/জ্বলন্ত জগৎ, তার পিছে পিছে আমারা হেঁটে গেছি শুধু/ ঘুমন্ত রোবট।" (শঙ্খ ঘোষ) সত্যি কি আমরা দেশে দেশে শরণার্থীর মতো ভেসে চলেছি। এই নবীন শতকেও আমরা মানবজাতি, যত সময় খণ্ড পাথরের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে ততই অধিকারহীন গণতন্ত্রের পুতুলের মতো এদিক-ওদিক ফুট'লের মতো লাট খাচ্ছি। কবিকে প্রশ্ন করতেই হয়—

'হায়, ত্যামুন দিন কবে আসবেক গ'?
কবে আসবেক?
দুধ পাবেক, পট ভর মুড়ি পাবেক, পোড়া দেশের মানুষ?

(বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত)

বুঝতে পারি, ভেতরে ভেতরে কে যে হাতুড়ি পেটে জানি—অভ্যন্তরে পুষ্পিত কাননে একটুও অবহেলা নেই। অথচ বুভুক্ষু কে? বা কেন? ঘরে ঢোল আছে, বাজে না, একতারায় ধুন ওঠে না। অবশেষে খঞ্জনার মতো ঢেউ ভেঙে উড়তে গিয়ে ডানা যায় কাটা। এখনো চলছে সেই নাটক—কেউ মুখোশ পরেন, কেউ মুখোশ ছেঁড়েন।

এই মানবতার দলিল সাহিত্য-পত্রিকার আকার। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধে এই সংখ্যার সাদা পাতাগুলো সেজে উঠেছে। আর এবার হাত পেতেছি প্রবীণের সাথে নবীনের উষ্ণস্পর্শে, দশক পার হলেই নতুন দশক যেভাবে আসে প্রগতির আয়নার, নতুন পাঠক—নতুন গবেষক আগামীর চিন্তা-চেতনার সাক্ষী হয়ে আত্মপ্রকাশ করুক, এগিয়ে যাওয়ার ব্যাণ্টন তুলে দিই সমুদ্র উচ্ছ্বাসে। এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছেন কবি-কথা সাহিত্যিক তাপস রায়, কবি সুশীল মণ্ডল এবং অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল। সাহিত্য অঙ্গন পরিবার তাঁদের ঋণ বিনীতভাবে স্বীকার করছে।

৩১, ডিসেম্বর ২০২১ জয়গোপাল মণ্ডল

স্মৃতিকথায়
রামকুমার মুখোপাধ্যায়

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় একসময় লিখেছিলেন ---বকুর দিদির মতো উলু দিয়ে চলে গেল আমাদের যৌবন বয়স। পাটিগণিতের নিয়মে সবারই বয়েস বাড়ে যেমন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়েরও বেড়েছিল, কিন্তু তাঁর মনের বার্ধক্য আসেনি। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একটি প্রিয় বই ছিল 'মৌরির বাগান ও কিছু নতুন কবিতা।' পড়ে মনে হয়েছিল আমাদের বয়সের কোনো কবি বোধ হয় লিখেছেন। বেশ কিছু কবিতা মুখস্থও হয়ে গিয়েছিল।

শরৎদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আটের দশকের শেষ দিকে। তাঁর কবিতার মধ্যে যে কৌতুকের ছোঁয়া পেতাম, সেটা তাঁর কথাবার্তার মধ্যেও দেখতে পেলাম। কর্মসূত্রে তাঁর সঙ্গে প্রথম যোগ অমিয় চক্রবর্তীর 'ঘরে ফেরার দিন ও অন্যান্য কবিতা' বইটির অনুবাদ নিয়ে। ক্যারোলিন বি. ব্রাউনের সঙ্গে তিনি বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং সেটির পাণ্ডুলিপি পড়ার সময় তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার বসি। তখন বুঝতে পারি কাজের বিষয়ে তাঁর গভীর দায়বদ্ধতা।

সে সুযোগ আমি ছাড়িনি। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ককবরক-বাংলা লোকগান ও কবিতা অনুবাদের কর্মশালায় শরৎদাকে অনুবাদ বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দিতে অনুরোধ করি। ককবরক একটি আদিবাসী জনজাতির ভাষা। কিন্তু শরৎদা এককথায় ত্রিপুরায় পাঁচদিনের সেই কর্মশালায় উপস্থিত থাকতে রাজি হন। বাংলাভাষী আরও দু-একজন গুণী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কবি হিসেবে শরৎদার থাকা ও দেখার অন্য এক মাত্রা ছিল। আগরতলা যাওয়ার দিন শরৎদা দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাওয়ার পর বিজয়াদি খবরের কাগজ খুলে দেখেন আগের দিন উগ্রপন্থী আক্রমণে সাতজন বাঙালি ত্রিপুরায় মারা গেছেন। বিজয়াদি আমার উপর রেগে, বকাবকি করবেন বলে, বাড়িতে ল্যান্ডলাইনে ফোন করেন। কিন্তু আমি তখন শরৎদার সঙ্গে বিমানে মধ্য আকাশে। বিজয়াদি আমার স্ত্রী সুদীপ্তার কাছে শোনেন আমিও আগরতলা গেছি। সেটা শুনে বিজয়াদি স্বস্তি পান, কিন্তু পরমুহূর্তেই সুদীপ্তাকে বলেন, রামকুমারকে ছাড়া তোমার উচিত হয়নি। সুদীপ্তা জানায় যে, ওর কাজই

ওটা আর তাই ধরে রাখার উপায় নেই। বিজয়াদি শান্ত হন। ককবরক অনুবাদ কর্মশালার উদ্বোধন পর্বে দুজন মন্ত্রী এবং দু-একজন আদিবাসী নেতার মধ্যে বাক্যবাণ ছোড়াছুড়ি হলেও বড়ো গণ্ডগোল কিছু ঘটেনি। তবে যেটা বলার কথা তা হলো কর্মশালার পাঁচদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শরৎদা একটি স্কুলবাড়িতে বসে পাণ্ডুলিপি সংস্কার করেছিলেন। শরৎদার জন্যে গাড়ি ছিল যাতে দুপুরে সার্কিট হাউসে খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু সত্তর বছরের শরৎদা সময় বাঁচাতে স্কুলবাড়িতেই খেতেন ও কাজ করতেন। এটাকেই আমি আগে যৌবন বলেছি। যাঁরা চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং সম্পাদিত "ককবরক লোকসংগীত ও কবিতা" সংকলনটি পড়েছেন তাঁরা জানেন কেমন সুখপাঠ্য সে বই। শরৎদা একই যত্নে শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত দান্তের "(দিভিনা) কোমেদিয়া" বইটির প্রায় সাতশো পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি পড়ে দেন। ইতালিয়ান জানা একজন বিশেষজ্ঞ পাণ্ডুলিপি রিভিউ করেছিলেন। কিন্তু বাংলায় কাব্যের দিকটা দেখার জন্যে কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

একবার অপর্ণা সেনের একটি ছবি দেখে শরৎদার ভালো লাগায় একটি পোস্টকার্ডে সেটি লিখে পরিচালককে জানান। সে কথা সেই সময় অপর্ণা সেন কোনো সাংবাদিককে বলেন আর আমি কোথাও একটা পড়ি বা শুনি। শরৎদার পোস্টকার্ড লেখার পিছনেও একটা ঘটনা আছে। ওজন কিংবা শর্করা স্তর একটু বেড়ে যাওয়ায় শরৎদা ডাক্তারের কাছে যান এবং ডাক্তার দিনে দু-কিলোমিটার করে হাঁটতে বলেন। শরৎদা ডাক্তারকে বলেন যে, কোনো কাজকর্ম নেই অথচ দু-কিলোমিটার হাঁটব, এটা ভালো লাগবে না! তাতে ডাক্তার পরামর্শ দেন রোজ রাতে একটি পোস্টকার্ড লিখে সকালে এক কিলোমিটার দূরের একটি পোস্ট-বক্সে ফেলে আসতে। কথাটা শরৎদার মনে ধরে। এটা ওঁর মুখ থেকেই শোনা। আমার অনুমান অপর্ণা সেন তেমনই একটি পোস্টকার্ড পান।

আরও একটি ঘটনার কথা বলি। বাংলা আকাদেমিতে কৃত্তিবাস পত্রিকা বা সুনীলদাকে নিয়ে কোনো সভা হচ্ছিল। শরৎদা বলছেন আর নবনীতাদি পাশে বসে আছেন। শরৎদা হঠাৎ মন্তব্য করলেন— সাংবাদিক- জীবন সন্তোষ ঘোষের গল্প-উপন্যাস আর নীরেনদার কবিতাকে গ্রাস করেছে, কিন্তু সুনীলকে কিছু করতে পারেনি। নবনীতাদি পাশে বসে হাসছিলেন। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষা ও অধ্যাপনার জীবনে এর আগে বোধ হয় একটি বাক্যে একজন লেখকের আবাহন ও দুজনের বিসর্জন দেখেননি।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে ঠিক এমনই দেখেছি। যা মনে ভাবতেন তাই মুখে বলতেন। ওঁকে নিয়ে কেউ ভিন্ন রকম কোনো কথা বললে কিছুই মনে করতেন না। ভাবটা এই রকম যে, ওর যা মনে হয়েছে তাই তো বলবে। কোভিড কাল অনেকের মতোই শরৎদার সঙ্গেও দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। শরৎদা চলে যাওয়াতে সে দূরত্ব আরও বেড়ে গেল।

—ফেসবুক ওয়াল থেকে সংগৃহীত, ২৩ ডিসেম্বর ২০২১

কবিতা

বদল

শঙ্খ ঘোষ

এখন আর আমাদের কোনো অশান্তি নেই
কেননা আমরা দল বদল করেছি
হয়ে গেছি ওরা।
সেদিন সারারাত জুড়ে চলছিল সেই বদলের উৎসব
পালটে যাচ্ছিল ধ্বজা
থমথমে উল্লাসে ভরে যাছিল প্রাঙ্গণ
আর গান আর হুল্লোড় আর জয়ধ্বনি আসছিল ভেসে
আর ভোজের সুবাস।
কোনো অশান্তি ছিল না আর, কেবল
আগুনের হল্কার পাশে
তখনও তোমার মুখে গতজন্মের ছায়া দুলতে দেখে
তোমাকে নিঃশব্দ দেখে
আমরা এগিয়ে এসে বলেছি : ভয় কী,
এই তো ভালো হলো
আমরা এখন হয়ে গেছি ওরা
আর কোনো অশান্তি রইল না আমাদের
দেখো কেমন চমৎকার কেটে যাচ্ছে আমাদের কৃমিকীট জীবন।

—নিজস্ব সংগ্রহ থেকে

বঙ্গভূম

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

ত্যামুন দিন কবে আসবেক
যখুন গরুড় বাহনে চড়ি আকাশে যেতি যেতি মা-লক্ষ্মী শুধাবেন
উদিক উটা কী দেশ গ";
লদী ভরি জল টমটম করে, মাঠ ভরি ধান
কাল-কাল মানুষগুলান খিলখিল খিলখিল করি হাসে।
অন্তর্যামী, লারায়ণ মিটিমিটি হাসবেন।
শুধাবেন, "তুমার মনে লাই
কতবার এইচ ইদিকে, তুমার মনে লাই
কত পুজা লিউচ
ই হল বঙ্গভূম।
বান হইছিল, উরা বাঁধ বাঁধল
লদী শুকাইছিল, এখুন কেলান হইচে,
বচ্ছরে তিন-তিনবার ধান উঠে। দেখ ক্যানে
লতুন দালান হইচে কত। উদের আর কষ্ট লাই।
বিকালের সোনার পারা লহর
উই শুন টিকটিক টিকটিক করি শব্দ উঠে
বল দিনি, উ কিসের শব্দ?"
"কী জানি।" মা-লক্ষ্মী অবাক হই তাকান।
"মানুষ এখুন কাজ করি ফিরছে।
শিশুরা পড়া করি ফিরছে।
উ মুড়ি খাওয়ার শব্দ বটে; দুধে ভিজাই মুড়ি খায়
বঙ্গভূমের মানুষ!"
হায়, ত্যামুন দিন কবে আসবেক গ"? কবে আসবেক?
দুধ পাবেক, পেট ভর মুড়ি পাবেক পোড়া দেশের মানুষ!
ত্যামুন দিন কবে আসবেক গ"?

—নিজস্ব সংগ্রহ থেকে

জীবন

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

একটি ঘোড়ার জন্য বসে থেকে থেকে
একটি পুরুষ ঘোড়া বুড়ো হয়ে যায়। সূর্য
ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
শেষে আকাশের গায়ে মুছে গেলে
পুরুষ ঘোড়াটি
পুরোনো দিনের কথা ভাবে,
যখন বয়স ছিল তার। যখন বিচুলি, ঘাস
বস্তা বস্তা ছোলা খেয়ে দৌড় শুরু হতো
আর সেই দেখে হেসে ঠেস দিয়ে
যুবতী ঘোড়ারা ঢলে যেতো একে একে
নিজেরাই নিজেদের গালে।
রাত্রি আরো
ঘন হলে পেয়ারা বাগানে
গাঢ় ও গহন শীত নামে।
বুড়ো ঘোড়া জানলার পাট খুলে
ঘরের ভেতর উঁকি মারে, দ্যাখে
তার মাদী ঘোড়া কাদা হয়ে গ্যাছে
কাল ঘুমে।

জীবন শুধুই কাদা কাদা—এই বলে
বুড়ো ঘোড়া আকাশে চাঁদের দিকে ছোটে।

—নিজস্ব সংগ্রহ থেকে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

স্বেচ্ছাচারিতায়

গণেশ বসু

একটুও নেই খুঁত
অনবদ্য বাকপটুতা শরীরী মুদ্রায়
মঞ্চে নাচান ভূত।
গড়গড়িয়ে শায়ের শোনান
মুসোলিনির দূত।

জানেন তিনি বেশ
সাধারণের অনুস্মৃতি ও অজ্ঞতা
ঝরা পক্ককেশ।
সেনারা তাঁর মুর্গিমাটন
যাক না চুলোয় দেশ।

বিচারপতিরাও
বন্দনাগান গাইতে দড়, ওঠোনবসনেও
এবং মারে দাঁও।
দিনদুপুরে বেনিয়ারাই
লোটে রাজ্যটাও।

কোথায় কারা খায়?
চিৎকারে তায় কাঁপতে থাকে, মরতে থাকে
শিশুরা রাস্তায়।
মধ্যযুগে দেশ ফিরে যায়
স্বেচ্ছাচারিতায়।

শঙ্খ ঘোষকে

কালিদাস ভদ্র

তোমার সাথে আমার
কোনো ফটো নেই
বিজ্ঞাপনী ফটো তুলতে চায়নি মন।
অথচ আমরা কামদুনির
নির্যাতিতার বিরুদ্ধে একসাথে
পথ হেঁটেছি বহুক্ষণ।
কলেজস্ট্রিটে সেদিন সেই
প্রতিবাদী মানুষের মুখ আপনি
দেখিয়েছেন কলম কতটা শক্তিমান!

আপনার বাড়িতে কতবার গেছি
সমন্বয় পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্যে
কবিতা আনতে
আপনি হাসিমুখে পাশে বসিয়ে
কবিতার কথা বলেছেন
ছোটো ছোটো বাক্যে
ওই সব বাক্য শঙ্খনাদের মতো
বাজছে আজ আমার বুকে

আপনার সঙ্গে আমি
কোনো ফটো তুলিনি।

মাস্টারমশাই

সুশীল মণ্ডল

আমাদের হৃৎকমলে সব রকম ধুম
শেষ হয়ে গেল না মাস্টারমশাই
আপনি যাবেন কোথায়?

কলকাতার মধ্যে আর একটা কলকাতার সন্ধান
মাস্টারমশাই শুধু আপনিই খুঁজে দিতে পারেন
কেননা, মিত্রমশাইদের চেনার চোখ শুধু আপনারই আছে।

বলে গেলেন, আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি
বলে গেলেন, মৃত্যু নেই দিগন্ত অবধি
মাস্টারমশাই, আজ আর চোখের চাওয়ায় ভিজিয়ে নেব না চোখ।

অগ্নিস্নান

(কবি শঙ্খ ঘোষ স্মরণে)

রবীন বসু

একটু স্তব্ধ হও, শব্দহীন বসো একপাশে
এখানে কবি শুয়ে আছেন,
এখানে দাঁড়ের শব্দ এখন ছলাৎহীন
এখানে মগ্ন অক্ষর পাঁজরে লেগে আছে
প্রহরজোড়া ত্রিতাল দুঃখ নিয়ে স্থির;
আমাদের শোক নম্র উচ্চারণে
পড়ে নিক কবিকে; আজীবন তীব্র তীক্ষ্ণ
অক্ষরের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি,
দাঁড়িয়েছেন মানুষের পক্ষে;
কবিতাকে তির করে প্রতিবাদ ছুঁড়েছেন।

আজ এই স্থানে প্রকৃত মানুষ আসুক
প্রকৃত কবি ছাড়া অগ্নিস্নান শুদ্ধ হয় না

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

কবি শঙ্খ ঘোষের স্মরণে বটবৃক্ষ

জয়গোপাল মন্ডল

আমাদের মোড়ে, উঠোনে চৌরাস্তায় একটা বটগাছ
মাথায় ঝাঁকড়া চুলের মতো শান্তি স্বস্তি কাব্যময় পরম্পরায়
লাইটহাউসের মতো নিশান ওড়ায়।
গায়ে জড়িয়ে এক নারী বহু মানুষ লাল চেলি জ্ঞানবৃদ্ধ
কাঠুরিয়া যতবার কুড়ালে আঘাত করে ততবার
শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "রাস্তা জুড়ে খঙ্গ হাতে
দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন "
অমনি ক্ষেপে গেল মোড়ল,
রেগে বলেন, শঙ্খ আবার কবি নাকি, কবি তো একমাত্র রবি
বটবৃক্ষ হেসে বলিলেন, এমন অজস্র বেচারা ছায়া নেয়,
ও তো বাঘ নয়
বাঘেরও সভ্যতা আছে
ক্ষমা করে দেন সুশীতল ছায়ার মতো
আজ তাঁর পাতা ঝরে গেছে, জীর্ণ শরীরে তবুও অটল হিমালয়ের মতো
মোড়ে মোড়ে দন্ডায়মান
যতই তাঁর বয়স বাড়ুক ততই তিনি আশ্চর্য্য আশ্রম
জীর্ণ বালিব্রিজের মতো পার করে দেন জীবনযুদ্ধের মাঠ
আমাজন থেকে সিন্ধু কিংবা গোদাবরী থেকে গঙ্গা
সর্বত্রই পাতা আছে তাঁর ভালোবাসা - মেঘ
অগণন চারা জন্ম নেয়, চারিয়ে যায় তরঙ্গ
ছন্দে ছন্দে গড়ে ওঠে 'কবিতার মুহূর্ত'
যখন "প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে"
তারপর রচিত হয় "এও এক ব্যথা উপশম"
রুগ্ন শরীরে বেজে ওঠে জীবনের গান
বেঁচেই থাকে বিশ্বাসে সমুদ্র যাত্রা

ঝড় এসে যখন ঝাপটা মারে
প্রতিধ্বনিত হয় কঠোর ঘোষণা:

"অধর্ম? কে ধর্ম মানে? আমার ধর্ম শত্রুনাশন
নিরস্ত্রকে মারব না তা সবসময় কি মানতে পারি?"

দ্রোণাচার্য্য আর কৃপাচার্য্য এই
বটবৃক্ষে ধারণ করে
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আকাশে সুবর্ণ গোলক। সূর্য্যমুখীরা চেয়ে আছে অনুক্ষণ।
তিনিও ডাকছেন, 'সূর্যমুখী, ওঠ ফুটে ওঠ, আমি তোর শ্বাসে শ্বাসে আছি।'

চাঁদ লাগা বাংলা

কানাইলাল জানা

চিরকাল চেয়েছি প্রতিটি লোকালয়ে বকুল ফুলের মতো ঝরে পড়ুক আহ্লাদ, রাজহাঁসের গলায় ঝুলুক ঝুঁটি বাঁধা শ্রাবণ, প্রখর নির্জনতায় ঢাকা পড়ুক প্রণয়পালকি, কীটপতঙ্গ ভাসিয়ে নিয়ে যাক ব্যথাভরা নৌকো। কথা বলা ডাকবাক্স বয়ে আনুক কমবয়সী চিৎসাঁতার। চিন্তা-চর্চাকে ঠায় বসিয়ে রেখে ভাবতে থাকুক নির্বিকল্প সমাধি। অতি উৎসাহী ক্রিয়াপদ এক পায়ে দাঁড়িয়ে বুনতে থাকুক তাঁতঘরের তন্ত্রবীজ...

আবার পুঁথি পাঠে মন দিক চন্দনচর্চিত মহাকাল। ফাগুন দিয়ে কালবেলাকে মুড়ে রেখে পূর্বরাগ বাজাতে থাকুক শরৎসেতার। আর্তনাদের খোঁপায় লিরিক গুঁজে তাকে রোমান্টিক করে তুলুক তৃষিত ঝিনুক। বেণীবাঁধা দীর্ঘশ্বাসকে ঊর্মিমুখর করে তুলুক সাধন সৃজনী। হলুদ কমলা লেবু হয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ুক অশ্রুসজল আশাবাদ। ফোঁটা ফোঁটা পাগলামি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাকে প্রকৃতি প্রেমিক করে গড়ে তুলুক আঁতুড়ঘরের উল্লাস...

খরগোশের প্রাণস্পন্দনে রঞ্জিত ঈশ্বর কাঁদো কাঁদো বাংলাকে আবার গড়ুক চাঁদ লাগা ওঁম শান্তি। প্রতিটি প্রতীক্ষা কুঁজো শালিকের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ুক চৈতন্য বিজয়ে। আম আঁটির ভেঁপু বাজিয়ে যে কোনো স্বীকারোক্তি ক্লান্ত প্রহরকে সাজিয়ে রাখুক কাস্তে হাতে নৃত্যপটিয়সী...

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

অপার্থিব

বীথি চট্টোপাধ্যায়

প্রেম এসেছিল অকূল সিন্ধুপারে
হাজার বছর আগেও কারুর কাছে,
এখনও সে প্রেম পূর্ণিমা চাঁদ হয়ে
ঝুলে থাকে কোনও বুড়ো অশ্বত্থ গাছে।

কখনও হয়তো প্রতিবাদ-সভা রূপে
দাঁড়িয়ে পড়বে ধর্মতলার মোড়ে,
যুবক-বয়সি সৌমিত্রর মতো
সিগারেট হাতে নন্দন চত্বরে।

পদ্মার বুকে কেউ কবি হয়ে ওঠে
নদীজল যেন কারুর গভীর দিঠি,
"আমাকে চায়নি কোনওদিন কোনওমেয়ে"
রবীন্দ্রনাথ লেখেন এমন চিঠি।

সেই শুধু পারে যে কাউকে নিয়ে যেতে,
ভুবন পেরিয়ে স্বর্গের খুব কাছে...
আঘাতের নামে কত যে পুরস্কার
হৃদয়ে সেসব যত্নেই রাখা আছে।

হাতে হাত রাখা যদিও সহজ নয়
তারচে সহজ ঢেউয়ের ওপর ঢেউ;
ছোট্ট ভ্রমণ জলতরঙ্গ হও
এই পৃথিবীতে থাকতে আসিনি কেউ।

বুড়িয়ে গেছে যে বেলা

পার্থ সরকার

বুড়িয়ে গেছে যে বেলা
তার জন্যও রেখো কুশল কামনা
প্রথমে রেখো সন্ধ্যার উপাসনা
রাতের শিহরণ বিগত পথিকৃৎে
যায় যে শেষ ট্রেন
শেষ বাস
দুপুরের হাঁড়িতে প্রত্যহ বিজয়া দশমী
মধ্যরাতের নিঃশব্দ ঘুমে রেখো তাদের প্রণামী

বুড়িয়ে গেছে যে বেলা
প্রকৃত বসন্তে
তাকেই বলে রঙের প্রকৃত নাম।

অনির্ণেয়

খগেশ্বর দাস

সম্পর্কের সমীকরণ খুঁজতে
খাতার পাতায় বেড়ে গেছে প্রশ্নচিহ্ন
কথার উত্তরে কথা
তাতে কোন গন্ডিকাটা নেই।

দূরত্ব নির্ণয়ে অনন্তে জুড়ছি আরো সূতো
জনে জনে নিবিড় শুভেচ্ছা
বিনিময়
হৃদয়ের উচ্চতা চাঁদের কাছাকাছি।

আমার জামায় ভালোবাসার
যে দাগ লেগেছে ভিড়ের মধ্যে
তাকেও কি স্পর্শ বলা যায় ?

জীবনের আরও কিছু কিছু
এখনও অজানা অনির্ণেয়।

আমি তোমাকে নিয়ে যাব
অজিত বাইরী

আমি তোমাকে নিয়ে যাব দূরদেশে;
আমি তোমাকে দেব মেঘমুক্ত আকাশ
আর সাত সমুদ্রের ঢেউ।

পর্বতের সানুদেশে পাতব বসত;
সুখ-দুঃখের শরিক হব পরস্পরের
মাথার বালিশ ভাগ করে নেব।

অনেক রাতঅব্দি গল্প করব
এক আকাশ নক্ষত্র উঁকি দেবে জানলায়।
দুজনেই মুগ্ধ হয়ে শুনব
দূরে, বহুদূরে রাতপাখির ডাক।

কোন কোন রাতে জ্যোৎস্না
উপচে পড়বে বিছানায়
সেই জ্যোৎস্নালোকে ভেসে যাব দুজনেই
এক আশ্চর্য্য স্বপ্নের ভেলায়।
বাতাসে রিনরিন করবে মহাকাল
হাতছানি দিয়ে ডাকবে দিগন্ত
আমরা স্বপ্ন বুনব আগামীদিনের।

সবুজে গা ধুয়ে জেগে উঠবে পৃথিবী
আমাদের চোখে ফুটবে নতুন ভোরের আলো।
নবীন পত্রে লেখা হবে নতুন কালের অক্ষর;
আমরা বাঁধব পদাবলী।

আমি তোমাকে নিয়ে যাব দূরদেশে।

আসবাব
মণিদীপা সান্যাল

আমাকে দেখছে এক পুরোনো দেরাজ
লেখার টেবিল আর কাঠের চৌপায়া
আমি একমনে ধুলোবালি মুছি
নরম কাপড়ে চেপে
তুলে দিই উপচানো তরলের দাগ
লেখার টেবিলের
ক্রমশ আবছা দাগেরা
আমার চাহনির ঝুলবারান্দা বেয়ে
আমার ভিতরে ঢোকে
আরো ভিতরে চামড়ার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে
তারা ছায়া ফেলে রাখে, গাঢ় হয়
চোখের নিচে, গালে ও চিবুকে
তারপর বিষণ্ণ দাগেরা
ক্রমাগত অবসাদ আনে
শিথিল হাত পা নিয়ে
পড়ে থাকি ঘরের মেঝেতে
আমার পোশাকে মিহি ধুলো, আর তখনও
আমাকে দেখতে থাকে পুরোনো দেরাজ
লেখার টেবিল আর কাঠের চৌপায়া।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

কবিতায় সুরে তালে
কৃষ্ণা বসু

নৃত্যের ছন্দে জেগে উঠত সংগীত প্রবাহে,
ভেতরে ভেতরে দুলে উঠত ছন্দের আবহে।
নাচের মধ্যে লুকিয়ে রয় জীবনছন্দখানি,
দুলে উঠত সারা শরীর, এই কথাটাই মানি!
সুরের মধ্যে জেগে উঠত, প্রাণেরই সম্ভার,
সুরই এসে গলায় আমার পরিয়ে দেয় হার।
সুরের আগুন সুরের মোহে ভেসে যেতে থাকি,
সুরকে আমি প্রাণের কাছে গভীর করেই রাখি।
নাচের ভেতর জেগে উঠত জীবন ছন্দ গান,
নাচের জন্য পরাণ আমার করে যে আনচান!
কেন এত ভালো লাগে নৃত্য ছন্দ বলো?
নাচে গানে কেন করে মন যে ছলোছলো।
ভালোবাসি বেঁচে থাকা সুরেরই বিস্তার
সুরের ভেতর নৃত্য ছন্দ অগাধ অপার!
কবি আমি, কলম নিই সত্তা জেগে ওঠে,
কবিতায় আর নৃত্য ছন্দে মন যে আমার ফোটে!
ফুটে ওঠা মনের গানে কবিতা আকুল,
কবিতাতে সুর ও তাল জাগছে ব্যাকুল।

ভোর
তাজিমুর রহমান

সোনালী আলোর রেখায় ভোর এল, একটা নীরব অঙ্গীকার নিয়ে ফিরে যাচ্ছে আঁধারের কণাগুলো
দুয়ারে দাঁড়িয়ে মা, শুকনো মুখ! নীল আলোর নিচে কিশলয় স্বপ্নেরাও দিশাহীন
যেটুকু তন্ত্র-মন্ত্র এ জীবন ধন্য করে তোলায় ব্রতী তার ভেতরে শুকিয়ে ওঠা অশ্রুবিষাদ
নিভৃতে কাঁদে পাখিদের গান ও গগন। মেদুর আলোয় তবু খেলা করে জলজ মাছেরা আর
অতল গহবর ছুঁয়ে এক অন্তহীন অপেক্ষা
যদি আগুনের মতো জেগে ওঠে আর একটা ভোর

ফেরিওলার ঘুঙুরের পাশে দু'বেণীর লাল ফিতে ওই

তাপস রায়

অশ্রু নিকটবর্তী হলে ভাবো, তাকে জল ও বাতাসা দিলে না
সে-ও তো কত পথ উজানে এসেছে, তোমাদের ভালো-মন্দ জানতে চেয়েছে
এতখানি ছলাকলাহীন পথিকতা, তুমি তাকে মূল্য দিলে না

এই যে সূর্যের ফ্রেমের ভেতরে আমাদের ঘুম ও জাগরণ নিয়ে হয়ে থাকা
মানে এই যে স্নানে যাওয়া, গামছা বুকের উপরে ফেলে
ভেজা পায়ে ঘরে আসা—সবটুকু অন্ধ অন্ধ
দৃশ্য মেলে রাখে, ডাল ও ভাতের সম্পর্কের মতো ঘোরাফেরা করে
অথচ স্কুল-গাড়ি আসছে না কতদিন হলো! খেলার মাঠের পাশে
যেসমস্ত ভৌতিকতা উবু হয়ে বসে যেত, শীতকাল, তার লম্বা ছায়ারা—কতকিছু
হেরে বসে আছে দেখতে পেলে না

দেবতারা বয়সের ভারে ঘোরাঘুরি করে না তেমন, জবুথবু
তুমি যেতে চাইছ না, স্টেশনের অজুহাত, এদিকে তেমন করে
লোকাল ট্রেনের থামবার কথা নয়, ভেবেছ কত আর অভিশাপ দেবে...
তখনও বোঝাপড়া বাকি, ফেরিওলার ঘুঙুরের পাশে
দু'বেণীর লাল ফিতে মনে পড়বে খুব

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

কবির প্রয়োজন

অমরেশ বিশ্বাস

নীরব অশ্রু ফেলে পতনেই কাঁদি
অসহ্য হলেও মেনে নিতে চাই
তোমার আশিস নিয়ে আসে সম্ভব।

অনেক মূল্য দিয়ে পেয়েছি স্বজন
না দেখেও দেখেছি তোমায়
মনের গহনে ছন্দে ছন্দে রূপময়।

আরও বেশি মহার্ঘ জীবন
কোথায় পাবো ফিরে কোথায় ফিরে দেখা
শোকের আবহে ঋদ্ধ হয় মন।

ওগো বিবেক আমার মোহনীয় রূপে
যাত্রা পথে চলার গতি শুদ্ধ হয়
সকল স্বপ্নে কল্পলোক বাণী।

কর্মজীবন যেন ধর্ম প্রচ্ছন্ন
অমোঘ রূপের বাক্যে ছেয়েছ
ভালোবাসা লুকিয়ে রাখি চিরকাল।

পাথর জীবন

উদয়ন ভট্টাচার্য্য

আমাদের মনোনীত সংকল্প নিয়ে
এই জীবন আমরা কাটিয়ে দিলাম
পাহাড়, শহরতলী গ্রাম ও গঞ্জ
আমাদের নিশানাগুলি উড়েছিল ধানখেতে
আমরা বহুদিন উদযাপনে কাটিয়ে
ছিলাম সঙ্ঘে।

একদিন ভোর হলো
আলোর মধ্যে দেখলাম কেউ সঙ্গে নেই
কারা ছিল আমাদের সঙ্গে
ঘাতক না মানুষ।

লিচ্ছবি বংশের একটি পাথর
কত যুগ আগে আমি এনে রেখেছিলাম
শারদপ্রাতে

আজ তার চূর্ণগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে আছে।

তুমি তা জানো না

শঙ্কর ঘোষ

শত শত স্রোত-অগ্নিচূড়া হয়ে বজ্র-বিদ্যুতে ভরা
তবু কেমন হোঁচট খেতে খেতে শিশুর মতো
আছড়ে পড়ি ...
স্বল্প বুদ্ধি নিয়ে এই জনস্রোতে কতটুকুই বা এগোতে পারি
যৎ সামান্য রং ছড়িয়ে ধূমকেতুর গায়ে ?
বৃত্ত থেকে যে ছিটকে যায় জানি মেলবে না ডানা
জ্যোতির্ময়ে, পুড়েছে সূর্য ছাইটুকু রেখে , তবু তো
বলেছি কোটি বছরের প্রাণের কথা — কালস্রোত
থেকে উঠে বলেছি অগ্নিচূড়া
কুন্তলের ভাঁজে তুমি তা দেখনি — কত কত
ইতিহাস কত কারুকার্যে দৃষ্টি মেলে
তোমাকে নির্জন করেছে বজ্রবিদ্যুতে ভরা
শিশুর মতো খেলে —
তুমি তা জানো না, অগ্নিচূড়া পোড়া সূর্যের
ছাইটুকু রেখে —

নাগপাশে

জয়ন্তী দেবনাথ

কানায় কানায় ভরে উঠেছে মন বিরক্তিতে...

ভাঁজ কপালে চোখের কোণে
কাজে বা ভাষায় তা ধরা যায় না

বন্দিত্ব অভিশাপ ইতিহাস প্রমাণ বহন করে

মানুষ নাগপাশে আবদ্ধ...

পৃথিবী সুন্দরী হয়েছো মানুষের ভাষায়
এখন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে মন
বেঘোর ঘুমই দিতে পারে কিছুক্ষণের প্রশান্তি

এসো ঘুম
এসো চোখে মজ্জায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে
বহুযুগ চাইনি তোমায়. ..

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ছুঁয়ে থেকো স্মৃতিরোদ

স্নেহাংশু বিকাশ দাস

দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়
ঋতুবদলের জনপদ কান্না লুকোবে শীতার্ত সকালে
যার মেঠো সুর ক্রমশ সবুজ হয়ে উঠেছে
ফোয়ারামুখ খুলে গেল মৃত্যুর দিকে
কিছুটা পাতা ঝরার অবসাদ ছায়াপথে মিশে গেলে
দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে পুতুলের দেশে
আর জল, মাটি, বোবা কথাগুলো
ভেঙে যায় ধীরে ধীরে
হলুদ পাখায় ফেরেনা স্মৃতিরোদ, শ্রমণপথ
ছিন্ন গোধূলির আলো মাটির ওপর
জাগিয়ে রেখেছে অস্তিত্বের কড়ি-বরগা
সুতো ছেঁড়ে, মুখরিত মাঠঘাট
কে যেন নিভৃতস্নানে ডাকে বারবার....

রবিবার ও কবরখানা

গোলাম রসুল

এখানে ছুটি কাটাতে আসি
পায়ের মেঘ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে

না খোলা না বন্ধ আমাদের চোখ প্রার্থনা ঘর
আর যে সব রীতিনীতি গুলো আমরা মেনে নিয়েছি সে গুলো দেখছি

খুলে আসা একটা চাতাল যার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি
দূরে আকাশ ডিমের খোলার মতো ভেসে রয়েছে সমুদ্রের সাথে

আলগা কয়েকটা দেশ
যেভাবে পালকগুলো ওম থেকে ফুটে বেরোয়

আমরা ছুটি কাটাতে আসি একটি উপত্যকায় যা ঝুলে আছে প্রকাণ্ড একটি পাথরের নিচে

সদর্থক
সুস্মেলী দত্ত

'ঘনমনুষ্য সূর্যোজ্জ্বল তুমি নও কারও তাঁবে!'
(মুখমন্ডল : শঙ্খ ঘোষ)

চুপজানলায় রেখেছি দুচোখ কারা যেন ফিসফাস
গেয়ে চলে কেউ আগুনের গান অসুস্থ সম্ভাষ

বিষাদ যেখানে সমূহ বিপদ আমরাও রাখি বাজি
সুচ্যগ্র খাক শত্রু পরম দুই এক ফুঁয়ে রাজি

বেনোজলে সুখ ভাসছে ভাসুক ভীষণরকম জ্বর
অশ্রুত যত কামড় মরণে উলঙ্গ দিবাকর

ইতিহাস জানে আমাজন স্তব কার কাছে কেউ ঋণী
দেবতা বা গৃহী মুখোশ মানুষে ঈপ্সিত বিকিকিনি...

আলোয় আলোয় উদ্ভাসে মন নিরলস সামাজিক
মৃত্যু কথায় জীবন কথায় উন্মাদ বায়োপিক।

মৃত্তিকা ছুঁয়ে আছে রাতের কৃষ্ণচূড়া
সুচরিতা চক্রবর্তী

কোনো রাতের বিভূষিত মায়া থাকে।
অন্ধকার চুঁয়ে পড়ে পাতা থেকে, পুকুরের জল স্থির আমার মতো —
মায়াফুলের গন্ধ জাগে রাতভর, পরী উড়ে এসে বসে ডালে, যেন আলোর সংকেত দিতে আসে। জল ভরা ডানায় ওড়ে ধূসর পাখি। সদ্য তরুণীর শবের মত শুয়ে আছে রাত, ফেলে আসা মায়াঘর জোনাকির আলো, স্মিত হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। আমি ঝরনা লিখি উপত্যকার ঢালে, কুয়াশার চাদর রাখি বুকে। পতঙ্গ চোখে আমাকে জড়িয়ে রাখে মাকড়সার লালা। চারদিকের এত গল্প, অসমাপ্ত, পাতা পচে পচে জন্মায় রূপকথা।
হাঁড়ি পাতিল আর পুরানো চালের গন্ধ ফোটাচ্ছে ভোরের সুবাস।
মায়ারাত; পার হলে অবশেষে মানুষের কথা জমে থাকে সিন্দুকে।
কৃষ্ণচূড়ায় আগুন জ্বেলে দেখি হারিয়েছে চাবি।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ভবিতব্য এক অনাধুনিক মিথ
কুমারেশ চক্রবর্তী

যেহেতু আত্মা অমর এবং পুনর্জন্মে
ফিরে আসে—
সেই হেতু সবই কি—
পূর্ব নির্ধারিত সরণি বেয়ে
ভবিতব্যের দিকে বয়ে যাবে ?
পুরনো বিশ্বাসে ভরা এত গোলযোগ
বোধের ভেতরে পরিকল্পিত ভিড়
জমিয়ে রাখলেও—
চক্রব্যূহে বালক অভিমন্যুর হত্যাকাণ্ড
কোনও ভবিতব্য নয়—
পরিকল্পিত অন্যায় বলেই মনে করি ;
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সশস্ত্র রামানুজ
লক্ষ্মণের ছোঁড়া তীরে
নিরস্ত্র মেঘনাদের মৃত্যুও
বিধি সম্মত—মানি না !

আর সেকারণেই দিনের খাটুনি শেষে
ঘুমের মধ্যে যখনই কোনও মাছি এসে
আমার স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেয় ,
সংক্রামিত করে—
ঘুমের ঘোরেও আমি তাকে
তাড়াতেই
ব্যস্ত হয়ে উঠি !
স্বজন হারানো দুঃখ—
ফসল খোয়ানো কষ্ট—
চাকরির বয়েস পেরুনো যন্ত্রণা—
কোনও হতাশ গ্রস্ত কবির মতো
পঠন অযোগ্য
পাণ্ডুলিপির ভাঁজে গুঁজে রেখে
কোনও পুনর্জন্মে—
ভাগ্য বদলানোর কথা ভাবি না !
বুক চিতিয়ে এই জন্মেই
ভয়ানক রাত্রির কষাঘাত সহ্য
করেও
শিউলির জন্মানোর অধিকার
রক্তের অক্ষরেই সুনিশ্চিত করে
দিতে চাই...

পাড় ভাঙা সনেট

বেবী সাউ

আমার সনেটগুচ্ছ চাকরির পরীক্ষার্থী নয়;
অধ্যাপক তাকে কোনও পিএইচডির পর্ববিভাজনে
বলবেন না এই তো রাস্তা, কত কাব্য ভ্রান্ত রসায়নে
মিশে গেল মহাকালে, কারো হাতে নেই তো সময়।

কেউ তো থাকে না আর, মা থাকেন, একা তিনি, মা-ই
পাশেই থাকেন শুধু, হাত রাখেন কবিতার পাশে
ধর্ম গেল, জল গেল, কত প্রেম ভাসালো খাতাই,
সেই সব অক্ষরেরা আজ কি জীবন লেখে ত্রাসে?

এ কেমন আগুনের কাব্য লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ে?.
সবার মাথায় ছাদ, ঘন বাড়ি, মার্বেলের রাত।
পোষা বেড়ালের মতো নারীদেহ নিয়ে মাখে ভাত
নিভে যায় যে প্রদীপ, তারও ধোঁয়া পেয়েছি আশ্রয়ে।

আমার সনেটগুচ্ছে একশো দিন কাজ লেখা নেই।
বিয়ে হয়ে যাবে তার, নথভাঙা হয়েছে আগেই।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

একটি কিশোর

শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায়

আমার বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে
সেনদের বসতবাড়ি মাটিতে গুঁড়িয়ে দিয়ে
নির্মিত হচ্ছে সুউচ্চ এ্যাপার্টমেন্ট, সেখানে
বহু শ্রমিকের সাথে হাতে-হাতে কাজ করছে একটি কিশোর।
ইট-বালি-বড় বড় পাথর তুলতে বেঁকে যাচ্ছে
ওর শীর্ণ শরীর।
দূর থেকে দেখি, নিজের আত্মজের সাথে মেলাই,
হিসেব করি, 'কত বয়স হল আমাদের স্বাধীনতার,
কত প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল এ 'স্বাধীনতা,
শিশু বা কিশোরকে শ্রমিক বানানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ নয়?'
ভাবনা ছিঁড়ে ঢুকে পড়ে আসন্ন করপোরেশন নির্বাচনের
দাদা, দিদিদের সোচ্চার বিজ্ঞাপন, প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতা—
ছেলেটি হাতের কাজ ফেলে ফ্যালফ্যাল করে দেখে
মিছিলের শুরু থেকে শেষ। আবার মাথার গামছাটা ঠিকঠাক বেঁধে
ভারি পাথর তোলে, কাজে মন দেয়।

সেদিন সন্ধ্যায় দেখি, বিল্ডিং নির্মাণে সাময়িক নির্মিত জলাধারে
ছেলেটি আপনমনে নুড়ি পাথর ছুঁড়ছে,
জলের টুপ শব্দ ছুঁয়ে যাচ্ছে কিশোরের মুখ।
ছেলেটির মুখে পূর্ণ জ্যোৎস্না।
আমিও হেসে উঠি, মনে মনে ভাবি—
শরীর মরে, কৈশোর মন বুঝি মরে না কখনও।

প্রবন্ধ

নিহিত পাতাল ছায়া

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

'He is no longer the dishevelled mad man who writes a whole poem in the course of one feverrish might; he is a cool scientist almost an algebraist, in the service of a subtle dreamer'

'Blood, intelled and imagination maning together'

এ এক আশ্চর্য দহন। জীবনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তকে আরো বেশি অর্থবহ করে তোলার এক অনিঃশেষ অঙ্গীকার। শঙ্খ ঘোষের কবিতার মূলতঃ আমরা সন্ধান পাই এক সুস্থিত জীবনবোধেব, তিনি আমাদের জন্য নির্মাণ করেন এক প্রবালদ্বীপ যেখানে শিল্পের নিহিত পাতাল ছায়া প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ থেকে এক ছায়াসৃত ভূমিখণ্ডের প্রতিশ্রুতিকে আমাদের অস্তিত্বে গোপনে সঞ্চারিত করে ঃ

> আকাশ, প্রসন্ন হও। রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝা কালো করো দিগঞ্চল—দীর্ঘ করো তামসগুণ্ঠন। আমাকে আবৃত করো ছায়াসৃত একখানি ধূসর বাতাস-ঢালা অকরুণ আলোর মায়ায়। (দিনগুলি রাতগুলি)

শঙ্খ ঘোষ অন্যত্র একবার বলেছিলেন, কবিতার নিজস্বগুণ্ঠনের কথা যে গুণ্ঠন দীক্ষিত পাঠককে প্রলোভিত করে, সম্মোহিত করে— এবং এই গুণ্ঠনই হয়তোবা শিল্প আর জীবনকে ভিন্ন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। উপলব্ধির আর্তি এক অর্ন্তমুখী প্রবাহের গতিশীলতায় তাঁর কাব্যাঙ্গিকের সমগ্র অবয়বে সম্পৃক্ত। 'দিনগুলি রাতগুলি' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতেই সেই মৃত্যু অথচ অতৃপ্ত উচ্চারণ ভঙ্গিমার উজ্জ্বল উপস্থিতি, আবেগ যেখানে নিয়ন্ত্রিত, মননসমৃদ্ধ। তাঁর ভাষা চুরি করে বলতে পারি "হৃদয় আর মেধার সমন্বিত কোন নির্যাস; কেবল মেধা নয়, কেবলই হৃদয় নয়।"

সমসময়ের ধমনীতে প্রবাহিত প্রবল জীবনাভিঘাত তিনি বিষ্ণু দে অথবা লোরকার ভঙ্গিতে ছেলেভুলোনো ছড়া, ঘুম পাড়ানি গানের লৌকিক ছন্দের সুপারিচিত আঙ্গিকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন।

> যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
> যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
> বিষের টোপের নিয়ে। (যমুনাবতী)

'আরুনি উদ্দালক', 'জীবাল সত্যকাম' অথবা 'বাবরের প্রার্থনা' শীর্ষক কবিতায় প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যান বা ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের পুনর্নির্মাণ বর্তমান জীবনের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তীব্র এক আবহ সৃষ্টি করে।

জীবনের কঠিন নির্মম বাস্তবতা শিল্পায়নের শর্তে পরিশ্রুত; ফলে তাঁর বাচনভঙ্গির অনির্বচনীয়তাকে ছন্দের কারুকার্যের সফলতায়, তিনি দুলিয়ে দেন পাঠককে—'অলস জল' শীর্ষক কবিতায় স্মরণযোগ্যতার বিরল সম্পদে উল্লেখ্য তাঁর পঙ্‌ক্তিসমূহ এক অপূর্ব ধ্বনি মাধুর্য্যের সহায়তায় বেলাশেষের বিষণ্ণতাকে স্পষ্ট করে তোলে, শৈশবের স্মৃতিসমন্বিত অলস জলের অপার্থিব চিত্রকল্পের আধারে ঃ

> নীলনীলিমা ললাটে এমন আজল কাজল অন্ধকারে
> খন বিনুনি শূন্যতা তাও বৃক্ষ ইব চতুধারে (অলস জল)

নাগরিক জীবনের সুনিপুণ চতুরতায় তিনি ক্লান্ত হয়ে বলে ওঠেন

> ঘরে ফিরে মনে হয় বড় বেশি কথা বলা হল
> চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব (মূর্খ বড়, সামাজিক নয়)

শহুরে জীবনের ভণ্ডামি খোলশ ছিঁড়ে তিনি প্রকাশ্যতায় নিজের মুখোমুখি বসে বিদায় জানান চতুরতাকে, বিশাল পোশাক খুলে তিনি পরিধান করতে চান মানবশরীর একবার। যদিও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ এক আপাপবিদ্ধ শুদ্ধতার প্রতি যে শুদ্ধতা এক পরিপূর্ণতার নামান্তর, তিনি স্বভাবজ বৈশিষ্ট্যের গুণে তাঁর পারিপার্শ্বিক, ঘটনা সমূহকে কবিতায় একান্ত করে তোলেন। পূর্বোক্ত 'যমুনাবতী' কবিতাটি যেমন লেখা হয়েছিল কুচবিহারে এক খুব মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত কয়েকটি মেয়েকে মনে রেখে তেমনি সত্তরের প্রথমার্ধে উগ্র রাজনীতির আবর্তে যখন সময়ের রঙের ছোপা ও তাঁর কবিতায় আমরা লক্ষ করি—

> এই দিকে ওই দিকে তিনচার পাঁচ দিকে
> টেনে নেয় গোপন আখড়ায়
> কিন্তু বা গলির কোণে কিছু বা অ্যাসফল্‌ট রাজপথে
> সোনার ছেলেরা ছারখার। (ক্রমাগত)

এক বিশেষ অনুশাসনের প্রেক্ষিতে রচিত 'মার্চিং সং', 'আপাতত শান্তিকল্যাণ প্রভৃতি কবিতায় তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রুপময় অথচ রূপকাবৃত উপস্থাপনা ভঙ্গি পাঠককে বিস্মিত করে। এক হতভাগিনী মেয়ের বিমানবন্দর থেকে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহের ঘটনা এবং এই অপরাধের শাস্তি হিসাবে তার দীর্ঘদিন কারাবাসের কাহিনির অর্ন্তলীন বেদনাকে তাঁর কবিতার উপজীব্য করে তোলেন অনায়াসে এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন আমাদের মেকী সমাজব্যবস্থা দূষিত কীটদষ্ট চেহারা।

> এখন সবই শান্ত সবই ভালো

সত্য এবার হয়েছে জমকালো
বজ্র থেকে পাঁজর গেছে খুলে
এ-দুই চোখে দেখতে দিন বা না দিন
আমার সবাই ব্যক্তি এবং স্বাধীন
আকাশ থেকে ঝোলা গাছের মূল।

এ জাতীয় কবিতার উদাহরণ আরো দেওয়া যেতে পারে, যেখানে তিনি আমাদের ঘুণধরা সমাজের অন্তঃস্থ চিত্রটি নির্মম নিরাসক্তিতে উন্মোচিত করেছেন, ছন্দের নিপুণ ব্যবহারে। সুতীক্ষ্ণ শব্দচয়নের অনিবার্যতায় তিনি তাঁর আঘাত কে শাণিত করে তোলেন, আমরা প্রত্যক্ষ করি বর্ণময় পোশাকের অন্তরালে কদর্য পুতিগন্ধময় এক ক্লিষ্ট অস্তিত্বের উপস্থিতি। তাঁর এ-ধরণের কবিতার উপরিভাগে এক কৌতুকের আবরণ থাকে যা মর্মভেদী যন্ত্রণার ভেতরের উত্তাপে আবেগের আর্দ্রতাকে বাষ্পায়িত ক'রে নিটোল স্ফটিকের দার্ঢ্যে তাঁর অনুভবকে পাঠকের কাছে সরাসরি হাজির করে। এই বিশিষ্ট রীতিটি এক আয়রনির আবহ সৃষ্টি করে।

তবু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মৃদু উচ্চারণের আবেশ আমার স্মৃতিতে এক দিব্য অনুভবের রেশ রেখে যায়—আততায়ীর ছুরির তীক্ষ্ণতায় পাঠকের হৃদয়টিকে কীভাবে অতর্কিতে উপড়ে নেওয়া যায়—স্থির লক্ষ্য সজাগ ও একাগ্রচিত্তে এই এই বোধ হয় মহৎ কবিতার সাধনা। কবিতা মূলত কানের, চোখের বা কোনো বিশেষ প্রত্যঙ্গের শিল্প নয়, এর আবেদন সামগ্রিকভাবে আমাদের বোধযুক্ত অনুরণনে। শঙ্খ ঘোষ যখন তাঁর সেই বিশিষ্ট কণ্ঠস্বরে বলেন, "শূন্যতাই জানো শুধু শূন্যের ভিতরে এতো ঢেউ আছে সেকথা জানো না" তখন অজ্ঞাতেই নত ইতি হয়, সকালের সোনালি রোদ্দুরে পৃথিবী সহসা মায়াময় হয়ে ওঠে। এই বাসভূমি এতো রম্য হতে পারে তাতো জানা ছিল না, এতকাল কেটেছে বুঝিবা অনবধানে।

আয়নায় মানুষ নাই
যশোধরা রায়চৌধুরী

আমার সামনে খোলা শঙ্খ ঘোষের গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, প্রমা প্রকাশনের। রচনাকাল ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪।

আমার সুষুম্না ছেড়ে কোথায় সে পালাবে ভেবেছে?
'দেখোনি কখনো আগে?' আমি ডেকে বলি, সে আমাকে
ভূতগ্রস্ত ভেবে দূরে সরে যায়, আমি ছুটে গিয়ে
জাপটে ধরি, সে আমাকে, তারপর কে-বা আমি, সে কে
কিছু স্পষ্ট নয় আর, ঝলকে ঝলকে থেকে থেকে
উগরে ওঠা শ্লেষ্মা পাঁক ঘূর্ণি যেন সুধারসধারে
ছড়ায় দিগন্তে দিকে তলে অবতলে ঊর্ধে অধে—
কোথায় দাঁড়াব আর তখন তোমার পাশে ছাড়া। (১১ নং)

এপ্রিল ২০২১ এর পর থেকে এই এক দেড় মাস সময় কালের মধ্যে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত, যে, বহুপ্রতিফলক হীরকখন্ড, হিমালয়ের চন্দ্রতাল আদি অতল শান্ত গগনপ্রতিফলক হ্রদসমূহ, এবং শঙ্খ ঘোষ, এঁদের কাজ মূলত এক আয়নার। প্রতিবিম্বের। প্রতিবিম্বিত করার কাজটিই যে কোন বড় ব্যক্তিত্বের মাপ বলে আমি মনে করি। পলিসেমি অফ টেক্সট যেমন যেকোন সার্বজনিক আবেদনের টেক্সটের বৈশিষ্ট্য। কবি তাঁর লেখা ও জীবনে, এইভাবেই, নিজেকে প্রতিফলক করে তোলার ক্ষমতা দিয়েই প্রমাণ করেন তিনি কী বহুবিস্তারী, কত অমোঘ।

না , এ শুধু এই কারণে বলছি না যে শঙ্খ ঘোষের দেহাবসানের পর যত কবি সাহিত্যিক যত সম্পাদক প্রকাশক তাঁকে নিয়ে স্মৃতিলেখা লিখছেন, তাঁরা আসলে অনাবৃত করছেন নিজেদেরই। নিজেদের পরিচয় তাঁরা রাখছেন, যখন স্মরণ করছেন শঙ্খবাবুকে, কীভাবে তাঁর রবিবারের আড্ডায় যেতেন তাঁরা, নিজেদের জীবনের নানা পর্বে কীভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁকে, বা তাঁর প্রশ্রয়ে কীভাবে ডালপালা ছড়িয়ে গেছে তাঁদের নিজেদের সাহিত্য উদ্যানের গাছেরা...। কীভাবে বিকাশ ও বিস্তার পেল নিজেদের সাহিত্য জীবন, শঙ্খ ছায়ায়। এইসব ব্যক্তিগত কথামালায় নিজেদের এক্সপোজ করেছেন অনেকেই। কিন্তু এহ বাহ্য। দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ তাঁর অস্তিত্বটিকে সর্বাতিশায়ী করে তুললেন যেন আরো, বিস্তারিত হয়ে গেল তাঁর এই হ্রদোপম হৃদয়, কেননা তাঁর লেখাও এখন আর তাঁর রইল না, হয়ে গেল আমাদের সবার, পাঠকের। পাঠক এখন সে লেখায় দেখতে পাবেন নিজেকেই। আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপ্রেমী পাঠক আর আত্মজিজ্ঞাসু পাঠক , উভয়েই পাবেন।

যেমন, যে বইটি আমি জেনেছিলাম রচনাকালের অব্যবহিত পরেই, শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন সিরিজ কবিতা হিসেবে শিমলাতে থাকাকালীন, সেই গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছকে নিয়ে বসতেই আমি টের পাই এর প্রতিবিম্বিত করার অগাধ ক্ষমতা। এ ত আমারই কথা, আমারই কবিতা হয়ে উঠছে এ অনবরত।

সমাজমনস্ক, ভাষায় আম জনতার কাছাকাছি থাকা যে শঙ্খ ঘোষকে আমিই পাঠ করেছি আকৈশোর প্রায়, ক্যান্টিনের টেবিল পিটিয়ে যে ছন্দমুখর শঙ্খ আবৃত্তি করেছিলাম আমরা ছাত্রদল, প্রেসিডেন্সিতে... তা থেকে বৈপরিত্যের এই একান্ত, প্রচন্ড নির্জন শঙ্খ ঘোষকে 'নিজের' করে পেলাম আজ। লাইনেই ছিলাম বাবা অথবা শবের ওপরে শামিয়ানাতে আমারই ত এক সামাজিক পাঠকসত্তার দিক থেকে উপনীত হয়েছিলাম গুটিগুটি পায়ে লেখাগুলির দিকে... রাজনীতিকে দেখতে পেয়েছিলাম। আর এই বইতে দেখতে পেলাম সর্ব অলংকার বর্জিত এক স্টার্ক, অব্যয় আস্তিত্বিক সত্ত্বাকে। ঝাপসা গথিক আয়নায় দেখলাম নিজেকে। নগ্ন আত্মাকে।

গথিক কেন মনে হল? আসলে শিমলার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, যেখানে থাকাকালেই শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন লেখাগুলি গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছের, কথিত আছে (ভূমিকাতে লিখেছেন তিনি, 'কয়েক বছর আগে, বেশ কয়েকটা মাস কেটেছিল শিমলার এক পাহাড়চুড়োয়। মেঘকুয়াশায় চরাচর ঢেকে দেওয়া সেখানকার এক সকালবেলায় অনেক দিন পর এক ঝোঁকে লেখা হয়ে গেল কয়েকটি কবিতা। পরে মনে হল, ঠিক 'কয়েকটি' নয় তারা একটিই মাত্র লেখা, কেবল স্তরে স্তরে খোলা।'

তা, একদা আমার শিমলাবাসের স্মৃতিও ত আছে। হেঁটে চলে যাওয়া যেত আমার হোস্টেল ইয়ারোজ থেকেই সেই বাড়িটিতে। বাড়ি ত নয়, সংস্থাটি অবস্থিত যেখানে, তা এক ইংরেজ আমলের বিশাল প্রাসাদ। ভাইসরিগাল লজ। আর সেই স্থাপত্যের গুরুগম্ভীর পাথুরে অবয়বের গায়ে লতানে সাদা গোলাপের ঝাড়টিকে এখনো ভুলিনি। তাই হয়ত বিশাল আয়নায় দেখা ওভারকোট পরা এক ছায়ামূর্তির ভেতর থেকে হঠাৎ উদয় হতে দেখলাম এই ছবিটি। নিজের ছবিটি।

সেই আমি যাকে মৃত্যুর ভেতর থেকে ধ্বংসের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াতে হয় বার বার। রহস্য রোমাঞ্চের মত, ধোঁয়াশার ভেতরে অবয়ব পাওয়া আত্মার মত, বস্তুত মায়াবাদী মিস্টিক এই সত্য আমিকে তৈরি করে তোলে এই লেখা।

ব্যভিচারী তুমি, তুমি যেখানেই যাও আমি যাব
আমারই পাঁজর ভেঙে যদি শুধু মশাল জ্বালাও
আমার করোটি নিয়ে ধুনুচি নাচাতে চাও যদি
তবু আমি কোনোদিন ছেড়ে যেতে দেব না তোমাকে।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

এক শতাব্দীর পরে আরেক শতাব্দী আরো এক
আমি যদি না-ও থাকি তবুও আমিই পড়ে থাকে। (১৮ নং)

২

তুমি জানো কে আমাকে আজকের মুহূর্ত পাব বলে
ছল বল মিথ্যে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে মধ্যরাতে
এবং বলেছে—যাও, অধিকার করে নাও ওকে
কোনো লজ্জা লজ্জা নয়, কোনো মিথ্যে মিথ্যে নেই আর। (১০ নং)

সত্য আর মিথ্যা বার বার ঘুরে আসে তাঁর লেখায়। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যে শিশুর সারল্য, নাইভেতে (naivete) নিয়ে আসে, সেভাবে নয়। 'শাখাপ্রশাখা' ছবিতে যেভাবে এসেছিল 'এক নম্বরী দু নম্বরী' প্রসঙ্গ, সেভাবে নয়। অনেক জটিল ও অনেক তলার দিক থেকে ভেতরের দিক থেকে। বিবেকের ভূমিকায় বহু মানুষকে কথা বলতে দেখেছি (ঐ সত্যজিৎ রায়ের ছবির প্রসংগেই বার বার দেখেছি)...। শঙ্খ ঘোষকে আমাদের বিবেক বলে ডেকেছেন অনেকেই আগে, আরো ডাকবেন পরেও। কিন্তু আমার কাছে এই বিবেকত্বের বহু পরত। এ মুহূর্তে এ কবিতায় অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসে বিবেকিতা। সত্য মিথ্যার সংঘাত নানাভাবে প্রতিফলিত হয় তাঁর লেখায় কিন্তু এই গভীর নির্জন নিঃস্তব্ধতার থেকে উঠে আসা প্রশ্নাকুল কথাগুলো আমাকে কাঁপায়।

চলেছি সীমান্তদেশে। ঝলসানো আলোয় খাক হয়ে
শিখেছি কাকে কী বলে। পিঁপড়ের মতন মুখোমুখি
চকিত আদর রেখে চকিতে পিছনে ফেলে যাওয়া
মুহূর্তের স্বাদে গড়া ছোটো ছোটো চিনির বেসাতি
এসব তো খুব হলো। (২৩ নং)

এই পিঁপড়ে জীবনে এইসব সত্যমিথ্যা নিয়েই ত কারবার, বেসাতি আমাদের। এ লেখার হ্রদে আরো একবার ছায়াপাত হয় এই ২০২১ এর। এই পাঠকের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায় সেই অনুভব... সত্য, মিথা ও বীতসত্য বা পোস্ট ট্রুথের কথা। মনে পড়ে, 'লাইনেই ছিলাম বাবা' বইটির শ্লেষ ভরা পংক্তিতে তো বার বার এসব কথাই বলেছেন তবে এত নির্জন স্বরে নয়:

নিজের বুদ্ধিবৃত্তির ওপরে অসম্ভব আত্মপ্রত্যয় যে 'পাবলিকের' সেই পাবলিক এখন, উত্তর ডিজিটাল যুগে, হোয়াটস্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া করতে করতে আরো বেশি বুদ্ধিমান কিনা, তাই মনে হয় এই কবিতা আজই লিখলেন কবি :

হঠাৎ কখনো যদি বোকা হয়ে যায় কেউ, সে তো নিজে আর
বুঝতেও পারে না সেটা/ যদি বুঝতই তাহলে ত বুঝদারই

বলা যেত তাকে। তাই যদি, তবে

তুমিও যে বোকা নও কীভাবে তা বুঝলে বলো তো? (বোঝা)

গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছে এই নিজেকে বোঝা আর নিজের বিপুল স্ববিরোধকে দেখা, এক রকমের অনিবার্য ভেতরযাত্রাই হয়ে গেছে বলে তা আরো নির্জন নিঃশব্দ ও অমোঘ। প্রতিদিনকার আবর্জনাহীন। **Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask– and he will tell you the truth.** অস্কার ওয়াইল্ডের এই কথাও আপাত স্ববিরোধী। কিন্তু সতত, আমাদের সামাজিক অ-মূর্খ আচরণের ভেতরে মিথ্যা আছে বেশি, আর নিরাভরণ একাকিত্বে অথবা কবিতা-গল্প-সাহিত্যের মুখোশের আড়ালে আছে সত্য ভাষণের সাহস। যদি তাই হয়, তবে শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতাকে সত্যের আয়নায় মুখ দেখার প্রকরণ করেছেন, আর এই গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছে উন্মাদ গন্ধর্বকে টেনে নিয়েছেন কুয়াশাভরা পাহাড়ের মাথায় সেই দুর্গে... মুখোশের আড়াল থেকে গর্জন করেছে এখানে সত্য।

এই সত্য নীতিকথার সত্য না। নৈতিক হ্যাঁ না, ভাল মন্দের উর্ধে। এক রকমের উদ্ভাসন।

৩

বেঁচে আছে? মরে গেছে? বাঁচামরা এক হয়ে আছে? (১২ নং)

শেষ পর্যন্ত সব কথাই জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত। এবং ধারাবাহিক মৃত্যু আর মানুষের বেঁচে থাকা সংক্রান্ত। এত বেশি আত্মদর্শনের অভ্যাসে নিজেকে বার বার বিদ্ধ করার জন্যও বটে, আবার সমাজ সংসারের কথা বলতেই বটে। হাতের পাঁচ আঙুলের একটি যখন অন্যের দিকে বাকি চারটিই তখন আমার দিকে। কেননা আমিই তো আততায়ী আক্রামক, আমিই আবার আক্রান্ত।

যেসব মানুষ নেই যেসব মানুষ মরে গেছে
যেসব মানুষ তবু কথা বলেছিল একদিন
দ্বাদশীর রাতে তারা আমার বাঁকের কাছে এসে
সরাসরি প্রশ্ন করে : বলো কাকে বলে বহমান।
যেসব মানুষ আজও কষ্ট পায়, যেসব মানুষ
শুধু বেঁচে আছে বলে মরে যেতে চায় বারে বারে
তাদের ক্ষতের নীচে আমার চুমুর শব্দ শুনে
কেউ-বা ঘুমিয়ে পড়ে অতর্কিত ডালপালা ফেলে। (২৪ নং)

জীবনানন্দের কবিতা বার বার আমাকে দাঁড় করাত এই প্রশ্নে... পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো—

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে। (সুচেতনা)

আজো এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি বলেই রক্তমাখা দুই হাতে ঘুরিফিরি। নিজের স্বার্থপরতায় রচিত হতে দেখি কীর্তির স্তম্ভ ও মিনার আর স্বার্থবহ তরীগুলি এসে নামে আমাদের বন্দরে। মানুষের শব বয়ে আনে তারা।

সব চোখ মেলে দিয়ে এ বাতাসে জড়িয়ে ধরেছ
তুমিই আগুন তুমি জল তুমি আকাশ বা মাটি
শরীরে শিহরণ তুমি মনে আমরণ আরাধনা
অমৃত পাহাড় থেকে সাগরের তরল গরল।
পুরোনো বছরগুলি ফুলের স্তবক নিয়ে প্রায়
পায়ে পায়ে হেঁটে যায় পার্ক স্ট্রিট থেকে গড়িয়ায়
আর তার মুক্তদেশে সোনালি সপ্তর্ষিরেখা রেখে
গভীর প্রান্তরে ঝুঁকে যখন এ ওকে চুমু খায়
তখনই শূন্যের থেকে ঝাঁপ দেয় লক্ষ লক্ষ তারা
তখনই অশত্থপাতা হাওয়ায় হাওয়ায় মাতোয়ারা
তখনই উৎসের থেকে নেমে আসে প্রলয়ের জল
তখনই গন্ধর্ব তুমি খুলে দাও মাটির আগল
আমার শরীরে তার ছোঁয়া লেগে থাকে অবিরল
আমার শরীরে সেই ছোঁয়া লেগে আছে অবিরল
আমার শরীরে সেই ছোঁয়া লেগে আছে অবিরল

নিজের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকি। তাহের বেন জলুন বলেছিলেন, বেদনাই সব প্যাশনের কেন্দ্রে। সব প্যাশনের মোটর আছে। ওই বেদনায়।

বেদনা, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? সমাজ থেকে রাজনীতি থেকে চুইঁয়ে আসা রক্ত ও মৃত্যুর বেদনা, তাই হয়ত আমার কাছে প্রকৃত কবিতার ইন্ধন। মোটর চলছে ঘুটঘুট করে, ঘড়ঘড় করে। মোটরটা চলছে বলেই লেখাতে চুঁইয়ে আসছে প্রকৃত রক্তক্ষরণ। প্রকৃত চার্জ। কবিকে কবি বলে চেনা যাচ্ছে। কবিতাটা পলকে আমার হয়ে উঠছে কারণ কবির আত্মার স্পর্শ, বেদনার স্পর্শ লেগে আছে লেখাটায়।

শঙ্খ ঘোষ সহজ কবি, সহজ ভাষায় লেখার কবি, নিখুঁত নির্মাণের কবি, তেমন বড়

কবি না অমোঘতার কবি, এত কথা জানিনা। অন্য বইতে শ্লেষ, অন্যের বাচনে কথা বলা কবি বড় নিরাভরণ, নিজের ভাষা ও নিয়তির কাছাকাছি, দায়বদ্ধ এখানে। মনে করিয়ে দেন রুমির কবিতা। মনে করিয়ে দেন কাতরতাবিদ্ধ ধ্বংস আতুর গালিব। মনে করায় আরশিনগরের খোঁজ করা লালন সাঁই। মনে করিয়ে দেন সুফি কবিদের। নীরবতাকে ভাষা করে তোলেন। শান্ত স্বরে বলে যান অশান্ত পৃথিবী। মায়াঞ্জনে পৃথিবী হয়ে যায় পরিস্তান। দৈনন্দিন হয়ে যায় নিরবচ্ছিন্ন অনৈসর্গিক। তার প্রতি বিন্দু থেকে আসে কোন অলৌকিকের স্পর্শ।

আমার অন্তত সেইরকম মনে হয়। গন্ধর্ব এখানে অভিশপ্ত, পর্বতবাসী। গন্ধর্ব এখানে আমি। কবি নিজে। এবং ফলত পাঠক। গন্ধর্ব এখানে আসছে চায়ের দোকান, কলকাতার গলিপথ ছুঁয়েই। কিন্তু এসে ডানা মেলে বসছে জলের কাছে, হ্রদের কাছে।

আয়নার কাছে।
গন্ধর্ব, উন্মাদ, তুমি অর্থহীন হাতে উঠে এসে
জলমণ্ডলের ছায়া মাখিয়ে গিয়েছ এই মুখে
তবু আজও বৃষ্টিহারা হয়ে আছে সমস্ত প্রবেশ
আমারও পায়ের কাছে চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে।
আমি সর্বনাশ দিয়ে সর্বনাশ বাঁচাতে গিয়েছি
হাত ছুঁতে গিয়ে শুধু আগুন ছুঁয়েছি, আর তুমি
শূন্যের ভিতরে ওই বিষণ্ণ প্রতিভাকণা নিয়ে
আমার মুখের দিকে চেয়ে আছো বিষম পাহাড়ে।
গান কেউ অন্ধকারে নিজে নিজে লেখেনি কখনো
আমাদের সকলেরই বুকে মেঘ পাথর ভেঙেছে
সে শুধু তোমার জন্য, গন্ধর্ব, তোমার হাত ছুঁয়ে
এই শিলাগুল্ম চিরজাগরূক বোধ নিয়ে আসে। (১নং)

কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতারাজ্যে : "এও এক ব্যথা উপশম"

জয়গোপাল মন্ডল

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত কবি শঙ্খ ঘোষ। বাংলা ভাষা সাহিত্য ও বাঙালির অহংকারও তিনি। ১৯৩২ সালের ৫ফেব্রুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীন ও পরাধীন ভারতবর্ষ দেখার অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর কবিতালালন। জীবনের সূচনা থেকেই তিনি সমাজচেতন, রাজনীতিচেতন ও প্রতিবাদী। অবশ্য কখনো কখনো নিশ্চুপ থেকেছেন। কারণটা স্পষ্ট জানুয়ারি ২০২০ তে প্রকাশিত সীমান্তবিহীন দেশে দেশে কাব্যগ্রন্থের বিদায় কবিতায় : "ভেবে দেখতে গেলে আমরা হয়তো এতদিন ধরে /কেউ কারো ভাষাই বুঝিনি / জ্বলন্ত জগৎ, তার পিছে পিছে আমরা হেঁটে গেছি শুধু / ঘুমন্ত রোবট।"" প্রশ্ন জাগে, অবশেষে বৃষ্টি কি নেমেছিল? অবশেষে থামব কোথায়? অবশেষে বুঝেছি এ রাত ক্রমান্বয়, দেখেও ঘুমিয়েছি সারাজীবন। কখনো সন্দ জাগে সব আয়োজন পুরস্কারের! নাকি লোকদেখানো? এভাবেই শাশ্বত তিমির, রাজার অনুচর শয়তানের চেলা। সেই আদ্দিকাল থেকে আজও চুপ থাকে বনও মনও, বাঘেরা যেভাবে মারে হরিণ, কিংবা সিংহেরা বাকি সব। তবুও নিজস্ব প্রত্যয়ে কখনো ফিরে আসা, চেতনায় অবিচল অটল। তিনি মুখর ও অপরাজেয় প্রত্যয়লিপির কবি। তাই যেন দোলা দিয়ে উঠে বলেন, "কে বলে আমরা চলিষ্ণু নই আজ? / শরীরে কেবলই বয়ে চলি ক্ষয় ক্ষত? / আমরা কি শুধু বে-হদিশ বে-সমাজ? / দেশে দেশে ঘোরা শরণার্থীর মতো?" আন্তর্জাতিক হয়ে উঠলেন। সমগ্র পৃথ্বির যেন একই মুদ্রা। স্বপ্ন এখনো আছে ধরা "এখনও হঠাৎ হাতে হাত রাখলেই / মনে হয় বুঝি বিদ্যুৎ ঝলকালো।" কখনো তীব্র দমকে মাথা উঁচু করে বিদ্যুৎ-চোখ ঝলকায়, কখনো মনে হয় 'আমি ভেসে যাই জলস্রোতে'। "এমন করুণাহীন দিনগুলি কত দূরগামী। কীভাবে তোমাকে আজও বিশ্বাসভাজন ভাবে লোকে?" নানা সন্দ বিচিত্র মন্দ ঘিরে আছে মন। তার মধ্যেই কবিতার সংকলন।

কবিতার প্রয়োজনে, বিষয়ের অভ্যন্তরীণ নিবিড়তায় বিবাদকে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও সহন সৌন্দর্যে পল্লবিত করতে করতে প্রকাশভঙ্গিতে এসে যায় নাটকীয়তা। "কথা বলতে বলতে চলেছেন দুজনে' (গুরুশিষ্য সংবাদ) আর পরস্পর সংলাপে নীতিহীন গণতন্ত্রের কঙ্কালসার চিত্র দেয়ালে সেঁটে দেয়— এ যেন কবির সহজাত স্বভাব। কার বিচার কে করবে, কী চায় কোন কুয়াশায়! 'যাবজ্জীবনের দণ্ড', নাকি 'উপঢৌকনের ভারে' যদি দাও বুঁদ করে, আত্মহারা সে শাসক যদিওবা অসন্তোষ রাখে, তা থাকবে গুপ্ত— বিরোধীহীন 'রাজ্যপাট' নাকি সমৃদ্ধ করে গণতন্ত্র! শাসকের অঙ্গুলিহেলনে চলবে অমাত্যেরা — 'তুমি যা শুনতে চাও অমাত্যেরা শোনাবে সেটাই।' —এ কি কবির সহজ অথচ গহন কটাক্ষ নয়? যখন উচ্চারিত হয়

কাব্যভাষায় শাসকের কণ্ঠস্বর 'যে তাতে সন্দেহ করে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে স্থির দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে এসো। —তাকে' —এমন নিপুণ শ্লেষ সেই সূচনা থেকে আজও চলে। কবি যে এখানে 'একাকী' — তাই শাসকের ভয়, শাসকের জবানীতে ফুটে ওঠে কবির স্বগত স্বভাব 'অনুবর্তী সবাইকে ভিতরে ভিতরে শুধু একে একে একা করে দাও।'

এত সহজ অকপট ঋজু ভঙ্গি — সহজগম্য, অনুকূল উচ্চারণ — যেন ঋষভের স্বর, আজীবন ঋষিকল্প—যাপন, এমন উচ্চরব শঙ্খধ্বনিতেই সম্ভব। শাসকের প্রকট রূপ অমানুষিক শোষণ চতুরতা সুস্পষ্ট — 'একহাতে লোভন আর অন্য হাতে ত্রাস কখনো প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কখনো—'

সুতরাং কবির সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সরল — 'গণতন্ত্র তন্ত্র মাত্র, গণ শুধু শোভা গতি দিতে পারে তাকে তোমারই নিজস্ব কোনো প্রভা।'

—কে কাকে গতি বা বেগ দিতে পারে, গভীরেই বক্রোক্তি অথচ তীব্র শ্লেষ প্রতিপাদ্য। —এভাবে দুই সচেতন নাগরিক, কবিও একজন—'আঙুল ট্রিগারে' রেখে চলেছেন।

প্রগতির সমুদ্র-পাড়ে— ইচ্ছে যেন এক্ষুনি শেষ করে দেবেন সমস্ত অগণতান্ত্রিক শোভনীয় লালসাকে। মহৎ কবিই এভাবে মধ্যবিত্তমদিরাকে জয় করেন। তাই তো উচ্চৈশ্রবা — উচ্চৈঃস্বর 'বহুকাল থেকে শুনি অসির চাইতেও না কি মসি শক্তি বড়ো' কোথায় সে মনীষীর মসি'? এ অন্বেষণ চিরকাল কবি শঙ্খ ঘোষের। তাঁর প্রকাশ যেমন সরলমতি, সচেতন নাগরিকের ঋজ্বায়ত — সরলদীর্ঘ, উচ্ছ্বাস যেমন স্পর্ধাস্ফুট —ঋষিতুল্য, তেমনি তাঁর কাব্যভাষা সরলদেহ—ঋজু, সহজবোধে সহজগম্য—মিতাক্ষরা। অনশ্বর তাঁর চিন্তন, উপমারহিত, অনুপ — অদ্বিতীয়। সমাজের কঠিন ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তাঁর মননে অনন্য বিস্ময় মূরতি লাভ করে — এই পৃথিবীতে কুয়াশা — কৃত্রিম শাসকের গড়া, তাদের লক্ষ্য;

"থাকবে না নবীন প্রজনন, জন্মাবে না কেউ কোনোখানে
থাকবে শুধু এই মহাস্রোত",
পাহাড় ভেবেছো যাকে সে তো শুধু
দিবাহীন বিভাহীন নগ্নকায় কিশোর-কিশোরী যত অযুত-নিযুত
আর যত পঙ্গু শিশুদল —
ওদেরই সারাৎসার নিয়ে আজ ধাইছে
ওই একমাত্র বেগবতী নদী।"

কবি যে চাননি, চায় না এ পৃথিবীর সাধারণ মানুষ, তবুও চলে 'বেগবতী নদী'। কবির হাতে অস্ত্র একমাত্র 'মসিই' — লেখার কালি অক্ষরের রূপ। ক্ষুরধার কলমে অস্ত্রের ঝলকানি, তাই তো নিরলস চিঠি লেখা, কবিতা—আশ্রমে বাস, সাদাপাতার মতো আলস্যহীন শব্দোচ্চারণ— 'এ চিঠি লেখার কোন মানে হয় না — তবুও লিখে যাই এও এক ব্যথা উপশম'।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

তাঁর বিশ্বাস 'অসির চেয়ে আজও যে মসিই বড়ো', তাই দিয়ে 'সরল করুণ' রজ্জুতে 'সিলিংএ লটকান' যেভাবে মানুষের চিতা জ্বলছে, সে চিতার তাপে যেন কবিমন দহিত, তাই রেখা বলতে কলমের রেখা, আর 'রেখা বলতে মনে পড়ে অসি।' যখন সবকিছু অন্ধকারে, পথ রুদ্ধ, অসহায় মানব বাকরুদ্ধ — তখন গোপন কক্ষ থেকে, কারাগার থেকে লেখা চিঠিই একমাত্র — ব্যথার উপশম আনে।

এই 'অক্ষরে অক্ষরে ঝুঁকে' দেখেন বিস্ময় চমক —
"মানুষ মানুষকে খুন করছে না গোটা একটা দিন —
এও কি সম্ভব হতে পারে?
সাংবাদিকরা ভুল করছে না তো?"

—কী তীর্যক কটাক্ষ! এ আধুনিক সমাজে মানুষ মানুষের মাংস খায়, শাইলকের ইহুদিরা যেন হার মানবে। নিত্যদিন সংবাদের পাতায় পাতায় মৃত্যু-মিছিল — মানুষের শব — মনুষ্যত্বের বলি — 'জঙ্গলে তবুও ভব্যতা আছে, 'বাঘকে খায় না বাঘ, সিংহকে সিংহেরা' কী ব্যাপার আজ! আশ্চর্য সকাল রক্তাক্ত সূর্য, অথচ সংবাদপত্র মৃত্যুহীন — এও কি সম্ভব! এ প্রতিপন্নকরণে কোন অভিসন্ধি! পাশবিক এই শোভনদৃশ্যে কবিমন আতঙ্কিত, শঙ্কিত 'মানুষ কি কখনোই অতদুর শোভাময় হবে?' তাই আহ্বান, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হোক 'অক্ষরে অক্ষরে ঝুঁকে' — কোন সত্যি আত্মগোপন করে আছে 'কোথায় লোলুপ কোন কৃপাণ বা ভল্ল ছুটে আসে ধর্মাতুর নরমাংসভোজে।'

কবি চান সময়ের গিরিখাত থেকে খোঁজা হোক লোলুপ পৃথিবীর বিষণ্ণতার খবর, ভোগলিপ্সায় উন্মত্ত মানুষের এই রূপ হায়না—বাঘের চেয়েও বেমানান সভ্যতা। কোন ইঙ্গিত বহন করে? সচকিত হও মানুষ এ কবির প্রার্থনা। আশঙ্কা দূরীকরণের ঋজু অন্বেষণ। লেখা হয় 'তিসরা ঝাঁকি', 'দুসরা ঝাঁকি ছিল বুঝি গুজরাতের অন্ধকারে, মুছে দেওয়া ন্যায়-অন্যায়।', 'তিসরা ঝাঁকিতে দিকে, দেখি, কোনখানে কালবুর্গি, কোথাও বা গৌরী লঙ্কেশের খরা জরা জলপ্রপাতে ভেসে যায় ভবিষ্যদেশের।' এ তো তীব্র বিদ্রূপ — স্বাধীনতার সত্তর বছর পর কবি ভাষ্যে 'সত্তর বছর পর, ঠিক ঠিক স্বাধীন সবাই গরিবী কোথাও নেই, ভুখা নেই কোনোখানে, সামনে শুধু আচ্ছে দিন।' —লক্ষ্য কেন্দ্রিয় শাসক। আসলে এ রূপে—অরূপে অন্যতর পরাধীনতা — একটা রাজনৈতিক স্লোগানকে কবির দ্ব্যার্থবোধক কঠোর কটাক্ষ, তির্যক ব্যাঙ্গোক্তি নয় কি? যে বা যারা ছিল গুজরাট দাঙ্গার নায়ক শ্মশানভূমিতে শুয়ে ছিল গোটা একটা ট্রেন, 'করসেবক'— তারপর গোটা একটা সম্প্রদায়, মুছে গেল সেই 'ন্যায় — অন্যায়'। চাড্ডখানি কথা নয় — বুকের পাটা রাখেন কবি — 'তিসরা ঝাঁকিতে' সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের মৃত্যু — চতুর্থ স্তম্ভকে গুঁড়িয়ে দেওয়া — দেশের চিত্র বদলে দেওয়ার নবীন স্বাধীনতা 'গলায় মুণ্ডুর মালা, তাথৈ তাথৈ নাচে গোটা দেশ হয়েছে ভাস্বর

—' —কথাটা সত্য, দীপ্তমান—সত্যভাষী স্বর পাঠকের চোখে—মানসে স্পষ্ট প্রতীয়মান, ভাস্বতী 'শববাহক' একবিংশ শাসক।

সাধারণ বিশ্ব চিরকাল নিদ্রাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে কৃষ্ণমেঘে ঢাকে আকাশ অতল সংকট, তবু প্রত্যেক দরজায় একমাত্র কবিই সজাগ প্রহরী — যেমন শঙ্খ ঘোষ। নির্দ্বিধায় বুক চিতিয়ে বলেন,

'ভয় করলেই ভয়, কিন্তু ভয় কিসের আমাকে যদি মানো।'

এমন ট্যারা কথায় বাঁধা তারে সুর ওঠে শান্ত — অথচ বড় জ্বালাময় শাসকের শরীরে, ইতিমধ্যে দুই হাজার ষোল — জ্ঞানপীঠ অর্জিত, ফের সুর ঝাঁঝালো, কখনো অধীর — কখনো প্রখর দীপ্তিতে মেরুদন্ড সোজা করার ডাক। যেভাবে দেয়ালে লটকে দেয় বিরোধী স্লোগান, সেভাবে যেন কবির তলোয়ার আলতো করে রাখা' 'ক্রসওয়াইজ'— প্রত্যক্ষত কোনো ভয়ঙ্কর শাসক—দমক এলে কবি শিরদাঁড়া সোজা রাখেন সেই শুরু থেকে। যখন উচ্চারিত হয়—

'আমার স্বচ্ছতা আজ বহুদূর থেকে চেনা যায়
নদীতে রূপোলী মাছ, সুনীল আকাশে হলদে পাখি
ভেসে থাকে আমরাই প্রভায়—'

'ক্রসওয়াইজ' অস্ত্রশস্ত্রের নিপুণ ছবি শঙ্খনাদে প্রজ্ঞাপক বাণী : অত্যন্ত সতর্ক, 'বাঁশ না ভাঙ্গে অথচ সাপ মরে' এমন নির্মম শ্লেষোক্তি —

'প্রত্যেক দরজায় শীর্ষ লক্ষ্য করো, পাঠ নাও,
তার পরে বাঁচো—'

গণতন্ত্রের তন্ত্রে যেন মন্ত্রপূতঃ গোটা দেশ। সাড়া—ইশারায় —ঘোরে মাথা ও মস্তিষ্ক কেউ বলে 'খেলা হবে', কেউ 'খেলা হোবে' — কারো কণ্ঠে বৈষ্ণবী মালা', কারো পছন্দ বিবেকানন্দ' শঙ্খ ঘোষ নিক্তি কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

'এ খেলার সবে শুরু, এখনও অনেক বাকি খেলা।'

—একথা প্রকাশিত ডিসেম্বরে দুহাজার সতেরো। ভাবো। যত্রতত্র খোল করতাল সহযোগে দুহাজার একুশ কী খেলা দেখালো। শোভাযাত্রা চলেছে, শিশুরা ভাবে — 'দেখবে চলো ভূতের খেলা — দুপুরে ভূতে মারে ঢেলা।'

'যুবদল মেতে থাকে খাপখোলা ঝলকে, মাদকে' — সুরা মদমত্ত করে রাখে অনুচরেরা — মত্ত অনুপ্রেরণায়— যখন চেতন হয়, চোখ খুলে দেখো বীভৎস রূপ — বসে আছে কে ও? — 'ঈশ্বরীর ডান পাশে বসে আছে শয়তানের চেলা?', 'বিষগ্যাসে ভরে যাওয়া আজ এই ঘোর ভোরবেলা।'

সমকালীন রাজনীতির কী অপরূপ কাব্যভাষ, যথার্থ চিত্রকর যেমন রঙ—তুলিতে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ফোটায় বোধমালা, শঙ্খ ঘোষের শঙ্খনাদে— শব্দমেলায় ধ্বনিত প্রখর দাঁতাল দীর্ঘ নখবিশিষ্ট শাসকের হুঙ্কার।

কবিমন ব্যথিত, জরাগ্রস্ত, আতঙ্কিত ঘরে-বাইরে কাছে—দূরে সবাই চেলা—মেলায় সাজিয়ে রেখেছে এই আচ্ছে দিন আর খেলার মানচিত্র।

জীবনে এই 'ধ্বস' কেউ কি পারে ঠেকাতে। যদি সব মন বেপথগামী হয়। 'কী ঘটে কী ঘটে' যতই পরিত্রাহি রব ওঠে — 'জনার্দন' কে, কে বলবে আজ। এভাবে আত্মগ্লানি—আত্মধিক্কার করার স্পর্ধা ক'জন কবির আছে — নিছকই 'কৌতুকে' কাটে দিন। কে কার দিকে ঝুঁকে আছে যায় না বোঝা,

'ধ্বস' কবিতায় 'বাড়িটা পেছনদিকে ঝুঁকে গিয়ে স্থির হয়ে আছে। গ্রিলখোলা জানালার মুখ প্রায় যেন আকাশের দিকে চেয়ে আছে প্রার্থনার মতো।' —এ তো অসহায় জনগণ, একটু পরেই হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে সর্বনেশে বানের জলে অবিরত। কে ভাবে কার কথা। উঠে আসতে চাইলেও দিশাহীন 'ফুল্ল শিশু', হাহাকার এই ভূকম্পনহীন দুর্ঘটনায় যেন যীশু। সব আয়োজন ছিল, আনন্দ যজ্ঞের — কিন্তু বন্দী সব জীবন, রোগে—ভোগে আর অনন্ত বেড়ি—গণতান্ত্রিক সরকারের। 'চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না এ ঘরের গিন্নি', আর 'আমি', আমরা সবাই গভীর ঘুমে লীন — চড়া বিদ্যুতের ঝলকানিতে একটুও টোল পড়েনি স্বার্থপরতায়, ঠাহর করতে পারা যাচ্ছে না — এ জনতা কোন দিকে ঝুঁকে — 'এইবার বাড়িটা গড়াবে কোন দিকে'— কী সুবিধা, গদি উল্টে গেলে পাল্টে গেলে, পাল্টে গেলে এই 'আমি'রা রাতারাতি প্রেরণায়—অনুপ্রেরণায় জামা পাল্টে ফেলে, রঙ ইচ্ছামতো গায়ে মাখে।

'এই মহান মিলনোৎসবে — অনুপ্রেরণায়। সগৌরবে।' —এই নিখুঁত বর্শাঘাত কাকে বিদ্ধ করে, বুঝতে অসুবিধা নেই কোনো অবসরে। তাই কবিতায় 'আমি'র স্বর প্রতিধ্বনিত বারে বারে — 'কী বলতে কী বলে ফেলব, চুপচাপই বেশ—' তারপর দুটি কবিতা — 'কৌতুক', 'ধ্বস' পাশাপাশি দুটো পাতায় — এ তো আত্মদর্পণ নির্মাণ, নাকি আত্মদর্শনের মৃত্যু দর্শন? ব্যাঙ্গের চাবুক — শুধু অসাধারণ নয়, সমাজ সচেতন, রাজনীতিক কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

প্রশ্ন জাগে, তুমি থাকবে কার প্রেরণায়? নাকি যাবে শশানভূমিতে — মানসিক বিষণতায় সেখানে শুধু লেখা 'অনুপ্রেরণায়'। যেখানে 'মানুষের মাংসপিণ্ড থিকথিক জমে আছে মানুষেরই শবের উপরে।' নব্বই ছুঁই ছুঁই তখন, তবুও অবশিষ্ট এক—কালের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আমরণ ডাক দেন— 'যা হবার হবে, এসো আজ মিলে যাই এ মহান মিলনোৎসবে — অনুপ্রেরণায়।' এমন কটাক্ষ কি সহনীয়? কিন্তু শাসকের ভাবটা এখন শাশ্বত প্রবাদ প্রবাহ : পিঠে বেঁধেছি কুলো কত কিলোবি কিলো।

এরপরেও তাই টনক নড়ে না জগতের। কোথায় এল নির্বাণ? এত্ত বাহ্য। কবির দর্শিত

পথই তো প্যাগোডা। মননে যে শব্দগুলো, কবিতাভাষ — তার ব্যঞ্জনা 'স্বহস্তে এঁকে দিয়েছে রৌদ্র।' গোয়েন্দাছবিতে যেভাবে আঁকা থাকে রন্ধ্রগুলি, শঙ্খ ঘোষের কবিতার আঙিনায় সেভাবেই লেখা — 'এও এক ব্যথা উপশম'।

কাব্যচর্চার সূচনা থেকে একটু অন্য মাত্রা থাকলেও জীবনের সুর সেইকাল থেকে একই আজও প্রায় সব কাব্যের 'রিংটোন' একই — 'গণতন্ত্র? গণতন্ত্র তন্ত্র মাত্র, গণ শুধু শোভা গতি দিতে পারে তাকে তোমরাই নিজস্ব কোনো প্রভা'। কবির কাজ কবিই করেছেন— আজীবন ঠারেঠোরে, কৌতুকে—ব্যাঙ্গে—সরল ঋজুতায় দ্রোহের অবিকল্প নির্মাণ। —'ওই দেখো কৃপার বাতাস বইছে সবদিকে, পাল তুলে দে না—'

অসহায় হ'তে হ'তে মানুষই প্রান্তিক, আর সাথে আছে কবি। পিষ্ট শস্যভান্ডারের মতো যে মাটি মানুষের, প্রকৃতির তাকে অধিকার করে নিয়েছে সিংহাসনের তেজ। কিন্তু কেন? এ প্রশ্ন করবে না? কবি দেখলেন, কেউ করেনি — সবাই 'আমি'। কবি শঙ্খ ঘোষের মতো ঘোষিত হও — চেনাও তোমার কণ্ঠস্বর, কারণ এই তাঁরই অভিপ্রেত। কবিতার পর কবিতায় কখনো বাঁকা রেখায় কখনো সোজাসাপ্টা — কৌতুক ছলনায় — কখনো সরাসরি বিবরণে — সমকালের পূর্ণ প্রতিমা নির্মাণে সে নিরঞ্জনের নয়, সুখে নয়, অবিরত মানসিক যন্ত্রণায় — মানবিক আর্তিতে বিদ্রোহের বিস্ফোরণ — তারপর আক্ষেপও : "পিছোতে পিছোতে শুধু পিছোতে পিছোতে কেটে গেল গোটা এ জীবন।'

এরপর কবির বয়স অষ্টআশি, মন বলে —এবার আসি, যেতে হবে সময় হলেই। তবু যখন 'একটা ভাঙা লাঠি হাঁটার সম্বল', তখনও কবি সুভাষ যেমন 'মৃত্যুর গলায়' পা দিয়ে চলতে চেয়েছিলেন, তেমনি শঙ্খ ঘোষও বেঁচে থাকার চেতন দিয়ে যেতে চেয়েছেন — চোখ তাঁর খোলা প্রহরীর মতো, চেতনালুপ্ত চারিধার — "শুধু আশা পায়ে লাগে তৃণাঙ্কুর, মাথায় তবু তো কিছু নীলিমা ছড়ানো ""— বাকি তো সুস্পষ্ট — 'সামনে হাজারে-হাজারে লোক দৃষ্টিহীন হেঁটে যাচ্ছে ঠিকানা খোঁজার অভিযানে। উঠে পড় চল'। এই অন্ধকার বিপর্যস্ত পৃথিবীতে কবি তো একা। রেখেছেন মান সভ্যতার। যদিও 'পথে পথে রিপু ভয়', সেই থেকেই যখন থেকে কবির কবিজীবন শুরু। ভাবতে অবাক লাগে — প্রতিটা যুগই তো তিমিরাগ্রস্ত, 'রক্তাক্ত ঝরোখা', 'অবজানো দুয়ারগুলি'। কবির 'আমি' যে ঝড় হয়ে উঠতে চায় — 'যে—কোন মুহূর্তে আমি খুন হয়ে যেতে পারি ঠিকই, তবু তো বলতেই হবে কথা।' —যেভাবে নজরুল ইসলাম কখনো ধরেছেন অস্ত্র, কখনো বা মসি। এভাবেই চলেছে —

'কবিদেব, কেবল বেদনা আহা কেবল বেদনা বুঝি ভালোবাসে হৃদয়' —এ তো একালের দীর্ঘশ্বাস। কেন উচ্চারিত হয়েছিল সেদিন, যেদিন তোমার স্বাধীন সূর্য দিয়ে ছিল নবীন গৌরব — 'রাত্রি তুমি আমাকে আর করো না বারে বারে পুঞ্জিশব গলিতমুখ'? সেদিনও

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

তো বলেছিলে, "নিভন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে, আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি বাঁচার আনন্দে'। আর আজও শতক বদলালেও একই প্রত্যাশা, চাইছ 'আগুনমালা', যুদ্ধে যাবে — 'পথে পথে রিপুভয়', তাই কেমন উদ্ধত শির 'আজ আমি গরীয়সী গুপ্ত রাখা লঙ্কার গুঁড়োয়।' এই হলো একুশ শতকের কাজ। চিরবিদ্রোহে কেটে গেল জীবন কাঁধে রেখে ঢাল, যখন 'গোটা এ জগত শুনশান'।

তাহলে বদলাল না? স্বাধীনতার পরেও? কী করার আছে কবি? সূচনা থেকে শেষ 'গাছের ডালে অন্ধতা ঝুলানো আছে'—সবসময় একই আশ্বাস, একই ডাক, একই আক্ষেপ, তারপর অনন্ত প্রতীতী— 'স্কন্ধকাটা যুবকের দল সূর্যকিরণে ছটা ঘাড়ে' ঘিরে থাকে বসতবাড়ি সবার।

তুমি তো পেয়েছ পুরস্কার — পুরষ্কার, কী পেলো অন্ধ জনতা —'শুকনো পাতায়'? অবশ্য তোমাকে তিরস্কারও কম পেতে হয়নি, 'এ আবার কোন কবি'! তোমার জন্য খুব কষ্ট পেয়েছিল সচকিত পাঠকও। তবু 'শরীর ভর করে ওরা ছড়িয়ে দিয়েছে জীবনময়', আর 'ছায়াভরা অন্ধকার ঘর', 'চারদিকে ঘটছে কান্ড', নিজেকে কেবলই প্রবোধ দিয়েছ— 'সমন্বয়; এ সমন্বয়'!

একবুক ভরা বিস্ময় পাঠকের চোখে। 'উন্নয়নকালে এরকম দু-একটা কান্ড ঘটে যায় সোনা।' তোমারই কথায় হয়তো বা আমাদের কাজ শেষ — 'নেই নেই, কোনো কথা নেই, শুধু কোটেশন পড়ে আছে কিছু—'। এই কোটেশন আজও প্রতিধ্বনিত হয়। হয়তো সব কবির কামনা এভাবেই অনন্তকাল বাসনার মতো জেগে থাকে চিরকাল।

আদ্যন্ত এক জীবনশিল্পী : শঙ্খ ঘোষ

অঞ্জনা দেব রায়

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২ — ২০২১) আদ্যন্ত এক জীবনশিল্পী। তিনি যে- জীবনের কথা বলেন, তাতে নির্ভীক কণ্ঠস্বর যেমন পরিলক্ষিত তেমনই ভাবপ্রকাশ ঘটে স্পষ্টতম ভাবে। দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ সেখানে কোনও ভাবে নেই। তিনি কবি, অথচ কাব্যের সুষমামণ্ডিত কোনও নির্দিষ্ট ছকে নিজেকে কোনও দিন বেঁধে রাখেননি। বরং কাঠিন্য রূঢ়তার মধ্য থেকে মন্থন করে গেছেন অমৃতসমান মানবজীবনের নানা অনুষঙ্গকে। তাঁর রচনা তাঁর ভাবনা মুদ্রিত অক্ষরের পরিচিত পরিসরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে পড়েছে এক বৃহৎ গণপরিসরে। সে পরিসর এতটাই বড়, তা দেশকালের সীমাও অতিক্রম করে গেছে সহজে। তাই তিনি শুধুমাত্র এক কবি নন, সৃষ্টিশীল মানুষ নন, তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলা এবং বাঙালির নিজস্বতার এক প্রতিমূর্তি। ভাষা সংস্কৃতি জাতি মেধা- এ সবকিছুর প্রতীক। আধুনিক সময়ে জাতিগতভাবে বাংলা এবং বাঙালির সমস্ত শুভ এবং হিতকরী ভাবনার তিনি অন্যতম উদগাতা। কাব্য সাহিত্যে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশের উত্তরসূরী।

শঙ্খ ঘোষের শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের পাবনায় চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ে। তিনি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনার সময় থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়া শেষ করে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। শঙ্খ ঘোষ সমস্ত কর্মজীবনে শিক্ষকতা করেছেন বঙ্গবাসী কলেজ, জঙ্গীপুর কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (সিমলা) সহ বহু শিক্ষা প্রতিশহানে। এছাড়া দিল্লী ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছেন।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবি প্রতিভার দ্বিমুখী চরিত্রে কবি জগতে লাভ করেছেন এক অদ্ভুত অনন্যতা। একদিকে তার কলমে দৃপ্ত শব্দে উঠে এসেছে কঠোর সামাজিক তথা রাজনৈতিক বাস্তব, সমাজের নিচু তলার মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা; আবার অন্যদিকে কোনো কোনো কবিতায় এই মানুষটিই ডুব দিয়ে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন মনের অবচেতনে। তাছাড়া অতি সরল কথ্য ভাষায় অসামান্য কবিতাগুলির সংযোজন তাকে পাঠকদের হৃদয়ের আরো কাছের করে তুলেছে। বাংলা কবিতার জগতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর রচিত 'বাবরের প্রার্থনা' 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ', 'দিনগুলি রাতগুলি', 'মিনিবুক', 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার', 'শুনি নীরব চিৎকার', 'এখন সময় নয়', 'হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ', 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ', ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলি বাঙালি কবিতাপ্রেমীদের মনের

অন্দরমহলে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। কবি ও সাহিত্যিকের পাশাপাশি একজন প্রাবন্ধিক হিসেবেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। শঙ্খ ঘোষের লিখিত 'উর্বশীর হাসি', 'শব্দ আর সত্য', 'এখন সব অলীক' 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', 'নির্মাণ আর সৃষ্টি', 'ছন্দময় জীবন', 'কবির অভিপ্রায়', 'সামান্য অসামান্য', 'অল্প স্বল্প কথা', ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ছোট ও কিশোরদের জন্যে লেখা 'সব কিছুতেই খেলনা নয়', 'আমন ধানের ছড়া', 'রাগ করোনা রাগুনী', 'বড় হওয়া খুব ভালো', 'ছোটদের ছড়া কবিতা', ' ইচ্ছে প্রদীপ', 'কথা নিয়ে খেলা', 'ছোট্ট একটা স্কুল', 'আমন যাবে লাট্টু পাহাড়', ইত্যাদি গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'সকাল বেলার আলো', 'সুপুরি বনের সারি'। অন্যদিকে বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার রচিত 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থ।

১৯৫২ সালে সম্ভবত 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের প্রথম কবিতা 'যমুনাবতী' নাড়িয়ে দিয়েছিল আপামর কাব্যপ্রেমীকে। কবিতাটার কিছু লাইন হল-

'নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে ,
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে !

নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী-
দুয়েক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দিই!

হায় তোকে ভাত দেবো কী করে যে ভাত দেবো হায়
হায় তোকে ভাত দিই কী দিয়ে যে ভাত দিই হায়'

এবং

'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে !
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ-পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ গিয়ে !
নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফলেছে !'

কী অসামান্য কবিতা। এক কিশোরীর মৃত্যু এখানে উপজীব্য। সেই কিশোরী যে মারা

যায় পুলিশের গুলিতে এক ভুখা মিছিলে গিয়ে। ভাতের জন্য মৃত্যু , যার ভাতের সন্ধান তাকে এনে দেয় গরম বস্তু তবে ভাতের বদলে সেটা সীসার বুলেট। সব সুখ-স্বপ্ন বারুদের কাছে , মৃত্যু এসে হাত ধরে। এখানে নিভন্ত চুল্লিকে করে তুলেছেন এক কিশোরীর দহনে দাউদাউ চিতা। আবার সেই কবিই পরিণত বয়সে যমুনাবতীর চল্লিশ বছর পর লিখলেন আরেক অমোঘ কবিতা 'ন্যায় অন্যায় জানিনে'।

'তিন রাউন্ড গুলি খেয়ে তেইশ জন মরে যায়, লোকে এত বজ্জাত হয়েছে !
স্কুলের যে ছেলেগুলো চৌকাটেই ধ্বসে গেলো, অবশ্যই তারা ছিল সমাজবিরোধী।
ও দিকে তাকিয়ে দ্যাখো ধোয়া তুলসিপাতা
উল্টেও পারেনা খেতে ভাজা মাছটি আহা অসহায়
আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছু জানেনা বুলেটরা।
দার্শনিক চোখ শুধু আকাশের তারা বটে দ্যাখে মাঝে মাঝে।
পুলিশ কখনও কোনও অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার
পুলিশ'।

কী দুর্দান্ত মুন্সিয়ানায় প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে এখানে। আক্রমণ এখানে শাণিত কিরীটের মত চিরে ফেলে সরাসরি। তিন রাউন্ড গুলিতে তেইশ জনের মৃত্যু ! কিভাবে প্রতিবাদ করতে হয় সেটায় শঙ্খ ঘোষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'পুলিশ কখনও কোনও অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ' — একেবারে নগ্ন করে দেওয়া রাজনীতির মুখোশ খুলে। কারণ '৪৭-এর আগে না বরং অব্যবহিত পরেও স্বাধীন পুলিশের, স্বাধীন বুলেট, স্বাধীন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে দ্বিধা করেনি, করেও না, করবেও না।

'বাবরের প্রাথনা' কাব্যগ্রন্থের আরেকটি কবিতা 'বিকল্প'। যেখানে লেখা হয়েছে —

'নিশান বদল হলো হঠাৎ সকালে
ধ্বনি শুধু থেকে গেল, থেকে গেল বাণী
আমি যা ছিলাম তাই থেকে গেছি আজও
একই মত থেকে যায় গ্রাম রাজধানী'

নির্বাক হয়ে যেতে হয় পড়লে। সাম্প্রতিকের থেকেও সাম্প্রতিক হয়ে থাকে এই অমর লাইন। সত্যিই তো কিছুই পাল্টায় না। আলো আছে যার, থাকে তার। যে তিমিরে থাকে, সে তো আরও অন্ধকারেই ডুবে যায়। রাজা আসে, রাজা যায়; আমরা জাবর কেটেই দিনগত পাপক্ষয় করি।

অসংখ্য কবিতা, তার অসংখ্য লাইন। আজ যখন চারিদিকে সময়ের সাথে সাথে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে তখন একই থেকে যাচ্ছে নষ্টামি, অস্থিরতা। অত্যাচার, শোষণ আসলে ধ্রুবক। এগুলো একই থাকে শুধু জামার বদল হয়। কবিও তাই কখনো কখনো অস্থিরতায়,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

দোলাচলে ভুগতে থাকেন। দিনের শেষে কবিও হয়তো আদ্যন্ত এক পরাজিত মানুষ। তাই অসহায় উচ্চারণে লেখেন —

'এত যদি ব্যূহ চক্র তীর তীরন্দাজ , তবে কেন
শরীর দিয়েছ শুধু, বর্মখানি ভুলে গেছ দিতে!'

এভাবেই আপাতঃ শান্ত, আদ্যন্ত ভদ্রলোক এই কবির কলমে ভরা থাকে প্রতিবাদের বারুদ। যিনি তাঁর লেখনীকে ব্যবহার করেন এক অনিবার্যতায়, সেই এক এবং অনন্য কবি শঙ্খ ঘোষ। আমরা যাকে পাই প্রেমে ও অপ্রেমে, বিক্ষুব্ধ শাণিত তলোয়ারে।

শঙ্খ ঘোষ রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকে কোনদিনই সুবিধাবাদী দলভুক্ত ছিলেন না। যখন যে জিনিসকে তিনি ঠিক বলে মনে করেছেন, তাকেই তিনি সমর্থন করেছেন মুক্তকণ্ঠে। তাঁর কলম যেমন রাজনৈতিক মানবপ্রেমের স্তুতি করেছে, তেমনি মুখর হয়েছে কখনো সুবিধাবাদী, কখনো জনবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধেও। তাঁর সাহিত্য সাধনা থেকে শুরু করে সমগ্র জীবনযাপনের মধ্যে বারবার প্রকাশ পেয়েছে সচেতন রাজনৈতিক সত্তা। তাঁর রাজনৈতিক কবিতা কিংবা প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর রচিত 'লাইনে ছিলাম বাবা' রাজনৈতিক কাব্যগ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। এই কাব্যগ্রন্থকে কবি অলংকৃত করেছেন বিস্ফোরক সব রাজনৈতিক কবিতা দ্বারা।

শঙ্খ ঘোষের সমগ্র জীবনটাই অসামান্য সব কমে অলংকৃত। তাঁর সকল অপূর্ব সৃষ্টিগুলির জন্য সমগ্র জীবনে অসংখ্য পুরষ্কার লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৮৯ সালে 'ধুম লেগেছে হৃদয় কমলে' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান। ১৯৯৯সালে 'রক্তকল্যাণ' শীর্ষক একটি অনুবাদের জন্য তিনি আবার সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান। ওই একই বছরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দেশিকোত্তম পুরস্কারে সন্মানিত করে। ২০১১ সালে ভারত সরকার তাঁকে ভারতবর্ষের তৃতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সন্মান পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করে। আবার ২০১৬ সালে তিনি স্বনামধন্য, সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান।

২০২১ সালের করোনা মহামারী বাঙালির হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে শঙ্খ ঘোষের মতন প্রবাদপ্রতিম প্রতিভাকেও। তবে সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি যে অমর সৃষ্টিগুলি রচনা করে গিয়েছেন, সেগুলি চিরকাল তাকে বাঙালি পাঠকদের হৃদয়ে অমর করে রাখবে।

সম্পর্ক ৪৪

শুভঙ্কর দে

সবাই বলছেন আমাদের সেবা করবেন। টিভির প্রতিটা খবরের চ্যানেলে সব নেতারাই বলছেন আমাদের সেবায় তাঁদের বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। আমরা শুধু বোতাম টিপব। আগামী পাঁচ বছর জয়ী নেতা আমাদের উজাড় করা ভালোবাসা দেবেন আর সেবা করবেন।

শঙ্খ জেঠুর একটি কবিতার বই প্রকাশ করেছিলাম ২০১২ সালে। 'গোটাদেশজোড়া জউঘর'। লিখছেন-

'সবাই আমার ভালো করতে চায়।

ওরা এসে আমার ভালো করতে চাইলে
ঘর ছেড়ে এগিয়ে যাই
ওরা কেটে নেয় আমার ডান হাতখানা
ঝুলিয়ে দেয় গাছের ডালে

এরা এসে আমার ভালো করতে চাইলে
মাঠ ছেড়ে এগিয়ে যাই
এরা কেটে নেয় আমার বাঁ হাতখানা
গেঁথে দেয় আলপথে
তার পর . . .'

ঘণ্টাখানেক টিভি দেখতে দেখতে সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। ভোটের দিন সাত সকালেই দাদু ধুতি পাঞ্জাবি পরে তৈরি। তখন আমি নেহাতই ছোট্ট এক বালক। জেদ ধরি আমিও ভোট দিতে যাবো। সেই আটের দশকে দাদুর সঙ্গে মফস্বলের একটা স্কুল বাড়িতে প্রথম আঙুলে কালি মাখি। তখন বুঝিনি নাগরিকত্বের প্রমাণ আঙুলে কালি লাগানো।

তখন মহেশতলার ব্যানার্জিহাটে থাকতাম। বালতি বালতি জল রং। লাল হলুদ কালো। কখনো বাঘের ছবি, কখনো কোদাল, বেলচা, হ্যারকিনও মনে হয় ছিল। আর ছিল কাটা হাত ও কাস্তে সঙ্গে হাতুড়ি অথবা ধানের শীষ আর তারা। জোড়া বলদের ছবিও ছিল। এই ছবিগুলো সবই দেখতাম দেয়াল জুড়ে আঁকা। ভোরবেলার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় ওপরের দিকে থাকতো 'তির্যক' নামে কার্টুন। কার্টুনগুলো এত মজার হতো, যে আমার এই ভুলো মনের মধ্যেও মনে থেকে গেছে। পরবর্তী সময়ে আজকাল পত্রিকায় প্রথম পাতায় থাকতো কুট্টির সেই বিখ্যাত কার্টুন। কুট্টির সেই কার্টুনগুলো নিয়ে আজকাল

থেকে বই হলেও 'তির্যক'-এর সংকলন এখনো প্রকাশিত হয়নি। দেয়াল জুড়ে ছবি আর নানান ধরণের ছড়া, তার নিচে লেখা থাকত এই চিহ্নে ভোট দিন। ছড়াগুলো ছিল বেশ মজার,

ভোট দেবেন কিসে
কাস্তে ধানের শীষে।

গড়তে দেশ রুখতে চীন
জোড়া বলদে ছাপ দিন।

আবার

জোড়া বলদের আটটা ঠ্যাং
কংগ্রেসকে মারো ল্যাং।

দিল্লি থেকে এলো গাই
সঙ্গে বাছুর সিপিআই।

এইরকম অজস্র লেখা থাকত দেয়াল জুড়ে। মিছিলে শোনা যেত 'ওটা কালো হাত, ওটা বুর্জোয়া হাত। ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও'। এখন মিলেমিশে সব এক। এখন আর গলার আওয়াজ পাওয়া যায় না এখন পাড়ায় পাড়ায় চলে ডিজে। কেউ বলে খেলা হবে, কেউ বলে টুম্পা সোনা, কেউ বলে বঙ্গে এবার বদল হবে। কি হবে না হবে জানি না, আমাদের নাকি ভালো হবে।

সেই আটের দশকে একঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টা এইগুলোর কোনো ব্যাপার ছিল না। ছিল একটাই ডিডি। দূরদর্শন। ভোট গ্রহণের দিন দেখাত কিনা মনে নেই তবে গণনার দিন সকাল থেকে সিনেমা দেখাত। এটা মনে আছে যে ভোটের দিন একটা ছুটির আমেজ। জেঠু মাংস রান্না করতো। সে এক মজার দিন ছিল। গণনার দিন ঘুমের ভান করে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ পিট পিট করে সিনেমা দেখা ছিল সেই ছেলেবেলার রঙিন স্বপ্ন। সিনেমার মাঝে মাঝেই কেউ একজন টিভিতে মুখ দেখিয়ে নেতাদের খবর দিত।

পেটোর আওয়াজ যত না ছিল তার থেকে বেশি আওয়াজ হয়েছিল পেটো ফাটার পরে দাদুর দোকান ঘরের টিনের চালে। একটু বড় হয়ে যখন শিয়ালদায় থাকতাম তখন শুনে ছিলাম আমাদের বাড়ির গলিতে বোম ফাটার শব্দ। যখন বইপাড়ায় থাকতে শুরু করলাম তখন কোনো এক পৌরসভার ভোটে জুনিয়ার নেতা পিস্তল হাতে এগিয়ে চলেছে তাঁর নেতাকে জয়ী করে আনতে। সেই নেতা যে, আমাদের ভালো করবে।

শঙ্খ জেঠু নিজের হাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নব্বইতম জন্মদিন উপলক্ষে একটি

পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'নতুন কবিতার বই'। তাতে একটি কবিতা ছিল,

'আপনি কোন দলে?
পা যেদিকে চলে।'

টিভিতে নেতাদের দৌড়দৌড়ি দেখে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই লাইন দুটো মনে পড়ছিল। এক চ্যানেল থেকে আর এক চ্যানেল, সকালে একের পর এক খবরে কাগজ দেখতে দেখতে সুভাষ জেঠুর আর দুটো লাইন মনে পড়লো,

'কেবল ওল্টাবেন,
কিন্তু পাল্টাবেন না।'

কলকাতার তিনশ বছর, সেই প্রথম কোনো মিছিলে হেঁটেছিলাম। তারপর! কয়েক বছর আগে স্যার অপূর্ব বিশ্বাসের নেতৃত্বে হিন্দু স্কুলের দুশো বছরে হেঁটেছি। আর হেঁটেছি বইমেলার সময় 'বইয়ের জন্যে হাঁটুন'। আর কোনো মিছিলে হাঁটিনি কখনো। পাঁচ কিলোমিটার দূরে নেতাদের সভায় না গেলেও নেতারা কী ভাষায় বলছেন তা সবটাই শোনা যায় ঘরে বসে। নেতাদের সুরেলা সুভাষিত কণ্ঠস্বর শোনা যায় তখন বলতে ইচ্ছে করে,

'হাতুড়ি কোদাল কাস্তে।
দাদু ঘুমোচ্ছেন, আস্তে।।'

এই বৈশাখী রোদে নেতাদের কী কষ্ট। কেউ আসছেন দিল্লি থেকে কেউবা ত্রিপুরা আবার কেউ ছুটেছেন হুইল চেয়ারে গ্রাম বাংলা। বাংলা আমার চাই। বাংলার মানুষের উন্নতি করবো, সব নেতার মুখে একই কথা। আমরাও দেখি আমাদের ভালো হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া পড়ি,

'ক্ষমতা গেলে মমতায়।
মমতা ফেলে ক্ষমতায়।।'

সেই কবে লিখেছিলেন,

'যদি

অটল হন মোদি
বইবে রক্তনদী

অথবা

মোদি অটল
হা রাম! তোবা তোবা
দেশ তুলবে পটল।।'...

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ফোন করলে এখনো শোনায় 'কোভিড কো রোখনে কে লিয়ে দো গজ কি দুরি' রেখে। তাবড় তাবড় নেতারা ডাক দেয় আমাদের ভালো করবে বলে।

'...আর সেই ডাক শুনে
ছুটে আসতে থাকে আরো সবাই আমাদের ভালো হবে বলে
খুবই আমাদের ভালো হতে থাকে
সবার দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে ফিনকিতোলা
রক্ত
আর তারই রসে
ঝুলে-থাকা খাড়া-হওয়া কাটা হাতে হাতে
ভরে উঠতে থাকে চারিদিকে জমিজমা জঙ্গল শহর।'

এটা কিন্তু পড়ে ভাববেন না যেন কোনো রাজনৈতিক পোস্ট। এই সময়ে এটা নিছক কয়েকটি বইয়ের বিজ্ঞাপন মাত্র।

১) গোটাদেশজোড়া জউঘর — শঙ্খ ঘোষ
২) নতুন কবিতার বই — সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৩) ছড়াসংগ্রহ — সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৪) ভোটের ছড়া ও অন্যান্য — কিন্নর রায়

সব শেষে

'সরকারকে সেলাম।
না করলে গেলাম।।'

নন্দনভাবনার আলোকে শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিলেখা ও জার্নাল

আরিফ বিন ইসলাম

শঙ্খ ঘোষের গদ্যসাহিত্যের একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে স্মৃতিলেখা ও জার্নালধর্মী রচনা। ছোটোদের জন্য লেখা গদ্যবইগুলির বহুলাংশেরও কেন্দ্রীয় ভর রয়েছে স্মৃতিতেই। তবে কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া ব্যক্তি শঙ্খ ঘোষ বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলির অনুপুঙ্খ তাতে অনেকাংশেই অনুপস্থিত। আর যে-সমস্ত লেখায় 'ব্যক্তিগত' ছায়া পড়েছে, সেখানে তার আড়ালে আসলে বিলীয়মান সমাজ বা সময়ের মুদ্রা থেকে গেছে। তাই সেই লেখাগুলিতেও তিনি ব্যক্তি-অংশকে গৌণ করে দিয়ে, পাঠকদের রচনার নিহিত অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ করতে বলেন।

বস্তুত শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিলেখাকে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক এই দ্বিকোটির কোনো একটিতে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া সম্ভব নয়। যখন তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে কোনো পরিচিতজনের কথা বলেন, সেটাকেও তিনি 'আত্মকথা' হিসেবেই স্বীকৃতি দেন। 'বা, আত্মসূত্রে অন্যের কথা।'[১] অন্যের কথার ভেতর দিয়ে নিজের কথা বলা, বা নিজের কথার অনুষঙ্গে অন্যের কথা বলাতেই গদ্যকার তাঁর স্মৃতিকথার আপাত-নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশশৈলী নির্মাণ করে নেন।

এই আপাত-নৈর্ব্যক্তিকতার ভেতরেই শঙ্খ ঘোষের 'কবিব্যক্তিত্বে'র সাবলীল উপস্থিতি রয়েছে। এর ভেতর দিয়েই তিনি তাঁর স্মৃতিলেখাগুলিতে সংস্কৃতিজগতের বিস্তৃত পরিধিকে বড়ো এক সময়পরিসরে ধরতে চেয়েছেন। নিরপেক্ষ এই দূরত্ব তাই তাঁর স্বনির্বাচিত। 'ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ' বইটির ভূমিকাংশে জানিয়েছেন এর কারণ : 'কেননা, খুবই ভিন্ন এক অর্থে, মাঝে মাঝে ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে গিয়েছি বটে, তবে "ভেতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে"। শুধু যে শক্তির অভাব তা নয়, হয়তো-বা ইচ্ছে বা প্রবণতারও অভাব। খানিকটা জড়তায় খানিকটা ভীরুতায় সবরকম পত্রিকাগোষ্ঠী বা সাহিত্যদল থেকে দূরবর্তী থেকে গেছি বলে আমার দেখা বা জানা অনেকটাই প্রান্ত থেকে দেখা বা জানা। স্পর্শকের মতো অল্প একটু ছুঁয়েই চলে যাওয়া।'[২] তিনি যে কেবল স্পর্শকের মতো সংস্কৃতিসমাজের কোনো প্রান্ত-বিন্দু ছুঁয়ে বেরিয়ে যান, প্রাবন্ধিকের এই স্বভাবসিদ্ধ বিনয়-বচন আক্ষরিক অর্থে ততটা গ্রাহ্য নয়। বরং খণ্ড খণ্ড এমন অনেক বিন্দু দিয়ে সময়-সংস্কৃতির স্পষ্ট একটা রূপরেখাই ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়। কেননা তিনি যে-কোনো রকম দলবর্তী আচ্ছন্নতার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখেন। আর বলেন ছদ্ম-নৈর্ব্যক্তিকতার প্রকরণে। ফলে তাঁর 'স্মৃতির দলিল' আদতে 'সংস্কৃতিরই স্মৃতি'। যাতে মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিল্প-সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস ধরা আছে। আর আছে তাঁর রচনাজগতেরও কিছু ছবি। এবং এসবেরই ভেতরে গদ্যকারের নিজস্ব নন্দনসূত্রগুলিও প্রচ্ছন্ন আছে।

শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিলেখা ও জার্নালধর্মী বইগুলি হল : 'জার্নাল' (১৯৮৫), 'ঘুমিয়েপড়া অ্যালবাম' (১৯৮৬), 'এখন সব অলীক' (১৯৯৪), 'বইয়ের ঘর' (১৯৯৬), 'ছোট্ট একটা স্কুল' (১৯৯৮), 'সময়ের জলছবি' (১৯৯৮), 'ইছামতীর মশা' (২০০২), 'সামান্য অসামান্য' (২০০৬), 'ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ' (২০০৭), 'অল্পবয়স কল্পবয়স' (২০০৭), 'বটপাকুড়ের ফেনা' (২০১১), 'অল্পস্বল্প কথা' (২০১৬), 'বেড়াতে যাবার সিঁড়ি' (২০১৬), 'নিরহং শিল্পী' (২০১৬)। এর সঙ্গে রয়েছে তাঁর স্মৃতিনির্ভর তিনটি উপন্যাস 'সকালবেলার আলো' (১৯৭২), 'সুপুরিবনের সারি' (১৯৯০) ও 'শহরপথের ধুলো' (২০১০)।

(২)

'কবিতার মুহূর্ত' বইটিতে শঙ্খ ঘোষ তাঁর পঁচিশটি কবিতার সূচনাকথা জানিয়েছেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ বছরের সময়সীমাবর্তী কোনো ঘটনা থেকে যে-কবিতাগুলির জন্ম। অবশ্য এই বইয়ে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই যে ঐতিহাসিক তা নয়, বেশ কিছু ঘটনা একান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। 'কবিতার মুহূর্ত' বইটির বাইরেও শঙ্খ ঘোষের অন্যান্য কিছু গদ্যে এমনই কয়েকটি কবিতার তির্য্যক উৎসকথা রয়েছে। সেই স্মৃতিলেখা বা অনুভবী গদ্যলেখাগুলিতে কবিতার সৃষ্টি-সংক্রান্ত নানা নান্দনিক নির্ণয় রয়েছে।

'জার্নালে'র কিছু গদ্যে কয়েকটি কবিতার উৎস-মুহূর্ত ধরা আছে। সূচনাগদ্য 'এই মুহূর্ত'ও তেমনই একটি লেখা। গদ্যকার এখানে সময়ের নন্দনের কথা বলেছেন। দেখতে চেয়েছেন সময়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সৌন্দর্যকে। প্রতিটি মুহূর্তই ক্রমবিলীয়মানতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তেই মুহূর্ত ফুরিয়ে যায়। তাই অপস্রিয়মাণতা থেকেই আনন্দে ও বিষাদে ভরা মুহূর্তের নির্যাস তুলে নিতে হয়। ক্ষণেই অতীত হয়ে যাওয়া প্রতিটি বর্তমান মুহূর্তকে সুন্দর করে তোলার এই-ই একমাত্র উপায়। আর তা করে তুলতে পারলে, উপস্থিত আত্মজনের সঙ্গে সম্পর্ককেও সুন্দর করে তোলা যায়। মুহূর্তের ভেতরই অমরতার বোধকে অনুভব করা যায়। কিন্তু এটাও সত্যি যে, অনেকক্ষেত্রেই দৈনন্দিনের আঘাতে খানখান হয়ে যায়, বা হয়ে যেতে পারে, মুহূর্তের পরমতা। পরবর্তী সময়ে কোনো বন্ধু 'স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বিস্মরণে উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান' নিয়ে দূরে সরে যেতে পারে। এমন ব্যবধান মাত্রেই কৃতঘ্নতা বা প্রতিশ্রুতিলঙ্ঘন নয়। ধারাবাহিক বন্ধুযোগের সঙ্গে ধারাবাহিক বন্ধুবিচ্ছেদও জীবনেরই সহজাত ধর্ম। তাই ব্যক্তির দায় কেবল আসক্তি আর নিরাসক্তির জটিল যুগলবন্দী থেকে প্রতিটি মুহূর্তকে 'কৃতজ্ঞ এক অঞ্জলিতে' গ্রহণ করা। যেহেতু বর্তমান মুহূর্ত মানেই ভবিষ্যতের প্রস্তুতিপীঠ নয়, তাই প্রতিটি মুহূর্ত গ্রহণীয় তার 'আত্মসম্পূর্ণ' অবয়বে। পূর্ণতার এই দৃষ্টিই ভালোবাসার জন্ম দেয়। জীবনকে যথার্থ বিন্যাসে বাঁধতে, সুষমতা খুঁজে নিতে সাহায্য করে। 'এই আত্মসম্পূর্ণ মুহূর্তগুলির সম্পর্কের মধ্যে, সংঘাতের মধ্যে কোনো সমতা নয় শুধু একটা সামঞ্জস্য খুঁজে বেড়ানো : এই তো একটা জীবনব্যাপী কাজ।'[৩] এরই

কবিতারূপ 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থের ৬১-সংখ্যক কবিতার চার পংক্তির অটুট অক্ষরবৃত্তে :

'প্রতি মুহূর্তের ধান আসক্ত মুঠোয় রাখি ধরে
তার পরে যায় যদি অবাধ সন্ন্যাসে ঝরে যায়
এই মাঠে আসে যারা সকলেই বোঝে একদিন
এক মুহূর্তের মুখ আরেক মুহূর্তে সত্য নয়।'[৪]

শিল্পের আধুনিকতার প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, তার প্রকাশ ঘটবে 'সংহতির ঘনতায়', সেই শিল্পকাজের শরীরে থাকবে 'দিব্য এক কার্পণ্য'। সংহত রূপায়ণের সেই দিব্যদ্যুতিতেই উপরের কবিতাটি ভাস্বর। মানুষে মানুষে সম্পর্কের চকিত উদ্ভাসের মুহূর্তে সম্ভাব্য কোনো সংগত বা অসংগত বিমুখতার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়। একইসঙ্গে তাই আসক্ত আর উদাসীন হাতে জীবনের প্রাপ্তিগুলোকে গ্রহণ করতে হয়, তার অনেকগুলির নিশ্চিত ব্যর্থতা জেনেও। ভালোবাসা ও দুঃখের দীক্ষা নিতে নিতেই মানুষ তার ভিন্নতর সত্তায়, সত্যতর 'মুখে'র দিকে পৌঁছোয়।

জরুরি অবস্থার সময়ে শঙ্খ ঘোষ সেই সময়ছাপ নিয়ে আরও অনেক লেখার সঙ্গে 'তুমি আর নেই সে তুমি' কবিতাটি লিখেছিলেন। কবিতাটি লেখা উচিত হয়নি, এমন একটি কথা শুনে বিস্মিত হন তিনি। কোনো লেখা ভালো না লাগার কথা স্বচ্ছন্দেই জানাতে পারেন যে-কোনো পাঠক। এমনকি নিজের ভিন্নমত নিয়ে তিনি আলাদা একটা মেরুতে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু তাঁর ভাবনা বা রুচির পরিপন্থী কোনো কথা লেখক বলতে পারবেন না, এমন দাবির পিছনে একটা অশনি সংকেত রয়েছে।

'তুমি কোনদলে' লেখাটিতে গদ্যকার, শীর্ষনামের এই প্রশ্নের পিছনে মানুষের যে সর্বনেশে অবস্থান, সেটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। রাজনীতির সঙ্গে কোনো রচনার প্রত্যক্ষ যোগ থাকলে প্রশ্নটা তখন বিপজ্জনকভাবে আক্ষরিক অর্থেই প্রযুক্ত হয়। রচনার বাইরেও জীবনের প্রতিটি অবস্থানে, প্রতিটি পদক্ষেপে এখন অনবরত উঠে আসে এই জিজ্ঞাসা। প্রত্যেকের চোখেই অনুক্ত সন্দেহ : তুমি কোন দলে?

এর সপক্ষে কেউ বলতে পারেন, কোনো মানুষের অবস্থানকে বুঝে নেওয়ার জন্য জরুরি এই প্রশ্ন। রাজনীতির বাইরে সাহিত্যনীতি বা লোকনীতি যে-প্রেক্ষিতেই হোক না কেন, ব্যক্তির ভাবনাভূমিকে ও তাঁর কার্যভূমিকে চিহ্নিত করার আর কোনো আলাদা উপায় নেই।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কিঞ্চিৎ মান্যতা দিয়েও, গদ্যকার মনে করিয়ে দেন এর বিপদের দিকটি। যেখানে 'দল' শব্দটির 'দর্শনগত ভিত্তি'কে ছাপিয়ে তার ঘাড়ে চেপে বসে 'পার্টিগত ভিত্তি' আর তাই-ই হয়ে ওঠে শব্দটির অভিধা। এমন সংকীর্ণ অর্থে দলকে গ্রহণ করলে সমস্ত বুদ্ধি-বিসর্জন অনিবার্য। যুক্তির পাল্লা তখন অন্ধতার ভারে নুয়ে পড়ে : 'এটা যথার্থ বলেই আমার পার্টি এটা করে, এই ধারণাটা উলটে গিয়ে দাঁড়ায় : আমার পার্টি এটা করে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

বলেই এটা যথার্থ।'[৫] দলের মতোই ব্যক্তির কাছেও ভুল অর্থে বিনত হলে একই সমস্যা দেখা দেয় নির্বিকার, নির্বিচার সমর্পণের। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সমর্থন জানাতে হলে, তা জানাতে হবে অন্ধভাবে। আর যাঁর বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে তাঁকে সর্বৈর্বভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। অথচ কোনো কথা বা কাজকে খোলা চোখে তার নিজের মূল্যে বিচারই একমাত্র সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। চলতি রাজনীতির নানা স্তরে সেই পথ বন্ধ করারই সমস্তরকম বন্দোবস্ত আছে। 'লাইনেই ছিলাম বাবা'র (১৯৯৩) 'তুমি কোনদলে' কবিতাতে যখন এই কথাগুলিই আসে, তখন তাতে জীবনের সমস্ত পরত স্তরপরম্পরায় জুড়ে যায়। রাজনীতি দিয়ে মানুষকে উলকি-চিহ্নিত করার ঘৃণ্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে আর্তনাদ কবিতাটির প্রতিটি শব্দে :

'বাসের হাতল কেউ দ্রুত পায়ে ছুঁতে এলে আগে তাকে প্রশ্ন করো তুমি কোনদলে
ভুখা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে প্রশ্ন করো তুমি কোনদলে
পুলিশের গুলিতে যে পাথরে লুটোয় তাকে টেনে তুলবার আগে জেনে নাও দল
তোমার দুহাতে মাখা রক্ত কিন্তু বলো এর কোনহাতে রং আছে কোন হাতে নেই'[৬]

জনপরিসরে প্রতিমুহূর্তেই যে অসূয়াদৃষ্টির সামনে ব্যক্তিকে দাঁড়াতে হয়, তাঁকে খণ্ডিত হতে হয়, প্রথম পংক্তির আপাত-নিরীহ শব্দাবলিতেই তাঁর সেই নারকীয় ভবিতব্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এরপর গোটা কবিতা জুড়েই এর অনুবর্তন চলতে থাকে, যেমন সারাটা জীবন জুড়েই নানা আয়তনে আক্রান্ত হতে হয় ব্যক্তিকে। বস্তুত জীবনের সব ক্ষেত্রেই রাজনীতির সংক্রমণ ঘটে গেছে। রাজনীতি অবশ্য শুধু ম্যানিফেস্টো-নির্ভর দলীয় কার্যকলাপ নয়, তার আরও গূঢ়চারী ক্রিয়াশীলতা আছে ব্যক্তিবিশেষের অন্তর্জীবনেও। আর তাই কবিতাটির শেষ পংক্তিতে 'রাজনীতি' যখন শয়নকক্ষেও প্রবেশাধিকার পায় তখনই ক্ষরণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে :

'রাতে ঘুমোবার আগে ভালোবাসবার আগে প্রশ্ন করো কোনদল তুমি কোনদল'[৭]

লক্ষণীয়ভাবে পুরো কবিতায় একটিও বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। এই অব্যবহার অনিঃশেষ আর্তনাদেরই সূচক।

আগের প্রসঙ্গের জের টেনে 'উপায় আর লক্ষ্য' গদ্যটিতে শঙ্খ ঘোষ যুক্তির খাতিরে দলবর্তী সভ্যের কর্মনৈতিক একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। দলীয় সদস্য যদি সর্বসমক্ষে দলেরই সমালোচনা করে, তাহলে বিরোধী শিবির সেটা তাদের স্বার্থে ব্যবহার করবে। তাতে দলের বিপন্নতা বাড়তে পারে। তাই কোনো কোনো সময় নীরবতাই কাম্য। কিন্তু এহেন 'স্ট্র্যাটেজি'র সম্প্রসারণ কতদূর সংগত, এর সীমারেখাই বা কোথায়, তার কোনো সদুত্তর পাওয়া কঠিন। বরং বিপদ থেকে রক্ষার ছলে এই 'উপায়' অবলম্বন আরও বড়ো বিপদের দিকেই ঠেলে দেয়। লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য যে-কোনো হীন উপায়ও ভালো, এই ভাবনা মূলত অনাচারী ও নির্বীর্য সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেয়। যেখানে শুধু আত্মছলনাই পড়ে থাকে।

প্রেক্ষিতটিকে গদ্যকার 'বিসর্জন' নাটকের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। 'ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!/ হেন আজ্ঞা/ মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!'[৮] জয়সিংহের এই সংলাপের উত্তরে রঘুপতি বলেন : 'আর/ কী উপায় আছে বলো।'[৯] এমন ছলনাপটু উপায়-সর্বস্বতাকে ধিক্কার জানায় জয়সিংহ : 'তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,/ খুঁড়িছে সুড়ঙ্গপথ চোরের মতন/ রসাতলগামী?'[১০] জয়সিংহের প্রশ্নাতুরতাকে এড়িয়ে গিয়ে রঘুপতি ঠিক এরপরেই তাকে হননের-রাজনীতিশিক্ষা দেন, যেখানে সমস্ত জগৎই চলছে 'হত্যার তাড়নে'। গুরু-শিষ্যের এই সংলাপেরই আরেকটা কাব্যভাষ্য 'মাটিখোঁড়া পুরোনো করোটি'র (২০০৯) 'আর কী উপায় আছে বলো'। সংহত-বাক কবিতাটি পদ্ধতি আর অভীষ্টের কূটাভাসকেই ধরে আছে :

'গুরু এসে বললেন : আর কী উপায় আছে বলো।
তুমি কেন এত ম্রিয়মাণ?
যাকে তুমি হত্যা বলো, যাকে বলো সুড়ঙ্গপথের অন্ধকার
কখনো কখনো তাও পথ হয়ে ওঠে, হতে পারে।
লক্ষ্য যদি ঠিক হয়, পথের এ শুদ্ধ্যাশুদ্ধি নিয়ে
বিচার করে না কেউ।'[১১]

গুরুবচনে অগত্যা উপায়হীনভাবে শিষ্যকে সপ্রতিভ উত্তর দিতে হয় :

'শিষ্য শুনে বললেন : সমস্তই বুঝেছি এবার
আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেইখানে উপায়ও এখন নিরুপায়!'[১২]

দুঃখের দীক্ষাহীন, আত্মপ্রস্তুতিহীন, সুযোগসন্ধানী উপায়-ব্যবহার লক্ষ্যের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয় কেবল।

'ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ' (২০০৭) বইয়ের 'অলোকের সঙ্গে দুই সন্ধ্যা' গদ্যটিতে শঙ্খ ঘোষ কবিবন্ধু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে কাটানো দুটি সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতার ভেতরও একটি কবিতার মুহূর্ত রয়েছে। ১৯৭০ সালের এক সন্ধেবেলা তিনি অলোকরঞ্জনের সঙ্গে ময়দানে বসে কথা বলছিলেন। আলাপের বিষয় ছিল আলোক সরকারের কবিতা। এমন সময় দুজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে এক পুলিশ অফিসার তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ান। অন্ধকারে ময়দানে বসে থাকার 'অপরাধে' দুজনকেই লাঞ্ছিত হতে হয়। চূড়ান্ত অপভাষায় হেনস্তার পর দুই বন্ধুকে ময়দান থেকে উৎখাত করে আলো ঝলমল রেড রোডের দিকে ঠেলে দেন ওই অফিসার। আর শঙ্খ ঘোষ, এই ঘটনা থেকে এগোতে থাকেন একটি কবিতার দিকে, 'আদিম লতাগুল্মময়'-এর (১৯৭২) 'রেড রোড' কবিতার দিকে। যে-কবিতায় ময়দানের ঘাসে শুয়ে থাকা একজন মানুষ পৌঁছে যান তাঁর গহন আত্মিকতায় :

'খোলা আকাশের নীচে শুয়ে আছি ময়দানের গভীর তলদেশে
যেন নক্ষত্র তুলে নেয় আমার নিভৃত নিশ্বাস

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

এই অন্ধকার মণ্ডলের গহন থেকে আমার শব্দহীন স্তব
যেন পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে যায় স্বর্গীয় ঈথারে
আমাকে ভুল বুঝো না ব'লে দু-হাত ছড়িয়ে দিতে টের পাই
চোখের ঢালু বেয়ে নম্র ঘাসের মতো ক্ষীণ জলরেখা'[১৩]

আকাশ আর পাতাল গ্রথিত করে নিয়ে সেই ব্যক্তি নিজের সঙ্গে চরাচরের 'সুড়ঙ্গলালিত' সম্পর্ক তৈরি করে নেন। নিজের আত্মবিস্তারের ভেতর অস্তিত্বের সজলতাকে অনুভব করেন। আর ঠিক সেসময়েই সুভব্য সামাজিক জীবন আঘাত নামিয়ে আনে আদুড় বেঁচে থাকার উপর :

'তারই পাশে রুল হাতে এগিয়ে আসে পুলিশ, বলে : ওঠো
অবৈধ তোমার এই একলা অসামাজিক শুয়ে থাকা
আবার আমি নিচু হয়ে পায়ে পায়ে চলতে থাকি শহরের দিকে
সামনেই ঝকঝকে রেড রোড!'[১৪]

ব্যক্তির হতে-চাওয়া আর হতে না পারা, অস্তিত্বের বেদনা আর অস্তিত্বের সংকট, এভাবে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। আড়াআড়ি টানে ব্যক্তি আর তাঁর সময় ক্রমাগত ছিঁড়ে যেতে থাকে। প্রত্যেকের জন্য বেঁচে থাকার একটাই পথ নির্ধারিত হয়ে যায়। প্রত্যেককেই সুসামাজিক আলোকোজ্জ্বল রেড রোড ধরে হাঁটতে হয়।

২০১৫ সালে কাশ্মীর ভ্রমণের সময়ে সেখানকার কয়েকজন মানুষের সঙ্গে কথা-বিনিময়ের স্মৃতি নিয়ে গদ্যকার 'বেড়াতে যাবার সিঁড়ি' বইয়ের 'কয়েকজন কাশ্মীরি' গদ্যটি লেখেন। সেই লেখায় মূলত প্রাধান্য পেয়েছে কথোপকথন থেকে উঠে আসা কাশ্মীরের মানুষদের জীবনযাপন। বিভিন্ন সংকটের ভেতর তাঁরা কীরকমভাবে বেঁচে আছেন, সেসব প্রসঙ্গ। এই লেখাটির সবচেয়ে জরুরি কথোপকথনটি হয়েছে সফত আমেদের সঙ্গে। সফত আমেদ তরুণ গাড়িচালক, সেই-ই গাড়িতে করে সপরিবার লেখককে কাশ্মীর ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্বে ছিল। ভ্রমণপথে তার হাস্যমুখর কথার ফুলঝুরি থেকে তাদের জীবন সম্পর্কেও অনেককিছু জানা হয়ে যায়। জানা যায় যে জেহাদিদের ফতোয়ায় সিনেমা সেখানে নিষিদ্ধ, সিনেমা হল তাই বন্ধ। যদিও বাড়িতে অনেকেই টিভিতে সিনেমা দেখে। মেয়েদের পড়াশোনার উপর বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু স্কুলে-কলেজে বোরখা আবশ্যিক। রাস্তায় দলে দলে মিলিটারি দেখে গদ্যকার জানতে চান, এতে তাদের অসুবিধে হয় কি না। উত্তরে সফত বলে, সয়ে গেছে। তবে বিশেষ একটি রাস্তায় মিলিটারির আধিক্যের কারণ, দিন সাতেক আগে দুজন মিলিটারির খুন হওয়া। তাই এত ঘন ঘন বন্দুক উঁচোনো। মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা ঘটে। এমনকি সেদিন যে তার পৌঁছোতে আধঘণ্টা দেরি হয়ে যায়, সেকথা সে জানাতে পারেনি ফোনে লাইন না পাওয়ায়। আগের সন্ধ্যায় দুটো টাওয়ার উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর রাজপথে যেতে যেতেই একদিন দুজন স্কুটার-আরোহী যুবককে গ্রেপ্তার হতে দেখা যায়। কারণ হিসেবে

সফত জানায়, ওদের হাতে Jammu Kashmir Liberation Fronte এর (JKLF) নিশান। ওদের কোনো ভয়ডর নেই, দিনদুপুরেই তাই ধরা পড়ল সবার চোখের সামনে। সেদিন ছিল শিখদের ষষ্ঠ ধর্মগুরু হরগোবিন্দ সিং-এর জন্মদিনের ছুটি। রাস্তার পাশেই শিয়াদের কোনো একটা অনুষ্ঠানও চলছিল। সমস্ত দেখাটাই শঙ্খ ঘোষের মনে জড়িয়ে যায় : 'শ্রীনগরের পথে, ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দের জন্মদিনের ছুটিতে, শিয়া মুসলিমদের মজলিশ শুনতে শুনতে, JKLF-এর ঝান্ডা-ওড়ানো দুই যুবকের গ্রেপ্তারি দেখলাম আমরা, দু'পাশে চিনার আর পপলার গাছের সারির মধ্যে।'১৫ পুরো অভিজ্ঞতাটাই উত্তীর্ণ কবিতা হিসেবে দেখা দেয় 'শুনি শুধু নীরব চিৎকার' (২০১৫) কবিতাগ্রন্থে, 'আবেষ্টন' নামে :

'নর্তকীচালে চলেছে ঝিলম, শান্ত শহর দুই পাশে
পথের দু-ধারে আরামবিকাশ উইলোতে আর পপলারে
শিকারার থেকে উঠে আসা হাতে ফুলের বেসাতি হাসিঝরা
কোমল চোখের মিনতি আভাস: আমারও থেকে কি দুটো নেবেন?
পথে পথে খাকি উর্দিধারীরা, হাতে হাতে AK 47!

পথ আমাদের দেখিয়ে চলেছে কথাবিহ্বল সফতামেদ:
"ভালো লাগছে তো আমার শহর? বলবেন সব ফিরে গিয়ে।
আসবার পথে দেরি হয়ে গেল হলো সামান্য কথাখেলাপ
খবর দেবার উপায় ছিল না, উপায় ছিল না লাইন পাওয়ার
কাল সন্ধ্যায় ওরা ফের এসে উড়িয়ে দিয়েছে দুটো টাওয়ার!"

ছুটন্ত গাড়ি দুরন্ত হাওয়া, সকলেরই বেশ খোশমেজাজ
রাজপথজোড়া ব্যস্ত ট্র্যাফিক তার মাঝখানে সফতামেদ
হঠাৎ তুলেছে আঙুল "দেখুন, বাইকে দু-জন, হাতে নিশান
(স্বরভঙ্গিতে কোনোখানে নেই ইতস্ততের কোনো প্রলেপ)
দিনদুপুরেই ধরা পড়ে গেল দু-জনেই ওরা JKLF!"

মুড়িমুড়কির মতো সান্ত্রিরা, হাতে হাতে AK 47!'১৬

প্রকৃতির প্রশান্ত ছবিতে কবিতার সূচনা। আর ক্ষমতার উদ্ধত চিহ্ন হিসেবে উদ্যত বন্দুকের ভিড়ে এর শেষ। এই শ্বাসরুদ্ধ আবেষ্টনের ভেতর মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে তীব্রভাবে বাঁচতে চাওয়া কিছু মানুষ। কেউ কেউ তাই রাজনৈতিকভাবে মুক্তির পথ খুঁজছেন, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রে তাঁদের পিষে ফেলার নিপুণ বন্দোবস্ত মজুত। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অসহনীয় আস্ফালনই 'শেষ সত্য' যেন! জীবন অবশ্য নিজের ধর্মানুযায়ী ভিন্ন রকম একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে ভেতরে ভেতরে। বাঁচার তাগিদে, পর্যটন-নির্ভর অর্থনীতির জন্য, পরিচর্যা নিয়ে

সবার আগমন প্রত্যাশায় অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। উপত্যকার মানুষগুলোর সংযোগেচ্ছু উৎসুক আপ্যায়নেই রয়েছে ঘৃণার বিরুদ্ধতা। ব্যক্তি, সমাজ, সময়, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রকৃতি সমস্ত কিছুকে মিলিয়ে নিয়ে কবিতা এভাবে গোটা জীবনপ্রণালীকেই তুলে আনে।

(৩)

'এখন সব অলীক' গ্রন্থের 'আর এক আরম্ভের জন্য' (১৯৮৯) প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরবর্তী চার দশকের সংস্কৃতিজগতের, বিশেষত কবিতাজগতের, কলকাতাকেন্দ্রিক একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। রচনাটির শুরুতেই তিনি বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' উপন্যাস থেকে সূত্র সংগ্রহ করে নিয়ে সৃজিত চরিত্রের অনুষঙ্গে তাঁর স্রষ্টার সাহিত্য দর্শনের ইঙ্গিত দেন। 'পানীয়বিলাসী মিনারবাসী' কবিদের প্রতিনিধিত্ব করা 'তিথিডোরে'র সেই কবি ধ্রুব দত্ত উপন্যাসের জরুরি চরিত্র কবিতাপ্রেমী স্বাতী আর সত্যেনের কাছে কিছুটা অবহেলিতই হয় তার জীবনবিচ্ছিন্ন আত্মম্ভরিতা আর সাধারণ মানুষ বিষয়ে উন্নাসিক অবজ্ঞা পোষণ করার জন্য। জনজীবন থেকে এই দূরত্ব রচনার পিছনে স্পষ্টই একটা 'নান্দনিক অভিমান' সক্রিয় আছে। আর এখান থেকেই প্রাবন্ধিকের মনে হয় যে, এই একইরকম প্রশ্নের মুখে বুদ্ধদেব বসুও পড়তে পারেন, তাঁর নিজস্ব কবিতানন্দনের জন্য। যার মূল কথা ছিল, প্রতিদিনের জীবন থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে নিয়ে কবিতার 'শুদ্ধ' রূপের চর্চা। ফলে এই পক্ষপাতের জন্য ধ্রুব দত্তের মতো বুদ্ধদেবও যদি অভিযুক্ত হন, তবে তা হয়তো খুব আকস্মিক নয়। তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকায় কবিতার সেই বিশেষ ধরনের চর্চাই প্রাধান্য পেয়েছে।

ঠিক এরই একটা উলটো ধরনের কবিতা-প্রবণতাও সমান্তরালভাবে বহমান থেকেছে। প্রায় প্রতীকী ভৌগোলিক অবস্থানে ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতাভবনে'র পশ্চিম প্রান্তে ১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে বিষ্ণু দে-র বাড়িতে গড়ে ওঠে কবিতার নৈর্ব্যক্তিক' কেন্দ্র। যেখানে কবিতার অভিমুখ ঘোষিতভাবেই মানুষের দিকে ফেরানো। আর এর মুখপত্র হিসেবে 'কবিতা' পত্রিকার তেরো বছর পর আত্মপ্রকাশ ঘটে 'সাহিত্যপত্রে'র (১৯৪৮)।

এভাবেই চল্লিশের দিনগুলির মাঝামাঝি থেকে সাহিত্যজগতের স্পষ্ট দুটো গোত্র তৈরি হয়ে যায়। একদিকে কবিতার শুদ্ধ রূপের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা রূপায়ণের অন্বেষা। মতাদর্শের এই প্রশ্নটা আরও জটিল হয়ে উঠল এই দশকের সময়-সংকটের ঘূর্ণাবর্তে। যখন সৃষ্টিচেতনা আর রাজনীতিচেতনার মিলিত কোনো মধ্যপথের বদলে, এই দুই হয়ে দাঁড়াল যুযুৎসু দুই পক্ষ। দীর্ঘস্থায়ী সেই লড়াইয়ের আশ্রয়রূপে পত্রিকাগুলিও প্রায় শিবিরচিহ্নিত হয়ে যাবে। একদিকে যদি 'কবিতা', 'পূর্বাশা' ও 'চতুরঙ্গ' থাকে, তবে অন্যদিকে আছে 'অগ্রণী', 'পরিচয়' বা 'সাহিত্যপত্র'। যে কোনো নতুন লেখকের আবির্ভাব ঘটলে সকলেই প্রথমে বুঝে নিতে চান যে তিনি কোন শিবিরের লেখক। লেখাতেও শিবিরের

সংক্রমণ ঘটতে থাকে। আসলে, মানুষের জন্য লেখা আর দলীয়তার দাবিতে লেখার সীমাবিভ্রমের মধ্যেই লুকিয়ে আছে লেখকের নির্দিষ্ট শিবিরভুক্তির বিপদ। রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে শিল্পের উন্মুক্ত সম্পর্ক স্বাস্থ্যকর, কিন্তু দল একাকার করে দিতে চায় দলীয় নীতি-নির্দেশের সঙ্গে এই চেতনাকে, পার্টি-লাইনই রাজনীতি চেতনার সমার্থক হয়ে উঠলে শুরু হয় শিবিরপুষ্ট শিল্পের সংকট।

যুযুধান দুই কাব্যাদর্শের একটি স্মরণীয় ছবি গদ্যকারের স্মৃতিলেখায় ঘুরেফিরে আসে, শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলাকে কেন্দ্র করে। 'নানা রঙের পাথর' লেখাটির "তিরিশ বছর আগে" (১৯৮২) শীর্ষক অংশটিতে ও 'করুণ রঙিন পথ' লেখাটিতে আছে ১৯৫৩-র ফেব্রুয়ারিতে আয়োজিত তিনদিনের সাহিত্যমেলার অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এই মেলার আহ্বান, অন্নদাশঙ্কর রায়ের উদ্যোগে।

সেই মেলারই এক সভার আলোচ্য বিষয় ছিল কবিতা আর নাটক। সেখানে গত পাঁচ বছরের কবিতা নিয়ে বলতে গিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বভাবতই কবিতার একটা নির্দিষ্ট ধরনের পক্ষে দাঁড়ালেন, যে-কবিতায় সরাসরি সময় আর সমাজের বাস্তব চেহারা উঠে আসে, যেখানে ব্যক্তিগত আবেগানুভূতির যে-কোনো প্রকাশই পরিত্যাজ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি জোর দিয়ে বলেন বিষ্ণু দে-র জনজীবনমুখী কবিতার কথা। এমনকি শেষে শঙ্খ ঘোষের 'যমুনাবতী' কবিতাটির কিছু পংক্তি ও উদ্ধৃত করেন, এটা দেখাতে যে তরুণ কবিরাও কীভাবে তাঁদের কবিতায় ছড়ার ছন্দে লৌকিক জীবনের সংকটকে তুলে আনছেন। জীবনানন্দ দাশ বা অমিয় চক্রবর্তীকে সমূলে প্রত্যাখান করে অবজ্ঞাভরে বললেন : 'এক ফুঁয়ে ঘর উড়িয়ে দেন জীবনানন্দ, হাই তুলে অমিয় চক্রবর্তী বলেন "বাড়ি যাব", জীবনের প্রতি এই নির্লিপ্ততা কবিতায় নিয়ে আসে শ্মশানের স্তব্ধতা আর শূন্যতার হাহাকার ।'[১৭] এবং নিজের কাব্যভাবনা নিয়ে জানালেন যে, 'কী নিয়ে লিখব এই প্রশ্নটাকে যাঁরা এড়িয়ে যান তাঁরা কানার বেহদ্দ প্রতি পদে তাঁদের খানাডোবায় পড়ার ভয় থাকে।'[১৮]

এমন আক্রমণের পর আর স্থির থাকা সম্ভব ছিল না সেই সভায় উপস্থিত বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে। কেননা যে-কাব্যদর্শনকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে লালন করেছেন, তারই উপর আঘাত নেমে এসেছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। জীবন আর শিল্পের যে নগদপ্রাপ্তির সম্পর্কে বিশ্বাসী বামপন্থী মহল, তার একেবারে বিপরীত দিকে বুদ্ধদেবের অবিচল অবস্থান। সমাজের প্রত্যক্ষ কোনো হিতসাধনের জন্য কবিতা ব্যবহারের সম্ভবপরতায় ঘোরতর অবিশ্বাসী তিনি। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিকে খণ্ডন করে প্রতিযুক্তি সাজান বুদ্ধদেব : "কী নিয়ে লিখব"টা কোনো প্রশ্নই নয়, বলেন তিনি। কেননা, বলবার কথা বাইরে থেকে আসে না, আসে কবির নিজের মন থেকে। সেখান থেকে এসে পৌঁছোলেই কোনো রচনা হয়ে উঠতে পারে সৃষ্টি।'[১৯] এবং ঝাঁজালো স্বরে সিদ্ধান্ত করেন যে 'নাচুনি ছন্দে' ভাতের জন্য আকুল

চিৎকার করলেই তা কবিতা হয় না, সেটা বরং কবিতার এক দুর্লক্ষণকেই সূচিত করে। কেননা, কবিতা হল ঘন বোধের জগৎ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বুদ্ধদেব বসুর আহত হবার আরও একটা গূঢ় কারণ হয়তো ছিল। এই সাহিত্যমেলার ঠিক বারো বছর আগে, 'পদাতিক'-এর (১৯৪০) কবিকে সপ্রশংস অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তিনি। আর সেইসঙ্গে সদ্যতরুণ কবির প্রতি বিকল্পহীন একটা পথ বেছে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব, 'পদাতিক' বইটির আলোচনার শেষে : "পদাতিকে" দুটি দিকই আমি দেখিয়েছি : প্রথমে, সরল চড়া গলার কবিতা, যা "জনপ্রিয়" হবার দাবি রাখে, অন্য দিকে জটিল বিন্যাসের সংস্কৃতিবান কবিতা। দু-দিক বজায় রাখা চলবে না, এক দিক ছাড়তে হবে। যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর কর্তব্য, তিনি তা করবেন মানুষ ও কর্মী হিসেবেই, কবি হিসেবে নয়। কিন্তু যখন এবং যতক্ষণ তিনি কবি, কবিতার উৎকর্ষই হবে তাঁর সাধনা। হয় তাঁকে কর্মী হতে হবে, নয়তো কবি। তিনি কোন দিক ছাড়বেন?'[২০] একযুগ পর এই প্রশ্নটিরই স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল যেন। কবিতা আর রাজনীতির মধ্যে কবিতাকেই ছেড়ে দিলেন সুভাষ, এমন মনে করা অসম্ভব নয় বুদ্ধদেবের পক্ষে। কিন্তু এই তর্কের নিষ্পত্তি সেই সভাতে হয়নি, এর মীমাংসা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরকালের কাব্যচর্চায় নিহিত আছে। 'পদাতিক' থেকে 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮) পর্যন্ত তাঁর কবিতায় বামপন্থার যে মতবাদ-প্রাধান্য আছে, 'ফুল ফুটুক' (১৯৫৭) থেকে সেই চাপ সরে যেতে থাকবে, এবং 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২) কাব্যগ্রন্থ থেকে আর নির্দিষ্ট কোনো অভিধা আরোপ করে তাঁর কবিতা পড়া যাবে না। এই ইতিহাসেই শিল্পসংক্রান্ত গূঢ় জটিলতার একটা সহজাত নির্ণয়সূত্র বেরিয়ে আসে।

বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী এই দুই নির্ণীত সাহিত্যচেতনার বিভেদ থেকে সরে এসে, শিবির ও প্রতিশিবিরের লড়াই থেকে সরে এসে সাহিত্যের অন্য কোনো পথের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন কেউ কেউ, এবং সংগতভাবে তাঁরা সকলেই ছিলেন তরুণ। ফলে এটা হয়তো অনিবার্য ছিল যে ত্রৈমাসিক 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) এসময়েই দেখা দেবে। 'কৃত্তিবাস' আবির্ভাবেই সেই সময়কে যেভাবে জয় করে নিয়েছিল তাতে সময়েরই একটা হাত ছিল, 'নিছক পরিকল্পনার প্রতিভাযোগে নয়, সময়ের আনুকূল্যে [আনুকূল্য] তার সার্থকতার জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।'[২১] সূচনায় দীপক মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও আনন্দ বাগচী এই তিনজন ছিলেন সম্পাদনায়। আর সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত, যিনি ডি.কে. নামেই পরিচিত ছিলেন বেশি, তিনি ছিলেন উৎসাহদাতা।

এই পত্রিকায় সমস্ত তরুণ কবির জন্যই ছিল উদার আহ্বান। 'কৃত্তিবাস' বাংলা কবিতায় তারুণ্যের গোটা একটা মানচিত্র তুলে আনতে চাইছিল। আর দল বা গোষ্ঠী গড়ার কথা ভাবলেও তা কোনো মতাদর্শ বা নীতি-সাপেক্ষে নয়, বরং সম্মিলনের ভিতর দিয়ে কবিতায় একটা স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় নিরূপিত 'জীবনদর্শনে'র গুমোট কাটিয়ে দেওয়া এবং সকলের

সঙ্গে মিলনের মাধ্যমেই প্রত্যেকে কবিতায় নিজের স্বতন্ত্র স্বর খুঁজে নেবেন এটাই ছিল পত্রিকার অভিপ্রায়।

এরও প্রায় বছর দুয়েক আগে দক্ষিণ কলকাতা থেকে বেরোনো আরও একটি কবিতাপত্র 'শতভিষা'য় (১৯৫১) কবিতার 'শুদ্ধ সত্তা'কে কিছু তরুণ খুঁজে নিতে চাইছিলেন। আলোক সরকার, দীপংকর দাশগুপ্ত ও তরুণ মিত্র সম্পাদিত সেই পত্রিকাগোষ্ঠীর দুজন উল্লেখযোগ্য কবি আলোক সরকার ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। 'পুরোনোর পুনরাবৃত্তি হবে না, কবিতা হবে ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত, একই সঙ্গে সৌন্দর্যময়।'[২২] অনেকটা এমন ভাবনাকে নিজেদের মুখপত্রের কেন্দ্রে রেখেছিল এই কবিরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নন্দনতাত্ত্বিক পার্থক্য সত্ত্বেও 'শতভিষা'র দুজন গুরুত্বপূর্ণ কবিই ধারাবাহিকভাবে 'কৃত্তিবাসে' লিখেছেন। কিছু মতভেদাভেদ নিয়েও গোঁড়া গোষ্ঠীপ্রবণতা থেকে সরে আসারই সূচনালক্ষণ এটা। শারীরিক এবং মানসিকভাবে 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুটা বিযুক্ত থেকেও 'কৃত্তিবাসে'র পাতায় শঙ্খ ঘোষের শিবির-বিরহিত স্বরের অনবচ্ছিন্ন উপস্থিতি সেই ইতিহাসেরই জোরালো সাক্ষ্য দেয়। আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত স্পষ্টই 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাসে'র একটা সামীপ্যেরই স্বীকৃতি দেন। যার মূলে রয়েছে 'অভীপ্সিত ঔদাসীন্য'।

এই ঔদাস্যের অনিবার্য ফলশ্রুতি ছিল কবিতায় ব্যক্তিগত উচ্চারণ। স্বনামেই আত্ম-উপস্থাপন 'কৃত্তিবাসে'র অন্যতম একটা লক্ষণ হিসেবে দেখা দিল। তাতে কখনও কখনও কিছুটা বিপজ্জনক আত্মকেন্দ্রিকতাগ্রস্ত হয়ে পড়ল কবিতা। কবিতার বাইরে ছন্নছাড়া কবিজীবনের কিংবদন্তি পল্লবিত হয়ে উঠল, এর পিছনে হয়তো কবিব্যক্তিত্বের কট্টরমূর্তিকে ভেঙে ফেলার বাসনাও কাজ করে গেছে দামাল তরুণদের মনে। কোনো রাখঢাক না রেখেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা তারাপদ রায়-রা দেখাচ্ছেন যে তাঁরা কীরকমভাবে বেঁচে আছেন। নিজেরাই কবিতার বিষয় হয়ে উঠছেন। এমন যথেচ্ছ উচ্চারণে প্রভূত যৌনতা ও ভোগবাদের সঙ্গে কবিতার অসংকোচ সমীকরণে কবিতা স্বভাবতই কিছুটা 'ভোগার্দ' হয়ে উঠল। এবং সূচনার এক দশকের ভেতরেই 'কৃত্তিবাসে'র একটা 'সমাজখ্যাপানো চরিত্র' তৈরি হয়ে যায়।

'কৃত্তিবাসে'র সূত্র ধরেই জীবনযাপনে মদ্যপতা, বাউন্ডুলেপনা এবং সাহিত্যে তার উৎকেন্দ্রিক উন্মাদনা থেকে দেখা দিল 'হাংরি জেনারেশন'। ১৯৬১ সাল থেকে তাঁদের বুলেটিন বিলি হতে থাকল। এই গোষ্ঠীর কবিরা 'অর্গ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে' কবিতা লিখতে চাইলেন। মলয় রায়চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য প্রমুখরা ছিলেন এই 'শাখা-আন্দোলনে'র সামনের সারিতে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসুও এই দলে ছিলেন। যদিও কিছুদিন পরেই তাঁরা নিজেদের সরিয়ে নেন। ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বরে এঁদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শৈলেশ্বর ঘোষের 'ঘোড়ার

সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' বা মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' ইত্যাদি রচনাগুলি অশ্লীলতাদুষ্ট বলে অভিযুক্ত হল। অল্পদিনের ভেতর ছাড়াও পেলেন সবাই।

খামখেয়ালিপনায় ভরা এই সময়ে স্বভাবতই তাৎক্ষণিক উত্তেজনা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। সেই প্রবণতারই পরোক্ষ ফল হিসেবে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বেরোতে শুরু করে 'কবিতা সাপ্তাহিকী', পরবর্তীতে নাম বদলে হয় 'সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা'। সাপ্তাহিকের পর আসে দৈনিক কবিতা'। বিমল রায়চৌধুরী ও শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত পত্রিকাটি মে মাসের পনেরো দিন টানা বেরোয়। তারাপদ রায়রা সকালবেলায় পথে পথে তা ফেরিও করেন। চটজলদি প্রবণতার প্রতিবাদ হিসেবেই হয়তো এই দৈনিক কবিতা'য় শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নিঃশব্দের তর্জনী' নামক গদ্যলেখাটি ছাপতে দিয়েছিলেন, যেখানে কবি বা লেখকের নেপথ্য নির্জনের কথা সমস্তরকম বিজ্ঞাপনের প্রলোভনের বাইরে আত্মিকতায় স্থিত থাকার কথা জোর দিয়ে বলা ছিল। গদ্যকারের স্বীকারোক্তিতেও তাঁর অভিপ্রায় স্পষ্ট : 'দৈনিক কবিতা'য় 'নিঃশব্দের তর্জনী' এর মধ্যে একটা আয়রনি হয়তো আছে।'[২৩] এর অবশ্য কৌতুকজনক প্রকট একটা প্রতিবাদও দেখা দেয়। সুশীল রায়ের সম্পাদনায় ৭ মে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা অব্দি প্রতি ঘণ্টায় 'কবিতা-ঘণ্টিকী'র আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্টলে ও পথে তা বিতরণও করা হয়। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে প্রতিবাদের এই দিনটি ছিল পঁচিশে বৈশাখ।

কবিতার ক্ষেত্রে 'কামার্ত ক্ষুধার্ত বা ভোগার্দ' রচনাদর্শের প্রতিপক্ষে মগ্ন কোনো কোনো কবিতাকেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'কবিপত্র' (১৯৫৭) প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের 'অলিন্দ' (১৯৬৪), বা জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবি ও কবিতা'র (১৯৬৫) মতো পত্রিকাকে অবলম্বন করে। এই পত্রিকাগুলিতে ভাস্কর চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, গীতা চট্টোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের স্বর শোনা গেল কখনো বিষাদমন্থর, কখনো মাটির-গন্ধমাখানো নিবিড়, কখনো বা আত্মমগ্ন। কোনো কোনো পত্রিকা আবার নিবিষ্ট উচ্চারণকেই ম্যানিফেস্টোর ভিতর দিয়ে ধরতে চাইল। 'শ্রুতি' (১৯৬৫) পত্রিকার প্রকাশের মাধ্যমে শ্রুতি আন্দোলনের সূচনা। আন্দোলনের প্রবক্তা পুষ্কর দাশগুপ্ত। আত্মমগ্ন ব্যক্তিগত উচ্চারণই কবিতা বলে এঁরা জানালেন। এবং কবিতায় সামাজিক নৈতিকতা বা জৈবমত্ততার কোনো জায়গা নেই। মুদ্রণের সাহায্য নিয়ে কবিতার দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ তৈরি, ছেদচিহ্নের বিলোপ, শব্দ আর ধ্বনির উপর জোর দিতে চাইলেন। এতসব ফতোয়ার কারণে, যান্ত্রিকতা থেকে কবিতাকে বের করে আনার কথা বলেও, তাঁরা কবিতাকে যান্ত্রিকতার দিকেই ঠেলে দিলেন।

একদিকে আত্মকেন্দ্রিক চিৎকার, অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে মগ্ন উচ্চারণ এই দুটো শিবিরই প্রগতিশীলদের মতে অবক্ষয়ী। এই দুটো দলই রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচাতে চেয়েছে। প্রগতি আন্দোলনও ভেতরে ভেতরে বদলে যেতে থাকে। ১৯৬৪ সালে 'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের

জন্য আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে সমস্ত স্তরের মানুষরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে যে বিপুল সংবর্ধনা জানান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠানে, তার কিছু পর থেকেই তিনি প্রশ্নের মুখে পড়তে থাকেন। সোমনাথ লাহিড়ী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়দের ভাবিয়ে তোলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যবোধের শিথিলতা। আসলে তিনি তখন দলেরও বাইরে সজীব জীবনটাকেই কবিতায় ধরতে চাইছিলেন। অবশ্য তা করতে গিয়ে নিজের রাজনীতিচেতনা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। নকশাল আন্দোলনের দিনগুলিতে লিখেছেন 'ছেলে গেছে বনে' বা 'ফেরাই'-এর মতো কবিতা। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হলে প্রতিবাদ-মিছিলে পথে নেমে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জেলে যান। আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সজ্ঞানেই সমস্তরকম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, নকশাল আন্দোলন দমনের বীভৎস পীড়নে 'কাব্যগুণহীন জার্নালিজম' দিয়ে এসব পাশবিক তাণ্ডবের প্রতিবাদ জানাতে চান। সবসময়েই অবশ্য তা কবিতাগুণহীন সাংবাদিকতা থাকে না :

'কে তুমি হে! দেবদারু বীথিতেও গন্ধ পাও কালো পুলিশের?
তোমার অসীম স্পর্ধা! জান না কি এখন স্বদেশ
ভেতরে বাইরে নিষ্প্রদীপ, তার বাতাসে বিষের ধোঁয়া
কে তাকে বাঁচাতে পারে যদি না পুলিশ ঢালে বৃক্ষের শিকড়ে গ্যালন গ্যালন রক্ত?
কার রক্ত নির্বোধের মত প্রশ্ন কর তুমি। দুধ কলা দিয়ে পোষা
সাপ তারা। দেবশিশু তোমার চোখের ভ্রম! ওরা কেউ শিশু নয়, জানে
তা পুলিশ, জানে দিল্লীর ঈশ্বরী।'[২৪]

গদ্যকার এর ভেতরে 'নতুন এক antipoetry-র কাব্যভাষা' দেখেন। যে কবিতাভাষা একটা দায়বোধ থেকে জীবনের একেবারে কাছাকাছি নেমে আসে।

(৪)

গ্রন্থেতিহাস বা History of the Book এই বিষয়ের অধীনে মুদ্রণ-প্রকাশন-বিপণন-পাঠ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিবিধ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়। অভিজিৎ গুপ্ত 'ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাস : কিছু মৌল সমস্যা' প্রবন্ধে এর মূল কাঠামোটি ধরিয়ে দেন : 'যে-কোনো দেশের গ্রন্থেতিহাস আমরা মোটামুটি চারটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করতে পারি মুদ্রণ প্রযুক্তির ইতিহাস, পুস্তক ব্যাবসার ইতিহাস, পাঠক ও পাঠের ইতিহাস ও গ্রন্থাগারের ইতিহাস।'[২৫] গ্রন্থেতিহাসের প্রথম দুটি শাখায় পর্যাপ্ত কাজ হয়ে থাকলেও, অপ্রতুলতা রয়েছে পাঠক ও পাঠের ইতিহাসে। শঙ্খ ঘোষের 'বইয়ের ঘর' অবশ্য উপরোক্ত চারটি শাখারই কিছু না কিছু উপাদানের জোগান দেয়। তবে সবথেকে বেশি সাহায্য করে পাঠের ইতিহাস নির্মাণে। যদিও গৌতম ভদ্র 'বাঙালি পাঠক ও তাঁর বাংলা বই পড়া' প্রবন্ধের টীকা অংশে অন্য কিছু রচনার সঙ্গে এই বইটির গোত্র নির্ণয়ে বলেন যে, 'প্রকৃতপক্ষে বাঙালির বই পড়া নিয়ে এতাবৎকালের রচনাগুলি নানা ধরনের 'রম্যরচনা' বা ব্যক্তিগত নিবন্ধের সুরে লেখা

হয়েছে। ভারী ইতিহাস লেখাটা এঁদের কারুরই উদ্দেশ্য নয়, আনন্দটা কারু কারুর মধ্যে চারিয়ে দিয়েই এঁরা তৃপ্ত।'[২৬] ধারাবাহিক 'সিরিয়াস' ইতিহাস না হলেও, 'বইয়ের ঘর' বাংলা পুস্তকসংস্কৃতির মোটামুটি স্পষ্ট রূপরেখা ফুটিয়ে তোলে, গ্রন্থেতিহাসের সম্প্রসারণ ঘটায়।

বইটির ভূমিকাতেই গদ্যকার জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বইয়ের অন্তর্গত বিষয়ের ধারণা দেবার লক্ষ্যে গদ্যগুলি লেখেননি। পড়ার কোনো তথ্যবাহী ইতিহাসও এতে নেই। 'সকলেরই জীবনে বইয়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো থাকে কিছু ঘটনার অভিজ্ঞতা। এ হলো সে-রকম বই-কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অল্প কয়েকটা বৃত্তান্ত।'[২৭] একক পাঠকের পাঠের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলিকে জুড়ে-জুড়েই একটা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গড়ে তোলা সম্ভব। আধুনিক গ্রন্থেতিহাস সেই পথেই এগোতে চাইছে। এবং এই ব্যক্তিগত পাঠে কেবল মলাট-মধ্যবর্তী সংখ্যাচিহ্নিত পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়টিই নয়, গোটা বইয়ের অবয়বই পাঠের অংশ হয়ে ওঠে। সাবেকি পাঠাভ্যাস থেকে আধুনিক গ্রন্থেতিহাসে পাঠের গ্রন্থনা এখানেই আলাদা হয়ে যায়। 'গ্রন্থেতিহাসে বইয়ের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে সমান নজর দেওয়া হয়, যেমন হরফ, ছাপা, বাঁধাই, অলংকরণ, ডাস্ট জ্যাকেট, কাগজ ইত্যাদি। ফলে গ্রন্থেতিহাসিককে সম্পূর্ণ নতুন একটি পাঠাভ্যাস রপ্ত করতে হয়।'[২৮] বইয়ের সঙ্গে জড়ানো পাঠকের নিজস্ব আনন্দের যে স্বীকৃতি আছে রোলাঁ বার্তের The Pleasure of the Text-এ, সেই আনন্দের সম্প্রসারণকেই গ্রথিত করে গ্রন্থেতিহাস। তাই শুধু বইয়ের বিষয়ের বদলে গোটা বইটিই উপজীব্য হয়ে ওঠে। পাঠের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় পুস্তকসংস্কৃতির সঙ্গে। শঙ্খ ঘোষ গ্রন্থেতিহাসকার না হলেও, 'বইয়ের ঘরে' তাঁর পাঠ আবহমান পন্থার বদলে এই নতুন দৃষ্টিতে এগিয়েছে। যেখানে প্রতিটি বই একক আভিজাত্যে উজ্জ্বল। বইয়ের সেই নিজস্ব মহিমার, পাঠকের সঙ্গে তার জৈবিক সম্পর্কের ইতিবৃত্তেই 'বইয়ের ঘরে'র স্বকীয়তা।

গদ্যকার শৈশবে নিজের হাতেখড়িতে বড়োমাপের একটা কৃত্তিবাসী রামায়ণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে উপহার পেয়েছিলেন। হাতে ধরে তাঁকে প্রথম অক্ষর লিখিয়েছিলেন সুনীতিকুমারই। প্রথম পাওয়া এই উপহার হারিয়ে গেলে তাঁর মনে হয় যেন নিজের জীবনেরই একটা অংশ হারিয়ে গেল। বইয়ের ভিতরের উপাদান ছাড়াও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনুষঙ্গের জন্যও কোনও কোনও বই পাঠকের জীবনাংশ হয়ে ওঠে। 'ভিতরের কথাগুলি ছাড়াও আরো কত সম্পদ থাকে বইয়ের, থাকে কত ব্যক্তিগত মুহূর্তের স্তবকে স্তবকে খুলে-যাওয়া স্মৃতি, কোনো একখানা বই হাতে নিলে যেন কোনো নিজস্ব জীবনাংশই জেগে ওঠে তাই। কোনো বইয়ের তাই কোনো বিকল্প-বই হতে পারে না, একই সংস্করণের একই মুদ্রণের হলেও হয় না তা। প্রত্যেকটা বই-ই জেগে থাকে তার একলা গরিমায়, একক ইতিহাসে।'[২৯] 'বইয়ের ঘরে'র সূচনা-রচনা 'হাতপাবাঁধা হনুমান'-এর প্রথমাংশের এই কথাগুলি গ্রন্থেতিহাসেরই প্রস্তাবনা যেন।

উপহার পাওয়া সেই রামায়ণের ভিতরেও অবশ্য বিশিষ্টতার ছাপ ছিল। বইটির সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তাই বইটিতেও ছিল স্বচ্ছন্দ সুরুচির পরিচয়। পাতায় পাতায় রবিবর্মা, উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালদের ছবিও এর অনন্যতার অন্যতম কারণ। পুস্তানিতে সুনীতিকুমার প্রাপকের নাম লিখে নীচে নিজের স্বাক্ষরও করেছিলেন এতে। আর সবটা মিলিয়ে লাল রঙের শক্ত মলাটওয়ালা সেই বইয়ে গদ্যকারের জীবনের অনেক ব্যক্তিগত ইতিহাস পুঞ্জিত হয়ে যায়। সেই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে দেখা দেয় পুস্তকশিল্পের অনুপুঙ্খ ছাপা, বাঁধাই, ছবি ইত্যাদি।

বইটি বালকবয়সের সব সময়ের সঙ্গী হয়ে থাকলেও, ঠিক পড়ার সঙ্গী হয়ে ওঠে না। সেই বইয়ের রচনাংশ তিনি পড়েছেন অনেক পরে। কিন্তু তবুও ভিন্নরকম পাঠসঙ্গী হয়ে থাকে বইটি। এর ভেতরের ছবিগুলির কারণেই বইটির প্রধান টান তৈরি হয়। গঙ্গাবতরণ, রামের সমুদ্রশাসন বা সোনার লঙ্কায় হাতপাবাঁধা হনুমানের ছবিগুলি ছিল তাঁদের ভাইবোনের থিয়েটার থিয়েটার খেলার রূপানুকরণের প্রধান উপাদান। ছবিগুলির ছাঁদে নিজেরাই তেমন ভাস্কর্য হয়ে উঠতেন, নিজেরাই দেখতেন এবং কিছুক্ষণ পর সেই রূপ ভেঙেও ফেলতেন। এসব ছবির মধ্যে হনুমানের ছবিটিই ছিল প্রিয়। যে-হনুমান শরীরের আয়তন বাড়িয়ে নিয়ে শুয়ে আছে, লিলিপুট রাক্ষসেরা তাকে নিয়ে মজা করছে। হনুমানেরও মুখে একটু হাসির আভাস, কেননা একটু পরেই সে ছোটো হয়ে ফুরুৎ করে উড়ে যাবে। উপেন্দ্রকিশোরের এই ছবিটির স্ট্যাচু নির্মাণে গদ্যকার নিজেই হনুমান হতেন সানন্দে। এর থেকেই যেন রূপ জাগিয়ে তোলার মগ্ন এক আলস্য প্রাপ্তি হয় তাঁর, আজীবনের মতো। তাঁর মনে হয়, 'হয়তো তখন থেকেই, অন্তর্লীন সেই আলসেমিটা আমার শরীরের পরতে-পরতে জড়িয়ে আছে আজও, সেইসব দড়িদড়া থেকে আর মুক্তিই হলো না মোটে।'[৩০] এই আলস্য সদর্থক অর্থময়তা পেয়ে যায় শঙ্খ ঘোষের সৃষ্টির নিরিখে। তাঁর কবিতা বা গদ্যে আলস্যের উচ্চারণ উঠে আসে বারবার। কখনও তিনি 'পা-ডোবানো অলস জলে'র কথা বলবেন 'নিহিত পাতালছায়া'র কবিতায় বা 'বটপাকুড়ের ফেনা'র গদ্যে, আবার কখনও বলবেন 'আলস্যপুরাণে'র কথা 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কবিতাবইয়ে। এই আলস্য বস্তুত জীবনের অন্তঃসারকে ধরার আয়োজন, প্রস্তুতির নির্জন নেপথ্য। এভাবেই একটি বই পাঠকের অস্তিত্বের অংশ হয়ে ওঠে। পাঠেরও আশ্চর্য্য সব আনন্দঘন আয়তন তৈরি হয়। সমস্ত স্মৃতিবিস্মৃতি মিলিয়ে প্রতিটি বইয়ের সঙ্গে একটা সর্বাত্মক সংযোগ গড়ে ওঠে। তাই কোনো নিরালা মুহূর্তে বইয়ের মাঝে এসে বসলে, 'অগোচর কিছু কিছু নিঃশব্দ কথা হতে থাকে তাদের সঙ্গে'।[৩১] বই আর তার পাঠকের এই সংলাপই গ্রন্থের ইতিহাস, পাঠকেরও ইতিহাস। যে-ইতিহাস অনুরণিত হয়েছে 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'-এর 'বই' কবিতায় :

'এখন আমার সব বই ঘুমন্ত, তার মাঝখানে
চুপ করে বসে আছি

ওদের ঘুমোবার আভা আমার গায়ে এসে লাগে।
দরজা বন্ধ করা থাক। এদের নিঃশব্দ শান্তি
আমাকে মুছে নিক
মাথা থেকে নেমে যাক গতদিনের ভার।
আরো কিছু স্তব্ধতার পর
কারো মুখে হাত রেখে বলে উঠি : ওঠো
জেগে ওঠো, এইবার, একা
আর তারপর
এইসব নিরিবিলি দেখাশোনা, তোমার আনন্দে
আমার আনন্দ-জেগে-ওঠা।'[৩২]

(৫)

'অল্পবয়স কল্পবয়স' বইয়ের 'ভাগ্যিস ছিলেন শরৎচন্দ্র' লেখাটিতে গদ্যকার নিজের ছাত্রবয়সের একটি সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। সিনেমাটি ছিল প্রমথেশ বড়ুয়া আর কানন দেবীর 'শেষ উত্তর'। সেই সিনেমার 'আমি বনফুল গো' গানটা শুনে লেখকের একটা বোধের দরজা খুলে যায়, "শিক্ষাটা হলো এই যে মেয়েদের বনফুল হয়ে থাকতে হবে সবসময়ে! দেশটাকে পিছিয়ে দেবার কত আয়োজন!"[৩৩] সেই আয়োজনের, নারীজীবনের সেই লাঞ্ছনার ইতিহাস শঙ্খ ঘোষের কবিতায় একটি স্থির বিষয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে থেকে গেছে। 'লিখে যাই জলের অক্ষরে/ আমার মেয়েরা আজও অবশ ভিক্ষার হাতে পড়ে আছে সব ঘরে ঘরে।'[৩৪] শঙ্খ ঘোষের সমগ্র কবিতাবৃত্তের নিরিখেও যথার্থ এই উচ্চারণ। অন্য অনেক কবিতার সঙ্গে তাঁর 'রাঙামামিমার গৃহত্যাগ' এক্ষেত্রে আলাদাভাবে লক্ষণীয় একটি কবিতা। কবিতাটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত। এই কবিতার কেন্দ্রে আছেন কবিরই এক আত্মীয়া। যিনি 'ঘর, বাড়ি, আঙিনা' পেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। কবিতার সেই চরিত্রটিরই সম্প্রসারণ মেলে কবির আত্মজীবন-নির্ভর উপন্যাস ত্রয়ীর দ্বিতীয়টিতে 'সুপুরিবনের সারি'তে ফুলমামি চরিত্রটির ভেতর। নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ও সন্তান হারানো নিঃসঙ্গ ফুলমামি নিজের ভেতর কবিতাকে বহন করেন। তাঁর দুঃখ-লাঞ্ছনার ইতিবৃত্তই তাঁর কবিতা। কবিতার কোনো মান্য রীতির বদলে নিজস্ব এক নন্দন তৈরি করে নেন তিনি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলু ফুলমামিমার কবিতাতেই দীক্ষিত হতে থাকে। ফুলমামির কবিতাভাবনা মনে করিয়ে দেয় 'নিঃশব্দের তর্জনী'তে গদ্যকারের কবিতানন্দনের কথা। যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'এখন ইচ্ছে করে যেমন-তেমন বলতে, খুব আপনভাবে, কাঁচা রকমে। খুব ছোটো আর খুব সহজ!'[৩৫] ছোটো ও আপাত-সহজ কিছু কবিতা নীলু পড়েছিল ফুলমামির খাতায় :

'সকালবেলার ওই পাখি যে

উড়তে আমায় ডাকছে নিজে
সেই কথাটা বলব আমি কাকে!
এসব তো কেউ বুঝবে না গো
সবাই আমায় বলবে পাগল
গোপন কথা গোপনে তাই থাকে।'[৩৬]

আর এমন কবিতা পড়ে সে আশ্চর্য হয়। তার মনে হয় ইস্কুলের বইয়ে বা 'শিশুসাথী' ও 'মৌচাক'-এর পাতায় যেসব কবিতা সে পড়েছে তার থেকে এই কবিতা অনেক অন্যরকম। এমনকি শুরুতে ফুলমামির এধরনের লেখাগুলিকে ঠিক ঠিক কবিতা বলা যায় কি না, তা নিয়েও সংশয় জাগে তার। ফুলমামি অবশ্য স্পষ্ট করে জানান, 'না-ই হলো। তাতে আমার কী? কবিতা লিখতে বয়ে গেছে আমার! আমার যা কথা, আমার তা কথা। ব্যস'[৩৭] 'ফুলমামি' কবিতায় কেবল নিজের সত্তাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। নীলু আরও লক্ষ করতে ভোলে না ফুলমামির কবিতায় মিল-অমিলের মধ্যপথ। 'না গো' ও 'পাগল' এই দুয়ের মিল নিয়ে মনে হয়েছে তার যে, 'কানে শুনবার সময়ে, মিল যে নেই, তা কিন্তু মনেই হচ্ছে না। অমিলটাও বেশ মিল! না?'[৩৮] আবার বন্ধু হারুনের কাছে অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে বন্ধুবিচ্ছেদের অনুভবে নীলু যখন নিজের প্রথম লেখা কবিতা শোনায় ফুলমামিকে, যে কবিতাটি ছিল

'সুখের দুটি পায়রা এসে বসছে জুড়ে একটি ডাল
আমার সেথা কীই-বা অধিকার!
জাগাই কেন বৃথাই সেথা মৃত আশার ব্যর্থ তাল
মনোমাঝেই থাকসে হাহাকার।'[৩৯]

তখন তা শুনে, কাব্যিক শব্দ ব্যবহারের বদলে নীলুকে আটপৌরে শব্দ ব্যবহারের কথা বলেন তিনি : 'কবিতায় যা লেখে লিখুকগে। তুই যেমন ভাবিস, যেমন বলিস, তেমনি লিখবি। সেথাটা মোটে ভালো কথা না। আবার একখানা নয়, দু-দুটো সেথা লাগিয়েছেন বাবু!'[৪০] কার্যত এর সমস্তটাই শঙ্খ ঘোষের কাব্যচিন্তার অন্তর্গত। তিনি বারংবার মনে করিয়ে দেন কবিতার অলংকরণবাহুল্য বর্জনের কথা 'শব্দের পবিত্র শিখা'কে জ্বালিয়ে তোলার কথা।

(৬)

শঙ্খ ঘোষ শিল্পকে বিকেন্দ্রীকরণের ভেতর দিয়ে দেখতে চান। তাই কবিতা বা কবিতাজগতের প্রসঙ্গেও তিনি বিকেন্দ্রীকরণের নন্দনকেই ধরতে চান। তাঁর স্মৃতিলেখায় কবিতার যে সূচনাকথাগুলি আছে, তা যখন কবিতায় আসে, তাতে অনেক জটিল অনুভব ও মনন জড়িয়ে যায়। বস্তুত অভিজ্ঞতা-অনুভূতির তির্যক রূপায়ণেই কোনো রচনা কবিতা হয়ে ওঠে। যেখানে একটি বিন্দুতে এসে মিশে যায় চেতনা-অধিচেতনা-অবচেতনা, স্বপ্ন

বাস্তব ও কল্পনা, এইসময় ও চিরসময়, ব্যক্তির নিজস্ব ইতিহাস ও সমূহের ইতিহাস, দৈনন্দিনের বহুলতর সংকট আর তার প্রশমনের শান্তি। এর সমস্তটাকেই ধারণ করে কবিতার সংহত 'শরীর' জেগে ওঠে। যে-ঘনতা থেকে ইশারার ব্যাপ্ত বিচ্ছুরণ মেলে। সংহতিময় উন্মোচনের এই ইতিহাসেরই কিছু ইঙ্গিতবিন্দু তাঁর কবিতার মুহূর্তগুলি। কেন্দ্রীভূত কোনো একমাত্রিকতাকে ভেঙে দেওয়া কবিতার কাজ। কবিতার পাঠেও তাই তিনি 'ভিন্ন রুচির অধিকারে'র পক্ষপাতী।

আবার সময়ের সঙ্গে কবিতার যে ধারাবাহিক ইতিহাসকে দেখেন তিনি, সেখানে লেখকের ব্যক্তি-পরিচয়ের সঙ্গে গোষ্ঠী-পরিচয়ও লিপ্ত হয়ে থাকে। এই পরিচয়গুলোকে তিনি চিহ্নিত করেন, সেগুলির অনড়তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নয়, একটা ধাক্কা দেওয়ার জন্যই। তাই তাঁর রচনায়, একটা শিবিরের বাইরে কীভাবে অন্য একটা প্রতিশিবির গড়ে ওঠে, বা এই দুয়ের প্রতিপক্ষে কোনো তৃতীয় শিবির, সেই চলিষ্ণুতাকেই ধরতে চান। সমস্তরকম শিবিরায়নের বাইরে বেরোবারই পথ এটা।

ফলে ক্ষমতাকেন্দ্রের বাস্তব সত্যও গদ্যকারের চোখ এড়িয়ে যায় না। তিনি দেখেন বাণিজ্যপত্র আর প্রতিষ্ঠানের প্রবল প্রতিপত্তি : 'দেশ'-এর মতো সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার বেড়েছে কেবলই, পঞ্চাশ থেকে তার তিনগুণ মুদ্রণ বেড়েছে ষাটের দশকে, আর এই সত্তরে প্রায় সাতগুণ। এই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যকে নানারকম সামাজিক আর আর্থিক প্রতাপ দিতে শুরু করেছে এইসব পত্রিকা আর প্রতিষ্ঠান, পুরস্কারে পুরস্কারে ভরে উঠছে চারদিক।'[৪১] এর অনিবার্য ফল হিসেবে সাহিত্যজগতের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় দৈনিক পত্রিকার হাতে। বড়ো পত্রিকাগুলির এক-একটিতে এক-একদল লেখক। এই পরিবেশে সচেতন লড়াইও জারি থাকে। তাই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বইমেলায় গলায় ট্রে ঝুলিয়ে 'মিনিবুক' নিয়ে হাজির হন। বা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঝোলায় নিজের এবং অনুজ কবিদের ক্ষীণকায় বই নিয়ে ঘোরেন। এসমস্ত পদক্ষেপ ভিন্নরকম একটা সাহসের সঞ্চার করে। সংঘর্ষের এই সাহসকেই শঙ্খ ঘোষ শিল্পের শক্তি হিসেবে দেখেন : ' কলকাতার অনড় প্রকাশনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই এক অভিমান আর অভিযান নিয়ে এগিয়ে আসেন লেখকদের দল, সাহিত্যজগতে দেখা দিতে থাকে বিকেন্দ্রীকরণের সমস্তরকম আভাস'।[৪২]

উল্লেখপঞ্জি :

১। শঙ্খ ঘোষ, 'গদ্যসংগ্রহ'- অষ্টম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৩৭
২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯৯
৩। শঙ্খ ঘোষ, 'গদ্যসংগ্রহ'- দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা- ২৯২

৪। শঙ্খ ঘোষ, 'কবিতাসংগ্রহ'- দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৩, পৃষ্ঠা- ৩০
৫। শঙ্খ ঘোষ, 'গদ্যসংগ্রহ'- দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা- ৩১৫
৬। শঙ্খ ঘোষ, 'কবিতাসংগ্রহ'- দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৩, পৃষ্ঠা- ১৪৩
৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৪
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'- প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৩, পৃষ্ঠা- ৫৫৯
৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৫৯
১০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৫৯
১১। শঙ্খ ঘোষ, 'কবিতাসংগ্রহ'- তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৪২১, পৃষ্ঠা- ১৪২
১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪২
১৩। শঙ্খ ঘোষ, 'কবিতাসংগ্রহ'- প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪২৩, পৃষ্ঠা- ১৬১
১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬১
১৫। শঙ্খ ঘোষ, 'বেড়াতে যাবার সিঁড়ি', স্বর্ণাক্ষর, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১০৭
১৬। শঙ্খ ঘোষ, 'শুনি শুধু নীরব চিৎকার', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৪০
১৭। শঙ্খ ঘোষ, 'গদ্যসংগ্রহ'- অষ্টম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৪২৬
১৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২৬
১৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২৬
২০। বুদ্ধদেব বসু, 'প্রবন্ধসমগ্র'- চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৮৫
২১। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত রুদ্র (সম্পা.), 'কৃত্তিবাসের ঘরের কথা', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৫০
২২। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত রুদ্র (সম্পা.), 'কৃত্তিবাসের ঘরের কথা', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২৬২
২৩। শঙ্খ ঘোষ, 'কথার পিঠে কথা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা-৬৬
২৪। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, মে ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৯৪

২৫। স্বপন চক্রবর্তী (সম্পা.), 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', অবভাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা- ১০
২৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬১
২৭। শঙ্খ ঘোষ, 'গদ্যসংগ্রহ'- প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৩
২৮। স্বপন চক্রবর্তী (সম্পা.), 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', অবভাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা- ৯
২৯। শঙ্খ ঘোষ, 'গদ্যসংগ্রহ'- প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৭
৩০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০
৩১। শঙ্খ ঘোষ, 'গদ্যসংগ্রহ'- প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১১৮
৩২। শঙ্খ ঘোষ, 'কবিতাসংগ্রহ'- প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪২৩, পৃষ্ঠা- ১৯৬-১৯৭
৩৩। শঙ্খ ঘোষ, 'অল্পবয়স কল্পবয়স', শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৬
৩৪। শঙ্খ ঘোষ, 'কবিতাসংগ্রহ'- দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৩, পৃষ্ঠা- ১৭২
৩৫। শঙ্খ ঘোষ, 'গদ্যসংগ্রহ'-তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৯
৩৬। শঙ্খ ঘোষ, 'ছোটোদের গদ্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৭
৩৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৬
৩৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৭
৩৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৫
৪০। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৫
৪১। শঙ্খ ঘোষ, 'গদ্যসংগ্রহ'- প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩০৫
৪২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৮

কবি শঙ্খ ঘোষ ও শিশু সাহিত্য

অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শিশুদের নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা, শ্লোক, গান চলে আসছে জীব সৃষ্টির সময় থেকেই। শিশু সাহিত্যে ছড়ার গঠনে ছন্দবদ্ধের বিষয় এবং ছন্দের দোদুল্যমানতা ছড়ার জগতে যে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে এ কথা অস্বীকার করবার কোনও পথ বা মত নেই। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছড়াই যে, শিশু সাহিত্যের মধ্যে পড়বে তা নিশ্চয়ই নয়! শিশুকে ঘিরে যা কিছু তাই-ই শিশু সাহিত্যের মধ্যে পড়বে।

পূর্বেই বলেছি ছন্দের দোদুল দোলা অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে ছড়া বা কবিতার ক্ষেত্রে। কিন্তু এ সকল কিছু বাদ দিলেও মনের ভাব, মনের কথা, দোলা, বুঝতে না পারার কথায় দুলুনিও শিশু সাহিত্যের মধ্যে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। যদিও সেই মাত্রা গদ্যে যতটা ধরা যায়, ছন্দে ও অছন্দে তা কীভাবে ব্যক্ত হবে তা এক এক বুদ্ধিজীবী এক এক রকম বলতেই পারেন, যেমন—

মা, শিশুকে দোল দিতে দিতে বলছেন—'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে' হাত-পা ছোড়া শিশু, চুপ করে এই সকল ছন্দে গড়া বাক্য শুনতে থাকে। মা-ঠাকুমা-দিদাদের কোলে বসে, শুয়ে শুনতে শুনতে সেও কিছু বলবার চেষ্টা করে। 'অ ও ও আ আ' তা রূপে ধরা পড়ে। শিশুদের এই বলাতে পিতা-মাতা-ঠাকুমা ও পরিজনেরা খুশি হয়ে আরো আরো শ্লোক বলেন। সুতরাং শিশুর মুখে অপুষ্ট —দোদুল্যমান বুলিতেই অভিভাবকের হৃদয় ভরে যাচ্ছে। ছন্দ এখানেই অসীম মাত্রা লাভ করেছে। এখানেই সার্থক শিশুর আবোল-তাবোল বোল! ঐ আবোল-তাবোল বোল ও তার না বোঝা ছেলেখেলা, হাসি-কান্না কবির কলমে ধরা পড়ে নানান আঙ্গিকে।

কি বলতে চায় শিশু, কি করতে চায় সে, ছন্দ না তা অছন্দ তার ধার ধারে না শিশু। অথচ এক সাবলীল গতিতে জীবন-সংসারে মধুর হয়ে ধরা দেয়। এই রকমই কিছু বোধ ও বোধির সত্ত্বা নিয়ে জেগে ওঠে শিশু সাহিত্য। কবি শঙ্খ ঘোষও এর বাইরে যাননি। তিনিও তাঁর নিজ বালকসুলভ ভঙ্গিতেই শিশুর অনায়াস স্বচ্ছন্দ মেনে নিয়েছেন। আরো একধাপ এগিয়ে বলতে হয়, শুধু শঙ্খ ঘোষই নয়, শিশু সাহিত্যের সকল পণ্ডিতই স্বীকার নিয়েছেন শিশুর অনায়াস স্বছন্দ।

সুদর্শন সেনশর্মা সম্পাদিত 'কারুকথা এই সময়' পত্রিকার 'কবি শঙ্খ ঘোষ সম্মাননা-২০১৭' সংখ্যায় 'গোধূলি সংগীত' এর প্রশ্নের উত্তরে কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন- 'না, শিশু সাহিত্যের জগতে আমার কোনো বড় আসন নেই, কেননা ছোটদের জন্য খুব বেশি আমি লিখিনি, মাত্র চার-পাঁচখানা বই হয়তো আছে। এর জন্য আরো খানিকটা মন আর সময় দেওয়া উচিত ছিল বলে অনেক সময় মনে হয়। আরো কিছু লিখতে পারলে

তা যে অত্যন্ত বেশি গৃহীত হতো তা অবশ্য বিশ্বাস হয় না, কেননা টিন টিন — আদি কমিকস অধ্যুষিত জগতে এখন উত্তেজক রোমাঞ্চ, ভৌতিক রহস্য কিম্বা হাল্কা কৌতুকের টানটাই সর্বস্ব হয়ে গেছে। ছোটদের মনকে কোনো সজীব কল্পনার দিকে উদ্রিক্ত করবার অয়োজনটা এতই কম যে তাদের প্রত্যাশাটাই ঘুরে গেছে অন্য দিকে।'

এই সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে তবুও বলতে হয়, কবি শঙ্খ ঘোষ শিশুদের নিয়ে যতটুকু কাজ করেছেন তা অন্তর দিয়ে করেছেন। শিশু সাহিত্যে তাঁর সৃষ্টি ভাস্বর হয়েই থাকবে। তাঁর ছড়ায় দেখা যায়, তিনি অন্তর থেকে একজন শিশুকে সৃষ্টি করেছেন, যাকে কেন্দ্র করে ছড়া গড়েছেন। যাকে কেন্দ্র করে ছড়া বলেছেন। সেই সৃষ্টিশীল এক শিশুর নাম আমন।

শিশুকে আনন্দ দিতে গেলে সে গল্প বুঝবে না। তাকে শোনাতে হবে দুলুনি ভরা ছড়া। এখন এই ছড়াকে কীভাবে আনা যায়! কীভাবে গঠন করা যায় অভিভাবকদের এক চিন্তা! সব সময় যে মুখস্থ ও প্রাচীন প্রবাদ ছড়াই বলতে হবে বা তাও যে মুখস্থ থাকবে তা তো নাও হতে পারে! আবার দেখা যায় তাৎক্ষণিক প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েও তিনি শিশুদের সামনে আসতে পারেন। কিন্তু তা কীভাবে! কবি শঙ্খ ঘোষ তা সুন্দরভাবে বর্ণনা দিলেন-

'ছড়া কোথা ছড়া কোথায় কোথায় আমার ছড়া?'
বলতে বলতে গলায় তোমার আওয়াজ হলো চড়া!
সে তো ঠিকই, ছড়া তো চাই কিন্তু কিসের ছড়া?
ছড়া তো হয় অনেক রকম শব্দ দিয়ে গড়া!
মাঠে গেলেই ধানের ছড়া গলায় মালার ছড়া—
বাজার থেকে মা তো আনেই কলারও এক ছড়া।
সেসব ছড়া নয় তা জানি—ভোরের সুখে ভরা
মুখে তোমার পড়ুক এসে প্রথম আলোর ছড়া!

ছড়ার মধ্যে এক দুলুনি, ছন্দের মধ্যে কোথায় যেন এক ভাবের নৃত্য! মনকে দুলিয়ে নিয়ে যায়। শিশু সাহিত্যে এই সকল ছড়া, বদ্ধ ঘরের আগল ভেঙে দেয়। জানালা দিয়ে ভুবনকে দেখা যায়। আকাশে-বাতাসে, গাছে-গাছে, ডালে-পাতায়, মেঘে-পাখিতে, জলে-স্রোতে, স্নেহ-আবদারে, আদরে-বাঁদরে ছড়া একেবারে এক ভূমিকায় উঠে আসে। আমনের মধ্যে দিয়ে কবি বলে ওঠেন,

'ভোর হলে চাই রোজ একখানা ছড়া'।

আগেকার দিনে প্রায় মানুষের বাড়ির খাটেই ছারপোকা থাকত। মানুষের রক্ত খেত। এখন অনেকটা কমলেও দেখা যায় একটু ঘিঞ্জি পরিবেশে। শিশু চিন্তা করে কেন আসে ছারপোকা, কেন বা সে রক্ত খায়! রক্ত নিয়ে খাটের মধ্যেই বা কী করে! কবির শিশুর মধ্যে দিয়ে প্রশ্ন রাখে—

'ছারপোকারা তক্তপোশে কিসের জন্য রক্ত পোষে?'

হয়তো কিছুই না কিন্তু একটা দুলুনি আছে। অনেক দিন মনে থাকবে। মুখস্থ করতে হবে না। শিশুদের মধ্যে মধ্যে ঘুরবে। ছারপোকা থেকে সাবধান হবে।

আবার কখনও আমরা দেখি রাস্তা-ঘাটে, স্টেশনে, কাউন্টারের সামনে ভিখারী ছেলে-মেয়েগুলো ভিক্ষা করে। তারা কেবল ভিক্ষা চায় না, না শুনলে গায়ে হাত দিয়ে ভিক্ষা চায়। অনেকেরই অসহ্য লাগে। কেউ কেউ আবার তা বেশ ভালোভাবে নেয়। সুন্দরী রূপসী যদি রূপ ঠিক করতে করতে বা চুল বাঁধতে বাঁধতে পথ চলে কিম্বা কেউই যেন না ছোঁয়, এই মনোভাবে চলে। সেখানে কেউ গিয়ে গায়ে একটু ছোঁয়া দিলে তা যে কী হয় তাও ব্যঙ্গভাবে কবি লিমেরিকের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন—

'ভিক্ষে করতে এসেও যদি গায় ছোঁয়াবি হাত
একটা চড়ে পুঁচকে ছোঁড়া করব কুপোকাৎ'-
বলতে বলতে পটের বিবি
গুছিয়ে নিয়ে চুলের ঢিবি
বাসের ভেলায় উঠতে গিয়ে লোকের ঠেলায় কাৎ।'

শিশু সাহিত্যের মধ্যে কবি দেখিয়েছেন শিশুদের মিতালি। ও মিতালির মধ্যে এক অদ্ভুত ছন্দ গড়া ভাব। এক শিশু বলছে আর এক শিশুকে—

'দুঃখসুখের ঝোঁকে বলতে গেছি তোকে
তুই কি আমার বন্ধু হবি-'

আবার

'সমান সমান সমান তুই যে আমার বন্ধু হলি
এটাই তো তার প্রমাণ।'

কখনও দুঃখ—কখনও সুখ, কখনও জোঁকের কামড় আবার সেইক্ষণে অন্ধকারে জুড়ে পায় ভ্যাপসা গরম। তারই মধ্যে দেখে পাঁচিল ফুঁড়ে শাদা পাখির পালক উড়ে আসে।

পাশাপাশি মন আনন্দে বলে ওঠে,

'সমান সমান সমান
শহরটা যে আমাদেরও
এটাই তার প্রমাণ।'

কখনও কবি শিশুর মধ্যে থেকে বলে উঠেছেন—এই তো আমাদের অল্প বয়স, কল্পনা করবার বয়স, এই বয়সই তো গল্প করবার বয়স। পাহাড় ঝর্ণার সাথে কবি শিশুদের মনে মন লাগিয়ে উড়ছেন, একশো হাজার লক্ষ কোটি তারার সঙ্গে এবং চোখ ও মন ভিজিয়ে দূর থেকে দূরে চলে যাবার কথা বলেছেন।

শিশু সাহিত্যে শিশুদের উপর স্নেহ উজার করে দিয়েছেন। তাইতো শিশুদের কেউ উপেক্ষা করলে তিনি বলেছেন—'কোনো জিনিষই ফেলনা নয়। সব কিছুতেই খেলনা হয়।

আবার বললেন, আমরা সবাই এক আসনে আছি।' যথা—

মস্ত এ সংসারে
ওই সাঁকোতে তুমি আছো
এই সাঁকোতে আমি
মধ্যে আছেন অবিন ঠাকুর
জোড়াসাঁকোর ধারে!

শিশু অভিভাবকদের মুখে মন ভোলানো ছড়া শুনে শুনে শিশুর মনের ভিতরও গুঞ্জন করে ওঠে। সময়ে সময়ে শিশু তাই মনে মনেই একটার সাথে একটা মিল দিয়ে ছড়া কাটতে থাকে। কখনও ঠিক হয় কখনও বেঠিক কিন্তু তার ছড়া কাটবার যে এক সুদৃঢ় প্রবণতা জন্মায় তাকে তো রোধ করা যায় না! কখনো সংখ্যা সংখ্যা মিল দিয়ে ছড়া কাটে শিশু, কখনও আবার শব্দে শব্দে মিল দিতে চায়। এমনি এক ভাব তুলে ধরেছেন কবি। যথা—

'এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত
ল্যাজখানা লম্বায় পঞ্চাশ হাত'

কখনও—

'তিন দুই এক সাত ছয় পাঁচ চার
দু-আঙুল হয়ে গেল ল্যাজ তাই তার'

কখনও আবার শিশুর খামখেয়ালি দশা কবির কলমে উঠে আসে—

'হিকরি ডিকরি ডক
এক পায়ে খাড়া বক!'

শিশু সাহিত্যে কবি শঙ্খ ঘোষ উঠে এসেছেন এক নবতম অধ্যায় নিয়ে। যেখানের চিত্র একেবারে ঘরোয়া, সংসার আবদ্ধ। এই নয় যে, তাঁর শিশু সাহিত্য সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ। পরন্তু বলা চলে তাঁর শিশু সাহিত্য সীমার মাঝে অসীম দিগন্তে উদ্ভাসিত। এখানে ঘরোয়া আর সংসার আবদ্ধ বলবার হেতু এই যে, শিশু নিয়ে পিতা-মাতা-প্রিজনেরা যে দিবা-রাত্র কীভাবে অতিক্রম করে, তারই চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি, মূলত এই কথাই বলা হয়েছে। শিশু দিবা-রাত্র খায় আর ঘুমায় আর বাকী সময় হাসাহাসি, টই টই করে ঘুরে বেড়ায়! এছাড়া আর কাজ কী! এসব নিয়ে আবার শিশুর পিতা-মাতার মধ্যে একটু মনোমালিন্যতা কবি শঙ্খ ঘোষের শিশু সাহিত্যে ধরা পড়েছে, সুখের তরণী স্বরূপ। শিশুর সারাদিন টই টই করা, এটা ধরা, ওটা ভাঙা দেখে মা আদুরে মেশানো অভিমানে বলে ফেলেন- 'অলুক্ষণে কোথাকার!' পিতা সেই সুরে সুর মিলিয়ে বলে ফেলেন- 'ছি ছি', 'বাউন্ডুলে'। শিশু কারোর মুখের পানেই সেই হাসি ও ভালোবাসা খুঁজে পায় না। হঠাৎ বুঝি সে কেঁদে ফেলে! মা তক্ষুণি বলেন, 'আমার মা-মণিকে মিছিমিছি বকছ কেন?' কোথায় আর যায় আমার খুকিটি! একটু শুধু ঘর থেকে নেমে উঠোনে। কবি বললেন- 'অষ্ট প্রহর

খাঁচার মধ্যে থাকতে কি কেউ পারে?' শিশুর পক্ষ নেওয়াতে হয়ত মায়ের প্রতি শিশুর একটু ভরসা উদয় হয়। এই ভালোবাসার মা, কখনও শিশুকে পড়ানোর ছলে ভীষণই কঠিন হয়ে পড়েন। তিনি এটা ওটার সাথে তুলনা দিয়ে পড়াশুনা বোঝানোর চেষ্টা করেন। ঠিক তেমনই অঙ্ক কষতে বসেও নিত্য নৈমিত্যিক দ্রব্যবস্তুর সাথে মিল দিয়ে শিশুকে পড়ানোর রীতি মায়েদের আজকের নয়। তাইতো কবি বললেন-

'পাঁচ পয়সায় সাতটা হলে এক পয়সায় কটা!'

কখনও

'চলার সময় সামলে চলো; দুটোই আছে চোখ তো!'

মায়ের বকুনির মাঝেও যে শিশুর প্রতি এক অমোঘ ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে তা কে বলতে পারে। তা একমাত্র মা'ই জানে। তাইতো 'বকুনি'তে কবি তুলে ধরেছেন মায়ের আচরণ শিশুর প্রতি। যথা মা বলছেন,

'যখন তোমায় বকতে থাকি সেটা যে এক মস্ত ফাঁকি
সেই কথাটা বুঝতে পারো না আজ ?

পরক্ষণেই বললেন,

বুঝবে তবু সামনে এসে তোমার জন্য কী আয়েসে
হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখি কী কী!

পাশাপাশি বললেন,

যখন তোমায় বকতে থাকি বুঝতে তখন পারো নাকি
তোমায় বাসি সবার চেয়ে ভালো?'

বড় হয়ে উঠতে না উঠতে শিশুর মাথার মধ্যে হাজারো পড়ার চাপ। সময়তে সে বই খুলে, খাতা খুলে বসে থাকে। ভেবে পায় না কি করবে! আগে কোনটা করবে। কীইবা লিখবে সে, তার থেকে যদি সে খালি রাখে খাতাটা তবে এই যে তার ভিতরে ওঠাপড়ার জন্যে খাতাটাই খালি, এই ব্যাখ্যাটাও কি অভিভাবকেরা বা মাষ্টার মহাশয়েরা বুঝবেন না!- এমনই চিন্তার ছবি এঁকেছেন কবি শিশুদের মধ্যে। আবার কবি এও বলেছেন, মায়েদের বকাঝকায় শিশুদের মনে বড় আঘাত লাগে। সর্বক্ষণ সেই বকুনি তার মাথায় ঘুরপাক খায়। এক সময় তার নিজের প্রতি নিজের আত্মবিশ্বাস উঠে যায়। কবি তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। যথা—

'মা বলেছে আমার নাকি অঙ্কে তেমন মাথা নেই"

আবার এই শিশুই কারও না কারও ভালোবাসা পেলে সে উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর মনের আঙিনায় বিশ্ব দুনিয়াকে দেখতে পায়। সে ছুটে বেড়ায়, ভিড়ের পর ভিড় ঠেলে মিউজিয়ামে, চিড়িয়াখানাতে, বিধান-শিশু উদ্যানে। কখনও সে তার মনে মনে দেখে বছর শেষের শীতে কলকাতা ডিগবাজি খাচ্ছে। কখনও সে রাস্তায় ফুচকা খাচ্ছে, কখনও ময়দানে

দেদার দৌড় দিচ্ছে এবং সঙ্গীদের বলছে আয় দেখি আমার সাথে পাল্লা দে। শিশুর মনের মধ্যে যে আর একটি মুক্ত মন দিবা-রাত্র ছুটে বেড়াচ্ছে, যা ইচ্ছা সে তাই করছে, তা কবি নিপুণভাবে কলমের কালিতে এঁকেছেন।

শিশুদের ক্ষেত্রে প্রথমে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক ঘন হয়। তারপরে সজ্জন-প্রতিবেশি, ক্রমান্বয়ে বন্ধুবান্ধবদের সাথে এক নাড়ীর যোগ চলে আসে, তাদের ঘিরেই যে, বেঁচে ওঠার এবং এগিয়ে যাবার স্বপ্ন — এতো স্বাভাবিক! এতো শিক্ষা নেওয়ার নয়! এ কোথাও ধার করবার নয়। এইগুলি সামাজিক ও প্রাকৃতিক বাতাসের উপকরণ। কখনও কখনও ইনিয়ে-বিনিয়ে মিথ্যাচারণও শিশুর স্বভাবের এক নবায়ত্ব বৈশিষ্ট্য। এই মিথ্যার মধ্যে তার একটা এ্যাডভেঞ্চার কাজ করে। এই মিথ্যার মধ্যে তার একটা সদা হাস্য রূপ থাকে। যেন সকলে ভুল বুঝে হেরে গেল, যেন সকলে তার কথাই বিশ্বাস করল। অর্থাৎ সেও যে কিছু বলতে পারে, সেও যে কিছু উপদেশ দিতে পারে, এটা তার স্বভাবের মধ্যে চলে আসে, পিতা-মাতার উপদেশ শুনতে শুনতে। মিথ্যাচারণটা ঠিক মিথ্যা বলতে চায় সেটা ঠিক নয়! সে চায়, সে যেটা বুঝেছে, সেটাতে সকলে সম্মত হোক। না হোক তবুও সে তার মতেই থাকে। লোকের কাছে তা মিথ্যা হয়, তাতে শিশুর কী! কবি এখানে স্পষ্ট দেখাচ্ছেন 'মিথ্যা কথা' ছড়ার মধ্যে। যথা- শিশু বলছে, 'লোকে আমাকে বেশ ভালোই বলে। শুধু দোষ ধরে আমি নাকি একটু আধটু মিথ্যে কথা বলি। ট্রেনে করে যখন বাইরে যাই তখন চারপাশ দেখে অনেক অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি মারে, সেইগুলি বলতে থাকি। বেশি কথা বলি এটাও নাকি আমার দোষ। ট্রেনের বাইরে জানালা দিয়ে দেখি মাঠের মধ্যে গাছপালাগুলি বেশ চলাফেরা করছে। এক এক রকম তালে তারা যেন নৃত্য করছে। এসব দেখেই বলেছি—

'ওমা দেখপ, নৃত্যনাট্য- মা অমনি আমাকে ভীষণ বকে দিলেন। বাড়ির দেওয়ালে খসে যাওয়া চুন-সুরকির মধ্যে বেশ কিছু ছবি ফুটে ওঠে। চেনা চেনা বেশ কিছু ছবি। কখনও সেখানে ফুটে ওঠে পশুরাজ সিংহ। কখনও মেঘের মধ্যে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথকে। একি সব আমি মিথ্যে বলছি! কিন্তু দিদিমণি থেকে মা-বাবা সকলে আমাকে কেবলই বকে।'

আবার কবি'রূপকথা'য় তুলে ধরেছেন শিশুর আঙ্গিক। যথা- শিশু যে সব সময়ে সকলের থেকে একলা হয়ে যায়। বাবা-মা তটস্থ হয়ে পড়ে শিশু কোথায়! এখানেও শিশু বলছে আমি কী নিথর! আমি কি পুরোপুরি স্থির! মোটেও না। আমি দেখতে পাচ্ছি ছবির উপর অনেক অনেক ছবি ভিড় করছে। আবার সকলকে থামিয়ে দিয়ে বিজ্ঞের মতো সে বলে ওঠে, কবির ভাষায়—

'বলছ তুমি 'চুপ কেন তুই?' আমি বলছি 'চুপ —
দেখছ না কি হাজার কথার দেখছি হাজার রূপ?'

আবার আর এক ছত্রে বললেন—

'আমি যখন একলা থাকি তখন কি আর একলা থাকি
জানো তখন সঙ্গে থাকে কারা ?
থাকে সবুজ গাছপালা আর তার ভিতরে চলে যাওয়ার
পথও থাকে, ঠিক যদি পাই সাড়া।'

সেখানে শিশু বর্ণনা দিচ্ছে, তার খেলার সাথি একটি কাঠবেড়ালি। সে আমার দিকে কেবলই তাকায়। তাকে ধরতে গেলে এমনই ছুট দেয় যে সব হিসাব ভুলিয়ে দেয়। গাছেরাও আশীর্বাদের মতো আমার মাথায় পাতা ঢেলে আশীর্বাদ করতে থাকে। মনেই হয় না আমি একলা একলা থাকি।

এই যে শিশুদের ভাব-অভাব নিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষের লেখনি, তাদের মনের ঠিক কোন জায়গায় যেন সকলের ভালোবাসা পৌঁছাতে পারছে না। আবার কোনও কোনও জায়গায় শিশুর মনটা সব কিছু ছাপিয়ে উঠে যাচ্ছে। এই সকল কিছু নিয়ে কবির উত্থাপন শিশু সাহিত্যে।

শিশুর চিন্তা-ভাবনার কোনও দাম যেন কেউই দেয় না। সে কারণে শিশুর মনের মধ্যে একটা ভীষণ অভিমান বাসা বাঁধে। হয়তোবা তাই সে খেতেও চায় না সময়ে। মুখখানা সে হুতোম প্যাঁচার মতো করে থাকে। মুখে সে কিছুতেই খাবার তোলে না, অনেক সময় খাবার তুললেও কিছুতেই গলাধঃকরণ করে না। এই সকল নানান দিক কবি তুলে শিশু সাহিত্য শুধু নয়, শিশুকে নিয়ে সমাজ চেতনার কথা তথা অভিভাবকদের কিছু ভাবতে নির্দেশ দিয়েছেন নীরবে।

কবি শিশু সাহিত্যের মধ্যে শিশুর জয়গান করেছেন প্রতি ছত্রে ছত্রে। তিনি শিশু মনের পাখি। পিতা-মাতা-অভিভাবকেরা শিশুর কথা মিথ্যে বলে ঘোষণা করে দিলে কবি তার প্রতিবাদ করেন এইভাবে—

'কোনটা যে ওর সত্যি কথা
কোনটা বলে মিথ্যে
সেটাই যদি জানতে তবে
অনেক কথাই শিখতে!'

শিশু যখন সত্যি বলে ঠিক করে তখন তার রোখ বেড়ে যায়। কেউ আর তাকে মিথ্যে বলাতে পারবে না। তখন যদি সকলে হাত জোড় করে বলেও, ঠিক বলেছ। মানছি তোমার কথাই মানছি। অমনি সে আবার মিথ্যে সাজাতে বসবে। কবি এক্ষেত্রে এঁকেছেন—

'কারণ তখন চোখের আড়ে
ঝিলিক দেবে মিথ্যে
বুঝবে যে সে দাঁড়িয়ে আছে
সৃষ্টি করার তীর্থে।'

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

শিশুর মধ্যে এইভাবে যে রসবোধ জাগ্রত থাকে তা কবি পরিষ্কার তুলে ধরেছেন শিশু সাহিত্যে কলমের কালিতে। 'কলকাতা' ছড়ায় তিনি রসের নলেন গুড় ঢেলে দিলেন।—

'এবার ছুঁড়ে ফেল খাতা
নিউ ইয়ারে শহর তো আর
কলকাতা নয় ক্যালক্যাটা!'

তাইতো আমার মনে হয়-

শিশু সাহিত্যে ছন্দ-ছড়ায়
অনেক কিছুই এমনই গড়ায়
সংখ্যা কখনো লঙ্কায় যায়
শব্দ সবেই পাল্টি খায়'

মজার মজার দৃশ্য তুলে ধরতে বস্তুর প্রয়োজন হয় না। কিছু শব্দ চয়নই যথেষ্ট। ছড়ার ভাব'এ শিশু চেতনে একটা দুলুনি লাগা আসে তবেই তো শিশুর মন জয় হয়। তবেই তো শিশুর মুখে, শিশুর চিন্তনে আজীবনকাল জেগে থাকা। তাই তো কবি তুলে ধরেছেন-

'ড্যাংডা ড্যাডাং ড্যাং, ড্যাংডা ড্যাডাং ড্যাং',
ঘাপটি মেরে চুপটি ছিল মস্ত কোলা ব্যাঙ।
ড্যাংডা ড্যাডাং ড্যাং, ড্যাংডা ড্যাডাং ড্যাং,
আলতো করে জাপটে নিল আমনবাবুর ঠ্যাং।
ডুম ডুমা ডুম ডুম, ডুম ডুমা ডুম ডুম
অমনি দেখো আমনবাবুর কান্নাকাটির ধূম-
ডুম ডুমা ডুম ডুম, ডুম ডুমা ডুম ডুম
লজ্জা পেয়ে আজ্ঞে দু-চোখ ব্যাঙ লাগাল ঘুম"

এই রকমভাবে শিশুর মন চুরি করেছেন কবি। সবেতেই তার দৃষ্টি। এযেন আজও পরখ করছেন। আজও রসের হাঁড়ি ঢেলে ঢেলে দিচ্ছেন শিশুর ভিতর, অভিভাবকের ভিতর। এই রকম রসে বশে কবি শিশুদের নিয়ে কতই না খেলা খেলেছেন—আরেক স্থানে দিলেন,

'কাকের নাকে নোলক—
এই নিয়ে লিখতে হবে ছোট্ট একটা শোলোক!'

আবার বর্ষাকালে বৃষ্টির দিনে শিশুদের মন খুব আনচান করে। বাইরে বেরোতে পারে না। ঘরের জানালা দিয়ে দেখে শিশু, জলের স্রোত বাওয়া। শিশুর আর কিছুতেই ঘরে মন থাকতে চায় না। কোথায়বা যাবে শিশু, এই বর্ষায়। থৈ থৈ জলের মধ্যে! কবির মধ্যে থেকে শিশু যেন বলে উঠল—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর

কলকাতাতে বান
খালের থেকে একটা-দুটো
নৌকো তুলে আন।'

শিশুর মনের মধ্যে নানান প্রশ্নের উদয় হয়। সে হঠাৎ হঠাৎ করেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় অতি ভালোবাসার মানুষকে। এ প্রশ্ন শিশুর ক্ষেত্রে নিজেকে জানার এবং অন্যকে জানার। অচেনাকে জানার। এই জানা হল বস্তুর সাথে ভাবের আদান-প্রদান। শিশু মনের এই প্রশ্নগুলিকে কবি রসে-বশে অভিমানের আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। যা এক এক ভাবের ছত্রে এক এক মাত্রা বহন করেছে। এখানে কবি দেখিয়েছেন-

'ভোরেরবেলায় গোলাপ হাতে
বলছে হেসে বেবে
'এইটে নিয়ে একটা আমায়
গল্প লিখে দেবে ?'

এখানে বেবে হল শিশু নাতি। নাতিকে ডাকবার আদরের শব্দ। অভিমানে কখনও আবার শিশু বলছে মাকে—

'বড্ড তুমি বকো আমায় যখন তখন বকো
থাকবে নাকি একটু আধটু খেলাধুলোর শখও?'

'ভালোমন্দ' ছড়ায় কবি শিশু বন্ধুর সাথে শিশু বন্ধু প্রশ্ন তুলে ধরলেন—

'বল তো তবে কেমন হতো
গোলমেলে এই দুনিয়াটাই যদি না রইত ?'

কবি ছত্রে ছত্রে শিশুর নানান দিক তুলে ধরেছেন সাহিত্যের ঘরানায়। শিশুর মনে কখনও উদয় হয়, অন্য কেউ দুঃখে থাকলে। কেউবা কষ্ট পেলে শিশুর মন কষ্ট পায়। মা, বলেছেন, তোর মতো মূর্খ কি কেউ আছে রে, নিজের কথা ভাব। তোর নিজেরই তো কত দুঃখ আর তুই মরিস কিনা অন্যের দুঃখে! শিশুর মা যে কত কষ্ট পেয়ে শিশুকে শুধোচ্ছেন, তাও কবি তুলে ধরেছেন। যথা-

'সেসব দিকে মন না দিয়ে
মন দিয়েছে অন্যকে
এই দুনিয়ায় ওর চেয়ে আর
বল তো মতিচ্ছন্ন কে ?'

শিশুর অভিমান যে শুধু তার বায়না পূর্ণ তা নয়। অনেক কারণেই শিশুর অভিমান হতে পারে। শিশু ঘুরে ফিরে চাইতেই পারে তার মাকে-বাবাকে। কিন্তু যখন সে ফিরে-ঘুরে কিম্বা ঘুম থেকে উঠে মাকে দেখতে না পায়, যদি সে তার বাবাকে দেখতে না পায় তবে কি তার পক্ষে অভিমান করা যথেষ্ট নয়! তা কি অযথা অভিমান। শিশুর মনের মণিকোঠায়

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

এ অভিমান যে পাথরে খোদিত হওয়ার সমতুল। কবি বলেছেন, 'শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে, তাকে যখন মাসির কাছে রেখে, পিতা-মাতা বাইরে চলে যায় বিভিন্ন কাজে, তখনকার কথা। শিশু যতক্ষণ সারল্য চিত্তে ঘুমিয়ে আছে তখন কোনও কথা নেই। কিন্তু আড়ামোড়া ভেঙে যখন শিশু ঘুম থেকে উঠে পরে আর উঠে যখন সে তার বাবা-মাকে কাছে দেখে না তখন তার কি অবস্থা হয়! শিশুর অঙ্কে ছবি এঁকেছেন কবি। শিশুর মাসি তাকে ঘুম পাড়াতে যায়। সে বলে, আমি যে মায়ের সাথে মায়েরই কোলে ঘুমিয়ে ছিলাম। মাসি বলে, ওটা তো তুমি স্বপ্ন দেখেছ। শিশু কিছু না বলে আবার বিছানায় ঢলে পড়ে, গোমড়ায়, ফোঁসরায়। মনে মনে বলে,

'চোখেই আমার লুকিয়ে আছে মায়ের ঘর বা বাবার।'

কখনও শিশুর ঘুম ভাঙবার সময়েই মা ঘুমে ঢলে যায়, তাতে করেও শিশু অভিমান করে। আর সেই অভিমানের আওয়াজ ওঠে কবির লেখনিতে।

'আমার যখন ঘুম ভেঙে যায় তুমি তখন ঘুমোও?
ঘুমের থেকে উঠলে তোমার পাই না একটা চুমোও।'

পরের ছত্রে বললেন—

'আমার যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন কেন ঘুমোও?'

শিশুকে রেখে মা যখন কাজে বেরোয় তখন সারাটা দিন যে শিশুর কি হয়! তা সে কাকে বলতে পারে! তাও বাইরে বেরোনোর সময়ে যদি শিশুকে শাসন করে বেরোয় মা, তবে তো আর কথাই নেই। মনের মধ্যে এক চাপা গোমড়ানো ভাব বাজতে থাকে। সহ্য করতে না পেরে তাই শিশু মা'কে বলছে, কবির কলমে। এইভাবে—

আমায় তুমি লক্ষ্মী বলো নইলে আমি কাঁদব মা
আপিস যাবার সময় তোমায় দুই হাতে আর বাঁধব না।
যাবার সময় একটু তুমি আদর করো মন দিয়ে
জানোই তো মা সারাটা দিন থাকবে ঘরে বন্দী এ!
কিন্তু তখন কাঁদবে না আর ছোট্ট তোমার ফুলসোনা-
ওমা তুমি চুপ কেন মা মুখটা কেন খুলছ না ?
আমার কাছে দাঁড়াও এসে লক্ষ্মী বলো এক্ষুনি
দেখবে তোমার ফুলসোনাটার আর তো কোনই দুঃখ নেই।

সারাদিন মা বাইরে থাকলে শিশুর অভিমানের জ্বালাটি কত হয়, তা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন কবি। শিশুর মনের মধ্যে শিশু হয়ে বসে পড়েছেন। তাইতো শিশুর পূর্ণ ভাব তুলতে পেরেছেন। সত্যিই তো শিশু পয়সা চায় না, টাকা চায় না। সে আদরের কাঙাল। তাই কত করে আদর চাইছে। লক্ষ্মীসোনা ডাকটি শুনতে চাইছে। শিশুর মনের বাসনা লক্ষ্মীসোনা বললে, আদর করলে মা ফিরে আসা পর্যন্ত সে ভালো থাকবে। সত্যিই কি

তাই! না, মোটেই আদর পাবো না তার থেকে। যদি কিছু পাই' এই পাওয়ার জন্যে শিশুর মধ্যে যে কাঙালিপনা জেগে ওঠে, তা কবি দেখিয়েছেন শিশু সাহিত্যে।

শিশুর বাইরে ঘোরবার নেশা যখন পূরণ হয় তখন তার মহা আনন্দ। সে বাইরে যায়। সবার সাথে কথা বলে। শিশু আমন। যাকে সামনে রেখে কবি একের পর এক লিখে গেছেন নানান আঙ্গিকের শিশু সাহিত্যের ছড়া। সেই আমন 'জলঢাকা' ঘুরতে গেছে। সেই জলঢাকা পার হয়ে জঙ্গলে নেমেছে। হৈ হৈ করে সারাদিন ঘুরছে, মাঝে মধ্যে ভয়ও পেয়েছে বাঘ বাঘ ভয়। এছাড়া খাওয়া-দাওয়া ভালো করেছে তা কবির ভাষায় উঠে এসেছে।

'আহার-বিহার চলছে ভালোই, দিব্যি আছি, বেশ—
খুঁটির উপর ঝুলছে বাড়ি খুঁটিমারির দেশ।'

কখনও আমন বলছে, কলকাতায় আর সে ফিরছে না। সে দোলনাতে চড়ছে, হেলান দিয়ে বসছে। কখনও সে চাঁদের সাথে কথা বলছে। কখনও বনের সাথে, গাছের সাথে কথা বলে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। শিশু মনের আঙ্গিকে সে সারাদিন মাঠ-ঘাট ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাখির পিছনে দৌড়াচ্ছে, পাহাড়ের উপরে উঠছে। চা বাগান দেখছে একমনে। দেখছে কেমন করে চা পাতা তুলে চলেছে কর্মীরা। কেবল পাখির কিচিরমিচির শুনে ঘুম ভাঙে তার। সূর্যি মামা আলতো করে জাগিয়ে দিয়ে যায়। তারপর ডুয়ারস, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, চা বাগান দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে আসে। ফিরে আসে বাসস্থানে। অনেকেই বলেছে বাঘের দেখা পাবে। কিছুটা ভয় পাবে। জড়িয়ে ধরবে মাকে। তবু তাকে বাঘ দেখতে হবে। কিন্তু সেই বাঘের দেখা পায়নি বলে তার কত না আক্ষেপ।

কবি শিশু সাহিত্যের আঙ্গিকে ভ্রমণের পিপাসা মেটালেন। তিনি আরো বলছেন, শিশু বায়না ধরুক, একরোখা হোক, কথা না শুনুক কিন্তু শিশুর শরীর খারাপ হলে পিতা-মাতা-সজ্জনদের যে কি কষ্ট হয়, কি কষ্ট হয় শিশুদের তাও তিনি তুলে ধরেছেন। আমনের মধ্যে থেকে তিনি অসুস্থের বিবরণ দিচ্ছেন এইভাবে—

'আমন যখন জ্বরে পড়ে তখন কী হয় বলো
বাবার চোখ তো ছায়া-ছায়া
মায়ের ছলোছলো সোনাদিদির মুখ হয়ে যায়
রূপোদিদির মতো
পাড়াপড়শি দেখতে এসে বড়োই থতমত!
শান্ত হয়ে চুপটি করে
আমন যখন শোয় মন থাকে না তখন কারো
আর-কোনো দৃশ্যয়।'

জ্বর থেকে উঠে শিশু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় আর তার মধ্যে স্বভাবগত বৈচিত্র্য

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

দেখা যায় আর তখনই মা-বাবা, সজ্জনেরা বকা দেন। তখন শিশুর মধ্যে যে কি হয় তা ব্যক্ত করেছেন—

'কয়দিন জ্বর-জ্বর কয়দিন জ্বর-জ্বর
কয়দিন বকুনিতে থাকি জর্জর
কয়দিন বলি 'আজ ভালো নয় দিন
ইস্কুলে যাই আমি বাকী কয়দিন।।'

এইভাবে মান অভিমানে শিশু আমন দিন পার করতে থাকে। শিশু যখন আবার জ্বরে পড়ে তখন মায়ের খুব চিন্তা হয়। শিশু ও মায়ের ভাব কবি এইভাবে তুলে ধরেছেন।—

'ঔষুধে যে অসুখ সারে, জানত না ও ঠিক।
ডাক্তারেরা এলেই দেখি
জাপটে ধরে- ওমা- এ কী—
জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করে অ্যান্টিবায়োটিক।'

শিশুদের দুষ্টুমিকে আরো কতভাবে তুলে ধরেছেন কবি। দুষ্টুমির ইয়ত্তা নেই শিশুদের। শাস্ত্রেও নেই সেসব খেলা, প্রচলিতও নয়। এক এক শিশুর মধ্যে এক এক উদ্ভট দুষ্টুমি ফুটে ওঠে। কবি তেমনই কয়েকটি দৃশ্য তুলে ধরেছেন। কবি শিশু সাহিত্যের মধ্যে আমন নামক চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন। এখানে দেখাচ্ছেন, আমনের হঠাৎই বায়না হয়েছে সে হরিণের শিং মাথায় পরবে। এই নিয়ে তার বায়না। এই নিয়েই তার গোঁসা। এই নিয়েই তার খিদে বয়কট। সে কিচ্ছু খাচ্ছে না। শুধু তার কথা সে হরিণের শিং মাথায় নেবে। কবি লিখলেন-

'নিজের মাথায় পরবে বলে
যায় হরিণের শিং ছুঁতে!...'

শিশু আমন খেলে বেড়াচ্ছে। খাওয়ার দিকে তার কোনও মন নেই। কিন্তু খেতে তো হবে! নইলে শরীর থাকবে কেন! শিশু খেলা পাল্টে খেলা ধরে আর মা খাবার বাটি হাতে ধরে শিশুর পিছনে ঘুরে ঘুরে বেরায়। সাহিত্যে তুলে ধরলেন কবি এইভাবে-

'তখন থেকে একবাটি দুধ
খাওয়াচ্ছি আর কাকে—
তোমার মতো একজনও তো
দেখি না এক লাখে
বড্ড তুমি দুষ্টু, তুমি
জ্বালিয়ে খেলে মাকে—
পূর্ণতে তাই পূর্ণ মিলে
পূর্ণ হয়ে থাকে!"

প্রতি ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছেন কবি শিশু ও তার মায়ের লুকোচুরি, খুনশুটি। কখনও

কখনও আমন নামক শিশু চরিত্রটি হয়ে উঠেছে ভীষণ রকমের জেদি। মা, তার সাথে আর পেরে না উঠে বলে—

'আমন বড় জেদি
একটু এদিক ওদিক হলেই
চ্যাঁচায় গগন ভেদী!
আমনটা খুব পাজি
যেটা বলো তাতেই 'না না'
কিচ্ছুতে নয় রাজি।'

এতো গেলো শিশুর ইচ্ছেখুশি খামখেয়ালী। কেবল ঘরের মধ্যে। আবার বাইরে আর এক রকমের দুষ্টুমি শিশুদের মধ্যে চোখে পড়ে। স্কুলে, মামারবাড়িতে, পার্কে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের দুষ্টুমি। স্কুলের এক দুষ্টুমির কথা কবি ব্যক্ত করেছেন। যথা-

মা টিফিনের বাক্সতে ডিম-রুটি সাজিয়ে শিশুর হাতে দিয়ে বলেছেন- টিফিনের সময় এটা খেয়ে নিস। মা এই না বলে তড়িঘড়ি চলে গেল। কিন্তু শিশুটি ক্লাসে এসে সকল বন্ধুদের ডেকে দ্যাখে কার কাছে কতটুকু খাবার আছে। আসলে টিফিনের খাবার না খেলে স্কুলের ম্যাম খুব বকেন, তাই সব বন্ধুদের ফিসফাস করে কাছে ডেকে জড়ো করে ঝুপঝাপ শব্দে সব খাবার ড্রেনে ফেলে দিল। ন্যাপকিনে মুখ মুছে শান্ত হয়ে ক্লাসে এসে বসল।

'ন্যাপকিনে মুখ মুছে বলে, মিস শেষ—
ভালো মেয়ে ভেবে মিস খুশি তাই বেশ!'

আর এক ছত্রে শিশু দুষ্টুমি দেখাচ্ছে, এইভাবে- যে শিশু দুষ্টুমি করতে করতে চরমে উঠে যাচ্ছে। পড়াশুনায় মন নেই। যা পড়ায় তা বলতে পারে না। এক প্রশ্নের উত্তর আরেকভাবে অন্য কিছু বলে। মা বকা দেন। কিন্তু তাতে ভয় না পেয়ে, শিশু আবার অন্য কথা বলে। মা তাই বলে, তুমি দুষ্টু ভারী, মাথায় তোমার কিচ্ছুটি নেই। শিশু বলল—

'তোমার মাথায় কিচ্ছুই নেই আমার মাথায় চুল আছে
আমায় যে খুব দুষ্টু বলো সেই কথাটায় ভুল আছে।'

কবি শিশুদের আনন্দ ও নিজের প্রতি পছন্দের কিছু পেয়ে যে খুশি খুশি ভাবের উদয় হয় তাও কবি নিপুণভাবে রূপ দিয়েছেন শিশু সাহিত্যে। তিনি এতটাই শিশুভাবে বিগলিত ছিলেন যে, শিশুদের নিয়ে ছড়া লিখেই ক্ষ্যান্ত নন। বই প্রকাশের সময়েও শিশু ভাব-ভাবনাকে স্থান দিয়েছেন উৎসর্গে। সেখানেও এক অমল সাহিত্য পরিবেশিত হতে দেখা যায়। যথা—

'এক হাতে মা, আরেক হাতে
বাবার আঙুল ধরা
শিউলি-শাদা জামায় আমন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

যেন বা অপ্সরা
এই হাসি এই চোখের জলের
বিষ্টিরোগে গড়া
আমন তোমার হাতে দিলাম
আমন ধানের ছড়া।

এখানে শিশুকে নিয়ে ছড়া, শিশুর বায়নাকে সান্ত্বনা দেওয়া, সুন্দর পোশাকে শিশুকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যাওয়া পাশাপাশি তার খুব কাছের যে দুইজন তাদের হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলা এর মধ্যে শিশুর আছে বিশ্ব ভুবন জয়ের নেশা। এই জয়কে এঁকেছেন কবি।

কখনও শিশু নিজেই নিজের মধ্যে ডুব দিচ্ছে। সে নিজেই নিজের মধ্যে বলছে-

'কোন নামে যে আমায় চিনি
ভাবছ কিতা ঠিক করিনি ?
কিচ্ছুতে আর লাগছে না মন
আসল কথা আমিই আমন।।'

কখনও শিশুর মনের কোণে নানান খেলা, নানান বলা ফুটে ওঠে। তাও যদি তাকে নিয়ে কোনও অনুষ্ঠান হয়, তো কথাই নেই। শিশু আপন মনে নিজের ভাবে রচে যায় ছন্দ ছড়া-

'টুই-টুই-টুই টু-ইলা
মুকুট কোথায় থুইলা?
আজ আমনের জন্মদিন, তা
যাও নাই তো ভুইল্যা ?
আই-আই-আই আ-ই রে
দাঁড়িয়ে আছি বা-ইরে-
আদর করে ডাক দিবি যে
কোথায় গেলি তু-ই লা?
টুই-টুই-টুই-টু-ইলা!'

আগেই বলেছি, কবি শিশু সাহিত্যে আমনকে এনেছেন। তাকে সামনে রেখেই তাঁর যত কিছু উপস্থাপনা। কেউ ভাবতে পারে আমন বোধ হয় কবির নিজস্ব রক্ত সম্পর্কের কেউ। কিন্তু তা সত্যি আবার সত্যি না। আবার তাতো দুই-ই। ঘরের শিশুকে তিনি সকল শিশুর সাথে মিলিয়েছেন। অর্থাৎ ঘরের শিশুকে তিনি বাইরের সকল শিশুর মধ্যে দেখতেন আবার বাইরের সকল শিশুর মধ্যে ঘরের শিশুকে খুঁজতেন। তেমনটি খুঁজতেন শিশুর মাকেও। তেমনই তো তুলে ধরেছেন- আমন ধানের ছড়া গ্রন্থে। ১৯৯১ সালের ২২ এপ্রিল প্রকাশিত হয় গ্রন্থটি মাত্র ২৪ পৃষ্ঠা নিয়ে, প্রজ্ঞা প্রকাশন থেকে। আমন এখানে এইভাবে

উঠে এসেছে—

"বল দেখি কে আমন ?
যে-ই যেখানে ছোট্ট মেয়ে
সবারই নাম আমন!
আর আমনের মা ?
এই এখানে, ওই ওখানে
দেখতে কি পাও না ?"

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, কবি নিপুন ভাবে শিশু সাহিত্যে কলম ধরেছিলেন। আমনকে সামনে রেখেই তার শিশুদের সাথে চলা-বলা-গল্প করা এবং ছড়ায় ছড়ায় ভরিয়ে তোলা। আবার আমনের আনন্দমাখা দিনগুলিও সুন্দরভাবে শিশু সাহিত্যে তুলে ধরেছেন কবি। শিশুর মনের আঙিনায় যে আনন্দ আর সেই আনন্দের বহিঃছটা যে কত সুন্দর এবং সাবলীলভাবে সেই শিশু বর্ণনা করে এবং মনের অলিন্দে এনে ভাবে যে ভাবে মনের সাথে সংযোগ করে তা অবর্ণনীয়। শিশু এখানে বলছেন কবির ভাষায় তা ব্রণায়। শিমুলতলা একটা প্রাচীন স্থান। সেখানে সকলে যাব যাব করে কিন্তু অনেকেরই যাওয়া হয়ে ওঠে না। বিশেষতঃ শিশুরা। তাই শিশু বলছে- শিমুলতলা একটা গ্রাম্য স্থান। অনেক গাছগাছালি ঘেরা। সেখানে আছে বাছুর, ছাগল, হরিণ। ছটফটানো ফড়িং, চোরকাটা, দূর আর দূরের দিকে তাকালে দেখা যায় আকাশটা শেষ হয়ে গেছে ঐ সুদূরে। সেখানেই তার একটি ঘর আছে। ধান ক্ষেতের মধ্যে সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছে ঘরটি। সেখানে আকাশ আর মাটি প্রায় এক হয়ে যায়। আর একটু হলে আমি (শিশু) আকাশ ভরা তারাগুলো ছুঁয়ে দিতাম।

এই যে শিশু মনের বিকাশ, শিশু চিন্তার বহিঃপ্রকাশ, সীমার মাঝে অসীমের দ্যোতনা এবং এর প্রকাশ- এখানেই কবির সার্থকতা। যার প্রথম পয়ারটিই হল—

'শিমূলতলায় যায়নি যারা
জানবে না তো তারা
ধানের ক্ষেতের মধ্যে আমার
ঘরটা কেমন খাড়া।
যায়নি যারা শিমূলতলায়
জানবে কি আর তারা
একটু হলেই ছুঁয়ে দিতাম
আকাশ ভরা তারা!

শিশুরা স্কুলে যেতে প্রথমে ভয় করে। কিন্তু মনের কোণে যখন বন্ধুদের কথা মনে পরে যায় তখন তারা সব কিছু ভুলে স্কুলে পাড়ি দেয়। ক্লাস চালু হওয়ার মুহূর্তেই আবার সকলের নিরানন্দভাব ফুটে ওঠে চোখে মুখে। কারণ ম্যাম পড়া ধরবে। না পারলে বকবে। কিন্তু যেদিন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

তারা দেখে ম্যাম আসেনি, সেদিন তাদের অনেক আনন্দ। তারা একসাথে মিলেমিশে ছাদে গিয়ে হৈ হুল্লোড় করে, খেলাধূলায় মেতে থাকে। এখানেও কবি তার একটা রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। যথা—

"ঘরের উপর ছোট্ট একটা ছাদ ছিল ভাগ্যিস—
দুঃখ-দুঃখ মুখ করে খুব ফুর্তি করেছিস।"

শিশুদের যে এই মুভমেন্ট এই যে হঠাৎ করেই পরিবর্তন হওয়া সাজিয়ে ফেলা মুহূর্তে তাদের চিন্তা ভাবনার বাস্তবায়ন! কোনও নাট্যাভিনয় ছাড়া, কোনও নাট্য শিক্ষা ছাড়া, কোনও পূর্ব পরিকল্পনা না থাকা সত্ত্বেও যে, কাজ তাদের মধ্যে থেকে হয়ে যায়, এখানেই শিশুর জয় আর সকলের পরাজয়। কবি তা বারংবার দেখাতে চায়েছেন শিশু সাহিত্যে।

কখনও শিশু এই বলছে খাব খাব, পরক্ষণেই বলছে না, খাব না। এই বলছে কোথাও যাব না অথচ সে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে। আমার মনে হয় কবি এইভাবেই বলতে চেয়েছেন যে,

"চাইছি যেতে মায়ের সাথে
এক'শ হাজার বার
কিন্তু আমি করব না না
মা সাধুক বারবার।"

মা তাকে নেবার জন্য আকুপাকু করবে, এই ভাবটিও দেখতে চাইছে শিশু। কবির শিশুকে দেখা ও তাদের ভাব সাহিত্যে তোলা সার্থক। কখনও কখনও শিশু কেবল বকতেই থাকে। নিজের মনে। আপন মনে। কোনও ক্লান্তি তার নেই।

"ওইটুকু ওই কচি গলায়
কত রকম বোল যে বলায়
সবাই ভাবে ভীষণ হিজিবিজি-
তোমার ভাষার মঞ্জু ধ্বনি
ভরে আমার দিন-রজনী
দায়দা পা মা মাম্মান বো জিজি।"

এই রকম আনন্দে শিশু মন জেগে ওঠে। নেচে ওঠে। আর এই নেচে ওঠা, দুলে ওঠা শিশুই তো সমাজের এক অন্য দিক। আমার মনে হয়—

"শিশু যা চায়, তা যদি সে পায়
ধরতে পারে আকাশ অনায়াসে
ভাব প্রকাশ তার নাইবা হলো
সকল ইচ্ছা ঘুরছে শ্বাসে শ্বাসে।

এই শ্বাসে শ্বাসের কথা শোনে মা-বাবা, শোনে কবি। তাই তো শিশুর ইচ্ছা পূরণ করতে

পারে মা-বাবা। তাইতো আমনের মধ্যে কবি আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, কিসে তার আনন্দ তাও খুঁজে পেয়েছেন। তারই ভাব ব্যক্ত করেছেন কলমের টানে। যথা—

"ঘুম ভেঙে দেখি আজ
পাখিদের কূজনে
বাবা আছে মা-ও আছে
দুই পাশে দুজনে।
এদিকে আজান আর
ওই দিকে সিয়ারাম
সব আছে ঠিকঠাক
আঃ আজ কী আরাম।"

এই যে শিশু-পাখির কূজনে, ঘুম ভেঙে মা'কে-বাবা'কে দুপাশে দেখে নিশ্চিন্ত। তার মনের মধ্যে যে আনন্দের রসবোধ এটা বোধহয় বাবা-মা'ও পূর্ণ রূপে জানে না। যতটা জানেন কবি। শিশু সাহিত্যে রসবোধের ও জাগরণে বোধ হয় কবির জয়গানও মুখ্য — তাইতো তালে তাল মিলিয়ে বলি-

কবি তুমি মনচোর কালের বিধাতা
শিশুদের চুরি করে ভরে ফেল খাতা
সব শিশু মায়েদের সব শিশু কবিরও
মা পায় হাসি মুখ কবি পায় আবীরও

কবি শিশুর কাছ থেকে আবীর রাঙা হাসি পায়, ফুলের মতো গন্ধ পায়, বাতাসের মতো দোল পায় তাইতো কবি যুগ যুগ ধরে তার সত্ত্বাকে জাগ্রত রাখতে পারে। শিশু সাহিত্যে কবি শঙ্খ ঘোষ যে দাগ কেটে গেছেন, সে দাগ চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। তাইতো শ্রদ্ধাঞ্জলি না জানিয়ে সমাপ্ত করতে পারছি না। বলি-

ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে বলি কত্ত ছোট আর
তার থেকেও ছোট্ট তুমি সাগর পারাবার
ছোট্ট তুমি নয়কো শুধু তুমিই কালের দিশা
তোমার মধ্যে সকলকালের জাগে দিবা-নিশা
শিশুর জীবন শিশু সাহিত্যে কে করে উলঙ্ঘ
আপন তুমি জীবনের চেয়ে সব ঘরেরই শঙ্খ।।

গ্রন্থ সহায়ক ঃ

১। ছড়া সমগ্রঃ শঙ্খ ঘোষ; (দে'জ পাবিলিশিং।। কোলকাতা ৭০০ ০৭৩)
২। সুদর্শন সেনশর্মা সম্পাদিত 'কারুকথা এই সময়' পত্রিকার 'কবি শঙ্খ ঘোষ মান্না-২০১৭' সংখ্যা।। ২৭ পৃষ্ঠা।

ছড়ার নির্মাণ আর সৃষ্টি : শঙ্খ ঘোষ

অভীক ঘোষ

"কী করতে পারে ছড়া?

খুলে দিতে পারে সব আগল, নিয়ে আসতে পারে বন্ধ ঘরের বাইরে, প্রতিদিনের মধ্যেই এনে বসাতে পারে আশ্চর্যকে, অভাবিতকে। বিশেষ করে ছন্দ যখন নাচে মেতে ওঠে খিলখিল, মিল যখন আচমকা ফুলঝুরি ছিটোয়, কৌতুক যখন প্যাঁচ কষে কথার প্যাঁচ, আর বদলে দেয় চেনাকে অচেনায়, অচেনাকে চেনায়। ছেলে ভোলানো ছড়ার লৌকিক চালের মধ্যেই এসে হাজির হয় অন্যরকম চলন, অন্যরকম ধরন"[১]।

'দেশ-বিদেশের শিশু সাহিত্য'-এর নবম গ্রন্থ হিসাবে ছাপা হয় শঙ্খ ঘোষের সব কিছুতেই খেলনা হয়'। সেই গ্রন্থের প্রাক-ভূমিকায়, ছড়া প্রসঙ্গে আলোচনা সূত্রে, গ্রন্থের সম্পাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি। এই সূত্র ধরেই, শঙ্খ ঘোষের ছড়া সংক্রান্ত মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে আমরা সামগ্রিকভাবে ছড়া নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বলে নিতে চাই।

দুই

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে লোকসংস্কৃতির এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে ছড়া। মানুষ যখন থেকে মনের ভাব প্রকাশ করা শুরু করেছে, ধরা হয় তখন থেকেই মানুষের সৃষ্টিশীলতার আনন্দে তৈরি হয়েছে ছড়া। তারপর তা পারিবারিক ও সামাজিক জগত ছুঁয়ে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এককাল থেকে অন্যকালে ছড়িয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ছড়াগুলি ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আটকে না থেকে হয়ে ওঠে সমষ্টির। ছড়াকার কারা সেই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সামনে না থাকলেও ছড়াগুলি থেকে যায় কালের পাতায়।

ছড়া সাধারণভাবে মুখের জিনিস। মৌখিক পরম্পরায় বয়ে আসা এক সংরূপ। উনিশ শতকের আগে অর্থাৎ ছাপাখানা তৈরির আগে 'ছড়া' শব্দটিকে আমরা কোথাও পাই না। প্রচলিত বা চালু শব্দ হিসাবে 'ছড়া' শব্দটি উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে কিছু সংশয় দেখা যায়। সুকুমার সেন, তাঁর **Etymological Dictionary of Bengali** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আঠেরো শতক পর্যন্ত প্রাপ্ত শব্দতালিকাতে ছড়া শব্দটি পাওয়া যায় না। তাহলে, এই প্রশ্ন জাগে যে উনিশ শতকের আগে কি 'ছড়া' ছিল না? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য প্রথমে ছড়া শব্দটির অর্থ বোঝা প্রয়োজন। ছড়ার আভিধানিক অর্থ 'ছন্দে গাঁথা গ্রাম্য পদ্য কথা'[২]। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'ছট্' শব্দ থেকে ছড়া শব্দের উৎপত্তি। গবেষকদের একাংশ মনে করেন সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত হয়ে এই শব্দটি বাংলায় এসেছে এবং এর অর্থ হল সাজানোর

জিনিস। আবার, ছড়াকে তদ্ভব শব্দ ধরে নিয়ে, এর অর্থ করা হচ্ছে ছড়ানো। সুকুমার সেন বলেছেন,

"গানের মধ্যে ছড়ানো আর পরপর গ্রথিত এই ছিল ছড়ার বিশেষত্ব। তারপরে অর্থ হল ছুটকো ছন্দময় রচনা। ... শ্লোক ছড়ারই সমনাম।"[৩]

ছড়া ঠিক কী, কাকে বলে ছড়া, তার গঠন কেমন হবে তা নিয়ে মূল তর্কগুলো মূলত রবীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশঙ্করের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাশাপাশি, লোকসংস্কৃতি চর্চা করেন যে সমস্ত গবেষক, তাঁদের অনেকেই এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্নদাশঙ্কর হয়ে বহু আলোচকই এই কথাটিই মনে করেছেন যে ছড়া মূলত মৌখিক। এর মৌখিক ব্যাপারটিই মুখ্য। আমরাও আমাদের এই আলোচনাতে এই মতই স্বীকার করে নেব যে, ছড়ানো জিনিসের মিলিত সঙ্ঘবদ্ধ রূপটিই হল ছড়া। ছড়াকে 'ছোটোদের', 'বড়োদের', 'লোকসাহিত্য', 'মেয়েলি'—এইভাবে আমরা বিভাজন করেছি। ছড়া, মৌখিক সংরূপ হিসেবে আগে প্রচলিত থাকলেও, উনিশ শতকের আগে তার কোনো বর্গ বিভাজন ছিল না। ছাপাখানা তৈরির পর থেকে এই বিভাজনের ঝোঁক লক্ষ করা যায়। ছড়া লোকমুখে, মন্ত্রে, ধাঁধাঁয় ইত্যাদিতে ছিল। ছড়া গবেষক নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেন,

"ছড়া হল বঙ্গীয় লোক সাধারণের সর্বপ্রকার প্রকাশ ভঙ্গীর একটি সর্বজনস্বীকৃত চিরাচরিত ভঙ্গী; সেটিকে নারী ও পুরুষ আপন আপন প্রয়োজনে গ্রহণ করেছে — তা কেবল নারী বা পুরুষের নয়। ... আসলে লোকসাহিত্যের কোন বিভাগই অসঙ্গতিতে পূর্ণ নয়, লোক মানস কয়েকটি প্রতীক ও সংমিশ্রিত প্রতীককে খুব গুরুত্ব দেয়। ছড়ার মধ্যেও সেই প্রতীক প্রবণতা ধরা পড়ে।"[৪]

ছড়া যে একটি বিশেষ সংরূপ, তার যে নানা গুণাবলি থাকবে, ছাপাখানা ব্যবহারের কাল বা ছড়ার লিখিতভাবে চর্চা শুরু কাল থেকেই এই ধারণার সূত্রপাত হয়।

তিন

শঙ্খ ঘোষের ছড়াসমগ্র লক্ষ করলে আমরা দেখব, তিনি তাঁর ছড়ার পাঠক হিসেবে নাতি-নাতনি অর্থাৎ ছোটোদের কথা বলছেন। ছড়াকে 'ছোটো'দের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে 'ফরমাল এডুকেশন' বা প্রথাগত শিক্ষার সূত্র ধরে। ছোটোদের সঙ্গে সহজে সংযোগস্থাপনের জন্য একটি ভিন্ন আদলের সংরূপের প্রয়োজন ছিল। ছড়া সেই সংযোগের কাজটি করেছিল। এর পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ একে 'ছেলে ভোলানো' ছড়ার তকমা দিচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছড়ার বিশেষত্বগুলির দিকে নজর দেন। তিনি বলেন যে এগুলি নামে ছেলেভুলানো ছড়া হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষেরই সৃষ্টি যা শিশু মনস্তত্ত্বকে আয়ত্ত করে লেখা হয়। ছড়ার একটি চিরকালীন আবেদন আছে, তবে দেখা যায় অচেতনভাবে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

নির্মিত সাহিত্যের তুলনায় অসচেতনভাবে তৈরি ছড়াগুলির চিরন্তনত্ব অনেক বেশি। শিশু চরিত্রের সঙ্গে ছড়া চরিত্রের উল্লেখযোগ্য ও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ইমেজ বা চিত্রধর্মীতা ছড়ার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছড়াগুলি যেন ছবির সাম্রাজ্য। শুধুমাত্র অপরিণত শিশুমস্তিষ্কেই নয়, পরিণত মানুষের কাছে ছবিগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। অসংলগ্নতা, নিয়মহীনতা ছড়ার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সচেতন সাহিত্যের মতো ছড়ার জগতে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না। অসামঞ্জস্যতাই ছড়াকে করে তোলে আকর্ষণীয়। ছড়া আসলে আকস্মিক, অনিয়মিত। সেখানে 'আর্ট' আছে, 'আর্টিফিসিয়ালিটি'র জায়গা নেই। ছড়ার জগতে ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যায়। তাই বালকের সঙ্গে ছড়ার যোগাযোগ ওতপ্রোত। ছড়ার বিষয়-বৈচিত্র্য আছে লঘু-গুরু সবধরনের এবং হাস্য-করুণা-ব্যঙ্গ-শান্ত নানা প্রকারের রস নিয়ে ছড়া তৈরি হয়। ইমেজারি ও সহজ ছন্দের কারণে তা স্মৃতিতে ধরে রাখাও সহজ হয়।

রবীন্দ্রনাথের আগেই, উনিশ শতক থেকে ছড়ার ব্যবহারের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। বিদ্যাসাগর, ছড়ার এই সংরূপ গ্রহণ না করলেও মদনমোহন তর্কালঙ্কার তা গ্রহণ করেছিলেন। পরে, যোগীন্দ্রনাথ সরকার সিটি বুক সোসাইটি থেকে ছড়ার বই প্রকাশ করছেন। সখা, মুকুল ইত্যাদি শিশুপাঠ্য পত্রিকার হাত ধরে ছড়ার জগতে সুকুমার রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখের প্রবেশ এবং তাঁদের হাতে ছড়া পাঠকসমাজে আরও জনপ্রিয় এবং সমাদৃত হয়ে উঠছে। আসলে, উনিশ শতকে মেকলে মিনিটস পরবর্তী সময়ে বাঙালি মধ্যশ্রেণির বাংলাপ্রীতি, বাংলা মনস্কতার মডেল খুঁজতে গিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের সব থেকে সহজ মাধ্যম হয়ে উঠছিল ছড়া। শিশুশ্রেণিকে উদ্দিষ্ট পাঠক (টার্গেট রিডার) হিসেবে চিহ্নিত করে স্মৃতি ও শ্রুতির গুরুত্ব বজায় রেখে ছড়াকে ব্যবহার করা হল।

রবীন্দ্র পরবর্তী সময়পর্বে অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়া সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিপরীত অবস্থান নিলেন। তিনি ছড়াকে শুধু শিশুপাঠ্য হিসেবে চিহ্নিত করতে রাজি হলেন না; চিহ্নিত করলেন জনসাহিত্য হিসেবে। ছড়াসমগ্র-এর ভূমিকায় তিনি লিখলেন "ছড়ার ঐতিহ্য অনেক দিনের, বহু পুরাতনের স্পিরিট, কিন্তু ছড়া লেখার প্রচলনটা সম্প্রতি হয়েছে, গত তিরিশ চল্লিশ বছরে। এর সম্ভাবনা তো অসীম, অনেক কিছু করা যায়। ছড়া হলেই হালকা সরস হবে তা কেন? সব কিছু নিয়েই ছড়া হয়েছে, বীভৎস রস নিয়েও হয়েছে।"[৫]

এই প্রসঙ্গে আলোচনা সূত্রে আমাদের মনে পড়ে যায় শঙ্খ ঘোষের লেখা 'যমুনাবতী' ছড়াটির কথা। একটি মেয়ের খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে হাঁটা এবং গুলি খেয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ছবি, অন্নদাশঙ্করের এই মতকেই সমর্থন জোগায়।

বাংলা ছড়াচর্চার ইতিহাসে অন্নদাশঙ্কর রায় ঘোষণা করছেন যে তিনি ছড়াকে চিহ্নিত করছেন কারণ ছড়া আসলে সকলের জন্য। তাঁর মনে হচ্ছে এটার মতো জনপরিসর বা জনবৃত্তে থাকা কোনো মাধ্যম এবং জনগণের সঙ্গে সংযোগ করার এরকম বড়ো মাধ্যম আর

কিছু নেই। সেই কারণেই তাঁর মনে হয়েছে ছড়া মূলত জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ (collective wisdom) এর বিষয়। সেই সংঘবদ্ধ জ্ঞানকে যদি জনলোক থেকে সরিয়ে ব্যক্তিগত নির্মাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে তাতে ত্রুটি হয়। যা জনপরিসরের জিনিস, যা জ্ঞানপ্রথা থেকে হয় সেটা যদি একজন ব্যক্তি করতে চায় তাহলে তার কিছু সাধারণ ত্রুটি ঘটে। অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়াকে সঙ্ঘবদ্ধ ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত করে তৈরি করতে চাইলেন।

চার

শঙ্খ ঘোষের ছড়া প্রসঙ্গে আলোচনা সূত্রে প্রথমেই যে উত্তর সন্ধানের প্রচেষ্টা আমরা করব তা হল এই ছড়ার পাঠক কারা। শঙ্খ ঘোষ কবি, প্রাবন্ধিক, গদ্য শিল্পী। তিনি একটি নির্দিষ্ট বয়সে এসে ছড়া লিখছেন, ছড়ার ফর্মাটিকে ব্যবহার করছেন। নাতি-নাতনিদের উৎসর্গ করা ছড়ার এই ফর্ম কী আগে তিনি ব্যবহার করেননি? শঙ্খ ঘোষও কী অন্নদাশঙ্করের মতো ছড়াকে জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করছেন? আমরা আমাদের আলোচনা সূত্রে শঙ্খ ঘোষের ছড়ার ব্যবহারের দিকটিকেও লক্ষ করব। আমরা দেখার চেষ্টা করব যে শঙ্খ ঘোষ কী শুধুই একটি সংরূপ হিসেবে ব্যবহার করছেন নাকি তিনি জনগণের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের জন্য এটি ব্যবহার করছেন।

শঙ্খ ঘোষের ছড়াসমগ্র গ্রন্থে অন্যান্য ছড়াকারদের মতোই খুঁজে পাই লেখকের একটু ছুটি, একটু ছেলেমানুষির সুযোগ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা। শব্দ নিয়ে খেলা, শব্দের অর্থ নিয়ে খেলা, মিল নিয়ে খেলা, কল্পনাকে বাস্তবের শিকল ভেঙে দশদিকে ছোটার জায়গা করে দেওয়া। কিন্তু এই সীমারেখাটি মানা যাতে সেই পরিসর শিশুর আরামপ্রদ বোধসীমানার মধ্যে থাকে, তার শব্দের অভিজ্ঞতা আর কল্পনার শক্তিকে যেন অতিরিক্ত চাপে না ফেলে। কিন্তু এই সনাতনী প্রবণতার বিরুদ্ধেও তো কথা থাকতে পারে। আলোচক পবিত্র সরকারের মতে—

"তবে কি শিশুকে (বা যে বয়সের পাঠকের জন্য ছড়া) তাঁকে একটু অভিজ্ঞতার বাইরের দিকে আমন্ত্রণ করা যাবে না, একটু চ্যালেঞ্জ করা যাবে না তার জন্য, যাতে তার সীমানার ওপরে কী আছে সে সম্বন্ধেও একটু উৎসুক হয়ে ওঠে।"[৬]

বাংলা ছড়ার ঐতিহ্য এবং শব্দ নিয়ে খেলা এই দুই অভিজ্ঞতাই আমাদের হয় যখন আমরা শঙ্খ ঘোষের প্রথম ছড়ার বই 'সব কিছুতেই খেলনা হয়'-এর দিকে তাকাই। "চাকুম চুকুম বাকতাল্লা/ অন্ধকারের ছা/ গাবুসগুবুস ইয়া আল্লা/ ডুবল ভরা না"-এ যেমন আমরা দেখতে পাই অন্ত্যমিলের খেলা, গোটা ছড়া জুড়ে নানা বিচ্ছিন্ন ছবি, তেমনই "কোলে তোমায় নিল না/ জায়গা তো আর ছিল না/ তাই বলে কি রাগতে হয়/ ধৈর্য ধরে থাকতে হয়"-এর মধ্যে পাই পুরোনো ছড়ার স্মৃতি।

কবি শঙ্খ ঘোষ যখন ছড়াকার হয়ে ওঠেন তখন স্বাভাবিকভাবেই ছড়ার চেনা ছক

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ছন্দের মিল, ইমেজ ফুটিয়ে তোলার পাশপাশি গভীর মনস্তাত্ত্বিকতার ছাপও তাতে ফুটে উঠবে, তাতে আমাদের কোনো সংশয় থাকে না। সব কিছুতেই খেলনা হয় বইয়ের 'খানা' ছড়াটিতে আমরা তেমনই মজার ছলে খিদের প্রসঙ্গকে, খিদে মেটানোর বাসনা, স্বপ্নকে তুলে ধরতে দেখতে পাই। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বাবাদের চিরকালীন মেয়েদের মায়ের বকুনির হাত থেকে বাঁচানোর ছবি আর মায়েদের পুত্রসন্তানদের পাশে থাকার ঘটনাকে সুন্দর ভাবে দেখা যায় 'তর্ক' ছড়াতে। একইভাবে শিশুদের বা বাচ্চাদের সত্যিকথা আর কল্পনার জগতে ঢুকে মিথ্যে বলার যে ছবি বা দৃশ্য দেখা যায় তা পাব 'সত্যিমিথ্যে' শীর্ষক ছড়াটিতে।

নাতি-নাতনিদের উদ্দেশ্যে লেখা ছড়ার ভেতর কবি-প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ যেন সমাজের নানা চেনা ছককে, চেনা ঘটনাগুলিকে সহজ করে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। চিনিয়ে দিতে চান অনেক ভণ্ডের প্রকৃত রূপকে।

"লোকটি বড়ো আল্‌সে।
দেখার জিনিস দেখতে চায় না
দু-চোখ ভরা চাল্‌শে
আজ যদি দেয় প্রতিশ্রুতি
সব ভুলে যায় কাল সে।"

উপরোক্ত 'আলসে' ছড়াটি পড়লে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে চিরপরিচিত স্টেজের ওপর মাইকের সামনে দাঁড়ানো বহু সমাজকর্মী বলে চিহ্নিত ক্ষমতাবানদের মুখ। একই কথা বলা যায় এই গ্রন্থের 'লিমেরিক-৫', 'লিমেরিক-১০' ছড়াটি নিয়েও। গোটা ছড়াসমগ্র জুড়ে এরকম অসংখ্য উদাহরণ লক্ষ করা যায়।

শঙ্খ ঘোষের ছড়াতে খুব উদ্ভট, পরিকল্পিত, কল্পজগতের কোনো মানুষ বা পৃথিবীকে আমরা দেখতে পাই না। তাঁর লেখা এখানেই সুকুমার রায় থেকে পৃথক হয়ে ওঠে। তাঁর চোখ মূলত ছোটোদের জগতকে লক্ষ করে, তার ভিতর বাইরের খোঁজ নেয়। ছোটোদের আচরণ, বড়োদের আচরণে তাদের প্রতিক্রিয়া, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-অভিমানের বিচিত্র সৃষ্টি ও হিসেব ইত্যাদি তাঁর ছড়াতে ছন্দের দোলে দুলতে থাকে। 'একটু যদি রাগাই?/ গাইতে বললে না গাই?" একটু খুনসুটি, বড়োদের বকুনিতে অভিমান 'বড্ড তুমি বকো আমায় যখন তখন বকো/ থাকবে না কি একটু আধটু খেলাধুলার শখও?"; এ যেন ছোটোদের নিজস্ব পৃথিবীতে এক কবি, ছড়াকারের দেখা।

বাড়িতে একলা থাকা, নতুন নিউক্লিয়ার পরিবারের শিশুর মনের যন্ত্রণা, তার একাকীত্ব কবির নজর এড়ায়নি। দুঃখ পেতে দেখি কবি শঙ্খ ঘোষকে আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই একা শিশুকে নানারকম সান্ত্বনা দেওয়ার ছড়া তৈরির তৎপরতা। ঘরে শিশু এলে তাকে

দেখতেই হয়, তার দুঃখ-আনন্দ সবই খুব তীব্র হয়ে চোখে আসে। শঙ্খ ঘোষের নাতি-নাতনিদের যেন তাঁর কাছে আরও তীব্র আর হৃদ্য এক উপস্থিতি দেখতে পাই। তাদের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর মনে দাগ কাটে আর ছড়ার মুহূর্তের জন্ম দেয়। আমনকে নিয়ে তাই-ই দেখতে পাই বহু ছড়া। আমনের বাড়িতে আসা, তার নাম, জন্মদিন পালন, নাচ, ঠোঁট কেটে যাওয়া, খাওয়া, জেদ—

"আমন বড় জেদি
একটু এদিক ওদিক হলেই
চ্যাঁচায় গগন ভেদী।
আমনটা বড় পাজি
যেটা বলো তাতেই 'না-না'
কিচ্ছুতে নয় রাজি।
আমন না কি লক্ষ্মী?
ইস, ভারী তো! সমস্ত দিন
লক্ষ রকম ঝক্কি!
না না আমন ভালো
একটু চোখের আড়াল হলেই
সব হয়ে যায় কালো। "

কবি শঙ্খ ঘোষ শিশুর দিক থেকে বাইরে মাঝে মাঝে তাকাবেন এ তো স্বাভাবিকই। তাতেও জেগে ওঠে কৌতুকের ছবি, বাস্তব, ব্যঙ্গ। 'লিমেরিক-১', 'লিমেরিক ২', 'ঝমর্ঝম', 'কলকাতা', 'রাজামামা', 'কোনটা আমি' এরকম নানা ছড়ায় আমরা ছড়াকারের শঙ্খ ঘোষের বাইরের দেখা দুনিয়ার প্রতি তাঁর নিজস্ব দেখাকে মজা করে পাঠককে দেখাতে দেখি।

ফিরতে চাওয়ার আকুতি, বড়ো হয়ে সেই ছোটোবেলাকে দেখার, ছোঁয়ার, সেই বেলাতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে কার-ই বা হয় না। মানুষের থাকা, মানুষের হওয়া, মানুষের সঙ্গের বাসনা তার বড়ো অংশ জুড়ে লেগে থাকে স্মৃতি। স্মৃতিকে ধরে থাকতে, স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার আকুতি আজীবনের। সেই স্মৃতিতে ফেরার ইচ্ছে আকুতি দেখা যায় শঙ্খ ঘোষের কিছু ছড়াতে। "আমার ছিল পদ্মার ভোর, বৈঁচিবনের বিকেল/ তুমি কি সেসব কিছু পাও?' 'সংঘাত' ছড়ার এইসব লাইন জুড়ে এখনের সঙ্গে তখনের ফিরে চাওয়ার, চাওয়ানোর চেষ্টা আমরা দেখতে পাই। 'পানসুপুরি', 'বন্ধু' এসব নানা ছড়া জুড়ে ফিরে ফিরে আসে ছড়াকারের নিজের শৈশব, শৈশবে ফেরার ইচ্ছা।

শিশুই যখন মূল পাঠক, তখন চিন্তাবিদ শঙ্খ ঘোষ নিশ্চিতই চাইবেন শিশুর বেড়ে ওঠার গড়নকে পথ দেখাতে। শিশুকে বোঝাতে তার কাছে ভালো মন্দের বোধ তৈরি

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

করতে কবির কলম যে ছড়ার মতন সহজ পথকে বাছবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকে না। 'রাস্তা'র মতো ছড়াগুলির ছন্দের প্রতি দুলুনিতে শিশু শিক্ষার পাঠ, ভালো-মন্দের পাঠ দেন ছড়াকার—

"সুভাষজেঠু বলত আমায় জোট বাঁধবি সবসময়
জোট বেঁধেছে হাসান হোসেন জোট বাঁধে রাম লক্ষ্মণও।
আরো কী সব বলত জানো? কথাটা খুব স্পষ্ট নয়-
সুভাষজেঠু বলত আমায় হোস না প্রথম কক্ষনো।

ফাস্ট অথবা সেকেন্ড হলে দায় বেড়ে যায় বড্ড রে
বছর বছর দৌড়োতে হয় একটাই ওই পথ ধরে!
তার চে' বরং ডাগর করে চোখ খুলে রাখ রাস্তাতে
দেখবি সারা জীবন ধরে কত কিছুই পাস তাতে।

সুভাষজেঠু বলত আমায় যখনই যাস ইস্কুলে
সবকটা তার জানলাদুয়োর দরাজ করে দিস খুলে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুর শিক্ষা নিয়ে যে গভীর ভাবনা, তার স্পষ্ট ছাপ আমরা দেখতে পাই শঙ্খ ঘোষের ছড়া গুলিতে। শঙ্খ ঘোষের ছোট্ট একটা স্কুল বইটিতে লেখক তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি বলতে বলতে আসলে শিশুর পাঠের, শিশুর বড় হয়ে ওঠার প্রকৃত পাঠ যেভাবে দিয়ে যান, সেভাবেই আরও দুলতে দুলতে তাঁর ছড়াগুলির ভেতর দিয়ে গড়ে দিতে চান শিশুর শৈশবকে। যে পাঠ শিশুকে প্রকৃত মানুষ, পূর্ণ মানুষ করে তুলবে। প্রথম হওয়ার ইঁদুর দৌড় থেকে সত্যকারের জানাকে জানানোর প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করি। বিপুল পৃথিবীর প্রতিটি আনাচে কানাচে যে যৌথতার পাঠ লুকিয়ে আছে, পৃথিবীর প্রতিটি চলনের সঙ্গে সঙ্গে যে ওপার বিস্ময়, 'কেন হল' এই অনুসন্ধিৎসা লুকিয়ে আছে তা থেকে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা আমরা দেখতে পাই। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা শুধু নয়, মানবিকতা, মানুষ হয়ে ওঠার বোধ তৈরি করার চেষ্টা আমরা শঙ্খ ঘোষের অনেক ছড়ার মধ্যেই দেখতে পাই। 'বস্তি' ছড়াতে ছড়াকার দেখান নির্মম কৌতুকের সঙ্গে কীভাবে "ছোটলোক"রা প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়ান, কীভাবে বিপদ থেকে বাঁচান। প্রতিক্রিয়াশীলরা যারা এককালে উৎখাত করতে চান বস্তিবাসীদের তাদের মুখেই কবি বলিয়ে নেন- "'ভাগ্যি পাশেই ছিল এ অবোধ বস্তি'।" শিশুকে প্রথম দিন থেকেই যুদ্ধের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করতে শেখান শঙ্খ ঘোষ; বলে ওঠেন—

"দেখো দেখো চড়ুইগুলির
কী মানুষিক স্বভাব হলো!

এই কি তবে ইতিহাসের
মুখের মতো জবাব হলো!
দিনরাত্তির আটকে থেকে
এইটুকুনই রুদ্ধ ঘরে
ওরাও যেন মানুষ এখন—
সবসময়ে যুদ্ধ করে।
এত হিংসে শিখল কোথায়?
ঠুকরে বুকের রক্ত ছোটায়!
ওদেরও আজ মানবপ্রথায়
ভালোবাসার অভাব হলো—
সমস্ত দিন মানুষ দেখার
এতই অপপ্রভাব হলো!
হায়রে আমার চড়ুইগুলির
কী মানুষিক স্বভাব হলো!"

'মতিচ্ছন্ন' —কথার আড়ালে ছড়াকার যেন বাচ্ছাদের হাতধরে জানাতে চান ওরকমই সুন্দর মানুষ হয়ে ওঠা প্রয়োজন; সে সমাজ তোমাদের যতই মতিচ্ছন্নে গেছে বলুকনা কেন। 'ভালো-মন্দ'র বোধ যে আসলে পাশ থেকেই, কাছ থেকেই, পড়শি থেকেই শুরু করা যায় বা শুরু হয় তা নিপুণভাবে শিশুদের পড়িয়ে দেন কবি-

"বল তো দেখি কেমন হতো
সব যদি হয় অন্যমতো
এই দুনিয়ায় কোথাও কোনো যুদ্ধ যদি না থাকত?

সেই কথাটা ভাবিস পরে
পড়শি দুজন পরস্পরে
আগে তাদের ঝগড়া ছেড়ে বন্ধুতাটা পাতাক তো!

ঘটবে না তা সম্ভবত।
বল তো তবে কেমন হতো
গোলমেলে এই দুনিয়াটাই কোথাও যদি না রইত?

মোটেই সেটা ঠিক হতো না—
থাকত কোথায় এই দ্যোতনাঃ
তোর চোখে চোখ রাখলে আমার লাগছে মনে ভালোই তো!"

শঙ্খ ঘোষের ছড়া শিশুর মানবিক নির্মাণে তাই এক ছন্দময় পাঠ হয়ে ওঠে।

আধুনিক ছড়ার আর একটি দিক এই যে, ছড়াতে সমাজ- রাজনীতি হাত ধরে থেকে যায় পাশাপাশি। ছড়ার আপাত সরস অবয়বের আড়ালে শঙ্খ ঘোষ আসলে সমকালীন সময়-সমাজ-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্রিটিক নির্মাণ করেন, ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। যে সমাজ-রাজনৈতিক সমস্যাকে আসামীর কাঠগড়ায় রেখে শঙ্খ ঘোষ ছোটোদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রশ্ন করেন, সে সমাজ-রাজনীতির পরিসর ব্যাপক। এই শতকের শূন্য দশকে বেড়ে ওঠা শৈশব চিনেছে গোধরার ছবি; ত্রিশুল ডগায় ভ্রূণের নাচন। জাতীয় জীবনের এই ছবি শিশুর কাছে কেবল কলঙ্কের নয়, বিপরীতে ছোটোদের কাছে এ ছবির কাঠ-বাস্তবটাই অসহনীয়। ছোটোদের স্বপ্নের বাস্তবে ধর্ম-বিভেদের অস্তিত্বই থাকার কথা নয়। যে বয়সে ধর্মের বোধ জাগে না, যে বয়স আরমান-আয়ুসের ছুটোছুটি লাফালাফি করে বাঁচার বয়স, সে বয়সে ছোটোরা গোধরার বিপরীতে স্বপ্ন দেখবে একপাশে শাঁখের, একপাশে আজানের। কেননা শাঁখ আজানের বিদ্বেষীভাব ছোটোদের মনে জাগরুক হয়নি। শঙ্খ ঘোষ তাই গোধরা উত্তর ভারতে ছোটোদের স্বপ্ন আঁকেন—

"এদিকে আজান আর
ওইদিকে সিয়ারাম
সব আছে ঠিক ঠাক
আঃ আজ কি আরাম"।

যে সমাজ ধর্মের তফাতগুলি ছোটোদের মাথায় গেঁথে গেঁথে সমাজের উপযুক্ত করতে চায়, সেখানে শঙ্খ ঘোষ কেবল ছোটোদের প্রতিনিধি হয়ে প্রশ্ন করেন না, সমাজের প্রতিনিধি হিসেবেও ছোটোদের বিকল্প ভাবনায় ভাবিত করতে সচেষ্ট থাকেন। যেমন 'ভাবো' ছড়াটি—

"ভাবো যদি সবাই মিলে
সেইভাবে থাকতাম
ধারা ভাষ্যে যেমন গলায় গলায়
শাস্ত্রী আক্রাম।"

শঙ্খ ঘোষ এই সমাজের প্রতিনিধি হয়ে ছোটোদের সমাজের বিপরীতেই যা ভাবাতে চান সে ভাবনা নেহাৎ আকাশ কুসুম নয়। সম্পূর্ণ অলীক ভাবনা ছোটোদের বিশ্বাসযোগ্য নাই হতে পারে। তাই রবি শাস্ত্রী আর ওয়াসিম এর কমেন্টি কালীন ছবিকেই সামনে রেখে বিকল্প ভাবনাটির কথা হাজির করেন।

কেবল ধর্ম বিদ্বেষ নয়, বিদ্বেষ- এই বিশেষণই শিশু মনের পরিপন্থী। মানব জীবনেরই পরিপন্থী। বিদ্বেষ নামক অনুভূতির অস্তিত্বকেই 'ভুল' বলে চিহ্নিত করেন শঙ্খ ঘোষ। তাই ছোটদের স্বরে বলেন—

"দূরে চলে গেলে চ্যাঁচান ভীষণ
কাছে গেলে ঠোকরান
কিছুর মধ্যে কিছুনা হঠাৎ
জ্বলে ওঠে পোখরান।"

এই সব ছড়ায়, হয়তো একটু পরের দিকে এসে, ছোটোদের শঙ্খ ঘোষ বড়োদের হাত চেপে ধরেন। যে শঙ্খ ঘোষকে শাসক ভয় পায়, সমাজকর্মীরা শ্রদ্ধা করে, যিনি যথার্থ মানবিক, মানুষের মতো মানুষ, যিনি রাজার কাপড় কোথায় প্রশ্ন করতে ভয় পান না, মানুষের হিংস্রতা, অবিচার, উদাসীনতা, আত্মপ্রসাদ, আত্মম্ভরিতাকে যিনি আক্রমণ করেন, যিনি উদাত্ত গলায় ব্যঙ্গ করে ছড়া কাটতে পারেন—

"ভিক্ষে করতে এসেও যদি গায় ছোঁয়াবি হাত
একটা চড়ে পুঁচকে ছোঁড়া করব কুপোকাৎ'-
বলতে বলতে পটের বিবি
গুছিয়ে নিয়ে চুলের ঢিবি
বাসের ভেলায় উঠতে গিয়ে লোকের ঠেলায় কাৎ।"

যিনি স্বপ্ন দেখতে পারেন, দেখাতে পারেন

"ধরো সেখানে সবাই আছেন
সবার চোখে চেয়ে
সে-দেশে এসে হাত বেঁধেছে
লক্ষ ছেলেমেয়ে
যে-কোন দিন যে-কোন রাতে
সেখানে বিস্ময়
জেগে থেকেছে ভালোবাসতে
ভরাট দৃশ্যয়
সে দেশ তবে দিতাম তুলে ওই বড়োদের হাতে
বলে দিতাম শোন
একটা আঁচড় যেন লাগেনা আর তাতে।"

আলোচক পবিত্র সরকারের কথায় "ছোটদের হয়ে বড়দের এই তিরষ্কার শঙ্খ ঘোষ ছাড়া কে আর করবেন?"[৭]

এই আলোচনা সমাপ্তির আগে শঙ্খ ঘোষের ছড়াসমগ্র পড়তে পড়তে বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়। 'মিথ্যে কথা'র মতো বেশ কিছু ছড়াতে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে আসে। পুরোদস্তুর বাঙালি শঙ্খ ঘোষের শৈশব নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের

ভূমিকা কতখানি তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার জায়গা থেকে গেল লেখাটিতে। প্রশ্ন থেকে গেল কবি যা অনায়াসেই তাঁর কবিতার মাধ্যমে বলতে পারতেন, তার জন্য তাঁকে ছড়ার আশ্রয় নিতে হল কেন? তিনি কী তাহলে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত ছোটোদের লেখা হিসেবে ছড়াকে দেখার প্রবণতাকে গ্রহণ করলেন ও পুষ্ট করলেন? ছোটোদের জন্য কবিতা লেখা যায় না, ছড়াই লিখতে হবে এমন কোন ধারণাকে মান্যতা দিতে চাইলেন কিনা তা নিয়ে আমাদের মনে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়। রবীন্দ্রনাথ ছড়াকে বাকি রোমান্টিক তাত্ত্বিকদের মতোই বাল্যস্মৃতির অনুষঙ্গে পড়তে চেয়েছিলেন; স্মৃতিচারণ করেছিলেন শৈশবের সেকাল ও একাল। ফলে সবসময় বাল্যস্মৃতির অনুষঙ্গে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে চাওয়া বা যোগস্থাপন করতে চাওয়া, এই ফিরতে চাওয়া ইত্যাদি খুবই সক্রিয় হয়ে উঠছে শঙ্খ ঘোষের ছড়ায়। ফিরতে চাওয়া ও তার নস্টালজিয়া, বাৎসল্য-প্রতি বাৎসল্য সেটার মধ্যেই আটকে যাচ্ছে ছড়াগুলো?

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার অবকাশ রেখে এখানেই এই আলোচনায় ইতি টানলাম।

উল্লেখপঞ্জি :

১. শঙ্খ ঘোষ, ছড়াসমগ্র, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা২০৪
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৪৫, পৃষ্ঠা ৭৫০
৩. বিশ্বনাথ কুণ্ডু, ধাঁধাঁর মেয়েলী গীতের অনবদ্য সংকলন, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১
৪. নির্মলেন্দু ভৌমিক, বাংলা ছড়ার ভূমিকা, কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৩
৫. অন্নদাশঙ্কর রায়, ছড়াসমগ্র, কলকাতা : বাণীশিল্প প্রকাশনী, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১০
৬. https-banglalive.com shankhaghosh Dt. 16.12.2021
৭. https-banglalive.comshankhaghosh Dt. 16.12.2021

আকরগ্রন্থ :

১. শঙ্খ ঘোষ, ছড়াসমগ্র, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০

কবিতা

রাই তুমি অনিন্দিতা

শঙ্খ অধিকারী

নদীর ওপাড়ে ফুটে আছে অগণিত মলি ফুল
ওপাড়েই বিচরণ করো রাই তুমি অনিন্দিতা
এপাড়ে গোপ নন্দন আমি বাজাই মোহন বাঁশি।
ফুলের সুগন্ধে মেতে উঠি ঘন ঘন
তুমিও মোহিত হও সেই মোহন বাঁশির সুরে।
নাবিকবিহীন নৌকো রয়েছে মাঝ নদী খেয়ালে।
তোমার সিঁদুর রাঙা সিঁথি আর পারাপারহীন
নদীঘাট - অবিশ্বাসী ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাটে বেলা।
দুই পাড়েই উঠেছে ঝড় শ্রীগোকুলে পৌঁছে যায়
মলি ফুলের সুগন্ধ আর মোহন বাঁশির সুর।

বৃষ্টি মাখি গায়ে

মৌসুমী মন্ডল

শত হতাশা ও শত দুঃখ ভুলে,
এসো বৃষ্টি মাখি গায়ে ।
প্রাণ খুলে শ্বাস নিই,
আজ প্রকৃতির কোলে ।
এখনও আছে অনেক কিছু
মনের সুপ্ত ঘরে,
তাই দিয়ে আজ আকাশ গড়ি
এই পৃথিবীর বুকে ।
জীবনের ভুল নেশা যত
মুছতে থাকি আজ থেকে,
বৃষ্টির ছন্দে সাজিয়ে তুলি
আজ সকল হৃদয়কে ।

নাও

অরবিন্দ সরকার

এই নাও ভুবনগড়ের নীলাকাশ
এই নাও অজগ্রামের জোনাকির আলো
এই নাও স্ফুরণ উদ্গীরণ
এই ভোকাট্টা জীবনের সম্পদ
এই নাও চিরদিনের বিষাদ।

মেঘকথা

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋতু বিপরীত মেঘ ঘনিয়ে তুলেছে
আধিদৈব আঁধার তাপহীন বিস্ফার
ঘূর্ণির ভিতর চক্রায়ন, বিন্দুজলে কটাল
ধর্ষণ ভূমি থেকে ধুয়ে দেয় দৈবভাষ
ধুলো অভিসার অশ্রুজলের নিরুচ্চার,
ফেটে পড়া চিৎকারে খুলে আসে
তন্তু স্নায়ু শিকড়ের তলদেশ স্থিরপাতা
বৃক্ষপ্রবাহ, আর ঘনিয়ে ঝড়ের আবহ
নগ্ন বসুমতী কেঁপে ওঠে রিখটারে
বিপদ সংকেত বাজে ঘণ্টাধ্বনিতে
শঙ্খ আজানে প্রলয়ের সীমা মাপে
হাওয়া- বিশারদ মেঘস্তরে ঘেমে ওঠে
আশঙ্কা পারদ, হংসের আকাশ থেকে
মিথুনলগ্ন ত্রাস নেমে আসে
বধ্যভূমিতে--- 'মা নিষাদ' হাহাকার
মিশে যায় চূর্ণিত শিলাপাথরে
তবুও বৃষ্টিকথা ছন্দপয়ারে লিখে রাখে
মেঘের মনস্তাপ হাওয়ার শুশ্রূষা, জলকথা
কীভাবে যে সহস্র শিরোধারা ধুয়ে দেয়
হিংসার বীজকণা ভয়ের আদিম প্রহরে।

অনিশ্চিত প্রেম

দিশা চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে খুঁজছি, খুঁজতে খুঁজতে
একদিন রঙিন হয়ে উঠবো।
একদিন, ঠিক মাতাল হবো, একদিন।
এতোদিনের অনিশ্চিত প্রেম
পথ দেখছিল—
পাতার আড়াল থেকে স্বভাব কোকিল
ডেকে উঠেছিলো.....
পাপ-এর কোনো শরীর নেই
অথচ ব্যাধি রয়েছে
অথচ মানচিত্র রয়েছে!
একদিন সব মুছে ফেলে
আমি রঙ হয়ে যাবো, আর
সেই রঙে তোমাকে আঁকবো,
তোমার চুল, পাঞ্জাবির বোতাম...
একদিন এবং নির্জন বাতিঘরে
ফেলে আসা সেই মৃত চোখের ছবি!
মনে পড়ে—
তুমি আমাকে ইশারা করেছিলে,
আলোছায়ায়, আলোছায়ায় একদিন...

সুজন গ্রহে
নির্মল সামন্ত

বেঁধে বেঁধে থাকো — মন্ত্র দিয়েছ তুমি
নদীতট থেকে পাহাড়ের পাদদেশে,
উন্মীলিত চোখের আয়না ঘিরে
রেখেছে বেঁধে হৃদয়ে বোধনকামী।

তুমি দুরাশার নীলবাষ্পের ঘাতি
তুমি নিরাশায় সহনশীলের পাথর,
তুমি নীলিমায় শুক্রগ্রহের স্ফূরণ
শুকতারাতেই ভোরাই ডাকের ভাতি।

সুজন-বৃক্ষ শঙ্খ-সুজন বর্ম
অশ্লীলতার অস্ত্র দিয়েছ ভেঙে,
রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে চেঁচায় অবুঝ
বুঝবে কারা তোমার নিদাগ ধর্ম?

বুঝেছে তারা — হৃদয়ে মানুষ যারা
বুঝেছে তারা — দৃষ্টি-আলোয় যাপন
বুঝেছে তারা — ভেলায় অন্তরাত্মা
বুঝেছে তারা — আপন যাদের ধরা

স্বপ্নভুক
খেয়া সরকার

লুডোখেলা শেখাতে গিয়ে
বুলাদির বয়স বাড়লো ঠিকই
জানলো না জীবনের সাপলুডোয়
বারে বারে আছড়ে পড়াও
একধরনের সহজপাঠ
খাবার টেবিল, বিছানায়
ব্যর্থ অপেক্ষারা হাঁটতে শেখেনি তাই
একলা ছাতে তাকিয়ে থাকে তারা
ক্রমশ সাপ হয়ে নেমে আসে
কালো ভয়
মাথা দোলানো ইতিহাস
বন্ধু হও তুমি
আর সব মিথ্যে হোক
সর্বনাশ নয়
স্বপ্নভুক শরীর চাই

বারণ
মঞ্জুশ্রী সরকার

স্বপ্ন একদিন বললো আমায় আসবো কাছে তোর
জেগে থাকিস বিনিদ্র রাত কুয়াশা মোড়া ভোর।
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ঘোড়া ছোটায় মন
ভাবে বুঝি এবার স্বপন করবে নিরীক্ষণ।
বাস্তবেরই কষাঘাতে ভাঙলো সুখের তরী
বুকের মাঝে পাথর চেপে কর্তব্যের সারি।
আজও কেনো ভাসতে চাস শুরুর দিনের মত?
বিনি সুতোয় বাঁধা তরী ঘুরছে অবিরত।
ছককষা এই জীবন মাঝে স্বপ্ন দেখা বারণ
স্বপ্ন যদি ভিড় করে মন খুঁজো না তার কারণ।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

অ-সুখ
তনুজা চক্রবর্তী

রাস্তা এখন এতটাই শুনশান—
বদলে গেছে চেনা নদীর মুখ,
মরা চরে দাঁড়িয়ে একা দ্বীপ
এখন সবার মনের জটিল অসুখ!

তাও তো আছি শব্দ নিয়ে পড়ে
নিজেকে একা একাই নিজের করে
আকাশ সেই ডুবে আছে নীলে
দিচ্ছে না কেউ ধূসর চিত্র ভরে !

এখনও আসে থাকে যে কাছে পিঠে
হাজিরা খাতা চেনা অচেনা নামে
ভরেও ডট নয়তো কালি পেনে
স্বজন বন্ধু বন্দি খোলা খামে।

সময় দাঁড়িয়ে
স্বপন শর্মা

সময় দাঁড়িয়ে দুয়ার খুলে ভাই
ঝুমঝুম পায়ে, এই শব্দ চেনা
চিনতে শেখায় জীবনের ফেনা
হারানো অধম চেতনা ফিরে পাই।
আসলে তার যে বিরতিহীন চিতা
কল্পিত হাতে হামেশা রাখি হাত
মৃত্যুর আগে হাজার বজ্জাত
চোখে ভাসে তার, হারায় অস্মিতা।
ইতিহাস কাঁদে, কাঁদছে জেলখানা
সময়ের সংগে একটি মৃত্যুতে
একটি বিষাদ ছিল হার না মানা
ক্ষমতা দেয়নি নিশ্চিন্তে শুতে।

বুদ্ধদেব গুহ
নীলাঞ্জনা হাজরা

ঝড়ে, কুটিরে, শাবল, কোদাল
তোমরা খান খান খান হয়ে যাও।
আমরা সুখ সুখ সুখ নিই,
সুর নিই,বন্ধন নিই,

তোমাদের শেষ করি।
তুমি প্রাণ প্রাণ প্রাণ ঢেলে
ঢেউ এর উষ্ণতায়
গাছকে আপন করে নিয়ে
জীবনের সমান গাছকে
মূল্য দিয়ে এক সমানুপাতে
জীবনধামে জীবন-জঙ্গল
মিলিয়ে দিয়েছেন।
জন্মান্তরের এক বৃত্ত
চিত্রায়িত বুনট করেন।

অলৌকিক যাপন—
বিমল রায়

অন্তরঙ্গ ঢেউয়ের মুহূর্তগুলি ক্রুর ইশারায় হাত ধরল
বৈতরণী ঘাটে দেখা হল আমি ও আমার সঙ্গে
দূরে চক্রবালে মুখোমুখি বসে নন্দিনী
আমাদের আয়না দেখাবে বলে অন্তর্বাস খুলছে।
দিন ও রাত্রি আশ্চর্য আয়নায় ফুটে উঠছে
অলৌকিক ব্রতযাপনে প্রহরকথা।

মোহময়ী ভৈরবী তীব্র শাণিত খড়্গে
টুকরো হয়ে যাচ্ছে বহুধা সত্তা
বধ্যভূমিতে গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত, রস
ভাসছে ভৈরবীর অশ্রুজল সরোবর
খসে পড়ছে ভয়ের রক্ষাকবচ, এসময়
অতৃপ্ত ঈশ্বর আত্মগোপন করে কচুরিপানায়।

যে খেলা খেলবে বলে নন্দিনী সেজে এসেছিল
নদী নৌকোর গল্প দিয়ে সাজানো পাণ্ডুলিপি
নোঙর খুলে আজ তারা এক অজানা অসুখ
গোল্লাছুট প্রান্তেরের ক্যানভাসে এক মৎসপুরাণ

ঢেউয়ের অভিঘাতে ডুবে যেতে যেতে
দলছুট ইচ্ছেক্ষ্যাপা বলে উঠলো
আবার আমি নতুন কোনো গল্প হবো।

পানপাত্র
ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য

আমার পানপাত্রের খালি অংশে
বিরাজ করে যে কুয়াশা
তা বড় মায়াময়।

সেখানে দৃষ্টি নেই
শুধু ধ্বনির উত্তরে
ফিরে আসে যে প্রতিধ্বনি
তা অন্য কোনো শহরের
মেঘলা আকাশ থেকে।

বহুদূর থেকে ভেসে আসা
ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ
আমাকে মাতাল করে দেয়
অনন্তের পথ দেখায়...

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ঈশ্বর
সমরেশেন্দু বৈদ্য

ঈশ্বর রাস্তায় ঘুরে বেড়ান
পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে
খালি গা
পেট দেখে বোঝা যায় না কবে খেয়েছেন।
তাঁর ক্লান্তি আসে না

ঈশ্বরের মুখে শব্দ নেই
সবকিছু শুনলেও কোনো প্রতিক্রিয়া দেন না
ঈশ্বর হাঁটছেন
সব দেখলেও কেউ তা বুঝতে পারছে না
শূণ্যের দিকে চেয়ে এর কারণ খুঁজেছি।

ঈশ্বর সরাসরি কিছু বলেন না
ইঙ্গিত দেন
তার অর্থ বুঝে নিতে হয়।

ভস্ম
পাপড়ি দাস সরকার

তিনটে মোমবাতি জ্বলছে সন্ধে থেকে
বাসি কিছু রজনীগন্ধার গন্ধ
শুকনো ঠোঁটে গড়িয়ে পড়ছে চলকে চলকে

মাঝে মাঝে অস্ফুট প্রতিধ্বনি
স্বাধীন সময় বেয়ে নদীর ছলাৎ ছল
আগুন সাগরে নরম শরীর

ভেজা চুলের গন্ধমায়ায়
পুড়ছে নিজের শরীরও
মন ও মননে -চিতাভস্ম!

ড্রোন
নিশা ঘোষ

মুখোমুখি হয়েছি বহুকাল। পিঠে পিঠ!
বাবুঘাটের গঙ্গা সিন্ধুবালার মতো নেচে গেল কত...
চিনে গেছি শরীরের সবকটি লেন-বাইলেন।
অপার মুগ্ধতা লেগেছিল
ব্রাইডাল মেকাপের মতো।

সুস্বাদু বনভোজনের পর
যখন আমাকে ছুঁড়ে ফেললে শূন্যে—
আমি মুহূর্তেই হয়ে যাই ড্রোন।
উঁচু থেকে বিচ্ছিন্না থেকে
তোমার প্রকৃত চেহারা, খুঁটিনাটি সব তুলতে থাকি
শেষ তক্ বুঝতে পারি—
মুখোমুখি আসলে একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার মাত্র।

কবি গণেশ বসুকে লেখা

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের পত্র

প্রীতিভাজনেষু,

গণেশ, কথা দিয়েও সময়মতো তোমাকে চিঠি দেওয়া গেল না। এর জন্য মার্জনা চাইছি। পারিবারিক কারণে আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম।

একদিন কফি হাউসে আমাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে তোমার বই। 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ', আমাকে দিয়েছিলে। সেদিনের আগে কিছু না বলার অপ্রস্তুত ভাবটা ধরে নিয়ে কেটে ছিল আর তোমাকে আমি যেটুকু জানি সেটা মিলিয়ে ভাবছিলাম আসলে কত শান্ত স্বভাবের তুমি। তোমার বই পড়েও তোমার ব্যক্তিচরিত্র আমার কাছে একই ভাবে ধরা পড়েছে। তোমার বইটি আবার শেষ করেছি। একটা একান্ত ব্যক্তিগত কারণ, বন্ধু হিসেবে যা তুমি জানো। এ বই-এর অনুষঙ্গ আমাকে যথেষ্ট আর্দ্র করেছে হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে। তোমার অনেক লাইন যেমন, 'আমরণ সে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার'/ 'তোমাকে ভুলিতে চাহি এতো স্মৃতি জমেছে আমার'/ 'উজ্জ্বল প্রেমিক বুঝি ডুবে যায় অপ্রেমের ভিড়ে' / 'যখন নির্জনে একা জেগে থাকি কেবল তোমার'/ 'বিষণ্ণ স্মৃতিরা বড় মুখরিত এ বুকের তলে', -এসব এবং এ ছাড়াও আরো অনেক লাইন মনে হচ্ছে আমার খুব চেনা। যেন আমিই লিখতাম তুমি না লিখলে। কেন এসব লাইন লেখার কথা আমার আরো আগে মনে হয় নি। তোমার কবিতা লেখার হাত বুক থেকে সোজা বার হয়ে এসেছে, তাই সেথায় কষ্ট কল্পনা বা কৃত্রিমতা নেই। সহজ অথচ হৃদয়ে দুঃখতাপে ভরা তোমার এসব লেখা। কবিতাগুলি একান্ত ব্যক্তিগত রচনা, তাই স্বভাবিকভাবেই উচ্ছাস অনেক সময় ভাষাকে ছড়িয়ে গেছে। কিছু লাইনে মনন তো পাঠককে নিশ্চয়ই ভাবাবে, যেমন—

"প্রেমহীন বৃক্ষের মতন
একাকী দাঁড়িয়ে রবো গোধূলির বুকে শোণিতে।" (১৫)
"হৃদয় স্বর্গীয় হলে করতলে দীপ্ত উজ্জ্বলতা
লাক্ষা বহিয়া আনে"। (১৮)
"এতো নিষ্ঠুরতা
সমস্ত গোপন সূত্র খুলে দিয়ে, বাগানের ফুলে
অজস্র স্মৃতির স্পর্শ রেখে কেন পাই আমি?" (২৬)
" কিছুকাল বিদ্যুৎ প্লাবনে
নিরাপদ শান্তি চেয়ে ভেসে গেছি, দুহাতে নিবিড়।"
"নৈরাশ্য বিবাদ সব অপ্রেমের বিভৎস স্বননে"। (২৯)

তোমার বই-এ ১৩, ১৫, ১৮, ২২, ২৩, ২৬, ২৯, ৩৫, ৩৬, ৪০ আমার কাছে উল্লেখযোগ্য লেখা বলে মনে হয়েছে। তোমার কবিতাটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। বিশেষ করে, 'করুণা সবার জানি শেষ হয় পৃথিবীতে অন্ধশোকে'। চতুর্দ্দশপদীতে তোমার হাত অনেকের ঈর্ষা যোগাবে। আমার আপত্তি আছে তোমার প্রকাশ ভঙ্গিমার ভাষায়। অনেক লাইনের অনুষঙ্গে দেখি আধুনিক মনের ব্যর্থতা, হতাশা, নিরাশা যে ভাবে তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, ভাষা আরো আরো উজ্জ্বল হলে হয়তো তা তীব্রতর হ'ত। প্রকাশ ভঙ্গিমায় থাকবে আরো smart, মননশীল এবং সচেতন হতে বলি বন্ধুবাচনে। কিছু কিছু কবিতা বাদ দেওয়া চলতো এবং বই-এ শুধুমাত্র চতুর্দ্দশপদী থাকলেই হয়তো ভাল হ'ত। অবশেষে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আরো স্বতন্ত্রতা বজায় থাকলে ভাল লাগতো আমার। তুমি দীর্ঘ চার/পাঁচ বছর ধরে লিখছো। সুতরাং একজন বুদ্ধিমান শিক্ষিত সচেতন পাঠকের এটা আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না।

তোমার বই সম্পর্কে আমি খুব খোলাখুলি ভাবে লিখলাম সব। তুমি অনেকের চেয়ে বড় হৃদয়বৃত্তি, তাই হয়তো তোমাকে লিখতে গিয়ে এত সহজে করে জানাতে পারলাম। যদি কোথাও ত্রুটি থাকে দোষ নিও না।

আশা করি ভাল আছে। নিশ্চই কিছু লিখছো, কোথায় লিখলে নতুন? উত্তরসূরীতে তোমার লেখা দেখলাম, যদিও স্টলে দাঁড়িয়ে ঠিকমত পড়া হয় নি। এখানে আমার দিন নানান দুশ্চিন্তা, কিছু ভাল না লিখতে পারার হতাশা, এবং নানান মানসিক ওঠা-পড়ায় কাটছে।

আমার অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
বুদ্ধদেব।

প্রবন্ধ

কবিতার মন্তাজ, মন্তাজের কবিতা ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

সৃজনী মণ্ডল

"সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; —কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।"

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা'য় কবি এবং কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ককে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। কবির হৃদয়বত্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তার সার্থক সংশ্লেষেই কবিতার জন্ম। কবি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের গভীর সংযোগ উপলব্ধি করেন এবং সেই উপলব্ধিজাত সত্য কবিচিত্তে এক ঐশী আনন্দানুভবের জন্ম দেয় যা তাঁর কবিতার মাধ্যমে পাঠককে আনন্দবোধে দীপিত করে। কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের (১৯৪৪- ২০২১) কবিতাও এই ভাবনার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর কবিতায় তিনি যেন শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন। শব্দের পিঠে শব্দ বসিয়ে নির্মাণ করেছেন কবিতার দৃশ্যপট। তাঁর কবিতা যেন অনেকটা ছবির মতন;—

"দূরে দীর্ঘ বন্দরের মাস্তুলের গায়
এখনো মেঘের চিহ্ন লেগে আছে।
তুমি ওই মেঘদল মাটিতে নামাও বারেবার,
পারাপার করে দাও, কাঁপাও হেলায়,
জনতায় সকলের অভ্যুত্থান নয়, সে কি জানে
অতিদূর বেলাকার কিশোর পাখিরা সে কি জানে
দূরে দূরে বন্দরের মাস্তুলের গায়
এখনো মেঘের কিছু ক্লান্তি লেগে আছে।"

('ব্যক্তিগত লেখা', 'গভীর এরিয়েলে', 'বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা')

যেন এই পৃথিবী নয়, চেনা চারপাশের মধ্যে নয়, দূরে কোনও এক দীর্ঘ মাস্তুলের গায় লেগে আছে ক্লান্ত মেঘের চিহ্ন। সারাদিন কত পারাপার হয় তার বুক দিয়ে। কবি লিখেছেন, "স্তব্ধতার খুব কাছে কেউ কেউ চলে যেতে পারে।/ পাহাড়ে স্তিমিত বনে কিছু খণ্ড

সূর্য্যাস্তের/ ছায়া পড়ে আছে, সমাধির শুভ্রতায় আরো ম্লান কিছু।/ স্তব্ধতার এত কাছে তবু কেউ চলে যেতে পারে।" ('ব্যক্তিগত লেখা', 'গভীর এরিয়েলে')। কবির এই ভাবনার মধ্যে রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শে কবি-ব্যক্তিত্বের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কবিতায় সৃষ্টি হয়েছে বাক্‌স্পন্দের দোলা। প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় ভাব-ভাবনা, চড়াই-উৎরাই কবির সাধারণ লৌকিক অস্তিত্বের সঙ্গে এখানে একান্ত সংশ্লিষ্ট। প্রাত্যহিক ক্লান্তি অবসন্নতার মাঝে তিনি জাগাতে চেয়েছেন আপন সত্তাকে; 'পুনরুত্থান হবেও আমার কোনোদিন।'

ছয়ের দশকের কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সৃষ্টিশীল মননশীল এক ব্যক্তিত্ব। পুরুলিয়ার গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট তাঁর সৃষ্টিশীল মনন কাব্য, চলচ্চিত্র এবং গদ্যসাহিত্যে অসামান্য কিছু রেখাপাত করে গেছে। তাঁর দেখার চোখটি বড়ো শাণিত। 'বাঘ বাহাদুর'-এ যে জীবনকে তিনি তুলে ধরেন, তা তাঁর দেখা জীবনের এক চিত্রকল্প। কবিতার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিমন প্রকৃতিপ্রেমিক আবার জীবনদার্শনিক। কবিতার মধ্যে প্রকৃতিদ্যোতনায় যেমন তিনি জীবনকে ধরেছেন, তেমনি চলচ্চিত্রেও। 'কোথায় যাবার আর বাকি আছে আমাদের, হেমন্তের শেষে/তোমার চাদরে তোলা সেই ফুল ঝ'রে পড়ছে খাটের নিচে/সিমেন্টের পলেস্তারা জুড়ে জন্মে উঠেছে বনের কাঁটাগাছ, লক্ষ করো/দেখতে-দেখতে একদিন আমাদের ঘিরেই অজস্র ডালপালা নিয়ে বেড়ে উঠবে তাদের শরীর, শেকড়সুদ্ধু গেঁথে যাবে হাড়ে' ('ভোরবেলা', 'কফিন কিম্বা স্যুটকেস') শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি, পুরুলিয়া জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে, তেমনি ধরা দিয়েছে যাপনের সৌন্দর্য। ১৯৪৪ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়ার আনাড়া রেলশহরে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা তারাকান্ত দাশগুপ্ত ছিলেন রেলের চিকিৎসক, সেইসূত্রে শৈশবের দিনগুলি কেটেছে পুরুলিয়ার পলাশ বনের সান্নিধ্যে। সেইকারণেই হয়তো পুরুলিয়ার গ্রামবাংলা তাঁর সিনেমায় অন্য রূপ পেয়েছে। ছৌ ঝুমুরের গতিশীল এবং সর্বাত্মক প্রয়োগ তাঁর শিল্পে ও নির্মাণে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যা পুরুলিয়ার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে চিনতে সাহায্য করে। মাত্র বারো বছর বয়সে হাওড়া দীনবন্ধু স্কুলে পড়াশোনার জন্য কলকাতা চলে আসেন তিনি। তবু পুরুলিয়ার সাথে তাঁর অন্তরের টান ছিল চিরজীবনের। এই টান আমৃত্যু থেকে গেছে তাঁর কাজে ও চিন্তায়। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন মানভূমের মাটির মানুষ। তবে শুধু তাঁর শৈশবের পুরুলিয়া নয়, বাংলা এবং বৃহত্তর বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার যে নির্যাস তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাই ছিল তাঁর শিল্পের প্রেক্ষাপট। চেনা দৃশ্য চেনা নিসর্গ তাঁর বিভিন্ন সিনেমায় যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, কবিতার ক্ষেত্রেও এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। মানুষের জীবনচর্যাই হয়ে উঠেছে তাঁর ভাবনার আশ্রয়, তাঁর শিল্পের মূলবিন্দু। এখানেই একজন চিত্রপরিচালক ও কবি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

"গাছের গুঁড়ির নীচে গুবরে পোকা
গোবোরের বল ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে
একবার তাকায় তাদের দিকে
তারপর ক্যামেরার দিকে আর
মুচকি মুচকি হেসে চলে যায় অনন্তের দিকে।" ('সিনেমা-৩', 'অগ্রন্থিত')

তথ্যচিত্র দিয়ে সিনেমাজীবন শুরু বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের। ১৯৬৮ সালে মাত্র ১০ মিনিটের একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'কন্টিনেন্ট অফ লাভ' দিয়ে চলচ্চিত্রে তাঁর অভিষেক হয়েছিল, পাশাপাশি আরেকটি ছোটো ছবি করেন 'সময়ের কাছে'। যদিও 'সময়ের কাছে' ছবিটি মুক্তি পায় প্রায় ৫০ বছর পর। ১৯৬৮ সালে তৈরি ছবিটি দেখানো হয় ২০১৮ সালে, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৯৭৮ সালে তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'দূরত্ব' এর জন্য পেয়েছিলেন জাতীয় পুরস্কার। এরপর একে একে 'নিম অন্নপূর্ণা'(১৯৭৯), 'গৃহযুদ্ধ'(১৯৮২), 'অন্ধ গলি'(১৯৮৪), 'ফেরা'(১৯৮৮), 'বাঘ বাহাদুর'(১৯৮৯), 'তাহাদের কথা'(১৯৯২), 'চরাচর'(১৯৯৩), 'লাল দরজা'(১৯৯৭), 'উত্তরা'(২০০০), 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান'(২০০২), 'স্বপ্নের দিন'(২০০৪), 'আমি, ইয়াসিন আর আমার মধুবালা'(২০০৭), 'কালপুরুষ'(২০০৮), 'জানালা'(২০০৯), 'মুক্তি'(২০১২), 'পত্রলেখা'(২০১২), 'আনোয়ার কা আজিব কিসসা'(২০১৩), 'টোপ'(২০১৭) প্রতিটি ছবিতেই নতুন নতুন ভাবনায় প্লাবিত হয়েছে তাঁর নির্দেশনা। তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই রয়েছে প্রান্তিক জীবনের বিন্যাস। 'বাঘ বাহাদুর' ছবিতে তিনি দেখিয়েছেন, তথাকথিত নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসন কীভাবে মরণ কামড় বসাচ্ছে গ্রামীণ লোকশিল্প ও লোকশিল্পীর ঘাড়ে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, সমাজের সাবঅল্টার্ন স্তরের মানুষদেরও নিজস্ব শিল্পধারা রয়েছে। ঘুনুরাম 'বাঘ বাহাদুর' ছবিতে সেই সাব অল্টার্ন শিল্পের প্রতিনিধি। সে নামী কোনও শিল্পী নয়, কিন্তু শিল্পচর্চায় তার কোনও ফাঁক নেই। নিজের শিল্প ও শিল্পীসত্তার অপমানে সে বিধ্বস্ত, হয়তো বা পরাজিত। নিজের শিল্পীসত্তাকে হারিয়ে ঘুনুরাম তখন এক অনুভূতিহীন অসহায় জীব। শিল্পের অপমান, অবজ্ঞা তার কাছে মৃত্যুর শামিল। পরিচালক কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 'বাঘ বাহাদুর' ছবিতে সেই অবহেলিত ঘুনুরামকে দিয়েই প্রতিবাদের আওয়াজ তোলেন। শিল্পের মানরক্ষা করতে ঘুনুরাম শেষপর্যন্ত নিজের জীবন উৎসর্গ করল। পরবর্তীকালে 'চরাচর' কিংবা 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান'-এও তিনি ফিরে গেছেন প্রান্তিক অবহেলিত অচেনা মানুষের জীবনযাত্রার দিকে। আসলে পুরুলিয়ার প্রান্তিক জীবনকে তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি। "ট্রামলাইনের ওপার থেকে দেখা যায় কবির বাড়িতে পটপট আলো জ্বলে ওঠে"('এক একদিন', 'কফিন কিম্বা স্যুটকেস'), তাঁর সৃষ্টির ভেতর তিনি সেই আলোটুকু রেখে গেছেন। পাঠকের ব্যথাতুর চোখ সেইদিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, পটপট আলো জ্বলে উঠছে দিগন্তের ঐ পারে। যে দিগন্তের পারে জেগে থাকে কবির ঠিকানা।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রতিটি সিনেমাই উঠে এসেছে কবিতার গভীর অন্দরমহল থেকে। তিনি তাঁর সিনেমার শব্দবন্ধ, ভাষার বিন্যাসকে একটি মনোহারি কবিতার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। ষাটের দশকের শেষে কবিতাই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান প্যাশান। বিদেশি কবিতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সহজ সরল ভাষায় তিনি লেখেন; 'ভুলচুকহীন ভাবে জন্মাব এবার শুয়োপোকা হয়ে।' ('শুঁয়োপোকা', 'রোবটের গান') খুব সহজ সরল বিষয় নিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি কবিতা লিখে গেছেন। 'খচ্চর', 'টিকটিকি', 'ডিম', 'গাধা', 'হাত', 'কান'এই তাঁর কবিতার নাম। তবে তাঁর কবিতার তল অনেক গভীর। তাঁর কবিতাকে দু-এক কথায় পরিমাপ করা সহজ নয়। সেইসঙ্গে তাঁর কবিতায় রয়েছে প্রতীকের যথেচ্ছ ব্যবহার, "একদিন তাকিয়ে থাকতো লাল পিঁপড়ের দিকে, যে ছিল/ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি পরিশ্রমী, যে করত/কাজের মতো কাজ একটা চিনির দানাকে/ঘরের এক কোণ থেকে আরেক কোণে নিয়ে যেত, আর/ফিরে এসে/আবার বেরিয়ে যেতো আর-একটা চিনির দানার খোঁজে।" ('লাল পিঁপড়ে', 'হিমযুগ')। এ যেন সিসিফাসের গল্প! আবার 'হাইত' কবিতায় কবি যখন বলেন, 'অদ্ভুত জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলে এক বিশাল মাঠে শুয়ে আছে/তোমার দু'হাত। বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে একটি হাতের ওপর, আরেক হাতে/শব্দ করে আস্তে-আস্তে গজিয়ে উঠছে ঘাস।' ('হাত', 'হিমযুগ'), তখন অর্থাতিরিক্ত এক ছবি পাঠকের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। যেন এক অদ্ভুত স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাতের অতলস্পর্শী নীরবতার গভীর থেকে কবিতার শব্দগুলি তুলে আনেন কবি। কবিতায় শব্দ জুড়ে জুড়ে তিনি নির্মাণ করেছেন এমনই বিচিত্র চিত্রকল্প। শুধু অর্থ নয়, চিত্র নয়, ধ্বনি নয়, আরও এক অনন্য বিস্ময় অর্থচিত্র তাঁর কবিতাকে চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করায়। শব্দের অমর বিন্যাসে তাঁর কবিতারা হয়ে ওঠে চিত্রময়।

জগৎ ও জীবনের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের নিরন্তর আগ্রহ। জীবনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জীবজন্তু এ সবকিছুই হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার বিষয়। যেমন, 'খচ্চর' কবিতায় লিখেছেন, "মানুষের জন্য আমরা রেখে গেলাম ঘোড়ার ডিম/তাদের মা বোন বউ/সবাই একসঙ্গে তা দেবে তার ওপর। আমরা গড়ে তুলব স্বাধীন এবং আশ্চর্য্য এক খচ্চর-পৃথিবী।" ('খচ্চর', 'হিমযুগ') কবিতার এ যেন এক অভিনব ধরণ। তিনি ছন্দে কবিতা লেখেন নি। বলা যায়, নিয়মমাফিক কবিতা লেখার অভ্যাস তাঁর ছিল না। অবশ্য যা ছন্দময় তাই সবসময় কবিতা হয় না। নিয়মিত ছন্দে বিন্যস্ত থাকে পদ্য, কবিতা নয়। তাই পদ্য হওয়াটা রূপকল্পের ব্যাপার, কবিতা হওয়া না হওয়া তো মূল্যবোধের ব্যাপার। তিনি একবার বলেছিলেন, "মনে আছে যখন আমি এভাবে কবিতা লিখতে শুরু করলাম, সেটা প্রায় সতেরো-আঠারো বছর বয়স। তখন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত আমার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, উনিই প্রথম বললেন

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা antipoetry। আমি যে খুব ভালো বুঝতে বেরেছিলাম উনার বক্তব্য তা নয়, কিন্তু পরে উনার কথা বুঝতে পেরেছিলাম। আসলে কবিতা বলতে এক ধরণের ধারণা আমাদের মধ্যে আছে এবং এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা অনেকে কবিতা লিখে যাই। সে কবিতাগুলো আদৌ কিছু দাঁড়াচ্ছে কিনা আমরা ভেবে দেখি না। আমি এর বাইরে দাঁড়িয়ে কবিতা লিখেছি সেগুলো হয়তো সবসময় সংসারী কবিতা নয়, সবসময় হয়তো জীবনমুখী কবিতা নয়। কিন্তু সেগুলো অবশ্যই অন্যরকম কবিতা, অন্য ধারার কবিতা, অন্য বাস্তবতার কবিতা।"

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতার ইমেজের সঙ্গে চলচ্চিত্রের মন্তাজের একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি তাঁর কল্পনার প্রবাহমানতায় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাস্তব, পরাবাস্তব এবং কাব্য ও সঙ্গীতকে জড়িয়ে তাঁর সিনেমা-মননের এক অনায়াস সেতুবন্ধ নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন এক বিচিত্র জাদু-বাস্তবতার জগৎ। 'চরাচর', 'উত্তরা', 'তাহাদের কথা', 'টোপ', 'কালপুরুষ' প্রতি ক্ষেত্রেই সিনেমা-ভাবনা লতা বিস্তার করে গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে কাব্য, অতিলৌকিকতা ও জাদু-বাস্তবতাকে। তবে এই জাদু-বাস্তবতা সৃষ্টি করতে তিনি বাস্তবকে অগ্রাহ্য করেন নি। বাস্তবকে প্রসারিত করে পরাবাস্তবের আলো-আঁধারি আধো-বোধগম্য রহস্যময়তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনি এক জাদু-বাস্তবতা সৃষ্টি করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "এই বাস্তবকে যদি চারদিক থেকে টানা যায়, আমরা এক অদ্ভুত অতিবাস্তবতার দিকে চলে যাই। সেটা এই বাস্তবের ভিতরে লুকিয়ে ছিল, আমরা শুধু আবিষ্কার করতে পারিনি। যখন আবিষ্কার করতে পারি, তখন এক অদ্ভুত ম্যাজিক নিজেদের মধ্যে গড়ে ওঠে।" কল্পনাকে সৃষ্টিসম্ভব করার এই বিশেষ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর জানার সঙ্গে অজানাকে মিশিয়ে দিয়ে, ঘটনার সঙ্গে স্বপ্ন-কল্পনাকে জুড়ে দিয়ে, ওলট-পালট করে নিজের মতো এক জগৎ তিনি গড়েছিলেন।

"কতদিন কবিতা লেখোনি? কতদিন?
হাজার বছর ? নাকি আরও বেশি? মন কি
খারাপ ছিল?
...কিন্তু তুমি তো মানুষ নও,
রোবট রোবট,
তাই বোঝার উপায় নেই কিছু।" ('রোবট সাহিত্যমালা-১', 'রোবটের গান')

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতায়, চলচ্চিত্রে এই ম্যাজিকটা আছে। কবি বোঝাতে চান সবাই এখনও ধূর্ত হয়নি, রোবট হয়নি। কেউ কেউ আছে যারা দুঃখী হয়ে, বোকা হয়ে, শিল্পী হয়ে, প্রেমিক হয়ে এই মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ঠিক যেমন 'বাঘ বাহাদুর' ছবির অবহেলিত ঘুনুরাম শিল্পের মানরক্ষা করতে মৃত্যু বরণ করে তার নীরব প্রতিবাদ

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

জানায়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত যখন সিনেমা বানিয়েছেন কিংবা কবিতা লিখেছেন, বারবার তিনি দৃশ্যকল্প তৈরিতেই জোর দিয়েছেন। মানুষের বাস্তবকে যাদুময় করে, এক 'Extended Reality'-তে পর্যবসিত করে তিনি আদতে সেই রূপকথার সন্ধান করেছেন, যেখানে মানুষও এক রূপক। নিরন্তর তিনি খুঁজেছেন এক অকৃত্রিম সারল্য ও মায়াকে, যেখানে সবকিছুর মাঝে নিজের প্রতিবিম্বকে দেখতে পাওয়া যায়, নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করা যায়।

"আঁধার হলে শিরীষ গাছ ভেঙে পড়তো পিঠে।
অসংকোচে তোমাকে আমি এসব বলেছিলাম, কেননা, জ্যোৎস্না বাঁকানো গ্রীবা
উদাস মাঠে তোমাকে ঘিরেছিল।" ('তোমাকে আমি', 'গভীর এরিয়েলে')

সহজ সরল বিষয় নিয়ে সহজ সরল ভঙ্গিতে কবিতা লিখলেও, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতার পংক্তিগুলি নিতান্ত সাদামাঠা বা আপাতসরল নয়। অদ্ভুত চিত্রকল্পের বন্ধনে যেন তাঁর কবিতার পংক্তিগুলি আবদ্ধ। "একটা কান দেখতে চায় আর একটা কানকে।/একটা কান বলতে চায় আর একটা কানকে/অনেক অনেক কথা। দেখা হয় না কোনোদিনই, কথা গর্ত দিয়ে ঢুকে/অন্য গর্ত দিয়ে ছুটে যায়, শেষে হাওয়ায় হাওয়ায় মিশে যায়, শেষে/হাওয়ায় হাওয়ায় মিশে যায়। দুঃখে ও লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে-যেতে কান ঝরে পড়ে, খসে পড়ে একদিন। পৃথিবীতে/শুরু হয় কানহীন মানুষের যুগ।" ('কান', 'হিমযুগ') আবার, "ঘুমিয়ে পড়ো, ভালোবাসার আগে এবং/ভালোবাসার পরে, থকথকে ঘুম/এঁটে ধরে রাখুক চোখের পাত।/যারা প্রতিবাদ করে, যারা টুঁটি চেপে/জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিতে চায় ব্যবস্থাকে,/যারা কিছুতেই মানতে চায় না/শান্ত হ'য়ে গেছে সবকিছু/যারা থুতু ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে চায়/ভাড়াটে মানুষের মুখ,--তাদের জন্য/ হাঃ, তাদের জন্য, সেই সব মূর্খদের জন্য/তৈরি হচ্ছে লোহার স্বর্গ।" ('থাপ্পড়', 'ছাতাকাহিনী') চারপাশের আক্রান্ত মানবিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ এসবের বিরুদ্ধে কবি কলম ধরেন। "শাদা পাতার ওপর পেন চেপে ধরতেই/রক্ত বেরিয়ে এলো।/ভয় পেয়ে টিভি চালিয়ে দিল নিখিল,/রক্ত বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।" ('সেই চোখ', 'উঁকি মারে নীল আর্মস্ট্রং') এমনই সব বিচিত্র অনুভূতি ধরা পড়েছে কবিতাগুলিতে। তাঁর কবিতার আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট। ক্যামেরার উজ্জ্বল লেন্স থেকে এক একটি শব্দ বেরিয়ে এসে সাজিয়ে তুলছে তাঁর কবিতার খাতা।

"শেষ হয়ে আসছিল তখন, বিকেল শেষ হয়ে এলে
আমি ঘুরে দাঁড়ালাম,
দেখলাম আমার স্নানের জল
তুলে দিচ্ছে বুড়ি।"

যেন পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলোর ভেতর থেকে উঠে এসেছে এই কয়টি লাইন। এক

প্রসন্ন আশ্রয়ের ছবি ভেসে উঠছে সন্ধ্যার মর্মরিত আলোয়। কবিতা নয়, যেন এক সিনেমার দৃশ্যপট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পাঠক। আবার 'বন্দুকের গল্প' কবিতাটি যেন শব্দ দিয়ে বুনে ফেলা এক সিনেমা--

"হাড় হিম ছোট্ট ফোকরের ভেতর
সেই বন্দুক শুয়ে থাকে সারা রাত,
সারা রাত সমস্ত শহর জুড়ে ফ্যান ঘোরার শব্দ
শুনতে পায় সেই বন্দুক
বন্দুকের ঘুম হয় না।" ('বন্দুকের গল্প', 'হিমযুগ')

আসলে কবিতায় শব্দ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসতেন কবি। এই তাঁর কবিতা লেখার কৌশল। যেমন 'হাতি' কবিতায় লিখেছেন, "হাতি নিয়ে একটাও কবিতা লিখিনি এ পর্যন্ত। আজ হাতি উঠে আসছে সাদা পাতার ওপর। আসলে উঠে আসছে হাতিমার্কা কাগজ চোখের ওপর।" ('হাতি', 'ছাতাকাহিনী', 'বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা') তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গভীর এরিয়েলে' তিনি লিখেছেন, "ক্রমশ যাত্রার পথ বিভিন্ন সড়কে ভেঙে যায়।" এখানে কোনও ধ্বনি মাধুর্যের জন্ম হয় নি, জন্ম হয়েছে দৃশ্যের। প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এটাই। বিভাস রায়চৌধুরী বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সম্পর্কে বলেছেন, "বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত রুক্ষ সৌন্দর্যের উপাসক। সংগ্রাম ছাড়া সবকিছুই তাঁর চোখে মনে হয়েছে গতানুগতিক, নিষ্ফল, অসাড়। আশাবাদী নয়, ছিলেন স্বপ্নবাদী। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেই তাঁর আন্তর্জাতিক পরিচিতি, কিন্তু আমাদের কাছে তিনি প্রথমত কবি।" বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতার বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাঁর সত্তরের দশকের কবিতাগুলি। সমগ্র বিশ্ব তখন ক্ষুধাময়, অস্ত্রময়, পরিবর্তনকামী। বাতাসে বারুদের গন্ধ এবং স্বপ্নে বিপ্লব। অগ্নিগর্ভ সত্তরের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি লিখলেন 'একদিন' কবিতা।--

"তারাভরা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ সমস্ত দিন
এভাবেই
ছুটে চলেছে চাঁদের পেছনে ধর্মভ্রষ্ট সেই কুকুর
ও তার মালিক, আমি,
ওই তো দূরে ওই এক চিলতে রুটির মত একটি দেশ, ওখানে
এসে গিয়েছে বিপ্লব, জুতো পরে ঘুরছে ফিরছে
বিপ্লবী সেনানী, জল খাচ্ছে, পিঠে বন্দুক" ('একদিন', 'কফিন কিংবা সুটকেশ')

আবার, ঠান্ডা যুদ্ধের শেষে এক অশেষ যুদ্ধ শুরু করে কবি ভালোবাসাকে নিয়ে চলে যাবেন দূরে কোনও এক গ্রামে; "আমি তোমাকে দেখিয়ে আনবো হো-চি-মিনের স্নানের

জায়গা/আর শমী ঠাকুরের বাড়ির পাশেই স্তব্ধ ভিয়েতনাম।" ('শমীর বাড়ির পাশে', 'কফিন কিংবা সুটকেশ') এ এক বিচিত্র নাটকীয়তা, যা দ্বন্দ্বের চেয়েও বেশি রহস্যময়। তিনি এই ব্যঞ্জনার কাছে এসে ছেড়ে দেন পাঠককে। পাঠক অনুভব করেন তাঁর প্রতিটি কবিতাই আসলে ছোটো ছোটো সিনেমার মতো। তাঁর বহু সিনেমার চিন্তাভাবনা ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। যেমন 'বামনবীর' কবিতাটি প্রসঙ্গে 'উত্তরা' ছবিটির কথা মনে পড়ে যায়;--

"তুমি কি বুঝতে পারো
লম্বাদের দিন শেষ, পৃথিবীকে
ঘুমের বড়ির মতো গিলে ফেলে
তারা ঝরছে জলের মতো
তোমার শরীর থেকে।
পৃথিবী বামনে ভরে যাক,
বামনবীরের বেশে
পৃথিবীকে তুলে নিক তারা।" ('বামনবীর', 'উকি মারে নীল আর্মস্ট্রং')

'উত্তরা' ছবিতে এই ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে। ছবির শেষে বিষণ্ণ মেয়েটিকে একটি স্বল্প উচ্চতার মানুষ বলেছিল, লম্বা মানুষ তো অনেক দেখা গেল তারা কিছুই করতে পারেনি যুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীটা বামন মানুষের স্বপ্ন। আপাত লম্বা মানুষদের পৃথিবী থেকে ক্ষুদ্র মানুষদের পৃথিবীর প্রতি তাঁর ছিল পক্ষপাত। তিনি এক ব্যতিক্রমী চিত্রের মধ্য দিয়ে তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন সমাজের সেসব উপেক্ষিত মানুষদের কথা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমাজের মূল ধারার বাইরে যাদের বাস। কারণ তিনি ছিলেন সর্বহারাদের পক্ষে, গণমানুষের পক্ষে।

কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত নিভৃতে কবিতা যাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। সমকালীন কোনও সাহিত্য আন্দোলন বা কবিতা বিষয়ক মুভমেন্ট থেকে তিনি দূরেই থাকতেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলা কবিতায় এক ব্যতিক্রমী ধারা জন্ম নেয়। চিরাচরিত ছকে বাঁধা বিষয়ের বাইরে বেরিয়ে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র, অনেকটা ছবির মতন। এই যান্ত্রিক পৃথিবীর রোবো-মানুষকে নিয়ে তিনি লিখেছেন কবিতা সিরিজ, যেখানে চোখের জল, আদর, ভালোবাসা, প্রেম সবই বহন করে কোনও না কোনও যান্ত্রিক মাধ্যম। কবি এই পৃথিবীর সুস্থতা কামনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "আসলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই একটা জার্নি। সেটা কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের বিশেষত্ব হলএই জার্নিটা তুলে ধরা।" তাঁর চলচ্চিত্রের মধ্যে এসেছে কাব্যের রূপকল্প এবং সাহিত্যে এসেছে চলচ্চিত্রের চিত্রকল্প। কবিতায় সিনেমার রুদ্ধ দরজা খুলে দিয়েছেন তিনি। নির্মাণ করেছেন শব্দে শব্দে এক গতিশীল ছবি, যা প্রবাহিত হচ্ছে অনুভবে, উপলব্ধিতে। ছোট ছোট দৃশ্য দিয়ে বুনেছেন কবিতার কোলাজ। লুই বুনুয়েলের একটি কথা পরিচালক কবি বুদ্ধদেব

দাশগুপ্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতেন, "Only Cinema can go between Poetry and Music" তাহলে কবিতায় সিনেমা নাকি সিনেমায় কবিতা? একজন কবি সিনেমা বানাতেন নাকি একজন সিনেমা পরিচালক কবিতা লিখতেন? এসব প্রশ্ন যেন অনুচ্চারিতই রয়ে গেল, আর তিনি চলে গেলেন। করোনাদগ্ধ এই সময়ে থেমে গেল সেই আশ্চর্য্য স্রষ্টার পথচলা।

তথ্যঋণ :

১) 'বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং।
২) "কীভাবে ছবি করি, কীভাবে ছবি হয়', বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, 'পরম্পরা'।
৩) 'বুদ্ধ বাহাদুর', গৌতম ঘোষ, 'কৃত্তিবাসী' মেগা, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।
৮) 'বেঁচে থাকা জিন্দাবাদ', বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং।
৫) 'বুদ্ধদাকে মনে রেখে', অসীম বোস, 'কৃত্তিবাসী মেগা', দে'জ পাবলিশিং।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র কবিতা : যাপিত জীবনের মেধাবী উচ্চারণ

অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

কবি যখন শব্দ খুঁজে এনে তাঁর কাব্যের ঘরবাড়ি নির্মাণ করেন, তখন সে শব্দের পিছনে থাকে কবিরই যাপিত জীবন। তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্জাত দর্শন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই কবির কবিতা হয়ে ওঠে কবির জীবনের ভাষ্য। সব সময় এমন সরল হিসেব অবশ্য মিলবে তেমন কোনো অর্থ নেই। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।'[১] তবে আমরা যদি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র কবিতা নিয়ে কথা বলি, তাহলে এ কথা খুব জোর দিয়ে বলা যায় যে তাঁর কবিতায় ব্যক্তিজীবন স্পষ্টভাবে হাত ধরাধরি করে চলেছে। তিনি অনেক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে কলকাতা শহরে না জন্মানো তাঁর কবিতার জন্য এক সুবিধে। শহরের জীবন একঘেয়ে। প্রতিদিনই এক রকম। কিছু ঘটে না। কিন্তু ছোট ছোট শহর বা গ্রাম বা অপরিচিত জায়গায় অনেক নতুন নতুন ঘটনা ঘটে। সেখানে জীবন চঞ্চল। লেখার রসদ অনেক বেশি।[২] সেই রসদ নিয়ে তিনি বিশ শতকের ষাটের দশকের স্বতন্ত্র কবি।

পুরুলিয়ার আনারা গ্রামে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র জন্ম ১৯৪৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। বাবা ছিলেন ভারতীয় রেলের ডাক্তার। তাঁর ছিল বদলির চাকরি। সে কারণে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র শৈশব কেটেছে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে। যদিও তাঁদের আদি বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর। কিন্তু তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তাঁর পড়াশোনা এক জায়গায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হোক। তাই তাঁকে হাওড়ার দীনবন্ধু স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে পড়া শেষ করে ভর্তি হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর কর্মজীবন শুরু হয় কলকাতার সিটি কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে। পরে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ শ্যামসুন্দর কলেজে অধ্যাপনা করেন। তবে ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে কবিতা ও চলচ্চিত্রের প্রতি গভীর প্রেম তৈরি হয়। সারাজীবন তিনি আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাঁর কাজের জায়গা হয়েছে তাঁর প্রিয় এই দুই বিষয়। তবে তিনি অধিক পরিচিতি লাভ করেছেন চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে। তুলনামূলকভাবে তাঁর চলচ্চিত্র পরিচালক সত্তার আড়ালে অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর কবিসত্তা। আমরা মূলত কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে নিয়ে দু'চার কথা বলবার চেষ্টা করবো এ আলোচনাতে।

১২টি কাব্যগ্রন্থ, ৪টি উপন্যাস, চলচ্চিত্র বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু। ১৯ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গভীর এরিয়েলে' (১৯৬৩) প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'কফিন কিংবা স্যুটকেস' (১৯৭২), 'হিমযুগ' (১৯৭৭), 'ছাতাকাহিনী' (১৯৮১), 'রোবটের গান'

(১৯৮৫), 'ভোম্বলের আশ্চর্য্য কাহিনী ও অন্যান্য কবিতা', 'উঁকি মারে নীল আর্মস্ট্রং', 'বেঁচে থাকা জিন্দাবাদ', 'ভূতেরা কোথায় থাকে' (২০২০) প্রভৃতি।

ষাটের দশকের কবিতায় নতুন স্বর শোনা গেল যাদের গলায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। পঞ্চাশের দশকের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত এঁদের চাইতে আলাদা রকমের কবিতা লিখলেন বুদ্ধদেব। তাঁর কবিতার ভাবনা; বলার ধরনে এলো নতুনত্ব। তাই প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত তাঁর কবিতাকে বলেছিলেন — 'anti-poetry'। অর্থাৎ প্রচলিত ধরন ও ধারণার বাইরে বেরিয়ে এসে লেখা তাঁর কবিতা।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র কবিতার মধ্যে কী কী আছে? আছে বেঁচে থাকা, জীবনযাপন, জীবনযাপনের জটিল আবহ, বিশ্বাসভঙ্গের কথা, প্রেমের কথা, অপ্রেমের কথা, ভালোবাসার কথা, ভালোবাসাহীনতার কথা। এরই পাশে পাশে চলেছে প্রকৃতির গভীর বাঙ্ময়রূপ এবং রহস্যময়তা।

১৯ বছর বয়সে লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গভীর এরিয়েলে'। নামকরণে জীবনানন্দের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যগ্রন্থের 'গভীর এরিয়েলে' কবিতার নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে এ কাব্যের। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত জীবনানন্দের নিবিষ্ট পাঠক। জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর ধারণাও সুতীব্র। তিনি 'গুরুচণ্ডা৯'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সে কথা জানিয়েওছেন। তাঁর প্রিয় কবির প্রসঙ্গে বলেছেন

"আমার প্রিয় কবি একজন বললে ভুল হবে, বলা উচিত নয়। অনেকেই আছেন। বেশ কয়েকজন আছেন। তবে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে নিশ্চিত জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ দাশ... তাঁর কথা মনে হয় না এমন সপ্তাহ আমার যায় না। বাংলা কবিতাকে যে জায়গায় উনি নিয়ে গেছেন... এত দূরে নিয়ে গেছেন... এত দূরে নিয়ে গেছেন যে সেটা ভাবাই যায় না! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটা পারেন নি। যেটা ওঁর সমসাময়িক আর কোনও কবি পারেন নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র পারেন নি, বুদ্ধদেব বসু পারেন নি, উমম... আরও অনেক... সুধীন দত্ত পারেন নি... কেউ পারেন নি। উনি এঁদের চেয়ে একটু অগ্রজ। কিন্তু উনি কবিতাকে এত দূর অবধি বিস্তৃত করে দিয়েছেন ছাতার মতন তার তলায় দাঁড়িয়ে আছেন এখনকার কবিরা।"[৩]

কাজেই তরুণ বয়সের কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামকরণে কেন জীবনানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে, তা আমাদের আন্দাজ করতে আর অসুবিধে হয় না। তবে ক্রমে ক্রমে তিনি ষাটের দশকের স্বতন্ত্র স্বর নিয়ে আসতে পেরেছেন তাঁর কাব্যে।

তাঁর প্রথম দিককার কবিতার মধ্যে প্রকৃতির রহস্যময়তা যেমন আছে, তেমনি আছে দুর্বোধ্যতা আবার একই সাথে আছে সময়ের কথা। যেমন 'গভীর এরিয়েলে' কাব্যগ্রন্থের 'ব্যক্তিগত লেখা' কবিতায় আছে ব্যক্তিগত চেতনা জাগরণের কথা, আছে অন্য মানুষ হয়ে ওঠার কথা এবং আছে প্রকৃতির আশ্চর্য রহস্যময়তা। এ কবিতা পাঠকের চেতনার বৃত্তে

মিশ্র অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। কবি বলেন,

"পুনরুত্থান হবেও আমার কোনোদিন।
আমি ওই প্রভাতের মন্ত্রময় শিশুদের ছোটো ছোটো হাতে
ন্যুব্জদেহে চলে যাবো, আমি ওই বনতলে তৃণের উপর
শুয়ে শুয়ে ঘুম যাবো কতকাল, ভীষণ প্রপাত
বহে যাবে শব্দহীন শোণিতে আমার।
নিরঙ্কুশ জাগরণ হবে কি, পুনরুত্থান হবেও আমার।"

আবার এই কবিতাতেই কবি যখন উচ্চারণ করেন 'পাহাড়ে স্তিমিত বনে কিছু খণ্ড সূর্য্যাস্তের ছায়া পড়ে আছে, সমাধির শুভ্রতায় আরো ম্লান কিছু' তখন আমাদের চেনা জগতের বাইরে চলে যায় এ অনুভূতি, তখন তো অচেনা হয়ে ওঠে। 'প্রহর' কবিতায় আছে পথ খোঁজার কথা। পথ ভাঙার কথা। যাত্রাপথ বিভিন্ন সড়কে ভেঙে যাওয়া তো আসলে জীবনের চলার পথ নানান দিকে চলে যাওয়া। যে পথে যেতে চাই না সে পথেও এসে পড়তে হয় একসময়। তাই প্রেমে-ভালোবাসায় সব সময় আমরা পছন্দের পথ বেছে নিতে পারি না। পথ ভেঙে অন্য পথেও যেতে বাধ্য হই। 'তোমাকে আমি' কবিতায় বাস্তব আর অধিবাস্তবের সহাবস্থান। তবে প্রকৃতির বর্ণনায় কবিতাটি অনন্য। কবি বলেছেন,

"ফুল কুড়োতে যেতাম আমি পাহাড়তলির বনে, ঝর্ণা আমায়
কাছে ডাকতো, বুকে রাখতো হাত;
বিকাল হলে আঙিনা জুড়ে মেঘ আসতো নেমে
আমি এক এক করে তাদের নাম ডেকে
কাটিয়ে দিতাম বেলা, আমার গর্বিত সারাবেলা —"

কবির ছেলেবেলার পুরুলিয়া আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তবে এর পরের পংক্তিগুলি যখন তিনি উচ্চারণ করেন 'আঁধার হলে শিরীষ গাছ ভেঙে পড়তো পিঠে' তখন বাস্তব-অবাস্তব কেমন একাকার হয়ে যায়। 'উনিশশো নব্বই' কবিতায় সময়ের কঙ্কাল উঠে আসে। এক একটা খণ্ডকাল নানান চিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। কখনো সে সময় সৃষ্টিশীল, উর্বর, সমৃদ্ধ, কখনো বা নিষ্ফলা। এ কবিতায় কবি সময়ের মেধাহীনতাকে লক্ষ্য করেছেন। তাই কবি ভারাক্রান্ত মনে বলেছেন,

"ক্রমে যায় সুদূর মেধার থেকে সেও সরে যায়।
তার বাহু তার নাভি উরুদেশ প্রচণ্ড শুভ্রতাসুদ্ধ
সরে যায়
ক্রমশ বুকের থেকে বুকের ওপরে ক্রমশ মেধার থেকে
মেধার ওপরে তার বাহু তার চোখ কণ্ঠার নির্জন
দেখা যায়, ক্রমে যায় যায়..."

কিন্তু কবি তো নৈরাশ্যবাদী নন, সময়কে চিনিয়ে দিয়েও বেঁচে থাকার রসদ ঠিকই খুঁজে পান। আর তখনই বলতে পারেন

"ভালোবাসার সাথে হ'ল দেখা
এখন সন্ধেবেলা।"

'কফিন কিম্বা স্যুটকেস' কাব্যগ্রন্থে উত্তাল ৭০-এর দশকের কথা আছে। এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বিভাস রায়চৌধুরী বলেছেন

"কফিন কিম্বা স্যুটকেস বিস্ময়কর। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক তখন জন্মাচ্ছে। বাতাসে বারুদ। স্বপ্নে বিপ্লব। বিশ্ব তখন ক্ষুধাময়, অস্ত্রময়, পরিবর্তনকামী।"[৪]

এ কথাগুলো মনে রেখেই পড়তে হয় 'একদিন' কবিতা। বিপ্লব, বন্দুকের দশককে কবি উল্লেখ করেছেন এই বলে

"এসে গিয়েছে বিপ্লব, জুতো পরে ঘুরছে ফিরছে
বিপ্লবী সেনানী, জল খাচ্ছে, পিঠে বন্দুক।"

এরই পাশে রেখে পড়তে হয় 'এপ্রিল '৭১' কবিতাটি। এখানেও সেই উত্তাল ৭০-এর ছবি ধরা আছে।

এ কাব্যগ্রন্থেরই আর একটি কবিতা 'সিনেমা'। এ কবিতা আসলে 'জীবনীকাব্য'। নিজের জীবনের কথাই বলেছেন কবি। সিনেমার প্রতি গভীর প্রীতি, শিক্ষকতা এই দুয়ের টানাপোড়েন। বেছে নিলেন শেষ পর্যন্ত সিনেমা। তারপর নিশ্চিত হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন সে পথে। আর পেছন ফিরে তাকান নি তিনি। সে কথাই বলেছেন কবিতায়

"দ্রুত প'রে নিলে বুট, হাঁটতে শুরু করলে একাই, কাঁধে
তোমারই সেই পুরোনো ক্যামেরা আর রেড ফিলটার।"

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র কবিতার এক বিশেষ ধরনই হল চিত্রকল্প নির্মাণ। তিনি তা সিনেমার মতো করে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। তাঁর অসংখ্য কবিতাতে এ ছবি আছে। 'এক একদিন' কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। কবি বাস্তবতার অতিরিক্ত এক জগতের সন্ধান দেন এখানে। লেখেন

"ট্রামলাইনের ওপার জুড়ে বৃষ্টি পড়ে
এপারে কবির বাড়ি"

কবির দৃষ্টি আলাদা। তা আর পাঁচজনের মতো নয়। বাস্তবকে তিনি টেনে লম্বা করে নিতে পারেন আবার চ্যাপ্টাও করে নিতে পারেন। তাই বাস্তব বড়ো অদ্ভুত ঠেকে কবির কলমে। অথচ অন্য রকম ভাবে যে বাস্তবকে দেখা যায় তার নমুনা আছে এ কবিতায়

"ট্রাম লাইনের ওপার থেকে দেখা যায় কবির বাড়িতে
পটপট আলো জ্বলে ওঠে
তারপর পটপট আলো নিবে যায় আর

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

কবি ঘুমায় কবির বউ ঘুমায়
ঘুমায় তাদের ছেলে।"

ঠিকই যে তিনি সময়ের ভাঁজগুলোকে নানান উপমায়, চিত্রকল্পে ধরেছেন, তবে চুপ করে দূর থেকে বসে বসে সময়কে লেখেন নি। সময়ের উত্তাপে দগ্ধ হয়ে সেখান থেকে নিজেই নিজের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অনাগতকে পথ দেখিয়েছেন। তাই দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন—

"আজ ওঠো, লাথি মারো খাওয়ার টেবিল, কবিতার ক্লাস
ছুঁড়ে ফ্যালো পচা গলা রেকর্ড-প্লেয়ার মাইতির ছাদে
বসে আছো কেন? ছোটো, লাফ দাও
বন্দুকের নলে, মারো"

'যাদু-বাস্তবতা'র ধারণা আমরা তাঁর কবিতায় পাই। কী সেই যাদুবাস্তবতা? আসলে অবিশ্বাস্য বাস্তবের সাহিত্যিক প্রকাশই হ'ল যাদু-বাস্তবতা। অর্থাৎ যাদুর উপাদান ও বাস্তবের সংমিশ্রণে তৈরি হয় সাহিত্যিক বাস্তবতা। কল্পনা যেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। তেমন একটি কবিতা 'শমীর বাড়ির পাশে'। তিনি এ কবিতার শেষ দুটো লাইনে লিখেছেন

"আমি তোমাকে দেখিয়ে আনবো হো-চি-মিনের স্নানের জায়গা
আর শমী ঠাকুরের বাড়ির পাশেই স্তব্ধ ভিয়েৎনাম"

দুটি স্থানের অবিশ্বাস্য সহাবস্থান ঘটেছে এখানে। বাস্তব কি নেই এখানে? আছে তা সাহিত্যের বাস্তব। তা কল্পনাপ্রবণ বাস্তব। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত অবলীলায় এ কাজটি করেছেন তাঁর কাব্যে। 'কফিন কিম্বা স্যুটকেস'-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল তৈরি হও'। এ কবিতাও '৭০ দশকের উত্তাপকে আবারও আলাদা রকম ভাবে ধরেছে। সময় যে বড্ড উত্তাল, অগ্নিগর্ভ। তাই কবি তৈরি হতে বলেছেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। এ সময় 'পাগলের মতো', নিজের জন্য ঘৃণা ও করুণা ছাড়া আর কিছু অনুভূতি বাকি নেই। তবুও নিজের হাসি দিয়ে বেঁচে থাকাকে উদযাপন করতে হবে। আর নিশ্চয়ই একদিন আসবে যখন আমরা ভুলে যেতে পারবো সে সময়। ভুলে যে যেতেই হবে কারণ নইলে তো বারে বারে মনে পড়বে, সে সময়ে সামনে শুধু দুটো দিকই খোলা ছিল মৃত্যু অথবা পলায়ন। কফিন কিংবা স্যুটকেস। তাই শেষ পর্যন্ত এ কবিতা ভবিষ্যতের কবিতা। অনাগত ফুলের মতো সুন্দর দিনের প্রত্যাশায় এ কবিতা হয়ে উঠেছে অনবদ্য। কবি বলেছেন

"তুমি ভুলে যাবে, ভুলে যাবে এই সব, এই অদ্ভুত সময়
যখন কফিন কিংবা স্যুটকেস যে-কোনও একটা বেছে নিতে
বলা হয়েছে তোমাকে।"

এ কবিতা মৃত্যুর নয়। এ কবিতা জীবনের। জীবনকে প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি দেওয়ার

জন্য প্রস্তুত হওয়ার কবিতা এই তৈরি হও'। জীবন মানে যুদ্ধ, লড়াই, যুদ্ধহীন পরাভব নয়। তাই সেই আশাবাদ উচ্চারণ করেছেন কবি ভয়ঙ্কর সময়ে দাঁড়িয়ে।

'হিমযুগ' কাব্যগ্রন্থও সময়ের দলিল। আমরা সভ্যতার অতীতে কি মুখ ফিরিয়েছি, আমরা কি 'পিঁপড়ের সারি'র মতো আত্মগোপন করছি এ সব প্রশ্ন কবিকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই তিনি বলেছেন

"আমাদের আগামী যে দিন সেও ঠিক আসে না কখনো
শুধু ভোর হয়, খালি ভোর হয়, অর্থহীন বোঁচা কালো ভোর
আর তোমার আঙুল ভয়ে বিঁধে যায় আমার আঙুলে
দ্যাখো, স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে এখন, এগিয়ে চলেছে
দ্রুত পিঁপড়ের সারি পুঁতির মতন সেই পৃথিবীর কোণে,
সেই কোণ ডাক দেয় আমাদের, চলো আরো নিচে নেমে যাই।"

আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট, দেশ নষ্ট, সকলের মুখই প্রায় নকল গোঁফ আর তিলে ভরে উঠেছে এ তেমন এক সময়। এমন সময় জন্ম নিচ্ছে আর এক কবিতা 'মাগুরমাছ'। কবিতাটি ভেতরে ও বাইরে নতুনত্বের স্বাদ বয়ে এনেছে। এই মাগুরমাছ তো আমাদেরই মনের প্রতিফলন। আবার মাগুরমাছ ও ঘরের বৌ কখনো কখনো সমার্থক হয়ে ওঠে। কবি বলেন

"বৌ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে সাঁতার কাটার
শীতল নীল দূর-বয়সের দীঘির ভেতর।
হঠাৎ ওঠে হাওয়া, আর
রান্নাঘরের দরজা ভয়ংকর শব্দ করে খুলে যায়,
আঁতকে ওঠে বৌ — মাগুরমাছ,"

এ মাগুরমাছ আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের নানান অপূর্ণ থাকা স্বপ্ন, যা বাস্তবে পূরণ হয় না। তাই তার আনাগোনা সারারাত ধরে আমাদের মনের আনাচে-কানাচে। শুধু মাগুরমাছই নয় এর সঙ্গে এ কাব্যে হাজির লালপিঁপড়ে, বন্দুক, হাত, টিকটিকি, গাধা, কান, সাঁড়াশি, মেশিন, হ্যাঙ্গারেরা। কত সাধারণ অথচ কত গভীর বিষয়কে বুনে দিয়েছেন কবি এ সব কবিতায়। এ পর্যায়ের প্রতিটি কবিতা সরস, দুর্দান্ত। 'হাত' কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধার করা যাচ্ছে

"তোমার হাতের জন্য সব সময় অসম্ভব চিন্তা করতে তুমি।
তারপর একদিন সত্যি সত্যি হারিয়ে গেল তোমার হাত,
... ...
অদ্ভুত জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলে এক বিশাল মাঠে শুয়ে আছে
তোমার দু'হাত। বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে একটি হাতের ওপর, আরেক হাতে
শব্দ করে আস্তে — আস্তে গজিয়ে উঠছে ঘাস।"

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

নিজের হাত বেহাত হয়ে গেলে আর কী বা থাকে সে জীবনে। অন্যের দাসত্ব করে করে সে হাত আর নিজেরই থাকে না। এক সময় হারিয়ে যায়। সে হাত নিজের শরীরে থাকলেও তা অন্যের জন্য নিবেদিত। তাহলে কিভাবে সে হাত ফিরে পাওয়া সম্ভব? আবার নতুন স্বপ্ন দিয়ে তাকে নির্মাণ করতে হয়। আগের সমস্ত অতীত মুছে ফেলে নতুন ঘাসের মতো আবার গজিয়ে উঠতে হয়।

'মেশিন' কবিতাটি আসলে সময়কে ব্যঙ্গ করে লেখা। মানুষ যে সময়ে তার চিন্তা-চেতনা, অস্থি-মজ্জা-হৃদয় নিয়ে আর মানুষ রইলো না, হয়ে পড়লো যন্ত্র বা মেশিন, সে সময়কে কশাঘাত করে লেখা এ কবিতা। মানুষকেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন আয়নার সামনে। লিখেছেন—

"একটা মেশিন থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা। পৃথিবীতে
মেশিন ভাই-বোন, মেশিন স্বামী-স্ত্রী ও মেশিন মা-বাপ
ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ।"

এ এমন এক সময় যার থেকে আমাদের মুক্তি নেই। আছে অনন্ত ডুবে যাওয়া। কিন্তু এই নিমজ্জন তো কবি চান নি। কিন্তু যন্ত্রণা আমাদের উষ্ণ রক্তস্রোতে ঝলকে ঝলকে চলেছে জন্ম পরম্পরায়। তাই কবির আক্ষেপ

"তুমি চেয়েছিলে কোলের ওপর
ছোট্ট এক হাতে হাত নাড়া, যা আমি এতদিন কিছুতেই
দিতে পারি নি তোমাকে,"

এই না পারার আক্ষেপের মধ্যেই আবার মেশিন জীবন তাদের মতো ফুল ফোটবে। ঘুরতে যাবে মেশিন বৌদির বাড়ি। আর এক জগতে নিয়ে গিয়ে ফেলেন কবি এখানে আমাদের। বিস্মিত হয়ে যাই আমরা পাঠককুল এ কবিতা পড়ে।

'সাঁড়াশি', 'প্রেসার-কুকার', 'হ্যাঙ্গার', 'স্টান্ট' এ সবই মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অক্ষর নির্মিত চিত্র। প্রেসার-কুকারের সিটিই মধ্যবিত্ত জীবনের বাঁশি। হ্যাঙ্গার তো আমাদের ঝুলে থাকা জীবনের কথাই বলে। জাস্ট ঝুলে আছি আমরা। টুপ করে খসে পড়লেই হলো। কিন্তু

"বছরের পর বছর, এক জন্ম থেকে আর এক জন্ম
ঝুলে থাকা যায় শুধুমাত্র একটা হ্যাঙ্গার ধরে।"

এও তো কম কথা নয়। যে ভাবেই হোক বেঁচে থাকাটাই তো মধুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বোঝাপড়া' কবিতায় কী সে কথাই বলে যান নি?

'ভেসে থাকতে পারো যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,'

আবার বলেছেন,

"মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।"

এই 'কিমাশ্চর্য বাঁচা'ই তো আসল। তাকেই তো কবি মহত্বর করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথের পথেই।

'খচ্চর' কবিতাকে কোন শব্দে ব্যাখ্যা করা সম্ভব! আশ্চর্য করে কবির চেতনা পাঠককে। শ্লেষভরে কবি বলেন

"মানুষের জন্য আমরা রেখে গেলাম ঘোড়ার ডিম,
তাদের মা বোন বৌ
সবাই একসঙ্গে তা দেবে তার ওপর।"

আমাদের গুলিয়ে যায় মানুষ ভালো না কি খচ্চর। পৃথিবী ভালো না অন্য গ্রহ, যখন কবি বলেন

"আমরা হাজার হাজার খচ্চর ভাইরা বেরিয়ে পড়ব
দূরে, এই হাজা-পচা গ্রহ থেকে
আমরা লাফ দেবো অন্য গ্রহে,
আমরা গড়ে তুলবো স্বাধীন এবং আশ্চর্য এক খচ্চর-পৃথিবী।"

কত রকম অসংগতি আছে আমাদের, তা আমরা চিরকাল ধরে যত্ন করে পুষি। আমরা বই কিনি, পড়ি না, সাজিয়ে রাখি। দেখাতে চাই। দেখনদারির যুগ এখন। যা আসলে আমাদের অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রমাণ করে। কবি কিশোরদের হাতে তুলে দিয়েছেন ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার দায়িত্ব। তারা যেন সাজিয়ে না রেখে পড়ে ফেলে সব বই। চোখে যেন তাদের জ্ঞানের আগুন বেরিয়ে আসে। তাদের পূর্বজদের মত তারা যেন সেই ভুল না করে বসে। সেই কিশোরের কথা এ ভাবে বলেছেন কবি

"এসেছিলো গভীর চোখের কালো, উস্কোখুস্কো চুলের কিশোর, ব'সে থেকে
ব'সে থেকে থেকে চিৎকার করে উঠেছিল একদিন, চোখের আগুনে
ঝলসে দিয়েছিলো বুকশেলফের শরীর, আবার যেন সে আসে,
ছাই করে রেখে যায় তাকে, যেন ঝলসে দিয়ে যায়
ভাঁড় ও ভাড়াটের মুখ, যারা তাকে
সাজিয়ে রেখেছে শুধু, ব্যবহার করে নি কোনোদিন।"

আবার আর একটা সভ্যতার সন্ধান দেন তিনি তাঁর 'চামচ' কবিতায়। যদিও তা ব্যঙ্গার্থে। তা হল চামচ সভ্যতা। আমরা সবাই এখন চামচ। মানে চামচা। কী নির্মম পরিহাস করেছেন কবিতায়। আসলে উলঙ্গ বাস্তবকেই তো তিনি সামনে তুলে ধরলেন। লিখলেন—

"প্রাইজ দেবো
চামচ-কবিকে, চামচ-গদ্যকারের সঙ্গে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

আলাপ করিয়ে দেবো চামচ-ফিল্ম-ডিরেক্টরের। আর
সেই চামচ-সভ্যতার ওপর ডক্টরেট হয়ে ফিরে আসবে আমাদের
ঝকঝকে চামচ-ছেলেমেয়েরা।"

কী নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন কবি বাস্তবকে; সময়কে। কবি রীতিমতো হতাশ এ কারণে। তাই তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়। সত্য যা তাকে মিথ্যা বানিয়ে দেওয়া, আর মিথ্যা যা তাকে সত্য বানিয়ে তোলা হচ্ছে দেখে তাঁর মন ভালো নেই। 'একটা হতাশা, একটা দুঃখবোধ' থেকে তাই তিনি পরের জন্মে নতুন এক পৃথিবীতে জন্মাতে চান। চারপাশের সময়ের এমন ক্লেদ দেখে দেখে কবি বিষণ্ণ। সেই বিষণ্ণতাই তো জন্ম দিয়েছে এমন সত্য কবিতা। তাঁর যাপিত জীবনেরই তো দৃশ্য এগুলো। মেধাহীন সময়ের মেধাবী উচ্চারণ এ কবিতা।

'রোবটের গান' কাব্যগ্রন্থের একটি-দুটি কবিতার কথা বলা যাক এবার। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'রোবট সাহিত্যমালা-১'। এখানে বলা হয়েছে চারিদিকে মানুষ নেই, আছে শুধু রোবট। তার নেই শিল্প সাহিত্য চর্চা। আছে নিয়মের গতানুগতিক অনুবর্তন। তাই তার পদ্য লেখা নিয়ে নেই মাথাব্যথা। ওতে তো কিছু তার বদল হবে না জীবনের। কারণ তার তো মনই নেই। 'বুঝতে পারি' কবিতায় এসে কবি আরো উপলব্ধি করলেন আদতেই আমরা হাত-পা সমেত সম্পূর্ণ রোবট হয়ে উঠেছি। 'দিন দিন আমাদের সংখ্যা বাড়ছে ক্রমশ'। 'এপিটাফ' কবিতায় এসে আমরা এবার চমকে যাচ্ছি 'বিশ্বাসহীন, ভালোবাসাহীন, মেধাহীন, অসম্ভব স্বার্থপর এক রোবট' -এর কথা জেনে। আসলে তারা কারা? কবি তাদের চিনিয়ে দিচ্ছেন এই বলে

"হাজারো মানুষ রোবট হয়ে যাচ্ছে,
চলে আসছে এ-গ্রহে। যেমন এসেছিলাম একদিন আমি।"

এবার আর তিনি রোবট বলছেন না মানুষকে। বলছেন 'মৃত মানুষ'। তারা মানুষেরই মতো। কেবল মৃত। ধ্বস্ত সময়ই হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার চরিত্র কখনো তা রোবট, কখনো মাগুরমাছ, কখনো গাধা, কখনো হ্যাঙ্গার প্রভৃতির রূপকে। আবার 'শুঁয়োপোকা' কবিতায় আছে সেই সময়ের কথা নতুন ভাবে বলা। শুরু করেছেন এ ভাবে

"ধন্যবাদ, এই জন্মের জন্য। ধন্যবাদ
চারিদিকের শুঁয়োপোকা ভাই-বন্ধুদের।"

আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, কারা এই শুঁয়োপোকা। শুঁয়োপোকাদের কাজ হলো বুকে ভর দিয়ে পরের জন্মের দিকে এগিয়ে চলা। শিরদাঁড়া নেই, দাঁড়াবার মতো শক্ত পা নেই। সেই শুঁয়োপোকাতেই যে আগামী দিন ভরে উঠতে চলেছে। তাই তিনি বলেন

"ভুলচুকহীন ভাবে জন্মাবো এবার
শুঁয়োপোকা হয়ে।"

'ভোম্বলের আশ্চর্য্য কাহিনী ও অন্যান্য কাহিনী' সত্যিই আশ্চর্য্য সৃষ্টি। 'ভোম্বলের আশ্চর্য্য কাহিনী' কবিতায় কী নেই সিনেমা, যাদুবাস্তবতা, সম্মোহন সবই মিলে মিশে একাকার। সর্বোপরি বিষয়। সেও ভারি চমৎকার। আমাদের সকলের মধ্যেই গোপনে থাকে একটা করে ভোম্বল ও মলিনা এবং তাদের আশ্চর্য্য কাহিনী। এ কবিতা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। 'ছাতাকাহিনী', 'উঁকিমারে নীল আর্মস্ট্রং' এ কাব্যগ্রন্থগুলোতেও কবি জীবনের যে কত ছবি এঁকেছেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। যেমন - 'ছাতাকাহিনী' নামক কবিতায় ছাতার আড়ালে আসলে মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্যকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। ছাতারা রাস্তায় বেরোয়, অভিমান করে, দাঁত কিড়মিড় করে, টুঁটি চেপে ধরে একে অন্যের। তারপর

"সারাদিন ঘুরে, ঘুরে-ঘুরে, শেষ ছাতাও
বাড়ি ফিরছে এখন। অন্ধকার একটা কোণায় চুপচাপ
দাঁড়িয়ে আছে সে, আর
তার সমস্ত শরীর থেকে জল ঝরছে, জল ঝরছে, জল ঝরছে।"

বাচ্যাতিরিক্ত এক গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে এ কবিতা। 'উঁকি মারে নীল আর্মস্ট্রং' কাব্যে উঠে আসে সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব, সংঘাত। চারিদিকে মানুষের দুর্দশা, কর্মহীনতা, স্মাগলিং এ সব নিয়েই নব্বইয়ের দশক। 'নন্দনমেলা' কবিতায় রাষ্ট্রনেতাদের সেই চিরপরিচিত 'পলিটিক্স'-এর কথা এসে পড়ে। এসে পড়ে হিন্দু-মুসলমান তাস। ভোটের বাজারে রফিকুল আর আমিনার খুব কদর তাই। কিন্তু

"রফিকুল বুঝতেই পারছে না
কেন সবাই তাকে চাইছে, হঠাৎ
'আপনি' 'আপনি' বলছে, বলছে
ঘর ছাওয়ার খড় দেবো
পাছা লুকোনোর থান দেবো
পেট পূরণের চাল দেবো...
রফিকুল শুনছে না কিছুই,
রফিকুল দৌড়চ্ছে
পেছনে ঢালের মতো পেট নিয়ে দৌড়চ্ছে আমিনা
যেন আবার নতুন খপ্পরে পড়তে না হয়।"

সেই চেনা গল্প। কিন্তু কবি কি করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। সংবেদনশীল মন থাকলে তো আর উটপাখির মতো চোখ বুজে থাকা যায় না। তাই তিনি লিখে চলেন

"বসিরহাটের নির্মল
এম-এ পাস করে সাত বছর চাকরি না পেয়ে
গলায় দড়ি লটকে সটকে পড়েছে,"

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

তাতে কার কি আসে যায়? গ্রাম দখল হচ্ছে, আবার বেদখল হচ্ছে। বন্যায় সাপ ও মানুষ সমান ভীত সন্ত্রস্ত। এদিকে নন্দনে কবিতা উৎসব ঠিকই চলছে, চলবে। 'অন্যগ্রহ' কবিতায় নারীর স্বাধিকারের কথা আছে। আছে সমকামের কথা। 'বামনবীর' কবিতা বঞ্চিতদের কবিতা। উপেক্ষিত অথচ বীর তেমন জনেদের কথা এই বামনবীর। 'অন্য মহাকাশ' অন্ধকার জগতের হদিশ দেয়। চেনা মানুষের অচেনা নোংরামো কথাকে সামনে তুলে আনে। 'গগন অন্ধকার' কবিতায় আছে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা। আছে জাতি বিদ্বেষের বিষ। তাই জীবনানন্দের রূপসী বাংলা ওপার বাংলার তানবিরের জন্য নিরাপদ নয়, তাই তানবিরকে দেখে

"বনগাঁ স্টেশনে
গগন গগন বলে
অন্ধকারে ছুটে গেল ওকে, ওকে, ওকে, ওকে?"

'উঁকি মারে নীল আর্মস্ট্রং' কবিতায় অবদমিত কামের কথা আছে। আছে রোমান্টিকতাও। ঘোষেদের মেজোছেলে বাইনোকুলার দিয়ে শেফালীর স্নান করা দেখে প্রায়ই। তার কামনা জাগে। নিজেকে কালবোস মাছ মনে তখন। সে তখন জলে নেমে দেখে

"শেফালির খোলা বুক
খোলা নাভি
হাত ও নিতম্ব
আশ্চর্য্য মেঘের মতো যোনি।"

কামনার জলাশয় ডুবে সেই মেজোছেলে তার নিষিদ্ধ স্বপ্ন পূরণ করে। অন্যদিকে যে চাঁদের আলো শেফালীদের বাড়ির চালকুমড়োর ডালে এসে ঝুলে পড়েছিল, সেখান থেকে

"উঁকি মারে
নীল আর্মস্ট্রং নিমাইয়ের বিছানায়
দেখে চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে নিমাই, বিছানা
আর ক্যানিং লোকাল।"

এ দৃষ্টি কামের নয়, প্রেমের। এই প্রেমই তাঁর কাব্যের অক্ষরে অক্ষরে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রেমকে বলে কি বোঝানো যায়? যায় না। তাকে অনুভব করতে হয় গভীরভাবে। সে কথাই রয়েছে 'গুটগুটিয়ে চলেছে নীল পোকা' কবিতায়। সেখানে কবি লতির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"ওগো, একটা কথা হাজারবার
বলার দরকার নেই, হাজার কথা
একবারও বলার দরকার নেই, গন্ধ পাচ্ছো?
গন্ধ পাচ্ছো?
গন্ধ পাচ্ছো আমার বুকের,
আমার বুকের নীচের তিলের?"

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত যে কোন বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে পারতেন এবং তাকে আশ্চর্য শিল্পমণ্ডিত করেও তুলতে পারতেন অবলীলায়। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাঁর কবিতা নির্মিত হয়েছে। কোন কবিই তাঁর সমকালকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তও তা যান নি। বরং সময়কে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট ও বহুমাত্রিক করে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতা পাঠ করে বোঝা যায়, সব শেষ হয়ে যায় নি। সব রোবট হয়ে যায় নি, সব শঠহয়ে যায় নি। কিছু মানুষ এখনো আছে যাঁরা সহজ-সরল, স্রোতের বিপরীতে হেঁটে চলেছেন। আপোষ করেন নি সবকিছুর সাথে। সে মানুষের মেরুদণ্ড আছে। তাঁরাই সাহস দিয়েছেন ছেঁড়া-ফাটা সময়কে বুঝে নিতে। কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তাদের ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। কবির দৃষ্টি ঠিক খুঁজে নেয় তাদের।

তবে তাঁর প্রথম দিকের কবিতা অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। বোধকরি কবি সেই তরুণ বয়সে নিজেও চেষ্টা করেছেন অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতায় যেতে। এবং 'হিমযুগ' থেকে সেটা তিনি সফলভাবে করতে পেরেছেন। একটার পর একটা চমক লাগানো কবিতা লিখে গেছেন তারপর। তাঁর কবিতায় তিনি সব মানুষকে দেখছেন কুঁজো হয়ে যেতে। আবার আকাশের গ্রহ তারাদের দেখা গেছে বিছানায়। চাঁদের আলোকে চালকুমড়োর গাছে ঝুলতে দেখা গেছে। তিনি দেখেছেন পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সে ভাবেই বেঁচে আছে মানুষ। আবার চারিদিকে মিথ্যের পাহাড় রয়েছে সুযোগ মতো বেড়ালের ব্যাগ থেকে তা বেরিয়ে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে কবি উড়িয়ে দিতে চান গত বছরের হাড় হিম করা অপমান যত। শেষ পর্যন্ত সেই বিড়াল ও কবি দুজনেই পাহাড় পেরিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে আলো ক্যামেরা পলকা রঙের বানানো বাড়ি পেরিয়ে পগার পার ছুটে চলেছে। এই ছোটার অর্থ বোঝা যায় নিশ্চিত।

তাঁর কবিতা সব সময় ছন্দে লেখা হয়ে ওঠে নি। সব কবিতা সমান নয়। কিন্তু অদ্ভুত সব চিত্রকল্পের ব্যবহার দেখা যায় কবিতায়। নিজের বেহাত হয়ে যাওয়া হাত দেখতে পান বৃষ্টিভেজা মাঠে। চাঁদকে দেখা যায় বিছানায়। পিঁপড়ের পিঠে চড়ে অক্ষরেরা বৃষ্টিভেজা পাতাদের শিরায় শিরায় হেঁটে বেড়ায় ইত্যাদি। আসলে জড়রা জীবের মতো আচরণ করছে তাঁর কবিতায়। তিনি বাস্তব আর অবাস্তব গুলিয়ে দেন কবিতায়। মিশিয়ে দেন কবিতায়। পোকামাকড়েরাও এসেছে তাঁর কবিতায় অনেক বেশি গুরুত্ব নিয়ে। এর সচেতন কারণ আছে। তিনি তো অতি সাধারণকে বিজয়ী দেখতে চান। তাই বামন তাঁর কাছে বীর হয়ে যায়। আরশোলা, পিঁপড়ে, শুঁয়োপোকা কত কি নগন্য পতঙ্গ এসে ভিড় করে। তাদের জীবনকে দেখে কী ভীষণ ভাবে মেলানো যায় মানুষের নিজের জীবনকে। এছাড়া শব্দের ব্যবহার খুব তীব্র তাঁর কাব্যে। তিনি মুখের ভাষা ব্যবহার তো করেছেনই, কিন্তু এমন এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা এমনিতে খুব শালীন নয়, সেগুলোও ব্যবহার করে নিশ্চিত ভাবে

নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা কোথাও তা অশালীন হয় নি। সেগুলি হ'ল পাছা, গু, পেচ্ছাপ, শরীর নেওয়া ইত্যাদি।

শক্তি-সুনীলদের সর্বগ্রাসী জনপ্রিয়তার যুগে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ষাটের দশকের কবিতার এক অন্যরকম সুর। তাঁর কবিতায় হুলোড়প্রিয়তা কম, আছে মগ্নতা, গভীর দর্শন তা একেবারেই দেশীয়। তাঁর সমকালের ভাস্কর (চক্রবর্তী)-সুব্রত (চক্রবর্তী)-শামসের (আনোয়ার)-কালীকৃষ্ণ (গুহ) দের চাইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা। কিছুটা চুপচাপ, একলা রকমের। তবে নিজের ছাপ তিনি রেখে গেছেন তাঁর কবিতায় একথা নিশ্চয়ই বলা যায়। আর রেখে গেছেন সময়ের হাতে মার খাওয়া অসংখ্য মানুষকে। সব মিলিয়ে তাঁর কবিতায় একটা সমগ্র জীবনবোধের ছবি ফুটে ওঠে। তাই তাঁর কবিতা আরো বেশি চর্চার দাবি রাখে। কারণ নিবিষ্ট পাঠক মাত্রই জানেন তাতে হিরে-মুক্ত-মাণিক্য আছে অঢেল।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। উৎসর্গ, ২১ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। এক সাক্ষাৎকারে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত জানিয়েছেন — "যদি কলকাতায় বড় হতাম, ভাগ্যিস কলকাতায় বড় হইনি! আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি যে আমি কলকাতা শহরে জন্মাইনি। কলকাতা শহরে আমি বেড়ে উঠিনি। আমার জন্ম পুরুলিয়া থেকে দূরে আনারা বলে একটা গ্রামে। ওটা তখন গ্রাম ঠিক ছিল না একটা রেলওয়ে কলোনি ছিল, বসতি ছিল। সেখানে লাইনের একধারে সাহেবরা থাকতেন, আর এক ধারে ভারতীয় কর্মচারীরা। তো সেখানে ডাক্তার বলতে মূলত একজন, বাবা, বদলি হয়ে এলেন। তারপর বিভিন্ন জায়গায় থেকেছি আর আমি ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর ঋদ্ধ হয়েছি।"
(www//parabaas.com/PB67/LEKHA/bBuddhadeb67/shtml)

৩। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র সাক্ষাৎকার — প্রথম পর্ব,
http.www.guruchandali.com.mcul.php?topic=21551

৪। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র কবিতা 'সাজিয়ে রেখেছে শুধু, ব্যবহার করেনি কোনদিন' — বিভাস রায়চৌধুরী, কৃত্তিবাস, নভেম্বর ২০২১, পৃ. ১২৯।

সন্ত্রাসকালের বীর্য নয়, কবিতার শরীর জুড়ে সময়ের জ্বালা-ঘৃণা-কারুণ্য : বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা কবিতায় পঞ্চাশের দশকের সাথে ষাটের দশকের যে মৌলিক তফাৎ তা সুচিত হয়েছে সময়ের যন্ত্রণা থেকে। দেশ স্বাধীনের সময় ষাটের কবিদের অধিকাংশই অতি শিশবে, বা কৈশোরে। তাঁদের শরীরে এসে লাগেনি স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ, উত্তেজনা। কিন্তু স্বাধীনতার ফলভোগ তাদের করতে হয়েছিল নিরূপায় ভাবে। এঁরা ছেলেবেলায় দেখেছে দাঙ্গা, দেশভাগ, ছিন্নমমূল সমস্যা। দুই বাংলা জুড়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে সুবিধাবাদী রাজনীতি। ধান্দাবাজি। মূল্যবোধের অবক্ষয়। তাই এই দশকের কবিরা জীবনকে দেখলেন সংশয়ের দৃষ্টি থেকে। কাউকেই যেন আর পূর্ণ বিশ্বাসের জায়গা থেকে দেখা সম্ভব হল না। অসহিষ্ণু ষাট তাই আত্ম আবিষ্কারের খেলায় মেতেছিলো। অথচ এই দশকে রইলো না পঞ্চাশের সংঘবদ্ধতা। সবাই সবার থেকে বিচ্ছিন্ন। স্বতন্ত্র। আলাদা। এই দশক যেন বন্ধুহীনতার বিষে আচ্ছন্ন। বাইরে এবং ভেতরে। যেন পরস্পর আড় চোখে দেখা। সম সময়ের বিরুদ্ধে শত্রুর দৃষ্টিপাত। ফলে একের পর এক কবিতা কেন্দ্রিক আন্দোলনগুলির জন্ম হল এই দশকে। অস্থিরতা আর সংশয়ের ভেতর থেকে জন্ম নিল হাংরি আন্দোলনের মতন উন্মত্ত কবিতা আন্দোলন। এক তীব্র উচ্ছ্বাসের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার আন্দোলন। যেন অস্তিত্বের এক অসহায় অবস্থা থেকে ব্যক্তিক মনের গভীরে ডুব দিয়ে মানব সত্তার অর্থ খোঁজার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠা। এরাও সেই পরাবাস্তববাদীদের মতনই অবচেতনের গভীরে ডুব দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনের দিকে তাকালেন। তবে পূর্ণভাবে ব্যক্তি অস্তিত্বকে ভাসিয়ে দিয়ে নয়। অনেকটাই সচেতনভাবে। ১৯৬২ তে প্রকাশিত হল হাংরি জেনারেশনের বুলেটিন।

অন্যদিকে আবার গড়ে উঠলো 'শ্রুতি' এবং 'ঈগল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলন পরিচিত হল শ্রুতি আন্দোলন হিসেবে। এঁরা চাইলেন শব্দের দ্বিমাত্রিকতা। শ্রুতি এবং দৃষ্টির সামঞ্জস্য বিধান। পাশ্চাত্যের কংক্রিট কবিতার প্রতি অনুরাগ। শব্দের দৃষ্টিগ্রাহ্য একটি সম্ভবনাকে খুলে দেওয়া।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'শ্রুতি' পত্রিকাটি। এই পত্রিকা থেকেই শুরু হয়েছিলো শ্রুতির মতন আন্দোলন। এর মূল কারিগর ছিলেলেন পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মন্ডল, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল বসুচৌধুরী। যুক্ত ছিলেন অনন্ত দাশ। যদিও রচনা ধর্মে তিনি আলাদা। পরবর্তী সময় 'ঈগল' বের হল। অশোক চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত করলেন।

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'কবিপত্র' প্রকাশ পেলো ১৯৬৭-তে। সূচনা হল ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন। আমরা এই ষাটের দশকে যে কবিতা আন্দোলনগুলি দেখেছি তার নাম এবং কবিদের একটি সূত্রে যদি গেঁথে দেবার চেষ্টা করি তবে বলা যায়—

১. হাংরি কবিতা আন্দোলন—মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুবো আচার্য, দেবী রায়, ফাল্গুনী রায়।

২. শ্রুতি কবিতা আন্দোলন—পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মন্ডল, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল বসুচৌধুরী, অশোক চট্টোপাধ্যায়।

৩. সমাজমনস্ক কবিতা এবং রাজনৈতিক কবিতা—মণিভূষণ ভট্টাচার্য, রবীন সুর, তুলসী মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ, আনন্দ ঘোষহাজরা, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব দেব, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীতীশ দেব সিকদার, অনন্ত দাশ।

৪. তত্ত্বপ্রধান কবিতা—সামসুল হক, গীতা চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়।

৫. অন্তর্মুখী কবিতা—রত্নেশ্বর হাজরা, কবিরুল ইসলাম, আশিস সান্যাল, কালীকৃষ্ণ গুহ, শান্তনু দাস, শামসের আনোয়ার, কেদার ভাদুড়ী, উত্তম দাশ, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় সেন, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, দেবারতি মিত্র, বিনোদ বেরা, অতিন্দ্রিয় পাঠক, ভাস্কর চক্রবর্তী, দীপালি রায়, শম্ভু রক্ষিত, রাণা চট্টোপাধ্যায়, শান্তি সিংহ, প্রত্যুষ ঘোষ।

৬. কবিতা বিরোধী কবিতা আন্দোলন—বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মানিক চক্রবর্তী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা এই আলোচনার প্রেক্ষিত থেকে ষাটের দশকের কবিতা এবং কবিদের যে ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। তার ভেতর থেকে একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম সময়ের বৃত্তটাকে। এরই প্রেক্ষিত থেকে কবিতা বিরোধী কবিতা লেখার প্রয়াসে মগ্ন কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে এনে একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখবো তাঁর কবিতার মনোবীজটাকে।

কবি, চলচ্চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (১৯৪৪-২০২১) জন্মেছিলেন পুরুলিয়ার লাল মাটির দেশে। তাঁর লেখা 'গভীর এরিয়েলে'(১৯৬৩), 'কফিন কিংবা সুটকেশ'(১৯৭২), 'হিমযুগ'(১৯৭৭), 'ছাতা কাহিনী'(১৯৮০) 'রোবটের গান(১৯৮৫), গ্রন্থগুলিতে বিস্ময়বোধ, তির্যকভাবনার বিস্তার, স্মৃতিচারণের সাবলীলতার আচ্ছন্ন প্রকাশে আমরা ক্রম মুগ্ধতার জগতে প্রবেশ করেছি। শব্দের উচ্চারণে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার কসরৎ যেন তাঁর কবিধর্মের বলিষ্ঠ একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন নিজের অবস্থান নিয়ে 'একদিন' নামের কবিতাটিতে তিনি যখন লেখেন—

'দ্যাখো চমকে উঠছে তোমার দাঁতের ভেতর নখ
এবার কি শীত নেমেছে আগের চেয়ে বেশী, কান পাতো
আমার হাড়ের ঠকঠক শব্দ শুনতে পাবে তুমি।'

কবিতার ভেতর সময়ের বিষণতা তাঁকে গ্রাস করেছিলো প্রবহমান সময় জুড়ে। বুদ্ধদেব

দাশগুপ্তর কবিতার ভেতর ডুব দিলে দেখা যায় কবি ক্রম বিষাদের ভূমিকে যেন চুম্বন করতে করতে এগিয়েছেন। সে বিষাদের আঁচল কবিতার শরীরে জড়িয়ে নষ্ট প্রেমের স্মৃতিকে ছুড়ে ছুঁড়ে আঁকছেন কবিতার দীর্ঘ ছবি। যেমন তাঁর 'রাজিয়া সুলতানা' কবিতাটির কথাই উল্লেখ করা যায় এ প্রসঙ্গে। সেখানে কবি লিখছেন—

'বয়স তোমাকে আমি খাটের তলায় রেখে আসি।
ওইখান থেকে ফের শুরু করো, ঠাকুমার ট্র্যাংক ভাঙো
দু'আনা পকেটে ভরে ছুটে মাঠ পার হও।'

কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছেলেবেলায় যে জাতপাত নির্ভর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার থেকে হৃদয়ের ভেতরে জন্মেছিল সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে এক তীব্র ঘৃণার প্রতিভাস। জাতপাতের দ্বন্দ্ব কবিকে ব্যথার সমুদ্রে নিয়ে গেছে বারে বারে। ভালোভাবে হৃদয়ের শুদ্ধতা নিয়ে বাঁচবার জন্য পৃথিবার শ্রেষ্ঠ খাদ্য যে আমাদের দেশেই পাওয়া যায় সেখান থেকে যখন উইলিয়াম তার স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে আকাশ পথে পাড়ি দেয়, তখন বোঝা যায় কবির হৃদয়—উড়োজাহাজের নোঙর কোন নদীর কিনারে ফেলতে চেয়ে লিখছেন—

'জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম
মেঘের ভিতর দিয়ে
উড়ে চলেছে উইলিয়াম
পেছনে তার বউ, ছেলে
দুই মেয়ে। হেসে
'সার' বলে চিৎকার করে ডানা নেড়ে
উইলিয়াম চলে গেল আগে।'

বোহেমিয়ান, নগর জটিলতায় ক্লিষ্ট প্রাণ, আত্মমগ্ন এবং বিষণতাবোধে আচ্ছন্ন বিরলপ্রজ কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। ব্যক্তিগত ও প্রাত্যহিক তুচ্ছ বিষয়কে তিনি শব্দে সাজিয়ে কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। চেষ্টা করেছেন সময়ের যন্ত্রণাকে বহুবিধ স্ফূরণ ও বিস্ফোরণ ঘটাতে। ফলে কবিতার বিরুদ্ধেই যেন এক অন্যধারার কবিতার তিনি জন্ম দেন।

জীবনের রূঢ় কঠোর বাস্তবতা, যুগের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং মধ্যবিত্ত জীবনের উপায়হীনতার মাঝে কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর লেখায় ফুটে উঠতে থাকে আমজাদ আলির সরোদে বোজে ওঠা দরবারি কানাড়ার বিষন্ন সুরের মতন নির্জনতা।

যেমন তাঁর 'ছাতাকাহিনী' নামের কবিতাটি। সেখানে কবি লিখছেন—

'ছাতা বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। একটা ছাতার পিঠে
ভর দিয়ে চলেছে আর-একটা ছাতা,

একটা ছাতার কাঁধে
হাত রেখে চলেছে আর-একটা ছাতা। বাসস্ট্যান্ডে
অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, অপেক্ষা ক'রে, আজও যখন
এলো না সেই ছাতা, ছোটো ছাতা রাগে হতাশায় অপমানে
মিলিয়ে গেলো আরো অনেক ছাতার ছাতার ভিড়ে। দূরে
মাথার ওপর আছে
অদ্ভুত, বিশাল সাদা ছাতা। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ
এলো ঘুরঘুট্টি মেঘ, জুড়ে বসলো
সেই শাদা ছাতার গায়ে। গিজগিজ ক'রে ছাতারা
দাঁড়িয়ে পড়লো
এক-একটা জায়গায়, দাঁত কিড়মিড় ক'রে একটা ছাতা
ছুটে এলো
আর-একটা ছাতার দিকে, একটা ছাতা টুটি চেপে ধরলো
অন্য-একটা ছাতার। সারাদিন ঘুরে, ঘুরে-ঘুরে, শেষ ছাতাও
বাড়ি ফিরছে এখন। অন্ধকার একটা কোণায় চুপচাপ
দাঁড়িয়ে আছে সে, আর
তার সমস্ত শরীর থেকে জল ঝরছে, জল ঝরছে, জল ঝরছে।'

আমরা এ কথা ভীষণ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি ষাটের দশকের কবিতায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত যেন ক্লৈব্য, হৃদয়হীনতা ও মনুষ্যত্বের অপস্মার থেকে এই দশকের কবিতাকে বাঁচিয়েছিলেন। সন্ত্রাসকালের বীর্য তাঁকে সেভাবে না ছুঁলেও, তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল সময়ের জ্বালা, সময়ের ঘৃণা, সময়ের কারুণ্য। তাঁর আবেগের সীমা আকাশের মতন বিস্তৃত। তাঁর কবিতার শরীরে সময়ের আর্ত চিৎকারের পরিবর্তে এসেছে যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের ক্ষুব্ধ উচ্চাচরণ। গভীর ক্ষতচিহ্নময় কালের ব্যথা। এক স্মার্ট, প্রতীক ও প্যাটার্নে অন্বিত। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতায় দ্রুত উত্তেজিত, খোলামেলা উদ্ভট চিত্রের উপস্থাপন পাঠককে প্রবহমান সময়ে ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেমন তিনি যখন লেখেন—

'হাড়হিম ছোট্ট ফোকরের ভেতর সেই বন্দুক শুয়ে থাকে সারারাত
সারারাত সমস্ত শহর জুড়ে ফ্যান ঘোরার ঘর-ঘর শব্দ শুনতে পায়
সেই বন্দুক, বন্দুকের ঘুম হয় না
জেগে জেগে সে শুধু স্বপ্ন দেখে হাজার হাজার বন্দুকের।
আর দিন যায়—
মাঝে মাঝে আলো পড়ে তার শরীরে, রাগে সে ঠিক রাখতে পারে না

সন্ত্রাসকালের বীর্য নয়, কবিতার শরীর জুড়ে সময়ের জ্বালা-ঘৃণা-কারুণ্য :
বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতা—পার্থ চট্টোপাধ্যায়

তার মাথা, ছায়ার দিকেই দেয় নল....
সমস্ত দিন কানের কাছে সে শুনতে পায় লাখ লাখ
কেন্নোর মতো মানুষ সপসপ ক'রে টানছে তাদের লালা। ভয়ে
নীল হয়ে ওঠে বন্দুকের বুক, দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বন্দুক
লজ্জা দুশ্চিন্তা ঘৃণার মধ্যে তবুও অপেক্ষা করে,
শুধুই অপেক্ষা করে আর শক্ত হয় ভেতরে ভেতরে।

বাংলা কাব্যে কবিতা-বিরোধী কবিতার বা অ্যান্টি-পয়েট্রির সূচনা সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের কবি বিনয় মজুমদারের হাতে। সেই ধারাকে পরবর্তী সময়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অন্যতম অশোক চট্টোপাধ্যায়। বলা যায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্তও সেই ধারাকে আরো ক'য়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ভেতর এক জাতীয় সমাজমনস্কতা প্রবহমান ছিলো যা চল্লিশের কবিতার শরীর থেকে যেন চুঁইয়ে আসা। শোষণ-পীড়ন, সমাজ-বাস্তবতা, আর্ত সমাজের শুশ্রুষা—এই সমস্তর বহু ব্যবহার আর সহানুভূতির উদ্রেককারী নয়, যদি তা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মতো হৃদয় থেকে জাত হয়।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতার প্রকাশ রীতিতে কবিতা-বিরোধী কবিতার একটি পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে স্বতস্ফূর্তভাবে। বস্তু আর দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনাই এই ধারার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে এগিয়ে চলেছে।

কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতা বর্ণময়। বহুমাত্রিক। তিনি সমাজকে নিয়ে ভেবেছেন, রাজনৈতিক আবহের উত্তাপকে ছুঁয়েছেন। অ-কবিতার ধারায় এনেছেন অভিনবত্ব। প্রথা ভেঙে কবিতায় এনেছেন সিনেমাটিক ফ্ল্যাস ব্যাকের মতন স্মৃতির তীব্র অ্যালবাম। তিনি বারে বারে তাঁর মগ্ন উচ্চারণ, আর ধ্বনি জগতকে বর্ণময় করার খেলায় তন্ময় হয়েছেন। যেমন আত্মমগ্ন কবিতা লিখেছেন, তেমনি সমাজবাস্তবতার কবিতাও এসেছে কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কলমে। সংস্কৃতির আত্ম-উৎস সন্ধানের মগ্নতাও তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। আধুনিক-উত্তর-আধুনিক কবিতার নানান স্তর-পরম্পরা বিমূর্ত হয়ে বাংলা কবিতার ইতিহাসে কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর বর্ণময় ও স্বতন্ত্র উচ্চারণ তাঁকে বাংলা কাব্য সাহিত্যে চিরকালের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলা যায়।

কাঙাল কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সোমা মুখার্জি

টিলার উপর থেকে যে শক্তিকে ডানা মেলে উড়তে দেখেছিলেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সেই অসাবধানী, বোহেমিয়ান কবিই প্রকৃত শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জীবনের লাগামছাড়া অভিযাত্রী তিনি। তাঁর কবিতার উত্তাল তরঙ্গে আমাদের নিদ্রিত সত্তা থরথর করে কেঁপে ওঠে। বাংলা কাব্যভূমিতে তিনি নতুন নিশান উড়িয়েছেন। কিংবদন্তি জীবন কিংবদন্তি কবিতা সৃষ্টি করেছে। কখনো তিনি পানপাত্রের মদিরতায় সিক্ত করেছেন শব্দাবলি, কখনোবা তর্জনী উঁচিয়ে শাসন করেছেন শব্দের প্রায়োগিক সংস্কারকে।

'তাঁর সম্পর্কে না চলে পূর্বাভাস, না চলে পরিমাপ।'

('তাঁরই সুবাদে আমি নীলকণ্ঠ' — বাদল বসু, প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায় — সম্পাদনা /গৌর শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, একুশ শতক, /সংস্করণ — ২০১৮, পৃষ্ঠা — ১৩৭।)

খেয়াল-খুশির কবি শক্তি। তাঁর শৈল্পিক মেধায় তিনি কবিতার তুলো উড়িয়েছেন। মন চাইলেই বেরিয়ে পড়তেন প্রকৃতির অনাবিল অকৃত্রিম পরিবেশে। জঙ্গলের চড়াই উৎরাই, বৃক্ষ-লতার সান্নিধ্যে শক্তি তন্ময় হয়ে থাকতেন। কখনো মৌন হয়ে দুচোখ ভরে দেখেছেন, বুক ভরে শ্বাস নিয়েছেন। পানকৌড়ির মতো চেতনায় ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন কবিতার ভাষা,—

"বৃষ্টি পড়ে রাত দুপুরে
আকাশে চাঁদ শায়া শুকোচ্ছে কি নরম জোছ্ছনা-আলোয়"

("আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি —শ্রেষ্ঠ কবিতা- শক্তি চট্টোপাধ্যায় দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা — ১১৭।)

বৃষ্টিভেজা জ্যোৎস্নার এমন পেলব রূপ অনবদ্য। কবি কখনো গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থেকেছেন গাছের মতো। সারা গায়ে মাখতে চেয়েছেন সবুজ,—

'গাছ তুলে আনো
বাগানে বসাও আমি দেখি
চোখ তো সবুজ চায় !
দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো, বাগানে বসাও।'

'আমি দেখি — শ্রেষ্ঠ কবিতা- শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা — ১৮৯।

আবার কখনো জলপ্রপাতে পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে তাঁর দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছে জল। কাঙালের মতো আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন প্রকৃতি — প্রেয়সীর কাছে,—

'ও গাছ আমাকে নাও, মুহূর্তের জন্যে হলে নাও
তোমার ভিতরে আমি ধীর বেড়ে-ওঠা দেখে আসি।'

('ও গাছ, আমাকে নাও, শ্রেষ্ঠ কবিতা — শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা — ১৬৪।)

শালের জঙ্গলে আষাঢ়ের বৃষ্টিতে স্নাত হয়েছেন শক্তি। শস্য ফুটলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখেছেন। শস্যের গন্ধে তাঁর মন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতি গাছের শাখা বিস্তারের মতো মনের ভিতরে ক্রমশ সঞ্চারিত হয়ে গেছে। কষ্ট হয়,—

'তার ভিতরে কাঁদে বর্ণচোরা শিশু'

('কষ্ট হয়'- শ্রেষ্ঠ কবিতা-শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১১৮।)

কবি শক্তির উদাত্ত কণ্ঠে তাই শোনা যায়,—

'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'

('স্বরবিতান-৪২, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪২২ পৃষ্ঠা-১১১।)

এ অপেক্ষা এ কাঙালপনা কীসের জন্য! এক হাতের মুষ্ঠিতে তার দুঃখ থাকে বদ্ধ, আরেক হাতের করতল প্রসারিত, সে হাতে তার ভালোবাসার কাঙালপনা,

'আমার কাছে আসতে বলো
একটু ভালোবাসতে বলো
বাহিরে নয় বাহিরে নয়
ভিতরে জলে ভাসতে বলো—
আমায় ভালোবাসতে বলো।
ভীষণ ভালোবাসতে বলো।'

('ছিন্নবিচ্ছিন্ন ৫৪', শ্রেষ্ঠকবিতা, দে'জ, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৩৩।)

এমনভাবে নিঃস্ব হয়ে ক'জন চাইতে পারে ভালোবাসা! ভালোবাসা পেলে যে কবি সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে যেতে পারেন, সেই শক্তি আমাদের বড়ো চেনা। কিন্তু এ শক্তি যে বড়ো শান্ত সংযত। এ শক্তি ভালোবাসার জন্য উঠোনে পিঁড়ি পেতে অপেক্ষা করে থাকেন অনন্তকাল। ব্যক্তিগত জীবনে সহধর্মিণী মিনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সত্যই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়। কিন্তু কাব্য জীবনে ভালোবাসার এমন কাঙালপনা---এ তো কবির অতৃপ্ত, তৃষ্ণার্ত হৃদয়েরই দ্যোতক, যা না থাকলে কাব্যে সুগন্ধ ওঠে না, 'ভারি ব্যাপক বৃষ্টি' নামে না কবিতার শরীর জুড়ে।

সবাই যেভাবে ভাঙে, ঠিক সেভাবে নয়, পরম যত্নে শক্তি ভেঙেছেন শব্দের বাঁধন। শব্দের ভিতরে যা ছিল তাকে বাইরে এনেছেন, নতুন শব্দজাল নির্মাণ করেছেন। বহু গ্রাম্য অনভিজাত তথা আঞ্চলিক, ইতর, অশিষ্ট শব্দ ভিক্ষা করেছেন তিনি। যেমন, আদুল, নুলো,

ঢপের কীর্তন, গোদা, আউরে, বিলোই, বোঁচকা, আকখুটে, ন্যাকড়া, ডাগর, পিমড়ে, কুতকুতে, নেওটা প্রভৃতি। অশালীন শব্দ চয়নে এবং বিদেশি শব্দের ব্যবহারেও তিনি ছিলেন সার্থক শিল্পী। প্রথাসিদ্ধ ছন্দের গড়ন ভেঙে নতুন রূপ দান, চিহ্ন, সংকেত, উপমা, চিত্রকল্প, অলঙ্কারের পারিপাট্যে তার কবিতার অঙ্গসজ্জা হয়ে উঠেছিল অনবদ্য। বাধা গত ভাঙার এ খেয়ালীপনা, শব্দ ভিক্ষা এ সবই তো তাঁর বাংলা কাব্য-সম্ভারকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যই। কিন্তু শক্তি শুধু দুহাত পেতে চাননি।

'আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে'

('যেতে যেতে', শ্রেষ্ঠ কবিতা — শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ, ২০১৪,পৃষ্ঠা-৪৬।)

তেমনভাবেই কাঙাল কবি সব ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছেন। না পাওয়ার রিক্ততায় তাঁর মনে হয়েছে এ জন্মের ক্ষেত্রটাই একেবারে বরবাদ হয়ে গেছে। তাই তিনি শ্মশান চিতার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেন,-

'ও চিরপ্রণম্য অগ্নি / আমাকে পোড়াও'

('ও চিরপ্রণম্য অগ্নি', শ্রেষ্ঠ কবিতা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দে'জ ২০১৪,পৃষ্ঠা-২৩২।)

শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসের দোতলার উনিশ নম্বর ঘর থেকে চিরনিদ্রায় শায়িত শক্তি যখন তুষার শয্যায় শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতা মহানগরীর দিকে যাত্রা করেছিলেন তখনও কি কাঙালের মতোই নিঃস্ব ছিলেন তিনি! তা নিশ্চয়ই নয়। তার কবিতাপ্রেমী অগুনতি পাঠক হৃদয় সিক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর শূন্যতায়। যথার্থ কবি-জীবন কাটিয়েছেন শক্তি। আজও পাঠক হৃদয়ে তাঁর স্থান অম্লান। জীবনানন্দ—সুভাষ—নীরেন্দ্রনাথ পরবর্তী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম, যিনি পাঠকের দুয়োরে ঘা মেরে তাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। এমন কবি কি কাঙাল হতে পারেন!

আকর গ্রন্থ—শক্তি চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ, সংস্করণ - ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থ — প্রসঙ্গঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনাঃ গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, একুশ শতক, বইমেলা ২০১৮।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা : চিরনিঃশব্দ চিহ্নহীন এক অনিঃশেষ উপসংহার

বিক্রম দাস

"লেখাই যাদের কাজ, পুরোদস্তুর লেখক যারা আমি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে পড়ি না। আমার বেশিটা সময় যে কাজে ব্যয় হয়েছে তা অভিনয় করা। সেই কাজটা যে পরিবেশে অধিকাংশ সময়ে করতে হয় সেখানে লেখার মতো মানসিক অবস্থা তৈরি হওয়াই মুশকিল।

কোনো একটা মুহূর্তে হয়তো একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল। আমার মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া হল। কিংবা ভাবনার মধ্যে একটা ছন্দময় কি চিত্রময় লাইন ভেসে এল, অথবা শুধুমাত্র একটা শব্দের ঝংকার। তার গুঞ্জরণ চলতে লাগল কাজকর্ম দিনযাপনের আড়ালে। পরে কোনো অবকাশের বেলায় নিবিষ্ট হয়ে সেইটাকে একটা পদ্যের আকৃতি দিতে পারলাম।"[১]

নিজের কবিতা বা পদ্য লেখার প্রসঙ্গে এই কথাগুলিই একবার বলেছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি যে পুরোদস্তুর লেখক বা কবি নন এবং নিজের অভিনয়ের ব্যস্ততার কারণেই যে তিনি কবিতা চর্চার প্রতি বা নিজের লেখালেখির প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারতেন না, তাও এই উদ্ধৃত মন্তব্যটি থেকে স্পষ্টতই বুঝে নেওয়া যায়। কিন্তু একজন পুরোদস্তুর অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে নিজের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার দুর্বার প্রকাশ তাড়নায় নিজের অন্তরেই প্রতিনিয়ত সহ্য করতেন আরেক প্রস্থ দহন, সেই আতপ্ত আবেগের দহনেই তিনি একজন কবিও। চলচ্চিত্র ও নাট্যমঞ্চে নিপুণ দক্ষতা ও দাপটের সঙ্গে অভিনয় যেমন করেছেন, তেমনই নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের প্রয়োজনে লিখেছেন প্রচুর নাটক, একই সঙ্গে তিনি সারাজীবন ধরে লিখেছেন প্রচুর কবিতা। কবিতা ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম, যেখানে তিনি নিজের অভিনেতাসত্তার আবরণ খুলে ফেলে প'রে নিতেন ব্যক্তি মানুষের রক্ত-মাংসের প্রাণময় পরিধান। কবি জয় গোস্বামীকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সৌমিত্রবাবু এই প্রসঙ্গেই বলেছিলেন

"অভিনয়ের সময় অভিনয়ে চরিত্রটির আড়ালে নিজেকে লুকোতে চাই আমি। যেন সেই চরিত্রটি আমার ঢাকনা, অন্তরাল। আর কবিতা লেখার সময় নিজেকে উন্মোচন করি আমি। নিজেকে খুলে দিই। যতটা পারি ভেঙে দিতে চাই আড়াল, কবিতা লেখা তাই আমার মুক্তি।"[২]

এই মুক্তির সন্ধানেই তাঁর আজীবন কবিতা-যাপন। নিজের কবিতা লেখার সূত্রপাত সম্পর্কেও তিনি বিভিন্ন সময় স্মৃতিচারণ করেছেন। এখানে তাঁর 'কবিতাসমগ্র'-র ভূমিকা থেকে সেই রকমই একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধার করা হল :

"আমি যতদূর জানি কোনো বড় ভাব বা আদর্শের প্রভাবে আমার লেখা শুরু হয়নি। ইস্কুল জীবনেই বাংলার মফস্বলের সঙ্গে বসবাসের ও ভ্রমণের সুবাদে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচয়ের সুযোগ ঘটে থাকলেও তার মুগ্ধতা ছিল মনের অন্তরালে তার আবেগ থেকে রাশি রাশি কবিতা লিখে ফেলার উচ্ছ্বাস কবিতার সেই প্রথম দিনগুলোয় বোধহয় প্রত্যক্ষ হয়নি।

আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম কৈশোরের নতুন জন্মানো প্রেমাকাঙ্ক্ষার আন্দোলনে। তাই প্রেমের আনন্দ বেদনা ব্যর্থতা চরিতার্থতাই বোধহয় আমার সমস্ত জীবনভর কবিতার সব থেকে দীর্ঘস্থায়ী স্রোত হয়ে থেকে গেছে।

পরবর্তীকালে অবশ্য একটু একটু ক'রে প্রকৃতি, সমাজ, বেঁচে থাকার অপরিহার্য অভিজ্ঞতাগুলি কবিতার মধ্যে একটু একটু ক'রে ফুটে উঠতে আরম্ভ হল।

ইস্কুল থেকে কলেজে আসতেই কবিতার অনেকগুলো জানলা যেন খুলে গেল। ভিন্ন ভিন্ন রচনাশৈলীর সঙ্গে দ্রুত পরিচয় ঘটতে লাগল। জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু। কলেজ জীবনে একজন জ্যেষ্ঠের দ্বিমুখী উপদেশ খুব কাজে দিয়েছিল। একদিকে 'not a day without a line' তাই কবিতার হাওয়া মনের মধ্যে বইল কি না বইল পরোয়া না ক'রে রোজ যা হোক কিছু লিখতাম। উপদেশের আর এক দিকের ফলাটা ছিল 'যা লিখলে তা যথাশীঘ্র ভুলে যেও, না হলে পরের কবিতাটা আর লিখতে পারবে না।' ফলে নিজের কবিতার প্রেমে পড়ার বিপদ থেকে মুক্ত ছিলাম। এই অভ্যাসের ফলে আমার নিজের কবিতার একটিও আজ অবধি আমার মুখস্ত থাকে না।

এই অভ্যাসের প্রভাবেই কবিতার বই প্রস্তুত করতে দীর্ঘকাল আমার অনীহা ছিল। বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিন্তু আমাকে উপদেশ দিত বই প্রকাশের জন্য। বলত 'বই না প্রকাশ করলে তুমি নতুন বাঁক নিতে পারবে না।' সে একদিন একজন প্রকাশককে আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, 'আমি এঁদের জুটিয়ে আনিনি, এঁরাই তোমার কবিতার বই প্রকাশ করতে চান বলে তোমার কাছে নিয়ে আসতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। এর পরে আর তোমার না বলাটা ঠিক হবে না। সেই থেকে কবিতার বই প্রকাশ শুরু হল।"[৩]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে যেমন একদিকে কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা চর্চার উৎস, প্রণোদনা ও তাঁর কবিতার প্রবণতা সম্পর্কে জানা যায়, তেমনই অন্যদিকে কবিতা চর্চার প্রথম পর্যায়ে নিজের কবিতা প্রকাশের সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা ও দ্বিধা-মুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ বন্ধু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণার বিষয়টিও দৃষ্টিগোচর হয়। সৌমিত্রবাবুর নিজের কবিসত্তা সম্পর্কে এই দ্বিধা ও তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় কী মনে করতেন? একটি স্মৃতিচারণায় তিনি নিজেই জানিয়েছেন সে কথা—

"আমার পদ্য লেখা পরিমাণে বেড়েছে। বইপত্তর কয়েকটা। মোটামুটি রুটিভাজার একটা চাকরি জোগাড় হয়েছে আনন্দবাজারে। পুলুকে প্রায় জোর করেই কৃত্তিবাসের কবিপঙক্তিতে বসানো হল। পদ্যর ব্যাপারে তার ভীষণ লজ্জা। বিশেষ করে যখন বলে অন্য জগতের লোক! জগৎ তো একটিই আমাদের, তা হল লেখার জগৎ। আমি মনে করি, আসলে ও লেখারই লোক, কবি। আর চলচ্চিত্র ওর দ্বিতীয় প্রেম।"[৪]

কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পাঁচের দশকের কবি। তিনি শক্তি-সুনীল ইত্যাদি 'কৃত্তিবাসী'দের বন্ধু, সমসাময়িক। পাঁচের দশকের বাংলা কবিতা বহুমুখী ও অবশ্যই বৈচিত্র্যময়, সেই বহুমুখী বিচিত্র কাব্যপরিসরেও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্বকীয় কবিপ্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত।

পাঁচের দশকের কবিতায় সমাজ ও প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অধিকাংশ কবি যেমন ফিরে তাকিয়েছিলেন নিজের অন্তরক্ষেত্রে; স্বাধীনতা-পরবর্তী সমাজ ও বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ তীব্র অভিমানী কবিমন সেই সময় কখনও আত্মসমীক্ষায়-আত্মসমালোচনায় যেমন প্রবৃত্ত হয়েছিল, তেমনই কখনও বা সেই অন্তরগত 'আমি'কেই স্বীকারোক্তির স্বগত-আলাপে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এক নিবিড় আত্মমগ্নতা গ্রাস করেছিল সমকালীন অধিকাংশ কবিকেই। কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাও সেই আত্মমগ্ন উচ্চারণে কখনও স্মিত, কখনও হয়তো কিছুটা উচ্চকিত। শৈশব থেকে পারিবারিক পরিবেশে কবিতা শোনা ও কবিতা পাঠ-আবৃত্তির সূত্রেই সৌমিত্রবাবুর কবিতা লেখার সূচনা। সৌমিত্রবাবুর কবিতার প্রথম পর্বে অর্থাৎ সেই চার ও পাঁচের দশকের বৈপ্লবিক কাব্য-পরিমণ্ডলেও রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের প্রভাব যেমন ছিল, তেমনই ছিল জীবনানন্দ-সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অগ্রজ কবিদের প্রভাবও। আরো পরবর্তী সময়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সর্বগ্রাসী কবিতাও তাঁকে নতুনতর কবিতার চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল।[৫] কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তাঁর অনীহা ও দ্বিধার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সাতের দশকের মধ্যভাগে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে'। তারপর থেকে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি। যেমন 'ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা' (১৯৭৬ খ্রি.), 'শব্দরা আমার বাগানে' (১৩৮৮ বঙ্গাব্দ), 'পড়ে আছে চন্দনের চিতা' (১৩৯০ বঙ্গাব্দ), 'হায় চিরজল' (১৯৯২ খ্রি.), 'পদ্মবীজের মালা' (১৯৯৯ খ্রি.), 'হে সায়ংকাল' (১৯৯৫ খ্রি.), 'জন্ম যায় জন্ম যাবে' (১৯৯৮ খ্রি.), 'ধারাবাহিক তোমার জলে' (২০০১ খ্রি.), 'যা বাকি রইল' (২০০৩ খ্রি.), 'হলুদ রোদ্দুর' (২০১০ খ্রি.), 'মধ্যরাতের সংকেত' (২০১২ খ্রি.), 'ক্যালাইডোস্কোপ' (২০১৫ খ্রি.), 'স্বেচ্ছাবন্দী আশার কুহকে' (২০১৭ খ্রি.), 'ছবি ও ছায়া' (২০১৯ খ্রি.), 'অন্তমিল' (২০১৯ খ্রি.), 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' (২০১৯ খ্রি.)। এছাড়াও ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হয়। এরপর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'কবিতাসমগ্র'।

দুই

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান অবলম্বন প্রেম, প্রকৃতি, সমাজ ও যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা। তবুও প্রেম ও প্রকৃতিই তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত 'চিরজল'। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন

"পায়ের চিহ্নগুলি দেখতে দেখতে এতদিন পরে নিজের অভিব্যক্তির যদি একটা কোনো অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস খুঁজে পাই, সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই কিছু কবিতা এই বইতে গ্রন্থনা করেছি। এককভাবে এক-একটি কবিতার আস্বাদের থেকে বরং সমস্ত গ্রন্থটির মধ্যে একটি ধারাবাহিক ভাবনার পরিচয় থাক, এই অভিপ্রায় নিয়েই কবিতাগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।"[৬]

কবিমানসের এই কাব্য-যাত্রার 'অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসে'র অনুসন্ধানে স্মৃতিকাতর কবি তাই আট পর্বের এই গ্রন্থের শুরুতেই 'নস্টালজিয়া' পর্বের প্রথম কবিতায় বলেছিলেন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

"শব্দহীন গান শোনে আজও জোনাকির ভিড়ে মহানিম
গ্রামাঞ্চলে অন্ধকার দীর্ঘ মাঠে পৌষের হিম
আমার শৈশব আমি ভুলব না
মুঠিতে শুকানো শিশির আমি তবু মুঠি খুলব না,

একি আবদার সময়ের কাছে।
জিয়লের গাছে
ম্লানতর ক্রমশ রোদ্দুর
কেন ভুলি বয়েস বেড়েছে ঢের ব্যথা ক্লান্তি সমর প্রচুর
মারমুখী এ শহর আকাঙ্ক্ষায় ক্লিষ্ট নীলাকাশ
কেন ভুলে যাই সময় করেছে চুরি শৈশব তুরুপের তাস।"[৭]

এই আত্মমগ্ন স্মৃতিময়তাই কবির বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'মারমুখী' নগর জীবনের 'ব্যথা ক্লান্তি সমরে'র প্রাচুর্য্যের কারণে ক্রমশ ক্লিষ্ট হয়েছে। তাই কবি দু'হাত বাড়িয়ে অকাতরে গ্রহণ করতে চেয়েছেন ভালোবাসাকে, অক্লেশে বলেছেন "আমি বড় ভালোবাসার কাঙাল।" এবং সেই ভালোবাসার সন্ধানেই তিনি হেঁটে চলেছেন প্রকৃতির নিবিড় গভীরতায়—

"জলপ্রপাতের ধারে একবার মাত্র আমি দাঁড়াব মনস্থ ক'রে আমি হাঁটছিলাম সেই কতদূর বেলা থেকে আমি হাঁটছিলাম, পায়ে চষা খেত ধুলো রয়ে গেল, পথ গড়াতে গড়াতে মাঠ, মাঠ গড়াতে গড়াতে পাহাড়, জঙ্গল কাঁপতে লাগল সমস্ত দিন শুধু জলপ্রপাতের ধারে একবার মাত্র দাঁড়াব ব'লে আমি হাঁটছিলাম।

ভারতবর্ষে সেই সমস্ত কাতর বিকেল এবং পৌষে উজ্জ্বল মাঠ সেখানে ভালোবাসা এখনও ভুলি না তারা আর কতদিন?"[৮]

এই প্রেম-ভালোবাসা ও প্রকৃতিলগ্নতার অনিঃশেষ যাত্রাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিজীবনের পরিণতি। তাঁর কবিতায় ভালোবাসা ও প্রকৃতি হাত ধরাধরি করে রয়েছে। ভালোবাসার সূত্রেই তাঁর কবিতায় এসেছে মানুষ ও সমাজ-প্রসঙ্গ এবং যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার নদীজলময় স্মৃতি। তাঁর ভালোবাসায় মিশে গেছে নিসর্গ এবং সেই নিসর্গের আশ্রয়েই তাঁর ব্যাপ্তি ও মুক্তি। 'ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা' গ্রন্থের নাম-কবিতায় অকপটে ভালোবাসা সম্পর্কে কবি বলেছেন,

"ভালোবাসা মানে কেবলই যাওয়া
যেখানেই থাকি না কেন
উঠে পড়া
পেয়ে গেলে নিকটতম যান"[৯]

ভালোবাসা সম্পর্কে এই নিরাবেগ আসক্তি থেকেই তিনি এক ধরনের আশ্চর্য নাগরিক সপ্রতিভতায় লিখেছেন—

"ভালোবাসা বহুদিন আগেই
বাসে উঠে পড়তে না পেরে
দাঁড়িয়ে গেছে"[১০]

এই ভালোবাসাই তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে শব্দের বাগানে কবিতার কাছাকাছি। তাই অক্লেশে তিনি বলতে পেরেছেন—

"বাগানে রাশি রাশি শব্দরা রয়েছে
এরই মধ্যে প্রেমকে খুঁজে পাচ্ছি না
বল্মীকের মধ্যেও কি সে থাকবে খুঁজব?"[১১]

এই প্রেম-প্রণয়ের সন্ধানে রত কবি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন "স্বতোৎসার থেকে শৃঙ্খলায় যাওয়া আসা করাটাও / খুব স্বাভাবিক কাজ প্রণয়ের / প্রেম যাতায়াত করিতেই থাকে / নিত্য যাত্রীর ক্লেশ ভোগান্তি ও বিরক্তি সত্ত্বেও / প্রেম গমনাগমন করিতেই থাকে / প্রতিদিন চিরদিন / প্রথম উৎসার থেকে শৃঙ্খলার মাঝে গিয়ে পড়ে / অনেক অনেক সব কাজ ক'রে / দায়দায়িত্ব সেরে সে প্রচুর সুখ পায়"।[১২] আবার 'পদ্মবীজের মালা' গ্রন্থের '৬০' চিহ্নিত কবিতায় কবি তাই বলেন "বেলা যেমন নিভু নিভু তেমনই প্রত্যাশা / শুধু কেবল নিভতে চায় না ভোরের ভালোবাসা / ভালোবাসার নাম ধরে কে ডাকল সেই ভোরে / সে ডাক শুনি বেলাশেষের প্রচ্ছায়া মর্মরে।"[১৩] এই ভালোবাসাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে, এই ভালোবাসার ডাকেই 'বিচ্ছিন্ন একাকী' কবি প্রেমের স্বরূপ অন্তরে উপলব্ধি ক'রেই যেন প্রশ্নময় জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেন তাঁর পাঠকদের প্রতি "প্রেম প্রকৃতই এক / চিরপ্রতীক্ষা কি?"[১৪]

তিন

প্রেমই ব্যাপ্ত হয়ে সর্ববাহিত ভালোবাসায় শব্দ-কোরক রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে কবিকে পৌঁছে দিয়েছে ধূলি-মাটির মানুষের কাছে। কবি নিজস্ব জীবনোপলব্ধির তন্ময়তায় বলেন,

"ভারতবর্ষের পথে আমি শব্দকে দেখে এলাম
হাসি-কান্না শোকের সজল মুহূর্ত
সামান্য অধিকার নিয়ে দিনভোর লড়াই
সারাদিন পথ হাঁটবার পরে আমি বুঝতে পারি
শব্দের ভিতরেই
আশাকাতরতা নির্ভরতা হাহাকার দারুণ লড়াই রয়ে গেছে
এত স্বেদবিন্দু অশ্রুর ফোঁটা
এই প্রসঙ্গেই উৎপাদন শব্দটা
আমার মনে পড়ল
রোমাঞ্চকর ভবিষ্যৎ যেন ওই কথার মধ্যে ছটফট করছে।"[১৫]

এই মানুষের প্রতি সমবেদনা থেকেই কবি সৌমিত্র তাকিয়েছেন সমাজের ক্ষত-দগ্ধ সমকালীন বাস্তবের দিকে। দেখেছিলেন "শব ছুঁয়ে বসে আছে কেউ / চলে গেছে শ্মশানের

মিতা / আগুনের ভালোবাসা চেয়ে / পড়ে আছে চন্দনের চিতা / কতদিন এইভাবে যাবে / শবের উপরে রেখে জানু / অহল্যা পাথর কবে পাবে / বারুদের ক্রুদ্ধ পরমাণু"।[১৬] মনে পড়ে যাবে ১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে ভারতের প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণের ('অপারেশন স্মাইলিং বুদ্ধ') কথা। সেই পোড়া সময়কালেই কবির কাছে সময়ের পোড়া গন্ধ বাতাসে ভেসে এসেছে 'বাতাস খবর দিচ্ছে / চন্দনে কেউ পুড়িয়ে এল ভালোবাসার ইচ্ছে।' এই দগ্ধ ও বিদ্ধ ভালোবাসার প্রসঙ্গেই স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের দেশভাগ ও দেশত্যাগ এবং ১৯৭১ সালের দেশত্যাগ নিয়ে কবি লিখেছিলেন "ঘর ছেড়েছে কবেই মানুষ / দু'দিকে দুই দেশ / কাঁটাতারই সাক্ষী তবে / প্রেমের আশ্লেষ?"[১৭] এই সাতের দশকের গায়েই লেগে আছে নকশাল আন্দোলনের 'রক্তের দাগ', 'হাড় বজ্জাত' শহরে তাই কবিমনও খুঁজে নেয় 'ত্রস্ত অন্তরাল'। একটা পলায়নপর মনোবৃত্তি কবিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কবি নিজেই কবি জয় গোস্বামীকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন

"আত্মগোপন, আত্মআড়াল করার প্রবণতা বোধহয় আমার নিজের ভিতরও আছে। অনেক রকম মিশ্র অনুভূতির জন্য বোধহয় একটা আড়ালের দরকার পড়ে। একটা পাপবোধের ব্যাপারও নানা কারণে মানুষের মনের মধ্যে কাজ করে। সে-সবের থেকে বাঁচার জন্যও এই আড়াল।"[১৮]

এক ভঙ্গুর দুঃস্বপ্নময় কালে কবি শুনেছেন—

"মিছিলের মধ্যে সমুদ্রগর্জন শপথের কঠিন ব্যারিকেড
অগ্নিনির্বাপক সংকেতের আড়ালে মুখ ঢেকে
ঝলসে ওঠে বন্দুকের নল

দুঃস্বপ্নের এই জায়গাটাতে এসে
আমার কণ্ঠরোধ হ'ল
আমি চোখে মুখে জল দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই
পথিকহীন পথ আর স্বপ্নাবিষ্ট ছাউনির ওপর
শ্রাবণের রাত থমথম করছে

একসময় বিষণ্ণ হাড়ের মত সাদা হ'তে আরম্ভ করবে আকাশ
পথ জুড়ে স্বপ্নহারা জনতা"[১৯]

আট ও নয়ের দশকের গোড়ায় যুদ্ধ-ত্রস্ত সমকালে দাঁড়িয়ে কবির 'এক এক দিন চা খেতে খেতে মনে হয় / জন্মভূমির যুদ্ধ আমার দরজায় এসে গেছে'। এই সময়কালেই বাবরি মসজিদ ধ্বংস, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, নয়ের দশকের শেষভাগে পুনরায় পোখরানে ভারতের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কার্গিল যুদ্ধ, পরবর্তী সময়ে ইরাকের যুদ্ধ এই সব কিছুই ছায়া ফেলেছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। তাই খুব সহজেই কবি সময়ের রক্তঝরা ছবিটিকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য আর্তস্বরে বলেন "নিউজপ্রিন্টের থেকে / ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝ'রে পড়তেই / ফ্ল্যাশব্যাক শুরু হয়ে যায় / ব্যাপক মৃত্যুর হার থেকে /

লোকালয়গুলো ক্রমে চিনতে পারি"।[২০] এই সমাজমনস্কতাই তাঁকে নিয়ে গিয়েছে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের মিছিলে। একজন 'সাধারণ লোক' হয়ে ফুটপাতে ইঁটের উনুনে গরম ভাতের গন্ধকে তাই অনায়াসেই তিনি তুলে এনেছেন। দেখেছেন "কত ঘৃণা এবং চাতুরি মানুষে সক্রিয় আজ, / ক্রূর অকরুণ কতখানি হতে পারে মানুষেরা / মানুষের জুলুমে মানুষ কত প্রাপ্তক্লেশ?"[২১] একইভাবে 'হে সায়ংকাল' কাব্যের 'মানুষেরই কাছে ঠ'কে' কবিতায় তিনি এই নাগরিক জীবনের জটিলতায় 'ক্ষয়হীন শোকে' ভুগে উপলব্ধি করেছেন 'একটি মানুষ হায়, মানুষেরই কাছে গেছে ঠ'কে'। তারপরেও কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এসে ভিড় করেছে ভু-পর্যটক, ভ্রমণকারী মানুষ, পথের বাউল, ভিখারি, অন্ধ কিন্নর, রাজমিস্ত্রি, পথে খেলা দেখানো ম্যাজিশিয়ান, ভোরবেলায় সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি দুধ পৌঁছে দেওয়া ছেলেটা। এদের নিয়েই তাঁর কবিতার অঙ্গীকার। তবুও যেন শেষ হয় না পথচলা। শহুরে যান্ত্রিক মানুষের ভিড়ে ক্লান্ত কবিপ্রাণ বাধ্য হয়ে বলে ওঠে "সত্যি ভূতের গল্প বলি এসো। / মানুষই তো ছিল এরা সব / স্নেহ প্রেম সুখ দুঃখ শোক তাপ ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে / মানুষেরা যেমন থাকে ইহ সংসারে / মৃত্যুর আগেই ম'রে ভূত হয়ে গেছে / প্রেত সংসারে বাস বহুকাল হ'ল তো আমার / এবং জানো কি / আমিও তো প্রেত? / মরে গেছি বহুকাল আগে"।[২২] কিন্তু কবি আশাবাদী, তাই তিনি তাঁর চিরজাগ্রত বামপন্থী মননে নিরন্তর লালন করেন সমাজ-বদলের স্বপ্ন :

"খাতাকলম না থাকলে
অর্থনীতির শাসনকে কাঁধে নিয়ে
বামনের মতো আমাকে দিনাতিপাত করতে হয়
খাতা কলমে
আমি এই আধপচা ভেপসে ওঠা সমাজটাকে
বদলে ফেলতে পারি
তখন আমার মাথা আকাশ ছোঁয়

খাতা কলম হাতে থাকলে
আমি এমনকী
আর একবার
সেই প্রেমকে অবয়ব দান করতে পারি
যা নাকি কবেই
জ্বলন্ত কর্পূরের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে"[২৩]

চার

সমাজভাবনার প্রেত-কুহক জর্জরিত প্রেক্ষিতে কবির আশা কিন্তু স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে খাতায় কলমেই জিইয়ে থাকে। সমাজের ঘুণ-ধরা বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসা অন্ধকার গ্রাস করে কবিমনকে। জীবনকে দেখার সূত্রে উপলব্ধির গভীরতায় কবি কখনও দুঃখ পেয়েছেন,

কখনও বা হয়তো বিষণ্ণতা কালো মেঘের মতো ছেয়ে ফেলেছে কবির মনকে। সেখান থেকেই মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়েছে কখনো-কখনো সৌমিত্রবাবুর কবিতার আনাচে-কানাচে। মঞ্চের অভিনেতাসত্তাই যে তাঁর কবিসত্তাকে গ্রাস করেছিল, সেই আক্ষেপেই কবি লিখেছিলেন

"সাজঘরে কোনো সংলাপ নেই
স্বগত বিলাপ প্রভৃতি সব চুপ

আস্ফালন নেই
মুখভাব ভ্রূবিলাস কিছু নেই।

সমবৎসর মঞ্চ থেকে চলে গেলে
দর্পণে মুখোমুখি দাঁড়াবার কাল এসে গেল।"[২৪]

এই দর্পণ কবির নিজের সঙ্গে নিজের একান্ত মুখোমুখি দাঁড়াবার, চিনে নেওয়ার দর্পণ। সেই দর্পণে কখনও ঝরে পড়ে দীর্ঘশ্বাস, কবি লেখেন "এসো একটা পদ্য তৈরি করা যাক / সেটাই আমার নিজস্ব শাঁখ / সকাল সন্ধ্যে ফুঁ দিয়ে ভরব। / এত রকমের পেশা আছে কোলকাতায় / এত রকমের গরীব / আমার পদ্যের কেবল একটাই আওয়াজ বাজছিল / দীর্ঘশ্বাসের স্বর / সমুদ্র শাঁখের মধ্যে থেকে যায়।"[২৫] 'শব্দরা আমার বাগানে' কাব্যের 'একদিন ক্লান্ত বোধ করব', 'অন্ধকারে দুঃখ এসে' ও 'এইখানে দুঃখ কেন' এই তিনটি কবিতায় কবির অবসাদ-বিষাদ সূর্যাস্তের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কবি স্বগত আলাপের ভঙ্গিতে লেখেন "একদিন এত ক্লান্ত বোধ করব যে / পপলারের পাশ দিয়ে সূর্যাস্ত হতে থাকবে / আমার দেখার ইচ্ছে থাকবে না / অবসাদ আমার চোখের পাতাকে ছুঁয়ে থাকবে। / পপলার পল্লবের বেশ কাছেই / পিকচার পোস্টকার্ডের সূর্যটা ডুববে / আমার দেখার ইচ্ছে থাকবে না / একদিন এত ক্লান্ত বোধ করব / একদিন খুব ক্লান্ত বোধ করব।"[২৬] 'হায় চিরজল' গ্রন্থের 'শূন্য বাড়ি', 'দুঃখ শেষ হ'ল কাল', 'করুণ পশম বোনো', 'একই ঠিকানা তবু', 'এভাবেই কেটে যাবে দিন', 'প্রতিদিন চিরদিন', 'হায় চিরজল' প্রভৃতি কবিতায় এসেছে যাপিত জীবনের নিরাশা, শূন্যতা, দুঃখের কালো ছায়া। ব্যস্ত যান্ত্রিক নাগরিক জীবন একটা অসুখের মতো বলে মনে করেছেন কবি। কবির কাছে সেই অসুখ অন্ধকারের মতো, এবং তাকে ঘিরে জমে ওঠে বিষাদ :

"অন্ধকারে বাস করতে করতে
বাস করতে করতে
বাস করতে করতে
মনে ভয় আসে
বিষাদ যে বড় অন্ধকার"[২৭]

এই বিষাদের অন্ধকারে থাকতে থাকতে আত্মপরিচয় লিখতে গিয়ে কবির শুধুই মনে হয়েছে 'এ জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে'। এই ভাবনা থেকেই কবির মনে মৃত্যুভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে "আমি সাড়ে তিনহাত জমি মাধুকরী / তুমি দ্বিধাহীন প্রীতিপরায়ণ হ'লে /

তার শান্তশীল অন্ধকারটুকু দিতে পারো / তাই দিও"।[২৮] 'জন্ম যায় জন্ম যাবে' কাব্যে এই বিষণ্ণতা, মৃত্যুচেতনা আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। 'তুমি বলো', 'অমীমাংসিত দুঃখে', 'এপিটাফ', 'অন্ধকার হঠাৎ ছুঁলে', 'দুঃখ ছিল বহুদিন', 'অতিশয় একা', 'স্মৃতিও কি নেই' ইত্যাদি কবিতায় বিচ্ছিন্নতা, বিষাদ ও মৃত্যু মিলেমিশে গেছে। 'যা বাকি রইল' কাব্যের 'এই সব সেলাই ফোঁড়াই কুরুশের কাজ' কবিতায় নিজস্ব উপলব্ধির প্রত্যয়ে বলেছেন 'জীবনে একমাত্র নিশ্চয়তা মৃত্যু'। কিংবা কখনও কবির উপলব্ধি "দুঃখের চেয়ে জীবনদায়ী কোনো / স্রোতস্বিনী পাওয়া যাবে না / দুঃখের চেয়ে সম্ভাবনাময়.."।[২৯] 'মধ্যরাতের সংকেত' কাব্যের 'বিষাদ, তোমাকে', 'শেষ শয়ানে' ইত্যাদি কবিতার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুঃখ, অবসাদ, বিষণ্ণতা ও মৃত্যুর হাতছানি থেকে বাঁচার জন্য কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফিরে তাকিয়েছেন প্রকৃতির মহান মৌনতার দিকে।

পাঁচ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রকৃতি-মগ্ন কবি। তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের নামেও প্রকৃতির নম্র স্পর্শ। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি-ভাবনার বিস্তার সম্পর্কে তিনিই জানিয়েছেন,

"আমি যে শহরে শৈশবের প্রথম দশ বছর অতিবাহিত করেছিলাম, সেটা খুব ছোটো শহর। দু-পা বাড়ালেই গ্রাম। নদী পেরিয়ে, ইস্কুল পালিয়ে, নৌকা চুরি করে ওপারের গ্রামে ঘুরতে যেতাম আমরা। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগাযোগটা তারপর আরও অনেকটা বাড়ল বাবা নতুন চাকুরি নেওয়ার সুবাদে। ইস্কুল বদল হতে লাগল আমাদের এবং একটা সময় দার্জিলিংয়ে একটা বছর ছিলাম। সেই সময় হিমালয় ও তার তরাই অঞ্চল আর ডুয়ার্সের বনভূমি প্রচুর ঘুরতাম। সেই একটা বছরে প্রকৃতি মনকে এমন করে গ্রাস করল যে ইস্কুলের লেখাপড়া থেকে মন অনেকটাই সরে গেল। তার পরে পরেই যখন কবিতা লিখতে শুরু করলাম তখন সেই মন-হরণ করা অভিজ্ঞতা কিছুটা কবিতা-ভাবনার মধ্যে তার শ্যামছায়া বিস্তার করেছিল।"[৩০]

এই বিস্তারের সূচনা সেই 'জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াবো ব'লে' কাব্য থেকেই। কখনও তিনি অনুভব করেছেন 'কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে ভারি অদ্ভুত তৃপ্তি', আবার কখনও মরুভূমির মরীচিকার মধ্যে খুঁজেছেন তাঁর তৃষ্ণার চরিতার্থতা। 'শব্দরা আমার বাগানে' কাব্যের 'নিসর্গের দূরত্ব' কবিতায় গ্রামীণ নিসর্গের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চেয়েছেন কবি। এই ভাবনা থেকেই কবি প্রকৃতির মধ্যেই নিজের দুঃখ যন্ত্রণাগুলিকেও খুঁজে দেখতে চেয়েছেন "ঘাসের মধ্যে পা ডুবে যাবে / ধানের মধ্যে চোখ / কার্তিকের ভোর নাকি ভিজে থাকে শিশিরের জলে / এইখানে দুঃখ কেন তবু / পার্পল আকাশের তলে? / এইখানে দুঃখ কেন তবু / ভূমিতৃষ্ণার স্বেদ লেগে আর্দ কেন কলমীর বন / মোভ ফুলগুলি কোনদিন / কেড়েছিল নাকি সর্বহারা কিশোরের মন?"[৩১] কবির কিশোর-বেলার স্মৃতিও এখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। 'পড়ে আছে চন্দনের চিতা' ও 'হায় চিরজল' কাব্য-পর্যায় থেকে তাঁর প্রকৃতিচেতনা আরো ঘনিষ্ঠ ও সংরাগময় হয়েছে। এই পর্যায় থেকে তাঁর কবিতায় পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও জল-নদী এতো বৈচিত্র্যময় রূপে ধরা দিয়েছে যে সেই সম্পর্কিত চিত্রকল্পগুলি অনেক সময়েই

কবিসত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। 'জলমগ্নের প্রতি' কবিতায় কবি অক্লেশে বলেন "হয়তো জলেরও কিছু কিছু দাবী আছে / পরাজিত হয়ে তুমি মানুষের কাছে / জলের নিকটে গিয়ে চেয়ে নিয়েছিলে / শীতলতা;"।[৩২] নিজের মনের অসুখকে নদীর সঙ্গে একাত্ম করে কবি তাই লেখেন "তীরকে ছোবল মারছে নদী / নদীই কি আশ্বস্ত আছে / তরুণ কিছু জিজ্ঞাসা আজ ছল ক'রে যায় জলের কাছে / মন থেকে কার মন সরেছে / বন থেকে কি বৃক্ষলতা পথভ্রান্ত / কখন সরে মরুর থেকে মরুচ্ছবি আদ্যোপান্ত / তীর থেকে কি তীর সরে যায় / বুভুক্ষু জল মৃত্তিকাভুক / নেপথ্য কার মন কেড়েছে / মন ভেঙেছে কিসের অসুখ"।[৩৩] এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যায় তাঁর 'বৃষ্টি পড়ে বনে' কবিতায় কবি বলেছিলেন "সারাদিন বৃষ্টি পড়ে বনে / আমার অসুখ আজ মনে"। 'হায় চিরজল' গ্রন্থের নাম কবিতায় জলকে এক আশ্চর্য অনিঃশেষ চিরকালীন প্রবহমানতায় সংযুক্ত করে দিয়ে এক লহমায় তিনি লিখলেন—

"না হয় তুমিও এক নদীরই মতন
থেকে যেতে চিরদিন
উৎসের কান্না ভুলে, জন্মের কারাগার বিরুদ্ধ পাথর
এইসব ভুলে
প্রান্তরের কোল ভ'রে না হয় বইতে তুমি
চিরদিন নদীরই মতন

স্থাবরের দুঃখগুলি
ঈর্ষা তৃপ্তি শোক আর সুখের বসত
হায় হ্রদ, সব ভুলে বহে যেতে পার না কি
হায় চিরজল, না হয় তুমিও এক নদীর মতন
থেকে যেতে চিরদিন"[৩৪]

এই প্রবহমান ধারাবাহিকতায় কবির মনের জলজ দর্পণে তাই অবিরাম প্রশ্নের ভিড়। কবি প্রশ্ন করেন "ধারাবাহিক, তোমার জলে ভয়ঙ্কর টান / ধারাবাহিক, বলো তো শেষ কবে এ আখ্যান? / মৃতের দেহে মাছের ঠোকর এই তো সম্বল / ধারাবাহিক, বলো কোথায় টানছে তোমার জল?"[৩৫] এই জল কবির কল্পনায় কখনও হয়ে উঠেছে 'রাত্রিজল' বা 'মহাজল', কখনও বা 'নক্ষত্রের জল'। এছাড়াও কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ক্যানভাস জুড়ে লেগেছে আশ্বিন, হেমন্ত, শীত ও বসন্তের বিচিত্র রঙ। আশ্বিন তাঁর কাছে নিজেকে নতুন করে চেনার ঋতু, তাই তিনি বলেন "এখনও আশ্বিন এলে এ পৃথিবী সুবিশাল আমি বুঝে যাই / ভুলে থাকা প্রান্তর ভূভাগ সবই মনে আসে / দিবস শর্বরী সুবিশাল স্মৃতিও তো আনে আশ্বিন / জীবনের, জীবন্ত ইচ্ছার স্মৃতি নিয়ে আশ্বিনই এল"।[৩৬] কবি সৌমিত্র এভাবেই তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রকৃতির চিরসংলগ্নতায় গাঢ় করে নিয়ে সহজেই বলতে পেরেছেন, "আমার মনে পড়ে কথা গড়তে হবে / আমার কথা / ছয় ঋতুকে আলিঙ্গন করে থাকবে"।[৩৭] তাঁর নিসর্গভাবনার

চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থে 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' গ্রন্থের প্রথম কবিতায়। তিনি এক অদ্ভুত রোমান্টিকতায় নিজের হৃদয়কে অঘ্রাণের কুয়াশায় জারিয়ে নিয়ে লিখেছেন—

"অঘ্রাণের সকালে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই পথের পাশে পুষ্পিত এক জারুলের সঙ্গে দেখা আর তার চোখে পড়ল গেটের ওপর খিলান তৈরি করে ফুটে আছে বোগেনভেলিয়া এবং এই নতুন শীতের ঠান্ডা হাওয়ায় একটা-দুটো করে শান্তভাবে ঝরেও পড়ছে তার মভ ফুল এই দেখার মুহূর্তেই সে বুঝতে পারল সে আর নিজের মধ্যে নেই নিজের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। সে এখন থেকে মনের মেঘ সরাতে তাকে হরবখত মেহনত করতে হবে না আপন হতে বার হয়ে সে এমনই সাড়া পেল অঘ্রানের ভোরে"[৩৮]

প্রকৃতির সঙ্গে এই চেনাশোনা, এই নিবিড় একাত্মতা কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আজীবনের 'বিনমিত নিরাবেগ হবার সাধনা'। প্রকৃতি-মগ্ন এক কবিপ্রাণ এভাবেই জীবনের কাছাকাছি, মানুষের কাছাকাছি এসে পৌঁছে নম্র মৃদুতায় আত্মবীক্ষণে বলতে পারেন— "সমস্ত পথটা পাড়ি দেবার সময় ঋতুগুলোকে বদলে দিচ্ছিল / আকাশ, বর্ষা বসন্ত নিদাঘ আর হিমঋতুর দাপটে সে তবু মুষড়ে / যায়নি / এতদিন হাঁটাচলা করে বহু ব্যবহারে তার পা দু'টি কি ক্লান্ত হয়ে / গেছে এবার কি ওরা থামতে চাইছে পদচিহ্নগুলিতে যে / উত্তরাধিকার রয়ে যাচ্ছে তার কোনটা কার ভাগে পড়বে তা কোনও / ইচ্ছাপত্রে লেখাপড়া করে দেওয়া নেই জীবনমৃত্যুই তো ভাগ- / বাঁটোয়ারা করে ইচ্ছাপত্রে লিখে যাওয়া নিষ্ফল / এর পরে যা রইল তা ঘরে ঘরে উপাসনালয়ে গম্ভীর প্রার্থনায় / মুখরিত হবার নয় চিরনিঃশব্দ চিহ্নহীন সেই উপসংহারের জন্যেই / সে বিনমিত নিরাবেগ হবার সাধনা করবে এইবার"।[৩৯]

ছয়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিষয়গত আলোচনার পরে তাঁর কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কেও কিছু কথা বলা প্রয়োজন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন কবিতার আঙ্গিকের বিষয়ে, তার শারীরিক গঠন বিষয়ে কাব্যচর্চার প্রথম পর্যায়ে তিনি খুব সচেতন ছিলেন না। তাঁর নিজের কথায়, সেই পর্বে 'স্বতঃস্ফূর্ততার ব্যাপারটায় বেশি অগ্রাধিকার ছিল'। 'পড়ে আছে চন্দনের চিতা' পর্ব থেকেই তাঁর কবিতায় 'ফর্মের প্রতি আগ্রহ' বৃদ্ধি পায়। কবি জয় গোস্বামীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই জানিয়েছেন,

"যতটুকু না বললে নয় ততটুকুই বলার চেষ্টা করছি। এবং শব্দ পছন্দ না হলে ডিকশনারি হাতড়ে অন্য প্রতিশব্দ খোঁজা শুরু করি। সবমিলিয়ে রচনাটার প্রতি আরও বেশি খাটাখাটনি করতে আরম্ভ করি। বিশেষ করে চন্দনের চিতার সময় মোটামুটি ঠিকই করে ফেলি, এবার একটু ছন্দের শৃঙ্খলে নিজেকে বাঁধব। সেটা করতে গেলেই দরকার হয়ে পড়ে নিখুঁত হওয়ার। দায়িত্বটা এসে যায় মনের উপর।"[৪০]

সৌমিত্রবাবুর প্রথম কাব্য 'জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াবো বলে'-তে লক্ষ করা যায় এক অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ কবিতার ধারা। কবিতার শেষে বিরামচিহ্নের অনুপস্থিতি, সেই অনিঃশেষ

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

কাব্যপ্রবাহকেই যেন ইঙ্গিত করেছে। তাঁর প্রচুর কবিতায় এই বক্তব্য বা ভাবের অনিঃশেষ ধারাবাহিকতা এক স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে বলা যায়। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়'তেও এই একই প্রবণতা লক্ষণীয়। তাঁর কবিতার দ্বিতীয় পর্বের 'পড়ে আছে চন্দনের চিতা', 'হায় চিরজল' থেকে শেষ পর্বের 'স্বেচ্ছাবন্দি আশার কুহকে', 'অন্তমিল' ইত্যাদি কাব্যপরিসরে তিনি দীর্ঘ কবিতার পাশাপাশি ক্ষুদ্র কবিতাও লিখেছেন প্রচুর। কবিতার শব্দশরীর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। ভাবকে সংহত, সংযত করেছেন। তেমনই একটি গ্রন্থ হল 'পদ্মবীজের মালা' কাব্যটি। এখানে মূলত চার চরণের কবিতাই প্রধান, কিছু ক্ষেত্রে পাঁচ বা ছয় চরণের কবিতাও দেখা গেছে। তিনি মূলত গদ্যকবিতাতেই অধিক স্বচ্ছন্দ। তবুও তাঁর কবিতায় কখনও কলাবৃত্তের মধ্যম স্পন্দন, কখনও বা মিশ্রকলাবৃত্তে ভাঙা পয়ারের চোরাটান অনুভূত হয়। যেমন, পয়ারের উদাহরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় এই দুটি চরণ—

"স্নান চাও? স্নিগ্ধতাও? / দুঃখের সম্বল (৮ + ৬)
ধুয়েমুছে দেবে কই / তেমন সে জল?" (৮ + ৬)

আবার কলাবৃত্তের উদাহরণে দেখা যায়

"ধারাবাহিক, / তোমার জলে / ভয়ঙ্কর টান (৫ + ৫ + ৭)
ধারাবাহিক, / বলো তো শেষ / কবে এ আখ্যান?" (৫ + ৫ + ৭)

সৌমিত্রবাবুর ছন্দবোধের ও কবিতায় অন্ত্যমিলের সুর-স্পন্দনের এক সুন্দর নিদর্শন তাঁর 'অন্তমিল' কাব্যগ্রন্থটি। এছাড়াও অলংকার প্রয়োগে, শব্দ নির্বাচনে, চিত্রকল্প সৃজনেও কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সমগ্রতার সন্ধানী। সে প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়ে তালিকা প্রলম্বিত করা বর্তমানে অপ্রয়োজনীয়। পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন কবিতাংশেও তার একাধিক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে।

সাত

কবিতার পাশাপাশি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রচুর ছড়াও লিখেছেন। 'নাতি-নাতনির ছড়া' (১৯৯৮ খ্রি.) ও 'ছড়া সংগ্রহ' (১৯৯৯ খ্রি.) মূলত তাঁর ছড়ার সংকলন। সেখানে মূলত পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে, খেলার জগতের মানুষদের নিয়ে, ভূত নিয়ে, শিশুতোষ মজার বিষয় নিয়ে এবং তাঁর আত্মিক বিষয় নিয়েও বিচিত্র ছড়ার ছড়াছড়ি। এছাড়াও তিনি অনুবাদ করেছিলেন খলিল জিব্রানের 'দ্য প্রফেট' গ্রন্থটি। 'দ্রষ্টা' (১৯৯৮ খ্রি.) নামে অনূদিত গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। সৌমিত্রবাবু এই অনুবাদের কারণ প্রসঙ্গে কবি জয় গোস্বামীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজেই জানিয়েছেন,

"অনেকদিন আগে বইটা যখন প্রথম পড়েছিলাম তখন বইটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। আসলে তখন ওর কাব্যময়তাটাই আমাকে বেশি আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তীকালে আবার যখন দ্য প্রফেট বইটার কাছে ফিরে গেছি, তখন তার দার্শনিকতাও ভীষণ আকর্ষণ করল। যেমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা ডিট্যাচমেন্টের সঙ্গে জীবনকে দেখা, অথচ জীবনের আস্বাদটাকে বাদ দিয়ে নয়, সেটা আমায় খুব আকর্ষণ করেছিল।"[৪১]

কবিতা লেখার মন ও মানসিকতা নিয়ে এক অন্তরগত তাগিদ থেকেই সৌমিত্রবাবু এই অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এছাড়াও উল্লেখ করতে হয় তাঁর জীবনের শেষ পর্বে প্রকাশিত 'ছবি ও ছায়া' বইটির কথা এখানে তাঁর নিজের আঁকা ছবির সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে রয়েছে তাঁর লেখা ছোটো ছোটো কবিতাও। এই বইটিকে বিশিষ্ট সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রশিল্পি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৪২] ছবি ও কবিতা শেষ অবধি তাঁর ভাবনায় হাত ধরে দাঁড়িয়েছে শিল্পীর সংযোগে।

আট

২০০০ সালে প্রকাশিত পরিচালক গৌতম ঘোষের 'দেখা' চলচ্চিত্রে সৌমিত্রবাবু একজন দৃষ্টিহীন কবি শশিভূষণের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কবি ও অভিনেতা এই দুই সত্তা শিল্পী সৌমিত্রর দুই মেরু। ২০০৯ সালে লেখা 'আত্মজীবনীমূলক' নাটক 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব'-এর দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তিনজন সৌমিত্রর মধ্যে 'সৌমিত্র ১'-এর মুখে নিজের কবিতা লেখার প্রসঙ্গে সৌমিত্রবাবু বলেছেন,

"কবিতা রচনার ইচ্ছেটা অভিনয়ের ইচ্ছের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত হলেও অভিনয়ের কাজটা যেমন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে করতে বললেও আমি করে দিতে পারি, কবিতা লেখাটা কিন্তু আমার স্বেচ্ছাধীন নয়। অনেক দিন ধরে কবিতার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে থেকেও তার দ্যাখা মেলেনি আবার মধ্যরাতে সে ঘুম থেকে তুলে ঝুঁটি ধরে লিখতে বসিয়েছে। লিখে গেছি আজও লিখি বলা যায় সেসব আমার দ্বারা লিখিত হয়।"

ওই প্রসঙ্গেই একই কথোপকথনে 'সৌমিত্র ১' ও 'সৌমিত্র ২'-এর মুখে নাট্যকার সৌমিত্র তাঁর পাঠক-দর্শকদের জন্য জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর কবি ও অভিনেতা সত্তার মধ্যে কখনও কোনো সংকট তৈরি হয়নি, রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং এ প্রসঙ্গে তাঁর সংকট-মুক্তির কারণ। এবং নিজের জীবনের অন্তরগত দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েনে 'কখনও অমৃত উঠেছে কবিতায়, কখনও-বা অভিনেতা জীবনের হলাহল'।[৪৩]

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজেকে কখনোই 'ভালো কবি' বলে মনে করেননি। নিজের কবিতা বিষয়েও তিনি অধিকাংশ সময়েই নিঃশব্দ-নীরব। তথাকথিত 'ভালো কবি'দের সঙ্গে নিজের কবিতা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন।[৪৪] নিজের কবিতা প্রকাশ প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিধা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পেশাদার অভিনেতা হওয়ার কারণে কবিতার চর্চার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সময় দিয়ে উঠতে না পারায় নিজের আক্ষেপও ঝরে পড়েছে তাঁর নিজের কথাতেই। অথচ কবিতার নির্মাণে তিনি অক্লান্ত কারিগর। প্রকৃতপক্ষে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শিল্পী-কবি। শিল্পীসত্তার দুর্নিবার প্রকাশের তাড়নাই তাঁর গড়ার বা তৈরি করার অনুপ্রেরণা। তিনি নিরন্তর প্রকাশিত হতে উন্মুখ। যাদের মধ্যে তিনি বেঁচেছিলেন, আনন্দ-বেদনার যাবতীয় আস্বাদ গ্রহণ ক'রে ঋণী থেকেছিলেন, যাদের সান্নিধ্যে তিনি এই 'পরমাশ্চর্য মানবজীবন' পেয়েছিলেন সেই মানুষের কাছে তিনি ছিলেন আজীবন ঋণী। সেই ঋণশোধের জন্যই তাঁর কবিতার চর্চা, লেখালেখি ও অভিনয় করা।[৪৫] এখানেই কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কবিসত্তার ব্যক্তিগত গণ্ডি অতিক্রম ক'রে নিজেকে

ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন মানবতার সর্বব্যাপী নক্ষত্রমালায় এবং তাঁর কবিতা প্রকাশের নিঃসীম দহনে হয়ে উঠেছে অমীমাংসিত অথচ চিরনিঃশব্দ চিহ্নহীন এক অনিঃশেষ উপসংহার।

তথ্যনির্দেশ

১. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, "ঋণশোধের জন্য", 'বই পড়া থেকে লেখালিখি', 'গদ্যসংগ্রহ ১', রঞ্জন মিত্র ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০১৬, দে'জ, কলকাতা, পৃ. ৪৩

২. জয় গোস্বামী, "কবিতার সৌমিত্র", 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: দেখি বিস্ময়ে', সৌমিত্র মিত্র সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২১, দে'জ, কলকাতা, পৃ. ৩০৩

৩. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা", 'কবিতাসমগ্র', প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পৃ. (অনুল্লিখিত)

৪. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, "পুলু: বিনীত আকাশ গাঢ়", 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: দেখি বিস্ময়ে', সৌমিত্র মিত্র সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

৫. জয় গোস্বামীর "আশ্বিন, নাচের টুকরো" শীর্ষক রচনায় কবি জয় গোস্বামীকে দেওয়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের "কবিতাই মানুষের কাছে আমার ঋণস্বীকার" নামক সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য, 'সৌমিত্র', অলক চট্টোপাধ্যায় ও মানস চক্রবর্তী সম্পাদিত, পরিমার্জিত পরিবর্ধিত প্রতিভাস প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, প্রতিভাস, কলকাতা, পৃ. ২১১

৬. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, "গ্রন্থপরিচয়" অংশের "জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে" কাব্যের ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য, 'কবিতাসমগ্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭৫

৭. ঐ, "নস্টালজিয়া", 'জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে', তদেব, পৃ. ৫

৮. ঐ, "জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে", তদেব, পৃ. ৩০

৯. ঐ, "ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা", 'ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা', তদেব, পৃ. ৫৬

১০. ঐ, "ভালোবাসা বহুদিন আগে", তদেব, পৃ. ৬৬

১১. ঐ, "শব্দরা আমার বাগানে", 'শব্দরা আমার বাগানে', তদেব, পৃ. ৮৫

১২. ঐ, "প্রতিদিন চিরদিন", 'হায় চিরজল', তদেব, পৃ. ২৩৮

১৩. ঐ, "৬০", 'পদ্মবীজের মালা', তদেব, পৃ. ২৭৭

১৪. ঐ, "প্রতীক্ষা", 'জন্ম যায় জন্ম যাবে', তদেব, পৃ. ৩৮৫

১৫. ঐ, "এখন শব্দকে দেখি", 'শব্দরা আমার বাগানে', তদেব, পৃ. ১২৯-৩০

১৬. ঐ, "পড়ে আছে চন্দনের চিতা", 'পড়ে আছে চন্দনের চিতা', তদেব, পৃ. ১৩৩

১৭. ঐ, "সন্দেহ", 'হলুদ রোদ্দুর', তদেব, পৃ. ৫৩৫

১৮. জয় গোস্বামীর "আশ্বিন, নাচের টুকরো" শীর্ষক রচনায় কবি জয় গোস্বামীকে দেওয়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের "কবিতাই মানুষের কাছে আমার ঋণস্বীকার" নামক সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য, 'সৌমিত্র', অলক চট্টোপাধ্যায় ও মানস চক্রবর্তী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

১৯. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, "দুঃস্বপ্নের এই জায়গাটাতে", 'হায় চিরজল', 'কবিতাসমগ্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫

২০. ঐ, "নিউজপ্রিন্টের থেকে রক্ত ঝরে", 'হায় চিরজল', তদেব, পৃ. ২১৭

২১. ঐ, "মানুষকে দ্যাখা হল", 'হায় চিরজল', তদেব, পৃ. ২৫১
২২. ঐ, "প্রেত সংসারে", 'জন্ম যায় জন্ম যাবে', তদেব, পৃ. ৪৩৮-৩৯
২৩. ঐ, "খাতা কলম থাকার সুবিধা", 'হলুদ রোদ্দুর', তদেব, পৃ. ৫৬২
২৪. ঐ, "সাজঘরে দর্পণে", 'ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা', তদেব, পৃ. ৫৪
২৫. ঐ, "আমার নিজস্ব শাঁখ", তদেব, পৃ. ৬৭
২৬. ঐ, "একদিন ক্লান্ত বোধ করব", 'শব্দরা আমার বাগানে', তদেব, পৃ. ১০৪-০৫
২৭. ঐ, "অন্ধকারে", 'হে সায়ংকাল', তদেব, পৃ. ৩০৯
২৮. ঐ, "মাধুকরী", তদেব, পৃ. ৩৫৯
২৯. ঐ, "দুঃখের চেয়ে জীবনদায়ী", 'হলুদ রোদ্দুর', তদেব, পৃ. ৫৪৭
৩০. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, "কবিতা বলা, কবিতা লেখা", 'বই পড়া থেকে লেখালিখি', 'গদ্যসংগ্রহ ১', রঞ্জন মিত্র ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১
৩১. ঐ, "এইখানে দুঃখ কেন", 'শব্দরা আমার বাগানে', 'কবিতাসমগ্র', তদেব, পৃ. ১০৮
৩২. ঐ, "জলমগ্নের প্রতি", 'পড়ে আছে চন্দনের চিতা', তদেব, পৃ. ১৩৯
৩৩. ঐ, "নদীই কি আশ্বস্ত আছে", তদেব, পৃ. ১৫৭
৩৪. ঐ, "হায় চিরজল", 'হায় চিরজল', তদেব, পৃ. ২৫৫-৫৬
৩৫. ঐ, "ধারাবাহিক, তোমার জলে", 'ধারাবাহিক, তোমার জলে', তদেব, পৃ. ৪৭৩
৩৬. ঐ, "আশ্বিনই এল", 'হায় চিরজল', তদেব, পৃ. ২২৩-২৪
৩৭. ঐ, "কথা", 'হলুদ রোদ্দুর', তদেব, পৃ. ৫৫৮-৫৯
৩৮. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, "১", 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়', প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৯, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, পৃ. ৩
৩৯. ঐ, "৩০", তদেব, পৃ. ৫২-৫৩
৪০. জয় গোস্বামীর "আশ্বিন, নাচের টুকরো" শীর্ষক রচনায় কবি জয় গোস্বামীকে দেওয়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের "কবিতাই মানুষের কাছে আমার ঋণস্বীকার" নামক সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য, 'সৌমিত্র', অলক চট্টোপাধ্যায় ও মানস চক্রবর্তী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২
৪১. তদেব, পৃ. ২১৮-১৯
৪২. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ছবি ও ছায়া' গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' অংশে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য। এই তথ্যের জন্য প্রভাত কুমার দাসের "সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা: বিনমিত নিরাবেগ হওয়ার সাধনা" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য, 'রঙ্গপট' নাট্যপত্র ২০২১, ডা. তপনজ্যোতি দাস সম্পাদিত, সৌমিত্র শঙ্খ স্মরণ সংখ্যা, অষ্টাদশ সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ১৯৪
৪৩. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, "তৃতীয় অঙ্ক, অতএব", 'নাটকসমগ্র ৩', প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২০৪
৪৪. জয় গোস্বামীর "আশ্বিন, নাচের টুকরো" শীর্ষক রচনায় কবি জয় গোস্বামীকে দেওয়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের "কবিতাই মানুষের কাছে আমার ঋণস্বীকার" নামক সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য, 'সৌমিত্র', অলক চট্টোপাধ্যায় ও মানস চক্রবর্তী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২
৪৫. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, "ঋণশোধের জন্য", 'বই পড়া থেকে লেখালিখি', 'গদ্যসংগ্রহ ১', রঞ্জন মিত্র ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

জীবনের ভাঙা-গড়া : কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

স্বপন প্রামাণিক

"...কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে।"[১] কবিকে কোথায় খুঁজব? তার জীবন কাহিনীতে নাকি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। বহুল চর্চিত এই বিষয়ের বাইরে গিয়ে যদি বলা যায় যে, যে কবির জীবনটাই কবিতার সামগ্রী হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে কবির জীবন কাহিনী পড়তে হয় বৈকি। হ্যাঁ, ষাটের দশকের তথা সমগ্র কাব্যসাহিত্যে একমাত্র "শ্রমিক কবি" কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। যিনি ছিলেন দুর্গাপুর স্টিল ফ্যাক্টেরির শ্রমিক। অক্লান্ত পরিশ্রম ও জীবন জিজ্ঞাসা কবির শ্রমিকসত্ত্বা সৃষ্টিসত্ত্বায় পর্যবসিত। একজন সরল-সাধারণ মানুষের ভাবনায় উঠে এসেছে মানুষের কথা, শ্রমিকের ভাবনা। এই সন্দর্ভে আমি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের এখনও পর্যন্ত জীবনপরিক্রমার সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কোনও লিখিত পুঁথিপত্র বা ডায়েরি নয়, স্মৃতির পৃষ্ঠায় ভর করে কবি আজও বলে যান তাঁর জীবনের আদি লগ্ন থেকে বর্তমানের যাত্রার কাহিনী। কবি পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল বর্তমান বাংলাদেশ। যদিও সেখানে আর কিছুই এখন নেই। কবির জন্ম ১৯৩৪ সালের ২২শে মে বিহারের সাসারামে। পিতা-মাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান হওয়ার দরুণ কৃষ্ণের অনুকরণে তাঁকে বাল্যে কেষ্ট নামে ডাকতেন পিতা। আর সেই নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন। পিতা উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি ব্রিটিশ বিরোধ, উদার, ব্যক্তিত্বপূর্ণ। মাতা বীণাপাণি দেবী ছিলেন মায়ের মতোই। উপেন্দ্রনাথ স্টেশান মাষ্টার হওয়ার কারণে কোনও একজায়গায় স্থায়ী বসবাস হয়নি কবি পরিবারের। কবির জীবনযাত্রা বেশ সর্পিল। পরিবেশ যত বদলেছে ততই মোড় ঘুরেছে কবি জীবনের।

অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতোই কবির ছোটোবেলায় একইরকম কেটেছে। ছিল না তেমন আদর যত্ন। বিলাসিতার তো বালাই ছিল না। যাযাবর জীবনের প্রথম বসবাসের স্মৃতি কবির কথায় হুগলির বংশবাটি। খুব ছোটো ছিলেন বলে কেবল কয়েকটি টুকরো ছবি ছাড়া তেমন কিছু মনে নেই। যেমন রেল কোয়ার্টারে থাকা, সামনে রেলস্টেশন, বেশি ট্রেন চলাচল না করলেও ট্রেনের আসা যাওয়া, রেলের আমবাগানের পাশাপাশি রামশকুল নামে এক ব্যক্তিকে কবির খুব মনে পড়ে। যিনি খুব ভালোবাসতেন কবিকে। রেলেরই কর্মচারী ছিলেন বোধহয়।

বংশবাটির পর সিঙ্গুরবাস। শৈশবের ঘটনাগুলির মধ্যে সিঙ্গুরের ছবিই কবির চোখে-মুখে বেশি করে ফুঁটে ওঠে। সাধারণত যে বয়সটাতে প্রথম স্কুল, বন্ধু, খেলাধূলার সেটা কেটেছে এখানেই। সিঙ্গুরে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক দুটি স্কুল ছিল। দুটি হাসপাতাল ছিল। কবি স্কুলে যেতেন ঠিকই, কিন্তু মনটা পড়ে থাকত জানালার বাইরে খেলার মাঠে।

ছোটোবেলাতেই খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। শুধু খেলা নয়, আশেপাশে ফুটবল ম্যাচ হলে দেখতে যেতেন। বাইরে থেকে প্লেয়ার এলে খেলার শেষে তাঁদের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যেতেন। পূর্বপুরুষের কেউ খেলাধূলায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে কবির জানা নেই। পরবর্তীকালে তিনি ফুটবল খেলায় দক্ষ প্রমাণ করেছিলেন তার হাতেখড়ি সিঙ্গুরেই।

ফুটবল খেলার পাশাপাশি শৈশবের আর একটা নেশা ভীষণভাবে টানত, সেটা সঙ্গীত। এবিষয়ে তাঁর বড় প্রেরণা ছিল পিতার মামাতো ভাই স্মরজিৎ কাঞ্জিলাল। ইনি সেসময় লক্ষ্ণৌর মরিস কলেজ থেকে সঙ্গীত বিষয়ে পড়াশোনা ও ডিগ্রি অর্জন করেন। আসা-যাওয়া ছিল কবিদের বাড়িতে। যখনই আসতেন, তখনই গান গেয়ে শোনাতেন। কবি মন দিয়ে শুনতেন। ক্রমেই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত কবিকে পেয়ে বসে। সঙ্গীতের সুর ভেসে এলেই তিনি বিভোর হয়ে শুনতেন। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি মৃদুস্বরে রেডিওতে গান শুনতেন। তানসেন সঙ্গীত আসর, সাধারণ সঙ্গীত আসরের কথা আজও মনে পড়ে কবির। শুনে শুনে বলে দিতে পারতেন কোন যন্ত্রাংশকে বাজাচ্ছেন। হুগলীর শ্রীরামপুরে চলে আসার পর তিনি গঙ্গার সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। কুমিরজলা রোডের শ্রীরামপুর টকিজ থেকে ভেসে আসা গান তাঁর মন-প্রাণ জুড়িয়ে দিত। গান শোনা শুধু নয়, শেখার জন্য পরে টাকা জমিয়ে একটি হারমোনিয়ামও কিনেছিলেন তিনি। কিন্তু সাংসারিক জটিলতায় তা আর শেখা হয়ে ওঠেনি। এখানে থাকাকালীন খেলাধূলাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমত বন্ধু দ্বিতীয়ত মাঠের অভাবে।

সালটা ১৯৪৬, কবির বয়স ১২ বছর। শ্রীরামপুরের পর্ব শেষ। এবার যাত্রা দুর্গাপুর। খাঁচার পাখি ছাড়া পেলে যেমন মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়, কবিরও যেন সেই দশা। এখানে অনুকূল পরিবেশে কবি পুনরায় খেলাধূলা আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে ফুটবল খেলা ও সঙ্গীতই জীবনের প্রথমদিকের প্রিয় বিষয় ছিল। পড়তেন তারকনাথ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। তবে পড়াশোনাটা ব্রাত্যই থাকত বলা যায়।

১২-১৩ বছর হলেও ঘরের মধ্যে বাইরের রাজনৈতিক ঢেউ যে আছড়ে পড়ত তা মনে আছে অল্পস্বল্প। কবির বড় ভগ্নিপতি কমরেড ডঃ নরেশ ব্যানার্জী ছিলেন খিদিরপুরের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। এঁনারই কারণে দাদা জ্যোতিবিকাশ পার্টির হোলটাইমার রূপে যোগ দেন। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হলেও কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে কংগ্রেস। জ্যোতিবিকাশ ধর পড়েন এবং তাঁর স্থান হয় হুগলি জেলে। এই সমস্ত কারণে সংসারের মধ্যে একটা অস্থির, অসুস্থ পরিবেশ বিরাজ করত।

১৯৪৯ সাল নাগাদ দুর্গাপুর থেকে কবিরা চলে আসেন সকরিগলি ঘাটে। এটা বাংলার সীমানা বলা যায়। আর একটু এগিয়ে গেলেই সাহেবগঞ্জ বিহার। সেই সময় আসামের সঙ্গে যোগাযোগের একটাই ট্রেন চলাচল করত, তার নাম আসামলিঙ্ক। এখানকার

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ছবিটাও বেশ আনন্দের কবির কাছে। তিনি পড়তেন রামপুরহাট স্কুলে, থাকতেন ছাত্রাবাসে। কাজের সূত্রে পিতার বিভিন্ন জায়গায় বদলির কারণে কবির পড়াশোনাও হতে লাগল ছন্নছাড়া। তবে খেলাধূলা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ছিল। তাঁর খেলার পারদর্শিতা দেখে খেলার শিক্ষক গোবিন্দ সেনগুপ্ত খুব ভালোবাসতেন। ইনি কবিকে বলেছিলেন কলকাতার যে কোনও বড় ক্লাবে ফুটবল টিমে সুযোগ পেয়ে যাবেন। ফলপ্রসূও হয়েছিল। পরবর্তিকালে বারাসাতের সুভাষ ক্লাবে তিনি সুযোগ পেয়ে যান। দলকে যেমন জিতিয়েছেন তেমনি প্রচুর ব্যক্তিগত ট্রফিও লাভ করেন।

বারাসাতে আসার পর পরিবারের সংকট আরও বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে জ্যোতিবিকাশ জেল থেকে ছাড়া পান। দাদার উন্নতির জন্য এবং রাজনীতি থেকে মন ঘোরাতে উপেন্দ্রনাথ প্রথমে ওষুধের দোকান পরে একটি লরি কিনে দেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। ওষুধ দোকান পরিণত হয় রাজনীতির আড্ডাখানায় আর লরি ব্যবহার হত সামাজিক কাজে। আয়ের দরজায় খিল পড়ল। ওষুধ দোকান আর লরি বিক্রি করে দেন পিতা। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া দিয়ে কোনওরকমে থাকার চেষ্টা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয়। শেষমেষ বাড়ি বিক্রি করে ভাড়া বাড়িতে থাকার সংস্থান হয়। পরে অবশ্য জ্যোতিবিকাশ ঘুরে দাঁড়ান, সফলও হন।

১৯৫২ পিতার চাকরি থেকে অবসর, অর্থসংকট কবির জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। দশম শ্রেণী সম্পূর্ণ করে স্কুল শিক্ষায় ইতি পড়ে। শুরু কাজের সন্ধান। কয়েকবছর পর ১৯৫৮ সালে সিঙ্গুরের বাল্যবন্ধু রঞ্জিত রায়চৌধুরীর হাত ধরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় অস্থায়ী কর্মীরূপে যোগদান করেন। কঠিন কর্মের বন্ধনে কবির প্রিয় খেলধূলা ও সঙ্গীত দুটো মুছে যেতে থাকে। হয়তো প্রয়োজনও ছিল। এক রাস্তা বন্ধ হলে যেমন আরেক রাস্তা পথ দেখায়, তেমনি কবির জীবনে কবিতা হঠাৎ করে পেয়ে বসল। কবির কথায় যেমন করে খেলাধূলা কিংবা গান ভালো লেগেছিল একইভাবে কবিতাও। যন্ত্রাংশের মাঝে কবিতার কোনও জায়গা নেই, তবুও তিনি যন্ত্রাংশের নাম লেখা চিরকূটের অপরপৃষ্ঠায় সুযোগ পেলেই লিখে ফেলতেন দু'চার ছত্র।

বারাসাতে থাকাকালীন বন্ধু পুনু ভট্টাচার্য একদিন ক্ষেত্রগুপ্তকে জানান যে, কেষ্টবাবু কবিতা লেখেন। ক্ষেত্রগুপ্ত ওই পাড়াতেই থাকতেন, সেই সময় খুব নামকরা ছাত্র। ক্ষেত্রবাবু কবিতা নিয়ে ঘরে ডেকে পাঠালেন কবিকে। কবিতা পড়ে ভালো লেগে গেলো। তিনি কবিকে বারাসত যুব উৎসবে কবিতা পাঠ করতে বললেন। পাঠও করলেন এবং সুনামও অর্জন করলেন। ক্ষেত্রে গুপ্তের উৎসাহে সেই প্রথম মঞ্চে ওঠা। দুর্গাপুরে কাজে যোগ দিয়ে লেখায় কিছুটা ছেদ পড়ে ঠিকই, কিন্তু প্রতিভাকে তো চেপে রাখা যায় না। ১৯৬২ সালে দুর্গাপুর যুব উৎসবে কবিতা পাঠ করে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।

বাড়ির রাজনৈতিক আবহ কবির মধ্যেও সুপ্ত ছিল। ১৯৬৪ সালে তিনি দুর্গাপুরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার হন। ১৯৬৫ সালে কালচার বিভাগের কনভেনর। ১৯৭২ সালে দুর্গাপুর গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। লড়াই করেছেন লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে। আজও তিনি আর্দশ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি বলেন, "যাঁরা প্রকৃত মার্কসবাদী তাঁরা হয় দলের না হয় বসে যাবেন, কখনও অন্য আর্দশে পা বাড়াবে না।"[২] আর্দশ থেকে বিচ্যুতিকে তিনি ভালো চোখে দেখতেন না। জীবনে ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন। ঠিকা শ্রমিকদের জন্য বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের স্থায়ীকরণ করেছেন।

(খ)

"বাংলা কাব্যক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে যেসব কবিরা জন্মগ্রহণ করেছেন—এমন কবিরাই ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাব্যচর্চায় রত।"[৩] আবার অধ্যাপক তরুণ মুখেপাধ্যায় বলছেন, জন্মসাল অপেক্ষা প্রথম কাব্য কিংবা মৌলিক কবিতা প্রকাশের সালকে গুরুত্ব দিলে উচিত বিচার হয়। এই দুই দিক থেকে দেখলেই কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়কে ষাটের দশকের কবি বলতে কোনও অসুবিধে হয় না। কারণ কবির জন্মসন ১৯৩৪। অন্যদিকে তাঁর প্রথম মৌলিক কবিতা পাঠের জন্য ১৯৬২ সালে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত যুব উৎসব থেকে পুরষ্কৃত হন। এরপর থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখালিখি প্রকাশিত হতে শুরু করে।

ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে পূর্বজ কবিদের ছায়া পড়ল ঠিকই, একইসঙ্গে স্বাতন্ত্র্যও ধরা পড়ল। এই দশকের কবিদের মধ্যে রয়েছেন তুষার রায়, কবিরুল ইসলাম, দীপেন রায়, মলয় রায়চৌধুরি, নীরেন্দু হাজরা, গণেশ বসু, উৎপল কুমার বসু, সমীর রায়চৌধুরি, দেবী রায়, কৃষ্ণা বসু, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, আশিষ সান্যাল প্রমুখ। কবি মণীন্দ্র গুপ্ত চল্লিশের দশক থেকে লিখলেও প্রথম কবিতার বই 'নীল পাথরের আকাশ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। হাংরি জেনারেশন ও কাব্যান্দোলন বাংলা কবিতায় মোড় ঘুরিয়েছিল এই পর্বে। কাব্যান্দোলনের প্রবক্তা মলয় রায়চৌধুরির কথায়, "...কবিতা ব্যক্ত করবে মানবিক, দৈহিক এবং শারীরিক ক্ষুধার কথা।"[৪] যদিও হাংরির এই কবিরা বিভিন্ন কারণে নিন্দিত। কারণ তাঁরা প্রচলিত নিয়মের বাইরে যেতে গিয়ে আচরণে স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দিয়েছে। আপাত কুৎসিত বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবুও এই সময়ের কবিদের লেখনীতেও বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কাব্যফসসল পাওয়া গেল। মলয় রায়চৌধুরির কাব্য 'শয়তানের মুখ'(১৯৬৩), 'তুষার রায়ের ব্যান্ড মাষ্টার'(১৯৬৯), 'মরুভূমির আকাশে তারা'(১৯৭৪), দীপেন রায়ের 'রাখাল বালকের সাথে'(১৯৭৩), গণেশ বসুর 'নিজের মুখোমুখি'(১৯৬৭) প্রভৃতি। এই পর্বে এক স্বতন্ত্র ভাবনার, নতুন দৃষ্টিকোণের কবি হলেন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দর্শন, সমাজভাবনা, আত্মানুভূতি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে সমকালের থেকে অনেকটাই পৃথক করে রেখেছে বলা যায়। অন্যান্য কবিরা দূর থেকে শ্রমিকদের দেখেছেন, কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু কেষ্টবাবু নিজেই একজন শ্রমিক। তাঁর সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক রক্তের। সেই কারণেই তাঁর কাব্যে শ্রমিকের গাথা জীবন্ত পল্লবিত হয়েছে। কবির কবিতার নাম সংগত কারণেই 'কবি কারো দাস নয়'। তিনি ভালো চোখে দেখেননি কিছু পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর কাছে শিল্পীদের মেরুদন্ড হারিয়ে যাওয়াকে। সমাজের উপর শিল্পীর দায়বদ্ধতার অস্বীকারকে। তবুও তিনি আশাবাদী। একদিন প্রতিবাদ হবে, শিল্পী তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেবে, মানবিকতার জয়ধ্বনি শোনা যাবে। 'সুকান্ত' কবিতায় কবি বলছেন-

'তবুও আশায় থাকি ঘুম নেই রাতে / বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে এ জীবন কাটে'[৫]

'সব পথ ঘুরে' কবিতায় তিনি বলছেন—

'এইভাবে বাঁচুক সবাই
গড়ে তুলুক বিশ্বাসে এভাবেই মানুষের উজ্জ্বল স্বাক্ষর..."[৬]

(গ)

কবি হওয়ার লক্ষ্যে নয়, বরং ভেতরের একটি তাগিদেই লেখার জন্ম। সালটা ১৯৪৬-৪৭ নাগাদ। প্রথম জীবনের আবেগভরা ছোটো-বড় বেশ কিছু কবিতা লেখেন কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই কবিতার খাতা পাওয়া যায়নি। কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'বসুমতি' পত্রিকায় ১৯৫৭-এর মাঝামাঝি। এরপর 'স্বগত সাহিত্য', 'যাত্রিক', 'মাঠ-ময়দান-কারখানা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। কবিতার লেখার প্রেরণা কি? কবি বলেন, বারসাতে থাকাকালীন একজনের পূর্বরাগে পড়েছিলেন ঠিকই, তবে তাঁকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়নি। তবে কবিতা লেখার পিছনে একদিকে খেলাধূলা, সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা কাজ করেছে। অন্যদিকে বারাসাতে থাকাকালীন শিশুদের সংস্থা পাততাড়িতে কাজ করেছেন। সেখানে বাচ্চাদের জন্য সঙ্গীত ও গানের স্ক্রিপ্ট লিখতে হতো। সেই অভিজ্ঞতাও অন্যতম প্রেরণা। সলিল দত্তের সৌজন্যে পড়তেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমারী দেবী, অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা। কবিতা লেখার জন্য ছন্দজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। এই ছন্দজ্ঞান তিনি কিছুটা শিখেছিলেন কবি দূর্গাদাস সরকারের কাছ থেকে। চার দেওয়ালবদ্ধ প্রথাগত শিক্ষার ভুরি ভুরি ডিগ্রি ছাড়াই তাঁর দার্শনিকতা পৌঁছে গেছে বিশ্বজনীনতায়। কবির প্রতিবাদের স্বর মুখরিত হয়েছে 'শ্রমিক কবির প্রতিবাদ কবিতা'(২০১৩) কাব্যগ্রন্থে। ১৯৯০-এ কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি একের পর এক কাব্য লিখে চলেছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর বাইশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শরিক না হলে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। একে একে 'স্বাধীনের এই স্বাদ'(১৯৭৬), 'কবি কারো দাস নয়'(১৯৯০), 'চর্তুদশপদী কবিতা'(১৯৯৭), 'কমরেডস লাইনটা সোজা করুন'(১৯৯৭), 'দিন, অস্ত্র দিন'(২০১১),'আমাদের কাজের মাসি'(২০১৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ

প্রকাশিত হয়েছে। আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার মুখে।

কবি তথাকথিত বিশাল ডিগ্রিধারী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি নন। দুর্গাপুর কারখানার স্থায়ী কর্মী হওয়ার সূত্রে সেখানকার জীবনযাত্রা, দৈনিক কর্মকান্ড কবির মজ্জাগত হয়ে আছে। তাঁর কাব্যে শ্রমিকশ্রেণী সেই জন্যই জীবন্ত। তিনি মানবতার কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শরিক না হলে'-তে পাই—

'...প্রতিদিন নিয়ে যায় সৃষ্টিছাড়া এ সৃষ্টিকে
অনির্দিষ্ট গতি থেকে সুনির্দিষ্ট পথে
তোমার সে অদৃশ্য অঙ্গুলি
মানবের মানবত্বে বারবার।'[৭]

জীবনে কৃতকার্য হতে কে না চায়। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ করতে হলে, সত্যি করতে হলে অর্থই কবির কাছে প্রধান বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কবিতার পটভূমি সংবাদ'-এ পাই 'সহস্র ইচ্ছাকে দড়ি বাঁধে অর্থের অসহযোগ'।[৮] 'মুখুজ্জ্যে মশায় আপনি কি কৃতকার্য হলেন' কবিতায় কবি যেন ধনতন্ত্র বিনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভিয়েতনামের উপর মার্কিনী আক্রমণ কিংবা কেরালায় কমিউনিস্ট ভাঙনকে ভালো চোখে দেখেননি—

'...অতঃপর ধনতন্ত্র কি আত্মহত্যা করবে অনায়াস!
ভিয়েৎনাম, কঙ্গো, কিউবা, ডোমিনিকান, এশিয়া-আফ্রিকা
কোথায় ক্রুশ্চভের নির্বিবাদ গলা..
কেরালায় কার কণ্ঠস্বর?'[৯]

শ্রমিকের অধিকার নিয়ে বারবার কলম ধরেছেন তিনি। পৌঁছে গিয়েছেন বিশ্ববোধে। 'ব্যুরোক্র্যাট' কবিতায় তিনি লিখছেন-

'...শ্রমে ঘাম দিয়ে যাও সব কিছু বিনীত সম্মান
নচেৎ একত্র হও, রক্ষা করো রক্তে অধিকার
মুক্ত করো এ লাঞ্ছনা, কেটে যাক বিপন্ন আঁধার।'[১০]

এই কবিই 'কিছু তো দাঁড়িয়ে নেই' কাব্যগ্রন্থে সোচ্চারে বলে ওঠেন—'আমরা সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে আছি তবু, কাউকে খুশি করার জন্য লিখি না। প্রথম যখন লিখি তখন কিছু পাবার জন্যও লিখিনি, চরম দুর্দিনেও না। বরং যা লিখেছি তা মানুষের জন্যিই লিখেছি। এখনো সেই পথেই আমাদের ক্লান্তিহীন যাত্রা।'[১১] কবির একটি অসামান্য কাব্যগ্রন্থ 'কমরেড সলাইনটা সোজা করুন'। নামকরণেই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। এই ভাঙনের মুহূর্তেও কবি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস রেখেছেন। পাশাপাশি মায়োকোভস্কির সতর্কবাণী কতখানি ভবিষ্যদবাণী ছিল তাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। 'মায়োকোভস্কি' কবিতায় তিনি বলছেন—

'সেদিন তোমার সতর্কবাণী কেউ-ই শোনেনি।
তবু, অসঙ্গতির শিখা নেভাতে বহু চেষ্টা করে গেছ তুমি..'[১২]

রোমান্টিক কবি না হলেও কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে প্রেমভাবনা, সময়ভাবনা ভিড় করেছে। তাঁর শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দিন, অস্ত্র দিন'(২০১১)। সময়টা বাংলার বামপন্থী রাজনীতিতে এক গভীর সঙ্কটকাল। যে কালের মুখোমুখি শিরদাঁড়া সোজা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছেন জীবনাদর্শের প্রতি অটল স্থিতধী কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। যিনি প্রথমেই এবং সারাজীবন মূলত শ্রমিক এবং সেই সোচ্চারিত কণ্ঠে কবিও। এখানে তিনি অসহ্য পীড়ন থেকে নিস্তার পেতে যুদ্ধাস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন—

'না
ঘুরে দাঁড়াতে হবে
যুদ্ধে যাব, অস্ত্র দিন
.....
অসহ্য পীড়নে বিদ্ধ
নেই, কোনোখানে কোথাও নিস্তার।'[১৩]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সনেট নির্মার্ণের প্রথম কারিগর মধুসূদন দত্ত। এরপর দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত প্রমুখরা বাংলা সনেটকে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধুসূদন পেত্রার্ক ও শেক্সপীয়র দুই রীতিতেই সনেট নির্মাণ করেন। বাংলা সনেটের প্রথাগত রীতি ভেঙে অভিনব কায়দায় সনেট বুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরি। রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য' ও চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলি তার পরিচয় বহন করছে। প্রমথ চৌধুরি পেত্রার্কীয় রীতির সঙ্গে ফরাসি সনেট রীতির মিশ্রণ ঘটালেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের অনান্য শাখার ধারা অব্যাহত থাকলেও সনেটের নির্দশন নেই বললেই চলে। অথচ ষাটের দশকে একজন শ্রমিক কবির কড়া ও কালি পড়া হাতে দু'শোর অধিক সার্থক সনেট রচনা কি সত্যিই বিস্ময়ের নয়? কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় সনেট রচনায় কতখানি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা তাঁর 'চর্তুদশপদী কবিতা'(১৯৯৭) এবং' 'আরো চর্তুদশপদী কবিতা'(২০১৮) গ্রন্থদুটি পাঠ করলেই চাক্ষুষ হবে। তিনি সনেটের সীমাবদ্ধ রীতিনীতি মেনে কাব্যচর্চায় যে অপরিসীম অনুশীলন করেছেন তা এককথায় অভাবনীয়। বিস্তৃত গবেষণার ফসল হয়ে উঠেছে এই কবিতাগুলি।

(ঘ)

ড. অজয় কুমার ঘোষ কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন বুলগেরিয়ার কবি নিকোলা ভ্যাপসারভের। তিনিও ছিলেন কারখানার শ্রমিক। বয়লারে কয়লা জোগানো

ছিল তাঁর কাজ। বিখ্যাত রবীন্দ্রগবেষক নেপাল মজুমদার কবির কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম তাঁকে 'শ্রমিক কবি' আখ্যা দেন। কবিকে সাংস্কৃতিক সংগঠক ও সামাজিক কাজের জন্য ১৯৯১ সালে সম্মাননা প্রদান করে 'মাধুকরী' সাহিত্য পত্রিকা। ১৯৯২ সালে 'কবি তারক সেন পুরস্কার' প্রদান করে যোধন সাহিত্য পত্রিকা(চিত্তরঞ্জন, বধর্মান পশ্চিম)। ২০০৩ সালে কফি হাউস পত্রিকা, কলকাতা দেয় 'সাহিত্য সম্মান'। ২০০৪ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, স্টিল অথোরিটি ইন্ডিয়া লিমিটেড দেয় 'সাহিত্য সম্মাননা'। সারা জীবনের কবিকৃতির জন্য বেহালা থেকে ২০১১সালে পান 'আরিত্রিক কবিকৃতি সম্মাননা'। দুর্গাপুর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তাঁর ভূমিকা ও সাহচর্যের জন্য দুর্গাপুর পুর নিগম ২০১১ সালে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে। ২০১৬ সালে লিটল ম্যাগাজিন মেলা (বধর্মান) থেকে কবিকে সম্মান জানানো হয়। 'দেবলা' সাহিত্য পত্রিকা ২০১৭ সালে বাংলা অ্যাকাডেমি সভাগৃহে কবিকে সম্মাননা দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। যদিও তাঁর প্রতিভা এখনও বৃহত্তর অংশে প্রচার পায়নি। আমার মনে হয় একদিন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মযার্দা পাবেন।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রজীবনী(প্রথমখন্ড), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ,কলকাতা, ভূমিকা অংশ, পৃ.৩০।

২. সাক্ষাৎকার সংগ্রহ (২৬শে জানুয়ারি ২০১৯)।

৩. তরুণ মুখোপাধ্যায়, ছয় দশকঃনয় কবি, ২০০৬,সহযত্রী প্রকাশন, কলকাতা পৃ.১০।

৪. ড.অশোক কুমার মিশ্র, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ২০১৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা,পৃ.৩৭৭।

৫. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রমিক কবির প্রতিবাদী কবিতা,২০১৬, শ্রমশ্রী প্রকাশন, কলকাতা, পৃ.৪৯।

৬. কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ, ২০১২, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা,পৃ.২৯।

৭. ঐ ,পৃ.১৭।

৮. ঐ,পৃ.২৭।

৯. ঐ,পৃ.২৮।

১০. ঐ,পৃ.৩৫।

১১. ঐ,পৃ.১৮১।

১২. ঐ ,পৃ.১৫১।

১৩. ঐ,পৃ.২০৪।

কবি গণেশ বসুর জীবন : এক ছিন্নমূল মানুষের লড়াই

নিখিল চন্দ্র মাহাতো

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যে জীবনানন্দ-মুগ্ধতাকে সরিয়ে রাখলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে শ্রেষ্ঠ কবি বলা যায়। আর স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে শঙ্খ-শক্তি-সুনীলকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিলে ষাটের জনপ্রিয় ও ব্যতিক্রমী কবি বলা যায় গণেশ বসু। কবি সুভাষ বিলাসিতার অঙ্গ হিসেবে গলায় পরে নিয়েছিলেন দারিদ্র্য। অনুজ কবি গণেশ বসুর জীবনে সেদিক থেকে অনিবার্য ছিল গরীবী। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অবস্থা—বৈগুন্যে জীবনের পথ বন্ধুর।

গণেশ বসুর পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার চাঁদসি গ্রামে। তাঁর বন্ধু অনিল দে চাঁদসি গ্রাম সম্পর্কে বলেছেন — "সদর থেকে অনেক দূর। কিন্তু বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পাকা রাস্তা। পাকা বাড়িই বেশি, একতলা দোতলা। নানা মাপের জমিদার, ডাক্তার-কোবরেজ, শিক্ষক, স্বদেশি, নায়েব-গোমস্তা থেকে পণ্যাঙ্গনার আশ্রয়। হাট বসে নিয়মিত, বাজারও, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল। হয়তো গোড়ায় নাম ছিল চন্দ্রশ্রী। খালের ওপারে যেমন বিখ্যাত ফুল্লশ্রী, বিজয় গুপ্তের জন্মভিটে। ক্ষত চিকিৎসার স্বতন্ত্র পদ্ধতির জন্য চাঁদসির খুব নাম-ডাক ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা প্রথম ভারতীয় মহিলা এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস (পিতা ব্রজকিশোর বসু) ছিল চাঁদসিই।"[১]

কবি গণেশ বসুর পিতামহ অন্নদাচরণ বসু মজুমদারের বাড়িটি ছিল এল প্যাটার্নের, দোতলা। গ্রামের লোকের কাছে পরিচিতি দারোগা বাড়ি হিসেবে। তাঁর বারোটি সন্তান, ছ'টি ছেলে, ছ'টি মেয়ে। পঞ্চম পুত্রের নাম সুমন্তনাথ বসু মজুমদার। প্রজারা ডাকত রাঙাবাবু বলে। সুমন্তনাথ বসু মজুমদারের বিয়ে হয় বরিশালেরই দেহেরগতি গ্রামের বিলাসচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা পারুলদেবীর সঙ্গে। সুমন্তনাথ বসু মজুমদার ও পারুলদেবীর চারটি সন্তান। তৃতীয় সন্তান হলেন গণেশ বসু। তাঁর জন্ম মাতুলালয়ে অর্থাৎ দেহেরগতি গ্রামে, ১৯৪০খ্রিস্টাব্দের ১ডিসেম্বর (১৫ অঘ্রাণ), রবিবার, বিকেল চারটে নাগাদ।

স্বচ্ছল জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও গণেশ বসুর বাল্যজীবন বেশিদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়নি। কেননা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের অভিশাপ নেমে আসে। ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মানুষ পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। সুমন্তনাথ বসু মজুমদারও স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বরিশাল ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। সালটা ১৯৪৮, গণেশ বসুর বয়স তখন মাত্র আট বছর। চাঁদসির জমিদার পরিবার কলকাতায় এসে নতুন পরিচয় পেলেন - উদ্বাস্তু, শরণার্থী।

শিয়ালদহ থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় পদ্মপুকুরের কাছে, এক পরিত্যক্ত মিলিটারি

ক্যাম্পে, আশ্রয় শিবিরে। আরো অনেক শরণার্থী পরিবারের সঙ্গে শুরু হয় ক্লিষ্ট জীবন-যাপন। এই দুঃসহ জীবন-যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে তিনদিন পর ৩১. ০৮. ১৯৪৮-এ সুমন্তনাথ বসু মজুমদার সপরিবারে আশ্রয় নেন ছোটো বোনের বাড়িতে ভবানীপুরে, ৩ বি কুন্ডু লেনে। কয়েকদিন পর সরকারিভাবে রিফিউজি হিসেবে নথিভুক্ত হলেন, মিলল রিফিউজি কার্ড। সাউথ সাবার্বান স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য দুই ভাই ইন্টারভিউ দেন, তাতে গণেশ বসু উত্তীর্ণ হলেও দাদা কার্তিক বসু পাস করতে পারেননি বলে সেখানে ভর্তি হওয়া হয়ে ওঠেনি। ১৯৪৯ অথবা ১৯৫০-এ তাঁরা দুই ভাই ভর্তি হন ভবানীপুর নাসিরুদ্দিন স্কুলে।

সুমন্তনাথ বসু মজুমদার ছোটো বোনের বাড়িতে ছিলেন প্রায় আড়াই বছর। তারপর নানাবিধ সমস্যার কারণে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা চলে আসেন টালিগঞ্জের একটি বস্তিতে। একটা সস্তার ভাড়াবাড়িতে অনেক ভাড়াটের সঙ্গে নিত্য কলহদীর্ণ পরিবেশে থাকেন কয়েক মাস। তারপর আশ্রয় নেন ২ বি চন্দ্র মন্ডল লেনের একটি বাড়িতে। সেই বাড়িটি আসলে একটি দোকান ঘর। গণেশ বসুর ছোটো মামা সেটি কিনেছিলেন একটি ছোটো-খাটো আইসক্রিম কারখানা তৈরি করবেন বলে। এইসময় ভীষণ আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন অতিবাহিত হয়। কোনোদিন একবেলা খাবার জোটে তো অন্য বেলা উপোস। কোনোদিন খুদের জাউ খেয়ে থাকতে হয়, কোনোদিন কাটে শুধু মুড়ি চিবিয়ে।

সুমন্তনাথ বসু মজুমদার মাঝে মাঝে দেশে যেতেন এবং সামান্য কিছু খাজনা-টাজনা নিয়ে আসতেন। একসময় তাও বন্ধ হয়। তার উপর তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন গ্যাস্ট্রিক আলসারে। স্ত্রী পারুলদেবী সংসারের হাল ধরেন। সর্বংসহা হয়ে তিনি আগলে রাখেন পরিবারটিকে। অন্যের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ ও কাঁথা সেলাইএর কাজ নেন তিনি। পরে এক প্লাস্টিক কারখানায় দৈনিক মজুরিতে চাকুরি করেন। অথচ দেশে থাকতে রাজরানীর মতো ছিলেন তিনি। তাঁর চুল বেঁধে দেওয়া ও পরিচর্যা করার জন্য ছিল নিজস্ব সেবিকা। গ্রামের গরীব প্রজাদের কাছে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তিনিই হয়ে পড়লেন অন্যের অনুগ্রহ প্রত্যাশী।

পরিবারের এই দুর্দিনে বালক কবিকেও কাজে নেমে পড়তে হয়। দিদির সঙ্গে খবরের কাগজের ঠোঙা বানিয়ে তা বিক্রি করতেন। দাদা কার্তিক বসু দোকানে দোকানে চানাচুর সাপ্লাই দেওয়ার কাজ নেন। পরে অবশ্য তাঁরা টিউশন পড়াতেন। গণেশ বসু যখন ক্লাস ফাইভে পড়েন তখনই ক্লাস টু-থ্রির ছেলে মেয়েদের পড়াতেন। সীমাহীন দারিদ্রের কারণেই একদিন কবির ছোটো বোন মারা যান। তখন তাঁরা ছিলেন সাহানগরে কবির ন'মামা সুরেশচন্দ্র দত্ত-র বাড়িতে। কবির এই মামা ছিলেন বিপ্লবী। অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের ডান হাত। এখানে থাকার সময় একদিন সকালবেলা মুড়ি খেতে খেতে কবির বোন ঢলে পড়েন কবির কোলে। এই ঘটনা কবির মনকে ভয়ানকভাবে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

নাড়া দিয়েছিল। তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারেননি কবি। তারপর তাঁরা আর সে বাড়িতে থাকেননি।

কবির পরিবার এরপর আশ্রয় নেন ৩৭ নং গোবিন্দ ব্যানার্জী লেনে, মেজো পিসিমার (কবি তাঁকে বড়ো পিসিমা বলে ডাকতেন, কারণ বড়ো পিসিমাকে কবি কখনো চোখে দেখেননি) বাড়িতে। পিসেমশাই সুবোধচন্দ্র গুহমুস্তাফি ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার। কিন্তু তাঁরা থাকতেন ভাড়াবাড়িতে। স্থানাভাব হওয়ায় সেই বাড়ির বারান্দাতে রাত কাটাতেন। এই সময় তিনি পড়তেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে। এই ইনস্টিটিউশনের সেক্রেটারি ছিলেন শিশির কুমার দাস। কবি সারা বছর বিনা মাইনেতেই পড়াশোনা করতেন। তারপর রিফিউজি স্টাইপেন্ড-এর টাকা চলে এলে স্কুল কর্তৃপক্ষ সারা বছরের বকেয়া মাইনে কেটে নিত। এছাড়া বই কেনার খরচ হিসেবে সরকার থেকে পেতেন চল্লিশ টাকা।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় গণেশ বসুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় অনিল দে-র (অনিল দে পরবর্তীকালে নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা হয়েছিলেন। এঁর পরিচালনায় স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও অভিনয় করেছেন)। তিনি ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কবির মেজো পিসিমার বাড়ির কয়েকটি বাড়ি পরেই ৪৭ গোবিন্দ ব্যানার্জী লেনে ছিল তাঁদের বাড়ি। তাঁর মা-বাবা, দাদা, দিদি, বোনেরা কবিকে খুব ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। তখন গোবিন্দ ব্যানার্জী লেন থেকে পায়ে হেঁটে কবি স্কুলে যেতেন। বাড়ি থেকে কোনোদিন খেয়ে যেতে পারতেন না। অনিল দে মাঝে মাঝে কবিকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। ক্রমে গণেশ বসু তাঁদের পরিবারেরই একজন হয়ে ওঠেন। এমনকি তাঁদের পারিবারিক নিমন্ত্রণেও তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

বন্ধু অনিল দে-র সাহচর্যে আসার পর গণেশ বসুর জীবন নতুন মোড় নেয়। অনিল দে কবিতা লিখতেন, গান বাঁধতেন, অভিনয় করতেন। তাঁর দেখাদেখি গণেশ বসুও কবিতা লিখতে শুরু করেন। অভিনয়ও করেছেন। জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'জাগো রে ধীরে', শিবরাম চক্রবর্তীর 'পন্ডিত বিদায়' নাটকে তিনি অভিনয় করেন কখনো অনিল দে-র নির্দেশনায়, কখনো অন্যের পরিচালনায়। অনিল দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতা কাহিনী'-র নাট্যরূপ দেন, গণেশ বসু সেখানে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন। বৈকণ্ঠের খাতা'-য় ঈশান চরিত্রে পাঁচবার অভিনয় করেন। নাট্যায়ন প্রযোজিত 'কম্পন'-এ হেডরিকের অভিনয় করেন মুক্তাঙ্গনের মঞ্চে। যাত্রাতেও অভিনয় করেছেন। 'শিবাজী' পালাগানে অনিল দে হয়েছিলেন শিবাজীর অনুগামী তানাজি, আর তানাজির বালক অনুসারকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গণেশ বসু।

অনিল দে-র সঙ্গে গণেশ বসু পি.সি.সরকারের ইন্দ্রজাল সম্পর্কিত বই কিনে ম্যাজিক, হিপনোটিজম প্র্যাকটিস করতেন। পরবর্তীকালে সাহানগর স্কুল, চেতলা বয়েজ প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় ম্যাজিক শো করেন তাঁরা। গণেশ বসুকে কবিতা লিখতেও উসকে দিয়েছিলেন

বন্ধু অনিল দে। যদিও কবির প্রথম লেখা হল একটি গদ্য, যার বিষয় ছিল মহাত্মা গান্ধি। ১৯৫৪ অথবা ১৯৫৫-তে কবি 'পথের বাণী' নামে এক দেওয়াল পত্রিকায় প্রথম কবিতা লেখেন, কবিতাটির নাম ছিল 'মৃত্যু'। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'নব জীবন' পত্রিকাতেও তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮-তে বীথি বসু ছদ্মনামে কবিতা অনুবাদ করেন যা মাসিক 'বসুমতী'-তে বের হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন কবি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। অম্বিকা চক্রবর্তী বিধানসভার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে। তাঁর সমর্থনে কচি-কাঁচাদের মিছিলে অংশ নিয়ে চোঙা ফুঁকতেন, শ্লোগান দিতেন — 'ভোট দেবেন কীসে / কাস্তে ধানের শিষে', 'হারে গা জী হারে গা / জোড়া বয়েল হারে গা' (কংগ্রেসের প্রতীক ছিল জোড়া বলদ)। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র অরুণোদয় গুহ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, তাঁর নির্দেশে কবি গোয়া মুক্তি আন্দোলনের জনসভায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হন। ১৯৫৩-তে ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধি পেলে, তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় কৌতূহলবশত তাতে যোগ দিয়ে এক স্টপেজে ট্রামে উঠে কয়েকটি স্টপেজ পরে নেমে যেতেন, ভাড়া দিতেন না। ১৯৫৪-র শিক্ষক ধর্মঘট তাঁকে খুব নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী সোমনাথ লাহিড়ীর সমর্থনে মিছিল করেন, রাত একটা, দুটো, আড়াইটা পর্যন্ত জেগে পোস্টার লিখেছেন। এই ভাবেই ধীরে ধীরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

গণেশ বসু স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পরীক্ষা দিয়েই তাঁরা চলে যান বাঁশদ্রোণীতে। কবির ন'মামা সুরেশচন্দ্র দত্তকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে সরকার বাঁশদ্রোণীতে জমি দিয়েছিল। ন'মামা সেই জমি কবির বাবা সুমন্তনাথ বসু মজুমদারকে দিয়ে দেন। একখানা ছাপরা বানিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করেন তাঁরা। এই সময় কবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন টালিগঞ্জ-এ সিভিল ড্রাফটসম্যানশিপ পড়তে যান। সেখানেও সরকার থেকে চল্লিশ টাকা করে স্টাইপেন্ড পেতেন।

১৯৫৯-এ সিভিল ড্রাফটসম্যানশিপ পড়া শেষ করে কবি বঙ্গবাসী কলেজে ইভনিং-এ ভর্তি হন সায়েন্স নিয়ে। উদ্দেশ্য দিনের বেলায় চাকুরি করা এবং রাত্রে বিজ্ঞান পড়া। কিন্তু কয়েকদিন পর, বন্ধু অনিল দে-র সঙ্গে পড়ার জন্য চারুচন্দ্র কলেজে ইভনিং-এ ভর্তি হন ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে। দিন দশেক পরে ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসেন ডে-তে। বাঁশদ্রোণী থেকে কবি বেশিরভাগ দিন হেঁটেই লেক মার্কেটে চারুচন্দ্র কলেজে আসতেন। কোনোদিন পান্তা ভাত খেয়ে, কোনোদিন কিছু না খেয়ে। তখনও তিনি টিউশন পড়াতেন, ঠোঙা বানাতেন।

এই চারুচন্দ্র কলেজেই কবির জীবনে অনেকটা বাঁক এনে দেয়। কলেজে ভর্তি হয়ে কবি দেখেন সেখানে ছাত্র ফেডারেশনের কোনো ইউনিট নেই। চারুচন্দ্র কলেজের ইউনিয়ন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

দখল করে কখনো পি.এস.ইউ. (পি.এস.ইউ. হল আর.এস.পি.-র ছাত্র সংগঠন), কখনো ডায়ানা। আসলে এরা কোনো দলের নয়, যদিও কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন। ডায়ানাকে সমর্থন করতেন চারুচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল ড. ক্ষেত্রমোহন বোস। গণেশ বসু ও আরো কয়েকজন ছাত্র মিলে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াবেন। যথাসময়ে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন হয় এবং ভোটে দাঁড়িয়ে কবি রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করেন। কবিতা লেখার সুবাদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউনিয়নের সাহিত্য-সম্পাদক নির্বাচিত হন। পি.এস.ইউ.-র প্রণব মুখার্জী এবং ডায়ানার অমূল্য সেন এক মত হয়ে সমর্থন করেন তাঁকে। ছাত্র-রাজনীতি করার কারণে এই সময় কবি নানান সমস্যার সম্মুখীন হন, কিন্তু বাংলা বিভাগের প্রধান শান্তিগোপাল সিংহরায় সেই সব ঝড়-ঝাপ্টা থেকে আগলে রাখেন। কবি তাঁর কাছ থেকে পিতার মতো স্নেহ পেয়েছেন। পরে ১৯৬৩-তে অবশ্য শান্তিগোপাল সিংহরায় চারুচন্দ্র কলেজ ছেড়ে চলে যান ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে।

১৯৫৯-এর ৩১ আগস্ট শুরু হয় ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ প্রায় ৮০ জন খেত মজুর, কৃষককে গুলি করে হত্যা করে। এই বর্বরতার প্রতিবাদে পরের দিন সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট। ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দ্রীয় সমাবেশ ঘটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। সেখান থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির দিকে যাত্রা করে। হিন্দ সিনেমার সামনে পুলিশ মিছিলের গতি রুদ্ধ করতে তিনদিক থেকে ঘেরাও করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠির ঘায়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন গণেশ বসু। সেই আঘাত আজও পীড়া দেয় তাঁকে। এখনো অমাবস্যা-পূর্ণিমায় তাঁর কোমরে ব্যথা হয়। সেই সময়ের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনকেও ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল এই আন্দোলন। এই পটভূমিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন বাবা ও ছেলেকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত কবিতা - 'বাবা ফিরল, ছেলে কেন এল না।' এই সময়ের পুলিশ-মন্ত্রী কালিপদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি বিখ্যাত কার্টুন বেরিয়েছিল। তাতে দেখা যায় কালিপদ মুখোপাধ্যায় দু'হাত দিয়ে রাজভোগ খাচ্ছেন, আর সেই রাজভোগ হল মানুষের মাথার খুলি।

১৯৬১-তে আই.এ.পরীক্ষা। কিন্তু কবির এক বছরের বেতন বাকি। কতৃপক্ষ জানায় বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দিতে না পারলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তখন কবির পরিবারের যা আর্থিক অবস্থা, তাতে অত টাকা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। নীতিগত কারণে ইউনিয়ন থেকেও কোনো টাকা নেবেন না, যেহেতু তিনি ইউনিয়নের সাহিত্য-সম্পাদক। অনোন্যপায় হয়ে ভাইস প্রিন্সিপাল ড. ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরির অনুমতি নিয়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠান 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-সহ অন্যান্য কয়েকটি খবরের কাগজে। ১৯৬১-র ৬-ই জানুয়ারি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সেই চিঠি বের হয় - 'সাহায্যের আবেদন : অর্থ না জুটিলে পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ'- এই শিরোনামে। চিঠিটি

প্রকাশিত হলে দমদম নাগেরবাজারের এক পান বিক্রেতা যুবক ৫ টাকা দিয়ে প্রথম সাহায্য করেন। ধানবাদ, ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লাখনির শ্রমিকেরা মানিঅর্ডার করে পাঠায় কিছু টাকা। বেলেঘাটা জোড়ামন্দিরের কাছে থাকতেন ডা. মাধবচন্দ্র লাহিড়ী। তাঁর পত্নী এসে কবিকে দেড়শো টাকা দেন, তার উপর পরীক্ষার সময় ভালো খাবার-দাবার খাওয়ার জন্য আরো কিছু টাকা দেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা হাতে আসায় কবি বাড়তি টাকা ড. ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরির হাতে তুলে দিয়ে বলেন, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে। ডা. লাহিড়ীর পত্নী এই ঘটনার পর থেকে কবিকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। তিনি বলেছিলেন যে গণেশ বসু যতদিন পড়াশোনা করবেন তাঁর পরীক্ষার ফি তিনিই দেবেন। প্রত্যেক বছর অষ্টমীর দিনে তাঁর বাড়িতে কবির নিমন্ত্রণ থাকত। এমনকি বিশেষ বিশেষ নেমন্তন্ন বাড়িতে তিনি সঙ্গে করে নিয়েও যেতেন।

আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে কবি তিন মাসের জন্য ক্যালকাটা অটোমোবাইলস নামে একটি মোটর গাড়ি সারাইয়ের কারখানায় কাজ নেন। তারপর চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন বাংলায় অনার্স নিয়ে। এই সময় দুপুরবেলা কলেজের ক্লাস কেটে টিউশন পড়াতেন, মাইনে ১৪ টাকা। ছাত্র-রাজনীতির চেয়ে এবার তাঁর ঝোঁক বাড়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে। দক্ষিণ কলকাতার চারু মার্কেটের কাছে সি.পি.আই.-এর অফিসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু হয়। ১৯৬১-তে পার্টির সদস্য হন। ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ হয়। পিকিং রিভ্যু ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও কবি তা পড়তেন গোপনে। এই নিয়ে কিছুটা বিপদগ্রস্তও হয়েছিলেন।

১৯৬৩-তে কবি একটি কাজ পান রাঁচিতে। শালিমার প্রোডাক্টস তখন রাঁচি হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আবাসন নির্মাণের ঠিকাদার। কবি সেখানে ওয়ার্ক সুপারভাইজারের কাজ করেন। থাকেন রাঁচি মেন রোডের উপর, রায় হোটেলে। কিন্তু কুলি-কামিনদের সঙ্গে গালাগালি দিয়ে কথা বলতে হত বলে এ কাজ তাঁর ভালো লাগেনি। মাস দেড়েক বাদে সেই চাকরি ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। এরপর বন্ধু-কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে সাউথ সাবার্বাণ মেন স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি মূলত সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ক্লাস নিতেন। কয়েক মাস পরেই কবি মণীন্দ্র রায়ের আহ্বানে 'অমৃত' সাপ্তাহিক-এ সাব-এডিটরের কাজে নিযুক্ত হন। মণীন্দ্র রায় তখন আমেরিকার ইতিহাস অনুবাদ করছিলেন, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের জীবনী লিখছিলেন। মণীন্দ্র রায় বলে যেতেন, কবি তা লিখতেন। অমৃতে কাজ করতে করতেই বি. এ. পাস করেন। মণীন্দ্র রায় তাঁকে এম. এ. পড়ার পরামর্শ দেন। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই এম. এ.-তে ভর্তি হন। কবি 'অমৃত'-এর অফিসে আসতেন দুপুর ১টার সময়, ৭টার সময় 'অমৃত' বন্ধ হত। এছাড়া বুধবার 'অমৃত' বন্ধ থাকত। সেইদিন তিনি ইউনিভার্সিটিতে যেতেন ক্লাস করতে।

কবি গণেশ বসুর জীবনে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই (১৯৬২-তে) কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। অগ্রজ কবির স্নেহ

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

লাভ করে ধন্য হন তিনি। 'বনানীকে' নামে এক কবিতাও প্রকাশিত হয় এ সময় 'অমৃত'-এ। বি.এ. পড়ার সময় এক বাড়িতে দু'জন মেয়েকে টিউশন পড়াতেন, একজনের নাম ছিল বনানী। তাঁকে নিয়েই কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হলে কবির টিউশনটা যায়। যাই হোক ১৯৬৪-র এপ্রিলে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' বের হয়। কবিপত্র প্রকাশভবনের পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬১-র ২ অক্টোবর থেকে ১৯৬৩-র ৮ অক্টোবর। উৎসর্গ পত্রে লেখেন - 'আমরণ যে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার'। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। দাম ছিল দু'টাকা। প্রথম প্রকাশেই যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন কবি। এম.এ. ক্লাসে সাহিত্যিক ও অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সকলকে বইটি দেখিয়ে বলেছিলেন - আমাদেরই ছাত্র, আশা করি ভবিষ্যতে একজন কবি হবেন।

প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অধুনালুপ্ত 'অমৃত' সাপ্তাহিকে কাব্যগ্রন্থটির উপর বিস্তারিত মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। কবি তরুণ সান্যাল 'সমকালীন' পত্রিকায় (১৯৬৫) বিশদ আলোচনা করে লেখেন —'সব কবিতাই যেহেতু প্রেমের আর্তিতে মুখর, বলা যেতে পারে এই তরুণ কবি নতুন কবিতার গড্ডলধারায় হারিয়ে যাননি। অন্য বহু তরুণ যখন রমণীর প্রতারণাকে মুখ্য করে পৃথিবীর দিকে তাকান, তখন গণেশ বসু পৃথিবী ও সমাজের ম্লানতার জন্যই প্রেমের পরাজয় দেখেন। কবি প্রেম ও শিল্পকে এক কেন্দ্রে আনতে চেয়েছেন। শিল্পই প্রেম এবং প্রেমই শিল্প।"[২]

বনানীকে নিয়ে কফি হাউসে কবির বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা হত। সেই বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন—পবিত্র মুখোপাধ্যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত, রমানাথ রায়, কল্যাণ সেনগুপ্ত, আশীষ ঘোষ প্রমুখ। এই সময় থেকেই কবি তরুণ সান্যাল গণেশ বসুর প্রতি বিশেষ নজর দেন। বনানীকে নিয়ে সেই সময়ের এক গল্পকার দিলীপ মিত্র একটি গল্পও লিখেছিলেন। যা বেরিয়েছিল মাসিক 'বসুমতী'-তে।

১৯৬৫-তে এম. এ. পাস করেন, ১৯৬৬-তে ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজে ইভনিং-এ পার্ট-টাইম পড়াবার সুযোগ পান। তিনি তখন দিনে কাজ করতেন 'অমৃত'-এ, রাত্রে পড়াতেন কলেজে, সুযোগমতো টিউশনও করতেন। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনে গোটা রাজ্য তখন আবারো তোলপাড়। এই সময় অর্থাৎ ১৯৬৪-র আগস্ট থেকে ১৯৬৬-র ডিসেম্বর পর্যন্ত কবি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিজের মুখোমুখি'-র কবিতাগুলি রচনা করেন। কাব্যগ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪, ইংরেজি ১৯৬৭-র মে। মৃণাল দেবের সৌজন্যে বীক্ষণ প্রকাশ ভবনের পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন নিতাই ঘোষ। প্রচ্ছদ শিল্পীও নিতাই ঘোষ। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬০। দাম তিন টাকা। ছাপেন ডি ডি প্রিন্টার্সের পক্ষে দেবিদাস মুখোপাধ্যায়। উৎসর্গ করেন কবি বিষ্ণু দে-কে।

গণেশ বসুর বহু আলোচিত কবিতা 'সমুদ্রমহিষ' এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবিতাটি

পড়ে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'সীমান্ত' পত্রিকায় লেখেন — 'সম্প্রতি বাংলা কবিতায় যখন সব-ছড়ানো সব-হারানো দেউলেপনার যুগ, যখন পুরো জাতটার সঙ্গে বাংলা কবিতাও পি. এল. ৪৮০-র মুষ্টিভিক্ষার মুখ চাওয়া, তখন কবি গণেশ বসুকে আত্মীয় বোধ করতে পেরে স্বস্তি পেলুম। মনে হল আমারও 'রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।'[৩]

কবিতাটি পাঠ করে কবি বিষ্ণু দে একটি আস্ত কবিতা লিখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন গণেশ বসুকে —

"মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাস্ফীত সমুদ্রমহিষ
তোমার কবিতা ওঠে জ্বলে জ্বলে ফসফরাসরাশি,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশপাতাল জুড়ে, চুল ওড়ে, বাহুর গারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল
সফেন উন্মার্গ নৃত্যে বিশ্বময় ভাষা খোঁজে
তখন নিজেকে লাগে অপরাধী, ছত্রীসেনা নেমে পড়ে কোনো
পর্দার আড়ালে বুঝি সুবিধাদানের
ভূমিকায়, পরস্পর বিপ্রতীপ কোণে
চেনা চেনা মুখে ক্ষিপ্র ধ্বংসের সেব
ঊর্ধশ্বাস, কেউ খোঁজে কংকালের কঠিন বিবর
বিমিশ্র হৃদয়ে শুধু অসহায় আর্তনাদে, আর
ঊর্ণাজাল গেঁথে চলে উত্তরে দক্ষিণে।
তখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্তমহিষ
নীলে লাল আহিরভৈরবে,
আর দশপ্রহরণ হাতে হাতে তুলে দেয়
তোমার কাব্যের যিনি মরণমর্দিনী।"[৪]

(১৯৬৮-র ১৮ই এপ্রিল কবি গণেশ বসুকে লেখা বিষ্ণু দে-র চিঠি।)

প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী লেখেন — 'কবি গণেশ বসুর শিল্প-মনন কোনো বোধহীন একদেশদর্শিতা কখনো স্বীকার করেনি। তাঁর চিত্তলোকে আছে সেই সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি, মনন-লোকে আছে সেই ক্ষমতা যার ফলে তিনি প্রগতিক পদযাত্রায় বহুমুখী ধারাগুলির বিচিত্র সংশ্লেষ বুঝে নিতে পারেন।'[৫]

১৯৭৩-এর মার্চ মাসে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রকাশনা থেকে যে 'স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় কবিতা' শিরোনামে 'বাংলা কবিতা সংকলন' প্রকাশিত হয় তাতে 'সমুদ্রমহিষ' কবিতাটি স্থান পায়।

১৯৬৯-এ কবি অস্থায়ীভাবে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

পান। পাকাপাকি ভাবে অধ্যাপনার সুযোগ পান ০১.০৯.১৯৭০-এ। 'অমৃত' থেকে বিদায় নিয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালেই কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' প্রকাশিত হয়। জয়ন্তকুমারের সৌজন্যে অনুভব প্রকাশনীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক। প্রচ্ছদ পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। বইটির দাম ছিল দু'টাকা। ছাপেন কুমার প্রিন্টার্সের পক্ষে জয়ন্তকুমার। কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কবি মণীন্দ্র রায়কে। এই কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল জানুয়ারি ১৯৬৭ থেকে অক্টোবর ১৯৬৯। খাদ্য আন্দোলনের পর তখন শুরু হয়ে গেছে নকশাল আন্দোলন। একদল তরুণ রক্তের বিনিময়ে সমাজ বদলের প্রতিজ্ঞায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের 'রক্তের ভিতরে স্বপ্ন, হাজার হাজার স্বপ্ন'।[৬] বলা বাহুল্য সে স্বপ্ন কবির রক্তেও খেলা করে। তাই শাসকের জল্লাদবৃত্তিতে কবির 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র ফেটে পড়ি লক্ষ লক্ষ ক্রোধের ফার্নেস'[৭] অথবা 'ধমনী নিদ্রিত সিংহ ফুঁসে ওঠে রৌদ্রের কেশরে'।[৮]

'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কথাশিল্পী জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লেখেন — 'রৌদ্র কিংবা অন্ধকার হতে দ্রুতবেগে বর্শার ফলক প্রথমে স্পর্শ এবং তারপর, পর পর স্নায়ু, মাংস, রক্ত ও অস্থি ভেদ করলে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। রক্তের বন্যা নয়, মোহময়ী বেত্রবতীও নয়, কমনীয়তায় স্নেহময়ী অঞ্জনা তো নয়ই। কালো কাঠের গুঁড়ি, শক্ত পাথরের চাঁই আর শুকনো বালির মাঝে মাঝে ছড়ানো-ছিটানো তিস্তা। ভিতরে ভাসান। মাঝে মাঝে প্রতিশোধ-অস্থির প্রলয়। কিন্তু রক্তের। এই হল রক্তের ভিতরে রৌদ্রের মেজাজ, গণেশ বসুর কবিতা। এ গ্রন্থ এই মেজাজেরই ঊর্ধতর সোপান। কঠিন জটিলতা, ক্রোধ আর নিশার মাঝখানে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমুদ্রমহিষ হয়ে, 'রক্তের ভিতরে রৌদ্রে' এসে তা যেন বিস্ফোরণের উচাটনে দুটি শক্ত হাত হয়ে ওঠার অধীর প্রয়াসে অশান্ত।'[৯]

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় লেখেন —'আমি স্বভাব-সংগতভাবে কবিতায় বা যে কোনো শিল্পে রাজনীতি চর্চার বিরোধী, শিল্পীর স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশই শিল্প এই বিশ্বাস একান্তে লালন করে এসে বিরোধী বিশ্বাসের সম্মুখীন হওয়ামাত্র বিপরীত মতাদর্শের গভীরতা ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলাম। উপলব্ধি করেছি যে, কোনো বিশ্বাস যদি স্রষ্টার অন্তর্জগৎ থেকে উদ্ভুত হয় তাহলে তার জোর সৃষ্টির প্রতিটি কোষে কোষে শক্তিশালী জীবনীশক্তি সঞ্চার করে, তাকে অপছন্দ হতে পারে, অবহেলা করা চলে না, এমনকি বিশ্বাসের ভিন্নভূমিতে অবস্থান করেও অভিভূত হতে হয়; গণেশ বসুর কবিতার প্রাণশক্তি এইখানে, বিশ্বাস ও আচরণে তিনি সৎ, নিজের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া এতই বিবেকসংগত, সেই মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য লড়াই করতে তিনি পিছপা নন; এই বিশ্বাস তাঁর কবিতার অন্তর্শক্তি, সৃষ্টির ও সমৃদ্ধির অন্তর্গত প্রেরণা ও প্রাণশক্তি।'[১০]

১৯৭০-এর মার্চে কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন কাব্যটির নাম ছিল 'অধিকার

রক্তের কবিতা', পরবর্তীকালে কবি এই কাব্যের নাম পরিবর্তন করে 'লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা' রাখেন। কাব্যটি আসলে একটিই দীর্ঘ কবিতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২। সীমান্ত প্রকাশনীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন দীপেন রায়। পরিবেশক মনীষা গ্রন্থালয়। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ, অলংকরণ ধ্রুব রায়। দাম দু'টাকা। ব্যবসা ও বানিজ্য প্রেস থেকে মুদ্রিত। রচনাকাল জানুয়ারি, ১৯৭০। উৎসর্গ করেন কবি তরুণ সান্যালকে। কাব্যের ভূমিকায় কবি লেখেন — "গত বছরই 'লেনিনের যুগ' কাব্য-সংকলন সম্পাদনার সময়ে মাথায় এসেছিল এক ঝোঁক। দীর্ঘ কবিতা লেখার রোখ চাপে। তবে এর মাশুলও কম গুনতে হয়নি। লেনিন আর লেনিনবাদের সারাৎসারে নিজের অক্ষমতার সান্ত্বনা নেই।"

'লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা' কাব্যটি রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —"দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তখন রঙের বদল ঘটেছে। দুঃশাসন কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে দু'বারের যুক্তফ্রন্ট। ভুল হোক শুদ্ধ হোক গ্রামে গঞ্জে উগ্র বামপন্থীদের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে মার্কস-লেনিন-মাও-এর নাম। বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু শব্দ উত্তরের হাওয়ায় রাশি রাশি ফেটে যাওয়া শিমূল তুলোর মত শ্রেণীশত্রু, খতম, শোধনবাদ, নয়া-শোধনবাদ...এবং এইরকম আরও।"[১১]

আর তখন লেনিনকে নিয়ে জন-জাগরণের স্বপ্ন দেখছেন মার্কসপন্থী সমস্ত কবি। কবি তরুণ সান্যালের সঙ্গে "লেনিনের যুগ" কাব্য-সংকলন (১৯৬৯) সম্পাদনা করছিলেন গণেশ বসু। কবি বিষ্ণু দে লিখছিলেন এমন সব উজ্জীবিত পংক্তি - ১) 'পরদেশি পরবাসী কত ছিল লেনিন তোমার দেশে?' ২) 'লেনিনের মনীষার হস্তাক্ষর বিশ্বব্যাপ্ত আজ ইতিহাসে', ৩) 'শুনেছি যে লেনিনেরও সাধ ছিল একদিন সকলেই হয়ে যাবে শতায়ু লেনিন !'[১১] তখন মার্কসবাদী যে-কোনো কবির পক্ষেই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল লেনিনকে নিয়ে কবিতা রচনা। গণেশ বসুও লেনিনকে নিয়ে লিখে ফেললেন একটি দীর্ঘ কবিতা — 'লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা'।

কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি মণীন্দ্র রায় লেখেন —"গণেশ বসু যা করতে চেয়েছেন এবং করেছেন তা তরুণ কবির পক্ষে দুঃসাধ্য। বর্তমান কালের এবং অনতিদূর অতীতে বাংলা দেশের সমাজ জীবনে যা ঘটেছে সেই বহুতল বিশিষ্ট বিচিত্র জটিল বাস্তবকে একটি দীর্ঘ কবিতার অবয়বে সমগ্রতা দেওয়া এবং তাতে মানুষের ইতিহাসে নবযুগের স্রষ্টা মহামতি লেনিনের ভাবসমর্থন একীভূত করা সৎ এবং পরিশ্রমী কবিত্ব শক্তিরই মুখাপেক্ষী। গণেশ এ কাজে আশাতীতভাবে সফল হয়েছেন।"[১২]

১৯৭১-এর জুন-এ গণেশ বসুর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' প্রকাশিত হয়। সীমান্ত প্রকাশনীর পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন দীপেন রায়। পরিবেশনায় সারস্বত লাইব্রেরী। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রী অনিল দে, শ্রী অশোক সেন, শ্রী বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়কে। কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১।

'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' হল গণেশ বসুর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রয়োগে কাব্যের নামকরণ এখানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতার স্বাদ যে কোনো দেশের পক্ষেই অমৃত আস্বাদের সঙ্গে সমতুল্য। কিন্তু সেই স্বাধীনতা লাভের পথটি বহু মানুষের আত্মত্যাগে ও রক্তক্ষরণে পিচ্ছিল। যা মৃত্যুর মতোই শোকাবহ। অর্থাৎ অমৃত আস্বাদের জন্য বা স্বাধীনতা লাভের জন্য মৃত্যুকে তুচ্ছ করে মানুষের লড়াই করার কথাই ব্যঞ্জিত হয়েছে এই নামকরণে। ১৯৭১-এ এপার ও ওপার উভয় বাংলায় উত্তাল। এপার বাংলায় অতি-বামপন্থী কয়েকজন তরুণ নতুনভাবে দেশ গড়ার স্বপ্নে মশগুল। তারা তখন বামপন্থীর ছদ্মবেশধারী কংগ্রেসের গুপ্তচর খুনের তান্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছে। আর এর পাল্টা হিসেবে শাসক তাদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। অন্যদিকে ওপার বাংলা তখন তাদের ভাষাগত Identity-কে সম্বল করে বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে মুক্তিলাভের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এইরকম টালমাটাল সময়েই গণেশ বসু 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ'-এর কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন।

'অমৃত'-এ কাজ করার সুবাদে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ভি.ডি.জে.-র আমন্ত্রণে জার্মানিতে যান কবি। বেইরুট সহ হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, তাশখন্দে ভ্রমণ করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নেন। বার্লিনের ভি.ডি.জে. পুরস্কার(১৯৭৩) প্রদান করা হয় তাঁকে। এইসময় ইরিনা নামে এক জার্মান তরুণীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁর। যদিও সে প্রেম প্রত্যাশিত পরিণতি পায়নি। জার্মানি থেকে ফিরে এসে আবার অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। "অমৃত"-এ সাংবাদিকতা করার সময় তিনি অমৃতবাজার - যুগান্তর - অমৃত এমপ্লয়িজদের ইউনিয়ন গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, প্রতিষ্ঠাতা সহঃসম্পাদকও হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি পশ্চিববঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (WEBCUTA)-র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই সমিতির নানা সমস্যার সমাধানে ছুটে বেড়িয়েছেন ১৯৯৯ সাল থেকে। এছাড়া বিভিন্ন কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য হয়ে গঠনমূলক কাজ করেছেন। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবেও বঙ্গবাসী (মর্নিং, ডে, ইভনিং), নিউ আলিপুর কলেজ প্রভৃতির মতো বহু কলেজে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে পঠন পাঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন।

১৯৮২-র মার্চে গণেশ বসুর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ "বাঘের থাবার নিচে" প্রকাশিত হয়। মডেল পাবলিশিং হাউস থেকে জয়দেব ঘোষ এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। প্রচ্ছদ নিতাই ঘোষের আঁকা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। 'বাঘের থাবার নিচে'-র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৮২-র ফেব্রুয়ারি। কবির পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ' প্রকাশের প্রায় দশ বছর পর এই কাব্য প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চালচিত্রে অনেক বদল ঘটেছে। বদল এসেছে কবির ব্যক্তিগত জীবনেও। তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পার হয়েছে। বিদেশ ঘুরে এসেছেন

তিনি। দশ বছরের বেশি সময় ধরে অধ্যাপনা করছেন। ফলে চিন্তা ভাবনাতেও এসেছে এক পরিণতির ছাপ। যার প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যের কবিতাগুলিতে।

এই কাব্যগ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপটটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন মৃদুল দত্ত রায় — "ষাট-সত্তরের দশক পেরিয়ে এসে বাঙালি কবিদের জীবন নাগরিক ও ব্যক্তিগত জটিল আবর্তে প্রবেশ করেছিল। গণসংগ্রাম, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ মানুষের জন্য নতুন সূর্য ওঠেনি। বরং এক অনিবার্য ক্ষয় জীবনকে গানহীন করতে ভারী থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল। গণজীবন ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছিল। এরকম সংকটের দিনে গণেশ বসুর মতো দরদী শিল্পীরা একবারের জন্যও জনগণের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। ষাটের দশকের আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। আর আশির দশকের আন্দোলন হয়ে উঠল একক মানুষের সার্বিক বেঁচে থাকার লড়াই। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শকে অতিক্রম করেও যে কেবলমাত্র জীবনের প্রতিনিধি হয়ে বহুর জীবনের সংকটকে স্পর্শ করা সম্ভব, তা এ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।"[১৩]

গণেশ বসুর 'নীরব সন্ত্রাস' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৯-এর জানুয়ারিতে। শঙ্খ পুস্তক প্রকাশনের পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন শঙ্খনীল দাস। ছাপেন দি শিবদূর্গা প্রিন্টার্সের নারায়ন চন্দ্র ঘোষ। প্রচ্ছদ শিল্পী নিতাই ঘোষ। উৎসর্গ - শ্রীচরণেষু মা-কে। কবিতাগুলির রচনাকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ থেকে জানুয়ারি ১৯৯৯। 'নীরব সন্ত্রাস' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন — "১৯৯০-এর একেবারে গোড়ায় এটি আচমকায় আমি ব্যবহার করি শ্বেত সন্ত্রাস, লাল সন্ত্রাস, গৈরিক সন্ত্রাস ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে। এই শব্দটি বেরিয়ে আসে আমি যে কলেজে পড়াতাম সেখানকার অধ্যক্ষ ও তার একান্ত অনুগত মুষ্টিমেয় অধ্যাপকদের দুঃসহ আচরণে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে।"[১৪] কবি বাল্মীকি ক্রোঞ্চের শোকে শোকাভিভূত হয়ে যেভাবে শ্লোকের জন্ম দিয়েছিলেন, গণেশ বসুও তেমনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যাচারিত হয়ে 'নীরব সন্ত্রাস' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। কিন্তু তারপরেই জীবন-অভিজ্ঞ কবি দেখলেন আজ গোটা দেশ নীরব সন্ত্রাসে আক্রান্ত। এ সন্ত্রাস শিরায় শিরায়, পরতে পরতে ঘুন ধরানো এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে সঞ্চারিত। হারিয়ে গেছে মানবিকতা, মানুষের মন হয়ে গেছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। প্রাণের সজীবতা, সরসতা কোথাও নেই, যেন — 'গোটা দেশ ডুবে যায় মর্গের ভিতরে।'[১৫] জীবনের এই বিশুষ্ক ছবি ধরা পড়েছে সুদীর্ঘ 'খরা' কবিতায়।

কবি পার্থ রাহা 'গণশক্তি'-তে (১৯৯৯) লেখেন — "এই গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'খরা' একটি উনিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ কবিতা। খরা প্রকৃতিতে, খরা মানুষের মনে, চারপাশের জীবনে। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে প্রকৃতির খরা আফ্রিকা থেকে ওড়িশায়। প্রকৃতির খরা থেকে আমাদের চারপাশের বন্ধ্যাত্ব খরা। কিন্তু এই কবিতার ঐশ্বর্য্য হল এক নিবিড় প্রত্যয়।"[১৬]

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

'নীরব সন্ত্রাস' কাব্য রচনার আগে গণেশ বসু দুটি ভাষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন পবিত্র সরকারের সঙ্গে। ১৯৮৯-এর মার্চে প্রকাশিত হয় 'ভাষা-জিজ্ঞাসা' আর ১৯৯১-এর জুলাইয়ে প্রকাশিত হয় 'ভাষা-সরিৎসাগর'। দুটি গ্রন্থই 'বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির' থেকে প্রকাশিত।

২০০১-এর ৩০ নভেম্বর কবি অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। ২০০২-এ তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থ (বনানীকে কবিতাগুচ্ছ, নিজের মুখোমুখি, রক্তের ভিতরে রৌদ্র, লেনিন - অধিকার রক্তের কবিতা, অমৃত আস্বাদে মৃত্যু বাংলাদেশ, বাঘের থাবার নিচে, নীরব সন্ত্রাস) নিয়ে 'গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১' প্রকাশিত হয়। ২০০৩-এ ভাষা-সংক্রান্ত আরেকটি বই 'ভাষাসঙ্গী' প্রকাশিত হয়।

গণেশ বসুর অষ্টম কাব্যগ্রন্থ 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন' প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০০৫-এ। বসুধারা প্রকাশনার পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন কৌস্তুভ বসু। গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় এই 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন'-ই হল কবির জীবন ও কাব্যের বীজমন্ত্র। শৈশবে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসে অর্ধাহারে, অনাহারে কাটানোর সময় কবি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন অন্নের মহিমা। ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেই ছাত্রাবস্থায় খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে মার্কসীয় আদর্শে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কবিতার মধ্যেও আমরা তার ছাপ দেখতে পাই। অপরদিকে অশ্রু হল ছিন্নমূল মানুষের, ক্ষুধার্ত মানুষের, সর্বহারা, অত্যাচারিত, শোষিত মানুষের কান্নার প্রতীক। আর কবিতা হল কবির ভায়োলিন। তাতে অসহায় মানুষের বেদনার সুর যেমন বাজে, তেমনি বিদ্রোহের ঝঙ্কারও শোনা যায়।

২০০৬-এ সাহিত্য কৃতির জন্য গণেশ বসু মঙ্গলাচরণ স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন', 'ভাসান দরিয়া' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৮, বসুধারা প্রকাশনী থেকে) ও 'ভাঙা বইঠার গান' (প্রথম প্রকাশ ২০১১, জানুয়ারি, মনন প্রকাশনী থেকে) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মৃদুল দত্ত রায় বলেন — "গণেশ বসুর রাজনৈতিক বিশ্বাস যা-ই থাকুক না কেন, দলীয় রাজনীতির অপরিসর, সংকীর্ণ, বাদুরে গন্ধে দমবন্ধ করা আদর্শে তিনি নিজের কবিতাকে বেঁধে ফেলেননি। তিনি দলকে পেরিয়ে দেখেছেন মানুষকে। সেই মানুষের যন্ত্রণা বারবার তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাই একসময় মানুষকে সংগ্রামী বোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টি, তার বর্তমান স্বৈরচার গণেশ বসুকে নীরব করতে পারেনি।...

গণেশ বসুর 'অন্ন অশ্রু ভায়োলিন', 'ভাসান দরিয়া' এবং 'ভাঙা বইঠার গান' পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার এক বিরাট ক্যানভাস হয়ে উঠেছে'।[১৭]

কবির একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'নরকরোটিতে প্রজাপতি' প্রকাশিত হয় ২০১১-র মার্চে। মনন প্রকাশনী থেকে। গ্রন্থটি আসলে কবির দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা, সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্যরচনার

ফসল। এজন্য অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয়ও সাহিত্য। অবশ্য তাতে ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। গোপা দত্ত ভৌমিক গণেশ বসুর প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন— "লক্ষ্যণীয় তাঁর পড়াশোনার ব্যাপ্তি, গভীরতা, চিন্তার মৌলিকতাকে প্রকাশ করার ধরণটি। পান্ডিত্যের গদাঘাত করা তাঁর স্বভাবে নেই, আবার জনপ্রিয় হবার তারল্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। এমন ভারসাম্যময় প্রবন্ধ খুব বেশি দেখা যায় না।... গণেশ বসুকে কবি হিসেবেই লোকে প্রধানত চেনে, কিন্তু কবিখ্যাতির নীচে চাপা পড়ে রয়েছে তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়। পদ্যরীতির মতোই গদ্যরীতিতে রয়েছে তাঁর জোরালো অধিকার।"[১৮]

গণেশ বসুর পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বর্ণময় পৃথিবী', প্রকাশ জুন ২০১৩, মনন প্রকাশনী থেকে এবং 'বলগা হরিণের শিং', প্রকাশিত হয় মার্চ ২০১৫, কবিতা সীমান্ত থেকে। কবির সবচেয়ে বড় কাব্যগ্রন্থ 'বলগা হরিণের শিং', ১৯৬টি কবিতা স্থান পেয়েছে এখানে। কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যও চোখে পড়ার মতো। 'শাসক উন্মাদ হলে', 'শয়নকক্ষেও কর চাপালেন তারা'-র মতো প্রতিবাদী কবিতা যেমন রয়েছে সেখানে, তেমনি 'বন্ধুতার মর্ম বুঝি বিদায় বেলায়', 'বাবাকেই দেখি'-র মতো একান্ত ব্যক্তিগত কথাকেও কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। জীবনের প্রান্ত বেলায় দাঁড়িয়ে যুবা বয়সের প্রেমের কথা, কবি-প্রেমিকা ইরিনার সঙ্গে বৃষ্টিমুখর বার্লিনের রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার কথাও বলেছেন তিনি।

'বলগা হরিণের শিং' হল কবির এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। অবশ্য কবির লেখনী এরপরও থেমে থাকেনি। আশি বছরে পা দিয়ে এবং অসুস্থ শরীর নিয়ে এখনও তিনি সমানে লিখে চলেছেন। ২০১৯-এর শারদীয় সংখ্যায় 'নবপর্যায়', 'নতুন পথ, এই সময়', 'কবিতা কলকাতা', 'শারদীয় কালান্তর', 'শারদ নন্দন' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। 'ক্ষমতাই শেষ কথা নয়', 'মানবতা অদ্ভুত নীরব' প্রভৃতি কবিতাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় তাঁর লেখনীর অভিমুখেরও বদল হয়নি। শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মানুষের প্রতি অন্যায়, অবমাননা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরতে পিছুপা হননি। জাতীয়তাবাদের আড়ালে মানবতার অপমৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে কবি লেখেন—

"মানবতা অদ্ভুত নীরব, /রক্তে ভাসে শিশুদের শব,/ এর নাম রাষ্ট্রধর্ম বুঝি?/ মর্টারে অভিযানে জাতীয়তা স্মরণীয় পুঁজি।.../ মানুষ নিখোঁজ হয়, ছররা চলে মাত্রাহীনতায়/রাত্রি জুড়ে শুধু আর্তস্বর/ আপেলের বনে বনে মৃত্যুর খবর।"[১৯]

তথ্যসূত্র :

১) "আমার বন্ধু কবি গণেশ বসু", "অহর্নিশ"(পত্রিকা), বর্ষ - ১৯, সংকলন - ২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২ পৃষ্ঠা - ৫৯

২) গ্রন্থ-পরিচয়, "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৪

৩) গ্রন্থ-পরিচয়, "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৪

৪) "অহর্নিশ"(পত্রিকা) বর্ষ আট, একাদশ সংকলন, শীত ১৪১১, পৃষ্ঠা - ৩

৫) গ্রন্থ-পরিচয়, "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৫

৬) "রক্তের ভিতরে স্বপ্ন", "রক্তের ভিতরে রৌদ্র", "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৯১

৭) "রক্তের ভিতরে রৌদ্র", "রক্তের ভিতরে রৌদ্র", "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৯৫

৮) "সিংহ", "রক্তের ভিতরে রৌদ্র", "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৭৪

৯) গ্রন্থ-পরিচয়, "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৫

১০) গ্রন্থ-পরিচয়, "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৫-২৭৬

১১) "গণেশ বসুর কবিতা", "এবং মুশায়েরা"(পত্রিকা), শারদীয়া ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৩০৯

১২) গ্রন্থ-পরিচয়, "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৬

১৩) "গণেশ বসুর কবিতা : এক অনির্বাণ রৌদ্রহাতিয়ার", "অহর্নিশ"(পত্রিকা), বর্ষ - ১৯, সংকলন - ২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২ পৃষ্ঠা - ৭৫

১৪) "কবি গণেশ বসুর সঙ্গে কিছুক্ষণ", "সময় তোমাকে"(পত্রিকা), উৎসব সংখ্যা - ২০১০, পৃষ্ঠা - ৯৭

১৫) "খরা", "নীরব সন্ত্রাস", "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭০

১৬) গ্রন্থ-পরিচয়, "গণেশ বসুর কবিতা সমগ্র ১", প্রকাশ ২০০২, বসুধারা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ২৭৯

১৭) "গণেশ বসুর কবিতা : এক অনির্বাণ রৌদ্রহাতিয়ার", "অহর্নিশ"(পত্রিকা), বর্ষ - ১৯, সংকলন - ২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২ পৃষ্ঠা - ৭৬

১৮) "মনন ও আবেগের সমন্বয়", "অহর্নিশ" (পত্রিকা), বর্ষ - ১৯, সংকলন - ২৪, গ্রীষ্ম ১৪২২, পৃষ্ঠা - ৬৫

১৯) "নবপর্যায়"(পত্রিকা), শারদীয় ২০১৯

ছোটগল্প

কাযান শহরে এলেন তিনি

অমর মিত্র

ইতালির ভেনিস নগরে লকডাউন চলছে। একটি ভিডিও পেয়েছিলাম মাসখানেক আগে। দুপুর ২-৩০ নাগাদ নগরে একটিও মানুষ নেই। নিস্তব্ধ নগরে শুধু কিছু পায়রা। গির্জার ঘন্টাধ্বনি। মার্কো পোলো ভেনিসের মানুষ। ভূ-পর্যটক। যে নগর জনপদ পেরিয়ে সে এল, তার কথা শুনুন মেয়র মহোদয়।

নগরে মানুষ নাই। কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরোন মাসাধিক কাল বন্ধ। পৃথিবীতে লকডাউন চলছে। সেই খবর নিয়ে মার্কো এখন তাতার দেশের কাযান শহরের মেয়রের মুখোমুখি।

মেয়র মহোদয়, আমি কাযান শহরে পৌঁছেছি কত নগর, জনপদ পেরিয়ে। ভোলগার ওপার থেকে দেখেছি অপরূপ এই নগর। উপাসনালয়, রঙ্গালয়ের শীর্ষ কোন পথে এখানে এল মার্কো, তা সে নিজেই জানে না। মার্কো শুধু পৃথিবীর পথে হেঁটেছে। শুনুন মেয়র স্যার, কোন মার্কো পোলো তা আমি জানি না। ৫০০ বছর আগের, না পরের? আমি ছেলেবেলায় ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলাম, টাইফয়েডে ভুগেছিলাম, আর বসন্ত তো ছিলই। জল বসন্তে ঘরের ভিতরে ঘর, মশারীর ভিতরে ছিলেন বিদ্যাধর। তখন পেনসিলে আমি খবরের কাগজ লিখতাম। সেই আমার প্রথম লেখা। লেখার চেষ্টা। একটা বিমান আঁকলাম, তার নিচে খবর লিখলাম, বিমান দুর্ঘটনায় এতজনের মৃত্যু। হ্যাঁ, সেই সময় প্যান আমেরিকান বিমান দমদমে অবতরণ করতে গিয়ে কৈখালির কলাবনে আছড়ে পড়েছিল। অনেক জীবনহানি হয়েছিল। আমি এত বয়সে এসে সেই খবরের কাগজ লিখছি...। করোনার দিনগুলির খবর। মেয়র মহোদয়, শুনুন, এই যে মৃত্যুভয়, এই ভয় এই প্রথম নয়। হিরোসিমা নাগাসাকি পার করেছে জাপান, চেরনোবিল পার করেছে পূর্ব ইওরোপ, প্লেগ, স্প্যানিস ফ্লু, ফ্রেঞ্চ ফ্লু...কত মহামারিতে মরেছে মানুষ। কালান্তক ভাইরাসের ভয়ে মশারির ভিতরে আত্মগোপন করে আমি আমার মতো করে খবর লিখছি। বিমান বাহিত হয়ে এই অদৃশ্য ঘাতক মহাদেশ থেকে মহাদেশে ঢুকে পড়ে মানুষ মারছে। ছেলেবেলায় মা শীতলার এমন অদৃশ্য পরিভ্রমণের কথা শুনেছি। ঠিক এই সময়ে। এই চৈত্রদিনে, যখন শিমুল পলাশ ফোটে, বাতাসে কাপাস, শিমুল তুলো ওড়ে, আমের মঞ্জরীতে দশদিক ম ম করে, গাজনের সন্ন্যাসীরা মহাদেবের চরণের সেবা লাগি...ডেকে ডেকে গ্রামের পথে হাঁটে, তখন শেতলাবুড়িও খর রোদের ভিতর হাঁটে মানুষের খোঁজে। পথের কুকুর গন্ধ পেয়ে লেজ গুটিয়ে বাগানে, ঝোঁপেঝাড়ে ঢুকে পড়ে জিভ মেলিয়ে হ্যা হ্যা করতে থাকে। আমি এখন করব কী? মশারির ভিতরে বসে খবর লিখছি। সারাজীবন ধরে কত খবর পেয়েছি, এখনো পেয়ে যাচ্ছি, রয়টার,

পি.টি.আই. অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এ. পি.), নিজস্ব সংবাদদাতা...যেমন খবর পাঠাত সেই পৃথিবীতে, তেমন খবরই আমি দেব, আমি বুড়ো খবরিয়া বলছি সেই অদৃশ্য ঘাতকের কথা। ডাকিনির ঝাঁটায় উড়ান দিয়ে সে পৌঁছে গেছে মহানগরে। মহানগর থেকে গাধার পিঠে চেপে মফঃস্বলে গেছে। তেহট্ট, চন্দননগর, শিলিগুড়ি, নিউইয়র্ক, ভেনিস, সিডনি, দিল্লির মহাসড়ক থেকে অলিগলিতে।

কাযান শহরের মেয়র এই প্রথম মার্কোর দেখা পেলেন। ভূপর্যটক মার্কো পোলো ৫০০ বছর আগে এই শহরে এসেছিলেন তাতার সম্রাটের কাছে। ইনিও মার্কো পোলো। পিছনের ৫০০ বছর হেঁটে এসেছেন, নাকি তাঁর পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছেন? মেয়র দেখলেন মার্কোর গায়ের রঙ রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে, সোনালি চুলে ধূসরতা। মেয়র মার্কোর যে ছবি দেখেছেন, তার সঙ্গে এই প্রবীণের মিল কম। শুধু চিবুকের গড়নে কিছু মিল দেখা যায়, ঈষৎ ছুঁচোল তা। মুখে অনেকটা দাড়ি জমেছে নিয়মিত খেউরি না হওয়ার কারণে। মেয়র নিজে সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। মস্ত চেহারা। তিনি মধ্যবয়সী। মেয়রের কত কিছু জানতে হয়। শহরে একজন বিদেশি এসেছে, সে নাকি সেই কত বছর আগে, কত শত বছর আগে দূর পাশ্চাত্য ভেনিস নগর থেকে এসেছিল এই নগরে। মেয়রের মনে হচ্ছিল, লোকটার গায়ে বহু দেশ, বহু জনপদের ধুলো, বহুদেশ বহু জনপদের বাতাস, বহু বর্ষের স্মৃতি আর স্বপ্ন। লোকটা বলছে, ঘুরতে ঘুরতে সে ভুলেই গিয়েছিল এই জনপদের কথা। সে ঘুরতে ভালোবাসে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন আচমকা দেখতে পেল আঙিনায় মানুষ নাই, সড়কে মানুষ নাই। অশ্বগুলির মুখে লাগাম, পিঠে জিন নাই, কিন্তু তারা বনের ঘোড়া নয়, তারা বন থেকে মানুষের কাছে এসে পোষ মেনেছিল। তারা প্রভু পেয়েছিল। কিন্তু এখন একেলা ঘুরছে হেথা হোথা। খাদ্যের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। গৃহে অন্তরীন প্রভুরা তাদের ত্যাগ করেছে।

মেয়র শুনতে শুনতে অবাক হলেন, বললেন, এমন তো শুনি নাই, এই নগরে এমন ঘটে নাই।

মহামান্য মেয়র, নগরাধিপতি, অন্যত্র ঘটেছে। আমি ভেনিস নগরের ফিরতে ফিরতে ঘুরুয়া বাতাসে ভুল পথে গিয়ে, আবার পথ পরিবর্তন করে, কাযান শহরে এসে পৌঁছলাম।

নগরাধিপতি মার্কো পোলোকে দেখছিলেন। মানুষটার চোখমুখে ভয়ের চিহ্ন। মার্কো বলল, মহারাজ আমি বহু জনপদ ঘুরে আসছি, মানুষ এখন মানুষের মুখের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে।

স্বাগত মার্কো পোলো, ভেনিসীয় পর্যটক, কী দেখেছেন বলে যান। মেয়র তাঁকে বললেন।

মার্কো বললেন, খবরিয়ার কথা শুনুন:

গত ১৪-ই মার্চ থেকে আমি মেলা-মেশা বন্ধ করেছিলাম করোনা ভাইরাসের ভয়ে।

অতঃপর দুটি দিন, ১৫ এবং ১৬-ই মার্চ ঘরে বসে কাটল। কিন্তু কলকাতা আছে কলকাতাতেই। বাসে ট্রামে মানুষজনের ভীড়। টেলিভিশনে ভয়ের কিছু দেখলাম না তেমন। তবে এক অদৃশ্য ঘাতক এসে গেছে এই শহরে তার ইঙ্গিত আসছিল। ১৭-ই মার্চ দিনটি ছিল রৌদ্রালোকিত। সেদিন লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু, অরিন্দম বসু সকাল নটায় খবর দিল। সুব্রতর মৃত্যু আমাকে আবার বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল। প্রখর হয়েছে রোদ্দুর। রোদে হাঁটতে হাঁটতে মেট্রো স্টেশন। মেট্রো ছিল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, তবুও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে যেতে হলো। মুখে মাস্ক। অস্বস্তি হচ্ছে। কবি নজরুল স্টেশন থেকে অটোয় করে সোনারপুর চললাম। গড়িয়ার ব্রিজ পার হইনি তখনো, পথের ধারে কী এক মন্দিরে দেখছি বেজায় ভীড়, লম্বা লাইন গায়ে গা, কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ঘেষে, রমণীরা দেবীর জন্য সিধে এনেছেন। নারিকেল, মিষ্টান্ন, ইত্যাদি। দেবী শীতলা কিংবা কালী হবেন। কাঁসর ঘন্টা বাজছে। এমন কেন? ভয় নেই। অটো থেকে দেখছি কোথাও কোনো ব্যত্যয় নেই। দোকানপাট খোলা, বেচাকেনা চলছে। ব্যাগ হাতে লোকে হাঁটছে। গাড়ির অবিশ্রান্ত হর্ন শুনতে পাচ্ছি। সবুজ জামা নীল প্যান্ট তরুণ সিভিক পুলিশ লাঠি হাতে যান নিয়ন্ত্রণ করছে। তার মুখে কাপড়ের মাস্ক। লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে, ভবঘুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঠিক করতে পারছে না কোন দিকে যাবে। আমি তো মৃত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ব্যারাকপুরের সুব্রত সোনারপুরে লিভার ফাউন্ডেশন হাসপাতালে গত রাত ১১টা ৫৫মিনিটে মারা গেছে। আমাকে ডাকছে, আয় বন্ধু, আমাকে দেখে যা। সোনারপুর যেতে যেতে দেখছি সমস্ত শ্যামলিমা উধাও। কংক্রিট আর কংক্রিট। এত বহুতল, ফ্ল্যাটের পর ফ্ল্যাট...কত মানুষ এইটুকু জায়গায়।

লিভার ফাউন্ডেশন হাসপাতালে যেতে সোনারপুরে অটো বদল করতে হয়। সোনারপুরে অটো হাঁকছে, বাস হাঁকছে, রিকশা প্যাঁক প্যাঁক করছে। থিক থিক করছে মানুষ। সবাই কাজের ভিতর আছে। সব রকম বয়সের সব রকম মানুষের সব রকম কাজ থাকে। খর রোদে হাঁটছি। রেললাইন পার হয়ে অটো স্ট্যান্ড কম দূর নয়। রাস্তা দিয়ে চলা যাচ্ছে না এত মানুষ পথে। কেউ যেন জানেই না কিছু, জানে না অদৃশ্য ঘাতক কার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে। সোনারপুর বদলে গেছে। মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগে এক বর্ষার দুপুরে গাড়ি নিয়ে সোনারপুর হয়ে কলকাতার দিকে যাচ্ছিলাম। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, গাড়ি আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। নিঝুম রাস্তা দিয়ে হেলেদুলে নিশ্চিন্তে কতক কই মাছ হাঁটছে। নিশ্চিন্ত মৎস্য রাস্তা পার হচ্ছিল। সেই অবারিত মাঠ, হোগলাবনের সোনারপুর এখন নেই, সব মুছে গেছে। রেল লাইন পার হয়ে অনেকটা হেঁটে আবার অটো। ১১-৩০ হয়ে গেল পৌঁছতে। খুব কষ্ট হয়েছিল সুব্রতকে দেখে। রূপবান বন্ধুর মুখ কালো হয়ে গেছে। রাজ্যের

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ধুলো এসে পড়েছে যেন মুখখানির উপর। যেমন হয়েছে এই সোনারপুর। গরম হাওয়ায় বালি উড়ছে বাতাসে।

শুনতে শুনতে মেয়র বললেন, অস্বাভাবিক কিছু তো দেখলাম না এই বিবরণে, বন্ধুর মৃত্যুতে বন্ধু যাবে, জনপদ স্বাভাবিক থাকবে, সেই জনপদে একবার বর্ষার দিনে কতক মৎস্য পার হয়ে যাচ্ছিল এক পথ থেকে আর এক পথে, সেই মৎস্য কত বড়?

মার্কো শুনেছেন কথাটি। অটো রিকশার ভিতরে বসেই বাকি তিনজনের কথোপকথনে শুনেছেন সেই মাছটির কথা। মাছটির নাম কৈ।

মেয়র বললেন, আপনি জিজ্ঞেস করেননি, যে মাছ একদিন বৃষ্টি হয়ে গেলে ডাঙায় হেঁটে বেড়ায়, সেই মাছের কি দুটি পা আছে, নাকি সে তার পুচ্ছ ভর করে লম্বভাবে হেঁটে বেড়ায়, নাকি পাখনা দিয়েই হাঁটে, আমি এমন মৎস্যের কথা শুনিনি কখনো।

আমি শুনেছি, একদিন এমন ছিল, এখন এমন নেই, পুষ্করিণী ভরাট হয়ে হর্ম্য শ্রেণী মাথা তুলেছে।

সেই মৎস্য কোন দিকে চলেছিল, পুব থেকে পশ্চিমে?

মার্কো বললেন, হয়ত পুবে, এখন পুব বন্ধ হয়ে গেছে মস্ত প্রাচীরে, কাঁটাতারে।

মেয়র জানালার শার্সির ভিতর দিয়ে দেখছিলেন বাইরে তুষারপাত শুরু হয়েছে। তুষারপাতের শেষ নেই, শীত গিয়ে বসন্ত আসার সময় হয়েছে, কিন্তু এবার শীত অতি দীর্ঘ, তিনি ভাবছিলেন এই ভূপর্যটক দাবা খেলতে জানেন কি না। মেয়র সাজাতে লাগলেন তাঁর সৈন্য সামন্ত। মার্কো সেই মাছটির কথা ভাবছিলেন। আসলে এমন হতে পারে ঐ মাছের কথা সত্য নয়। কত সত্য মিথ্যা যে ভেসে বেড়াচ্ছে এখন জনপদে জনপদে। জলের মাছ ডাঙায় হেঁটে বেড়ালে, সে মৎস্যকুমার কিংবা কুমারীও হতে পারে যাদের কেউ কখনো দ্যাখেনি। তিনিও দ্যাখেননি, অতএব মিটে গেল সমস্যা। কিন্তু জল থেকে বেরিয়ে তারা কি অন্য জলাশয়ের দিকে যাচ্ছিল, নাকি চিরকালের মতো পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। আর জল, বায়ু, আলো, অন্ধকার দরকার হবে না তাদের বেঁচে থাকার জন্য। এসব ছাড়াই শক্তিমান হয়ে উঠবে অন্ধকারের জীব। মার্কো চমকে উঠলেন। সেই যে ভাইরাস, সে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি এই কথাই শুনেছেন পথে পথে। কোভিড-১৯ কি এমনি?

জল নেই

গৌতম দে

জল নেই। মাটির তলে বোধকরি জল নেই।

সেকি গো!

তুমি অবাক হলে?

অবাক হবোনি! এতো ভয়ানক কান্ড!

তাহলে আমরা বাঁচব কীভাবে?

যেভাবে বেঁচে আচে আর পাঁচজনে, ঠিক সেইভাবেই বেঁচে থাকপ। আমাদের কথা কেউ তেমনভাবে ভাবেই না।

হুম। ঠিক কতা।

লাইন দেবো। সকাল সন্ধ্যে লাইন দেবো। লাইন দিতে হবেক আমাদের।

দিচ্চি তো।

সেইসঙ্গে যুদ্ধও করতি হবেক আমাদের।

করচি তো। রোজই করচি একই যুদ্ধ। কখনও ইখানে, কখনও উখানে। বাধ্য করচে আমাদের যুদ্ধ করতি তা কি জানোনি?

জানি। জানি। ঠিক বলিচ।

ধাঁই ধাঁই করে পিচ রাস্তা প্রতি বছর উঁচু হতিচে। অনেকটা পুঁটির ইস্কুলের সিল্টের মতো। মাথার ওপরে ঝাঁ চকচকে বিরিজ। বিরিজের ওপর সাঁই সাঁই গাড়ির ছুটাছুটি। গগনে গগনে মিনিট দশেকের মদ্দে ইয়ারপোট। রেল ইস্টিশন। মাটির তল থেকে টিরেন উঠে মাথার ওপর দিয়ে ঝাবে। সব কিচু হাতের মুঠায়। ই তো চাট্টিখানি কতা লয় গো!

হক কতা!

রাস্তার দুপাশে আমাদের বাস হলিও আসমান ছোঁয়া ইয়া বড় কত্তো আবাসন। দামও অনেক। শুনেচি কোটি টাকার ওপর হবে।

তাই নাকি!

হুম।

কত টেকা সেইসব মানুষের!

উ আমাদের ভেবে লাভ নাই।

হক কতা। ঠিকই বলিচ।

২

পিচ রাস্তার একধারে কর্পোরেশনের জলের কল। অনেকটা নিচুতে। একটা চৌবাচ্চার মতো গর্তের ভিতর। তাতে বাচ্চাছেলের নংকুর মতো ঝুঁকে আছে একটা কল। লোকে বলে টেম কল। জল আসে। জল যায়। সময় নিয়মে বাঁধা।

সেই কলের ঘাড়ের ওপর দিয়ে পর পর সাজানো একের পর এক বালতি। কোনও কোনও বালতির গায়ে নাম লেখা, নানা রঙের দাগ লেপটানো। একটু পরে একে একে

দাবিদাররা আসবে। একটা হইহই রব বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে। সেই ঝাপটা এসে লাগবে বেচারা বালতিগুলোর গায়ে। তারপর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করবে। যুদ্ধ তাদের করতেই হবে। কোনও উপায় নেই। কোনও ছাড়নছুড়োন নেই। লড়তেই হবে। ঠোকাঠুকি, ধাক্কাধাক্কি, হুমড়ি খাওয়া। এমন কি খুনও। দিনেদুপুরে। সবার চোখের সামনে।

এই যুদ্ধের হার নেই। নেই জিতও। শুধু খিস্তিখেউড় আছে বিস্তর। একে অপরকে দোষ দিতে দিতে নিজেদের সীমানা লঙ্ঘন করবে। হুমকি দেবে। এমনতর মহড়া। চলবে। চলতে বাধ্য।

এমতাবস্থায় লাল নীল হলুদ সবুজ প্লাস্টিকের বালতিগুলো গোল গোল মুখ করে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকবে মনিবদের মুখের দিকে। যেন তারা ইশারা করলেই টপ করে যুদ্ধে নেমে পড়বে।

ঢ্যাম্পর ঢ্যাম্পর বাদ্য বাজবে। গান হবে। কদম কদম বারাহেঁ যা খুশিকে গীত গাহে যা...।

৩

উলটো দিকের সেইরকম এক ঝাঁই চকচক বিরাট আবাসনের সাততলার বাসিন্দা বটুক নন্দী। ব্যালকনিতে আরামচেয়ারে বসে চা খেতে খেতে প্রতিদিন এইসব দেখেন। দেখতে দেখতে তার ধারণা হয়ে গেছে, এরপর কী হবে। কী হতে যাচ্ছে। একের পর এক চোখের সামনে ভেসে ওঠে জনপ্রিয় যুদ্ধের সিনেমার সিক্যুয়েন্স। সেই একই থিম। সেই একই আগমার্কা আবেগের ডায়লগ। মুহূর্তে ম্যাদামারা জনগণেশের রক্ত গরম। তালি বাজাও। তালি। সুপার ডুপার হিট ছবি।

মনিবদের হাতের ইশারায় বালতিগুলোর মরণপণ যুদ্ধ চলবে। চলতেই থাকবে। এই সুন্দর সকালটা তখন গপগপ করে ওই জলচৌবাচ্চা নামক কড়াইতে ফুটবে। ক্ষণিকের বাতাসে ফুলে ওঠা বুদবুদগুলো বটুক নন্দীর চোখে মনে হবে, অজস্র ছোট বড় মাথা। ক্ষণে ক্ষণে জন্ম নিচ্ছে। তারপর বাতাসের ধাক্কায় ভুস। আবার নতুন করে জন্ম...।

অঢেল অবসরের জীবন এখন বটুক নন্দীর। দুহাতে ধরা খবরের কাগজের পাতা। পড়েন না। খবর দ্যাখেন। প্রতিদিন খবর হয়ে ওঠার দৃশ্য দ্যাখেন। রাজ্যের খবর। গোটা দেশের খবর। দেশের বাইরের খবর। দেখতে দেখতে তার মনে হয়, সব খবরগুলোর একই সুর। একই গৎ। একই তারে বাঁধা।

হুমকি হাতির শুঁড়ের মতো বাতাসে এলোপাতাড়ি দাপাচ্ছে। একটা শংকার আবহাওয়ার মধ্যে বেঁচে আছেন। লাল নীল হলদে সবুজ বালতিগুলো, একই যুদ্ধ নিজেদের মধ্যে করছে। নতুন মোড়কে। নতুন ভাবনায়।

একটা দমকা বাতাসে খবরের কাগজটা উড়ে যায়। একটুও আফশোস করেন না বটুক নন্দী।

চোখের সামনে দেখেন লাল নীল সবুজ হলুদের নেতৃত্বসকল ধূসর পাতার মতো উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে প্রবল বাতাসে...।

রাম কিলা

সৌমিত্র চৌধুরী

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি। বেলজিয়াম দখল করে সেখানকার ঐতিহাসিক ব্রিনডঙ্ক দুর্গকে (Fort Breendonk) জেলখানা বানিয়েছিল নাৎসি বাহিনী (১৯৪০)। আদতে ছিল কনসেন্টেশন ক্যাম্প। ওরা বলত 'প্রিসন ক্যাম্প।'

'নবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কোন রকমে কথাটা ছুঁড়ে দিল আফজাল। তারপর দাঁত বের করে আবার হাঁপাতে লাগল। গলা দিয়ে কথা বেরচ্ছে না। প্রবল উৎকণ্ঠা। কাঁপছে শরীর। দু'পা এগিয়ে এসে ওর ঘাড়ে হালকা চাপর মারল সানি। ভারিক্কি কায়দায় বলল, 'পাওয়া যাচ্ছে না মানে! কোথায় যাবে'?

দামোদর সিং ওদের কথা শুনছিল এতক্ষণ। স্বভাব সিদ্ধ শান্ত ভঙ্গি। মুখ নিচু করে কিছু একটা ভাবতে ভাবতে বলল, 'খুব খারাপ সময় কিন্তু এখন...'।

—খারাপ সময় তো কী হ'ল? একটা ছেলেকে পাওয়া যাবে না?

—বাওয়াল ছাড়'। কথাটা বলেই সানির মুখের দিকে তাকাল দামোদর। একটু পরে আফজালের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুবই খারাপ সময় রে! চুরি ডাকাতি রাহাজানি রেপ ... তার সঙ্গে রোজ অ্যাকসিডেন্ট'।

—থানায় খবর নিয়েছিস? সব খারাপ খবর ওখানেই আসে আগে।

সানির প্রশ্নে ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল আফজাল। একটা ঢোঁক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, 'থানায় গেছিলাম। আমি আর নিত্যানন্দ। মেসের দোতলার নতুন বোর্ডার।'

—থানা কী বলল?

—এখানে কোন খবর আসে নি। আসপাশে খোঁজ নিন।' সেকেন্ড অফিসার একটা ফাইল দেখতে দেখতে মুখ না তুলেই বলে দিল।

—তুই আর কোথায় খুঁজলি?

—দু'এক জায়গায় ফোন করে তোদের হোস্টেলে খবর দিতে এলাম।

—নিত্যানন্দ কোথায়, তোর ঐ বন্ধু?

আফজালের স্বরে ক্লান্তি। সানির প্রশ্নে ধীরে ধীরে বলল, 'ওর আজ পরীক্ষা। সেকেন্ড সেমিস্টার। সকাল থেকে একটুও পড়তে পারে নি। তাই...'

—হুম', মাথা নাড়ল সানি। ততক্ষণে হস্টেলের লম্বা করিডরে জড়ো হয়েছে অনেকে। জটলা বাড়ছে ক্রমশ। হস্টেলের সবাই মিলে আফজালকে একটা টুলের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ওর মুখ থেকে পুরো ঘটনাটা শুনতে চাইছে।

নিরীহ ছেলে আফজাল। একটু গবেট টাইপের। কথায় এখনও গ্রামের টান। পড়াশোনায় মনযোগী, খাটেও খুব। কিন্তু নম্বর পায় না। সায়েন্স ছেড়ে দিয়ে সোসালজিতে ভর্তি হয়েছে। এতগুলো ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে নাগারে অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছিল আফজাল।

ওর দিকে জলের বোতল এগিয়ে দিয়ে লিকলিকে এক ছাত্র নেতা বলল, 'কাল কী হয়েছিল বল তো! মানে মেসে রাতে খাওয়ার পর থেকে ঠিক কী কী ঘটেছিল।'

অনেকটা জল ঢেলে গলা ভিজিয়ে আফজাল একটু থামল। অল্পক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'মেসে তো খায়নি ও। টিউশনি পড়িয়ে একটা ধাবায় ঢুকেছিল। ওখান থেকে রুটি মাংস খেয়ে মেসে ফিরেছিল'।

—তারপর?

—আমি তখন ছবি আঁকছিলাম। ছবি না, পোস্টার। আঁকতে আঁকতে একবার ঘাড়া ঘুরালাম। দেখি খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে নবকুমার। পেটে হাত বোলাচ্ছে। আমি বললাম, শরীর খারাপ নাকি রে'?

—তেমন নয়, একটু অ্যাসিড হয়ে গেছে।' নবা পাশ ফিরে বলেছিল।

—তারপর?

—ও হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পর বিছানা থেকে উঠে বলল, একটু হেঁটে আসি। তারপর পায়ে চপ্পল গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল নবকুমার।

নবকুমারকে নিউম্যান বলে ডাকে অনেকে। ওর সোসিওলজির অধ্যাপক ডক্টর অভিজিত পাঠকের দেওয়া নাম। ডক্টর পাঠকের বিদেশী বন্ধু নিউম্যান, তাঁর মতই নাকি দেখতে নবকুমার। পেটানো শরীর। হাসি মুখ। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। নবকুমার, নবা, নিউম্যান। ছাত্র হিসাবে টায়ে টায়ে পাস নম্বর পাওয়া। কিন্তু বন্ধু মহলে জনপ্রিয়। অনেকেই ওকে আদর করে মাথামোটা বলে ডাকে।

মাথামোটা নবকুমার গরিবের ছেলে না-হলেও তেমন এক্সট্রা কারিকুলার কিছু শেখেনি। গান বাজনা খেলাধুলা কিছুই না। তবে গলাটা ভালো। পল্লিগীতি গায়। ওর গ্রামের গান। আর হাতের লেখা দারুন। কলেজের কোন আন্দোলন হোক বা ছাত্র সংসদের ভোটের ব্যানার-পোস্টার আঁকা। নবকুমারের ডাক পড়বেই। ইউনিয়ন রুমে সকাল সন্ধ্যা ঘাড় গুঁজে কাজ করতে হয় ওকে। সেই নবকুমারকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তিন দিন হ'ল নবা নিখোঁজ। ফেসবুক টিভি খবরের কাগজে ভর করে সংবাদটা পৌঁছে গেছে গোটা দেশে। বিদেশেও। তবু রাজধানীর বুকে এক নামী কলেজ-ছাত্র বেপাত্তা। চেষ্টা করেও হদিশ মিলছে না। হাঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল নামী কলেজের ছাত্র। তাগড়াই এক যুবক বেমালুম বেপাত্তা!

ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তেজনা বাড়ছে। উত্তেজনা থেকে হতাশা। সেখান হেকে একটু একটু

করে জন্ম নিচ্ছে ক্রোধ। ছাত্র সংসদের ডাকে ছাত্রদের জমায়েত শুরু হয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে ধর্না চলছে। শ'খানেক ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলিত গলায় আকাশ ফাটানো চিৎকার, 'নবকুমারের খবর চাই। খবর চাই'।

তিন দিন আগেই অধ্যক্ষের কাছে খবরটা পৌঁছে গেছিল। টাটকা খবর। নবকুমার নিখোঁজ। থানা হাসপাতালে বার দুয়েক খোঁজ নিয়ে সেদিনই নবার বাড়িতে ফোন করেছিলেন অধ্যক্ষ স্যামুয়েল মুর্মু। দু'একটা মামুলি কথা। তারপর সংবাদটা দুম করে বলেই দিয়েছিলেন, 'নবকুমারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না'।

নবার বাড়িতে খবরের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, জানতে পারেননি অধ্যক্ষ। তবে পরের দিনই তিনশো কিলোমিটার দূর থেকে বাসে চেপে শহরে ছুটে এসেছিলেন সনাতন কুমার। নবকুমারের বৃদ্ধ বাবা। উনিও অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে ছাত্রদের সাথে ধর্নায় বসে আছেন।

অধ্যক্ষের ঘর থেকে ডাক এল। কয়েক জন ছাত্র নেতার। সাথে অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধ সনাতন কুমার।

স্থানীয় থানায় আরেকবার ফোন করলেন অধ্যক্ষ। কিছুক্ষণ ফোনালাপের পরই মুখটা থমথমে হয়ে গেল প্রিন্সিপাল মুয়েলের।

ছাত্র নেতা সানি চক্রবর্তির উদ্বিগ্ন মুখ। অনেকক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করল সানি, 'কোন খোঁজ পেলেন স্যার'?

দু'পাশে মাথা নাড়ালেন অধ্যক্ষ। একটু পরে বড় একটা শ্বাস ফেললেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'খোঁজ পাই কোথায় বল তো! নিজের বাড়িতে যায় নি। মেস কলেজ হাস্পাতাল মর্গ, কোথাও নেই। মোবাইল ফোন সুইচ অফ। জলজ্যান্ত একটা যুবক যাবে কোথায়?'

কলেজ অধ্যক্ষের নিস্তব্ধ ঘর। বাইরে জমায়েত। ছাত্রদের সংখ্যা বেড়ে চলেচে ক্রমশ। বহু সময়ই এক দলের সাথে আরেক দলের সামান্য কারণে লড়াই লেগে যায়। জমায়েতে উত্তেজনা চিৎকার হাতাহাতি ছাত্র রাজনীতির নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু আজ ঝগড়া বিবাদ নেই। সবাই এক জোট।

সনাতন বাবুর দিকে তাকিয়ে অধ্যক্ষ প্রথমে মুখ খুললেন। গম্ভীর স্বর। বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমারা দেখছি। কোথায় আর যাবে নবকুমার?'

একটু পরে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে অধ্যক্ষ বললেন, 'কী করা যায় বল তো'!

নিস্তব্ধ ঘর। স্তব্ধতা ভেঙে আবার কথা বললেন অধ্যক্ষ, 'স্থানীয় এক উকিলের পরামর্শ নিচ্ছি আমি। রাইট টু ইনফরমেশন, মানে আর টি আই বলে তো একটা ব্যাপার আছে! উকিল বাবু আসবেন একটু পরে। তোমাদের সামনেই কথা হবে।'

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

উকিল রামহরি রামের সাথে আগেও কথা হয়েছে স্যামুয়েল স্যারের। আজ আরেক বার ছাত্রদের সামনেই কথা বলবেন। নিজের ঘরে কয়েক জন ছাত্র নেতাকে ডেকে পাঠালেন অধ্যক্ষ। ওদের সামনেই উকিলবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ছেলেটিকে ট্রেস করি কী ভাবে বলুন তো'?

ছাত্র নেতাদের মুখগুলোর দিকে তাকালেন রামহরি উকিল। একবার কেশে নিয়ে অধ্যক্ষের দিকে মুখ ফেরালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ছেলেটাকে কোথায় খুঁজবেন আপনি? এদিকওদিক তো দেখলেন অনেক...।'

—তাহলে কী করবো এখন?

—দেখুন মিস্টার স্যামুয়েল, মরে গেলে লাশ পাওয়া যেত। তার মানে, আমার সেন্স যা বলে, নির্ঘাত বেঁচে আছে ছেলেটা।'

—যাক নিশ্চিন্ত হলাম।' কথাটা বলে চেয়ারে হেলান দিলেন অধ্যক্ষ।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে উকিলবাবু বললেন, 'স্মার্ট ইয়ং বুদ্ধিমান একটা ছেলে। ও-তো চেষ্টা করছে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারছে না। তার মানে...'।

কথা শেষ করবার আগেই প্রশ্ন করলেন অধ্যক্ষ, 'তার মানে..., আপনি বলছেন কোন গুন্ডা মস্তান ধরে নিয়ে আঁটকে রেখেছে?'

—রাখতেই পারে। তবে চান্স কম। গুন্ডা মস্তান সব কমে গেছে।

—কমে গেছে? মানে?

—মানে আর কি! কমে তো গেছেই। দেখছেন না সবাই পার্টিতে ভিড়ে গেছে। পুলিশ গুন্ডা মস্তান ধান্দাবাজ...। দলের ছাতার তলায় থেকে গুন্ডা-গার্দি...। এর মাজাই আলাদা।'

—কী বলতে চাইছেন উকিল বাবু?

—শুনুন প্রিন্সিপাল সাহেব,' গলাটা গম্ভীর করলেন রামহরি রাম। এতক্ষণের হালকা চালে বলা কথার জায়গায় এবার ভারী শব্দের হাতুড়ি ঠুকলেন। 'ছেলেটাকে পুলিশ ধরে যদি 'রাম কিলাতে' ঢুকিয়ে দেয়'?

—মানে? কী বলতে চাইছেন?

—রাম কিলা। মানে শহরের ঐতিহাসিক ওল্ড অ্যান্ড স্ট্রং রাম ফোর্ট। এখন ওটাই প্রিসন ক্যাম্প। আর্মির নিয়ম চলে ওখানে। আমাদেরও ঢুকতে দেয় না।'

—বলেন কি!' হঠাৎ কেমন একটা স্তব্ধতা অধ্যক্ষের বড় ঘরটাকে জাপ্টে ধরল। অনেকগুলো নির্বাক মুখ পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করছে। ভাষাহীন মুখগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে একটু থামলেন উকিল বাবু। তারপর স্বগতোক্তির মত বললেন, 'ওরা বলে 'প্রিসন ক্যাম্প'।

একটু থেমে আবার বিড়বিড় করলেন উকিল বাবু, 'প্রিসন ক্যাম্প বন্দী শিবির ডিটেনসন ক্যাম্প... অ্যারেস্ট করে আর্মি যদি ছেলেটাকে ওখানে রেখে দেয়?'

—কোন কারণ না দেখিয়ে অ্যারেস্ট করে রেখে দেবে? কোর্টে তুলতে হবে না?

—হা হা হা, প্রিনসিপাল সাহেব, পুরানো আইন ভুলে যান। গ্রেফতার করলে পরের দিন কোর্টে তুলবে, এই আইন এখন হিমঘরে। মানে বাতিল অবসোলেট তামাদি।

—স্যার আমরা প্রতিবাদ করবো। এই আইন চলতে পারে না।' এক ছাত্র নেতা সাপের মত ফোঁস করে উঠল।

—তোমরা ইয়ং ম্যান। প্রতিবাদ তো নিশ্চয় করবে।' শহরের নামজাদা প্রবীণ উকিল ছাত্রদের মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে একটু থামলেন। তারপর স্বর নরম করে নিচু গলায় বললেন, 'এবার একটু আলাদা কথা বলবো অধ্যক্ষের সাথে।'

তিনজন ছাত্র নেতা এবং নবকুমারের বাবা ঘরের বাইরে যেতেই চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসলেন উকিল রামহরি রাম। স্বর একপ্রস্থ উঁচুতে তুলে বললেন, 'নতুন আইনে আরও কী আছে জানেন?'

অধ্যক্ষ নীরব। ওঁর চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন উকিল বাবু। তারপর স্বরে গাম্ভীর্য মাখিয়ে বললেন, 'নতুন আইনে পুলিশ যাকে খুশী ধরতে পারে। কোন কারণ-টারন লাগে না, জানেন! টানা এক বছর, কি আরও বেশী বন্দী করে রাখতে পারে।'

—তাই নাকি? কাগজে তো পড়লাম না।

—রাখুন আপনার কাগজ। মুখ খুলবার সাহস আছে কোন মিডিয়া হাউসের?

অধ্যক্ষের মুখা কথা নেই। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে উকিল রামহরি রাম বলে চলেছেন, 'শুনুন প্রিন্সিপ্যাল সাব। ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে। বিদেশী আর দেশ বিরোধীদের ঢোকাতে হবে তো! ...তাই প্রিসন ক্যাম্প।'

একটু থেমে এক ঢোঁক জল খেলেন উকিল রামহরি। সাদা রুমালে ঠোঁটের দু'পাশ মুছে নিয়ে বললেন, 'একবার ধরলে ছাড় পাওয়া..., কী আর বলবো। প্রায় অসম্ভব...।'

—ওখানে কী ভাবে রাখে? ছাত্ররা পড়াশুনা করতে পারবে তো?'

—হা হা হা। হাসালেন মশায়। শুনুন, আমার কাছে যা খবর। ওখানে খুবই আরামে রাখে।'

একটু থেমে আবার, 'মুখ খোলা বারণ, তবু দু'এক জন ছাড়া পাওয়া বন্দী আমাদের কাছে, মানে উকিল বারে এসে মুখ খুলেছিল।'

—বন্দীদের কী ভাবে রাখে'? আগের প্রশ্নটাই আবার করলেন অধ্যক্ষ।

—বড় একটা শ্বাস ফেললেন প্রবীণ উকিল। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর নিচু বলায় বললেন, 'দশ বাই দশ ঘরে ত্রিশ জন বন্দী। চারশ বন্দীর বরাদ্দ একটা পায়খানা। মানে চল্লিশ জন পিছু একটা। আর...।'

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

—থামবেন না, বলুন উকিল বাবু।

—সূর্যের আলো ফুটবার আগেই শুরু হয়ে যায় কর্মকাণ্ড। সকাল পাঁচটা বাজতেই কর্কশ চিৎকার। শক্ত পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খায় বুক ফাটানো আওয়াজটা — 'গেট আপ। উঠ্ যাও, উঠ্ যাও'। একটু পরেই হুঙ্কার — তৈর্য়া তৈর্য়া। তৈরি হতে একটা পায়খানায় দশ মিনিটে কাজ সারবে একশ জন! ভাবুন তো কী দেশ!'

—তারপর কী করতে হয়?

—আবার আদেশ, কাম শুরু কর। স্টার্ট স্টার্ট।

—কী কাজ?

—পাথর ভাঙ্গা। পিচ গলানো, লোহা পেটানো। ছাদ ঢালাই, দেওয়াল গাঁথা। কবর খোঁড়া...।

—খেতে দেয় তো?

—দেয়। সকালে একবার পাতলা খিচুড়ি। আর রাতে ডাল-সব্জি। আর...'

—আর কি?

—মার খেতে হয়, মার। বুট লাথি ডাণ্ডা বন্দুকের বাঁট। এমনকি গুলি। ...ফাঁসিও হয় বলে শুনেছি।

—বলেন কি?

—ওখানে, ওরা বলে প্রিসন ক্যাম্প। বছর খানেক টিকে থাকা মুশকিল। লাঠি বন্দুকে না মরলেও মরবে খিদের জ্বালায়। খিদে মেটে না তো! গাছের পাতা খায় অনেকে। জেল কোডে ওদের নাম 'ঘাস খাউকা', মানে গ্রাস ইটার।

—ভয়ঙ্কর। এসব কথা ছাত্রদের সামনে বলি কী করে?

—সেটাই তো কথা! কোন রিপোর্টার বলে না। জজ উকিল ব্যারিস্টার কেউ মুখ খোলে না। আপনিই বা বলতে যাবেন কেন? ছাত্ররা যেমন বন্ধুকে খুঁজছে, খুঁজুক। বাপ-মা যেমন কাঁদছে, কাঁদতে থাকুক...।'

—ছাত্রদের কী বলবো এখন?' অধ্যক্ষের স্বরে বিপন্নতা।

—বলবেন, তোমরা আন্দোলন চালিয়ে যাও। লাঠি, বন্দুকের গুলি...কুছ পরোয়া নেই। লড়তে থাকো।'

সম্মতিতে ঘাড় নেড়ে উকিল বাবুর দিকে তাকালেন অধ্যক্ষ। উকিল বাবুর গম্ভীর মুখ। কোটের বোতাম লাগিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। একবার কেশে গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে বললেন, 'কী করা যায় আমি দেখছি।'

একটু থেমে অধ্যক্ষের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন উকিল বাবু। নরম গলায় বললেন, 'আমার আজকের ফিস টা...!'

মৌসুমীদের পাড়া

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

মৌসুমীদের পাড়ার মুখে খান তিনেক টগর গাছ ঝুপসি হয়ে আছে। ফুলে ফুলে সাদা। সবাই বেশ লম্বা। একতলা বাড়ি সমান লম্বা। তারপর মৌসুমীদের পাড়া এগিয়ে গেছে। গায়ে গায়ে দোতলা-তিনতলা পুরনো বাড়ি, পাখি-জানলা, ছোট ইট, পলেস্তারা খসা দেয়াল, বেশিরভাগ বাড়ির রং লাল, মোটা দেয়াল, ছোট টব-বাগান, ফুটপাথ-গাছ। তারপর গঙ্গা। না, গঙ্গার কাছে যেতে হলে অবশ্য চক্ররেলের লাইন পেরোতে হয়। তা সে পেরোনো কঠিন কিছু নয়। তো মৌসুমীদের পাড়ায় ঢোকার জন্য ট্রাম লাইন, সৌরভ সুইটস, রাজুস গ্যারাজ, রথবাড়ি এসবকে পাশে রাখতে হয়। মৌসুমীদের পাড়া নিয়ে মৌসুমীর খুবই ভাল লাগা আছে। খুবই। এত ভাল লাগা যে মৌসুমী মাঝেমাঝেই কেঁদে ফেলে। পাড়াটাই তার প্রেমিক হয়ে ওঠে।

অনিন্দ্য পাড়ার রকে বসেছিল। সিগারেটে টান দিয়ে দেখল ধোঁয়াটা ঠিক ধোঁয়া ধোঁয়া নয়, কুয়াশা কুয়াশা। ধোঁয়া কেন কুয়াশা হবে? শহরের দূষণ নিয়ে অনিন্দ্য মনখারাপ করল। চারটে খিস্তি করল। বঙ্কা অনিন্দ্যর পাশে এসে বলল, 'মৌসুমীকে কি গিফট দিচ্ছিস অন্দ্য'?

অনিন্দ্য একটু উদাস উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকানোর চেষ্টা করে দেখল আকাশ দেখা যাচ্ছে না। বলল, 'শাড়ি কিনেছি একটা। নীল শাড়ি। চুমকি বসানো। মৌসুমীকে নীল রঙ্গে সবচেয়ে বেশি মানায়'।

বঙ্কা নাক টানল। সর্দি হয়েছে। বৃষ্টি ভিজে ভিজে খাবার ডেলিভারি করলে এই হয়। এখন সর্দি নিয়ে বিয়েবাড়ি যেতে হবে। বলল, 'আরে ধুর, তুই কচু জানিস। মৌসুমীকে সবচেয়ে বেশি মানায় কচি কলাপাতা রঙের শাড়িতে'।

—'দ্যাখ, আমি মৌসুমীকে নিয়ে অ্যাকাডেমিতে নাটক দেখতে গেছিলাম। মৌসুমী নীল তাঁতের শাড়ি পরেছিল। তুই ভাবতে পারবি না মৌসুমীকে কি অসাধারণ সুন্দর লাগছিল'।

—'শালা তোর সেই আঁতেল আঁতেল হাবভাব আর গেল না। কী নাটক দেখতে গেছিলি? ওই মন এবং ফ্রয়েডের স্বপ্ন ধরণের ভাবুক কিছু? মৌসুমীকে নিয়ে কটা কবিতা লিখলি? রেলে চাকরি করে তুই কবি হলি কি করে'?

বঙ্কা খ্যাকখ্যাক করে হাসে। অনিন্দ্য ভুরু কুঁচকে বলে, 'তা তুই মৌসুমীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছিলি তো? কি দেখলি? ঝিনচ্যাক কিছু'?

—'বিলকুল। মৌসুমী সবুজ শাড়ি পরেছিল সেদিন। বললাম মৌসুমী আমি তোকে ভালোবাসি'।

—'গজদাঁত বের করে খিলখিল করে হাসলো তো'?

—'আর বলিস না। যত হাসছে, তত বেশি সুন্দর লাগছে। শেষে আমিও ক্যাবলার মতো মাথা চুলকে হেসে ফেললাম। আমাকে বলল এবার পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে মঞ্চ সাজানোর সব দায়িত্ব তোমার। আর শোনো বঙ্কাদা, আমিও তোমাকে ভালোবাসি'।

—'আরে আমারও সেম কেস। আমাকে বলল পাড়ার পিকনিকে এবার আমরা মায়াপুর যাব। সব বয়স্কদের দেখাশোনার ভার তোমার, আর আমিও তোমাকে কিছু কম ভালোবাসি না। মৌসুমী কিছু বললে না বলাই যায় না'।

অলোক, তপন, আলতাফ আর অর্ক রকে এসে বসল। মৌসুমীর বিয়ে বলে সবার একটু দুঃখ দুঃখ হচ্ছে। অলোক বলল, "মৌসুমীকে না পেলে একটা সময় তো মনে হত মরেই যাব। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম দুঃখে। শেষে একদিন বাড়িতে এলো। সাদা শাড়ি পরেছিল। সাদার মধ্যে জড়ির ছোট ছোট ফুল। এসে পেছল কলতলার পাশের সিঁড়ি দিয়ে সোজা চিলেকোঠার ঘরে উঠে গেলো। আমি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তখন মনের ভুলে নাক খুঁটছিলাম। বলল, 'অলোকদা, তুমি না স্কুলে পড়াও। তোমার এভাবে নাক খুঁটতে আছে? খারাপ অভ্যাস। এসব ছেড়ে দাও'। এমন বড় বড় চোখ করে বলল, বিশ্বাস করবি না অর্ক, সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে ফেললাম হ্যাঁ ম্যাম। শুনে আবার গজদাঁত দেখিয়ে হাসি। ব্যাস, আমার মনখারাপ কোথায় চলে গেলো। মনে হল মৌসুমীকে ভালোবাসাই যথেষ্ট, পাওয়া, না-পাওয়া এসব খুব ছোট কথা। আর তাছাড়া মৌসুমীও আমাকে ভালোবাসে। মৌসুমী কারোকে না ভালোবেসে থাকতেই পারে না"।

অর্ক বলল, 'এপাড়ায় আমরা সবাই মৌসুমীকে ভালোবাসি। কী অদ্ভুত না! সেই মৌসুমীর নাকি বিয়ে। আমি একটা ফুলদানি কিনেছি'।

বঙ্কা বলল, 'তোরা সব বড় বড় চাকরি করিস, দামী জিনিস দিবি। আমি দেবো লটারির টিকিট'।

অনিন্দ্যরা সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তপন হাসতে হাসতে রক থেকে পড়েই যাচ্ছিল। বলল, 'বিয়ের কনেকে লটারির টিকিট দিবি'?

—'তাই দেবো। খবরদার হাসবি না। একটু পড়াশোনা বেশি করেছিস বলে আমাকে নিয়ে খিল্লি করবি না বলে দিচ্ছি তপনা'।

—'এই শালা এই, এ পাড়ায় বড় ছোট হয় না তুই জানিস না? মৌসুমীর চোখে ছোট হয়ে যাব না তাহলে'?

অনিন্দ্য বলল 'মৌসুমী নিয়ম করে দিয়েছে, সবার সবাইকে ভালোবাসতে হবে, নো ঘেন্না। কত যে নিয়ম মৌসুমীর'।

আলতাফ কিছু বলল না। ভালোবাসার কথা সে বলতে পারে না। ভেতরে ভুরভুর

করে। ভাবল, সত্যি অনেক নিয়ম মৌসুমীর। ভালোবাসার নিয়ম, নিয়ম-ভাঙার নিয়ম। মৌসুমীর নিয়মগুলো কেন যে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায় না!

২

—'মিষ্টির কি অবস্থা চ্যাটার্জীদা'?

—'মিষ্টি, আইসক্রিম সব চলে আসবে। ওদিকে কি অবস্থা? রান্নার যোগাড়যন্ত্র চলছে স্বপন'?

—'তা চলছে'।

—'বললাম ভিয়েন বসাও। তা শুনলে না'।

—'আহা ভিয়েনের অনেক ঝামেলা চ্যাটার্জীদা। নহবত তো বসছে'।

—"ভিয়েন আর নহবত এক হল স্বপন? কী যে বলো না তুমি! মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এমনিতেই আমার মন ভালো নেই। খালি ভাবছি কালকের পর থেকে মৌসুমী আর বলবে না 'দাদু ১, ওষুধ খেয়েছো'?"

—"সেতো আমাকেও বলবে না যে 'দাদু ৫, যাও গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে এসো। বাড়িতে বসে বসে তো হাত-পা ব্যথা হবে'। পাড়ার সব বুড়োবুড়ির দিকে নজর বলো"।

—'হুঁ, মেয়েটা পাড়াটাকে মাতিয়ে রাখে। ছেলে-বুড়োদের নিয়ে পিকনিক, সবাই মিলে দুর্গাপুজো, তুবড়ি প্রতিযোগিতা, অনিন্দ্য-অর্কদের জুটিয়ে গঙ্গার পাড় পরিষ্কার, এটা-সেটা। সেই মেয়ে চলে যাবে। ভাবা যায়। কোথায় যেন যাবে? আমেরিকা না? বর তো সেখানেই থাকে।

—'না না, ও যাবে নিউজিল্যান্ড। বর নিউজিল্যান্ডে চাকরি করে'।

—'কী যে বলো স্বপন, স্পষ্ট শুনলাম ও যাবে আমিরিকা। মিচিগান না স্টেনগান কোথায় যেন'!

—'চ্যাটার্জীদা আপনার বয়েস হয়েছে, কী শুনতে কী শুনেছেন'।

—'আরে কী শুনতে কী শুনেছি মানে কি! আমি কি কানে খাটো? দ্যাখো স্বপন, মৌসুমী তোমার একার নাতনি নয়, আমারও নাতনি, এপাড়ার সব দাদু-দিদার নাতনি। মৌসুমী আমাদের সব্বার। না হলে কি আর তার বিয়ে নিয়ে গোটা পাড়া এভাবে আনন্দে-মনখারাপে মেতে ওঠে'।

ঝগড়া চলছে। চ্যাটার্জীদিদা বলল 'সুমিটাকে চন্দন কে পরাবে? আমার ইচ্ছে আমি পরাই'।

মানসীদিদা বলল, 'আহা, তোমার হাত কাঁপে। তুমি থোড়াই পারবে চন্দন পরাতে।

চন্দন আমি পরাবো'।

পাড়ার সব দিদারা মৌসুমীকে চন্দন পরাতে চাইছিল। মৌসুমী কি চাইছিল? মৌসুমী কোথায় এখন?

৩

কঙ্কনা বেনারসী নিজের গায়ে ফেলে বলল, 'দ্যাখতো, এই সবুজ বেনারসীতে কেমন লাগছে আমাকে'?

শ্রীতমা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুই যে বলেছিলি মৌসুমীদির বিয়েতে লেহেঙ্গা পরবি'?

—'আরে বলেছিলাম তো। কিন্তু মৌসুমীদির ইচ্ছা বিয়েতে সবাই যেন শাড়ি পরে। তাই। অবশ্য বৌভাতে যেমন খুশি সাজো। মৌসুমিদিতো বলে কে কি সাজবে, কাকে ভালোবাসবে, কোন ভগবানকে ডাকবে, তাই নিয়ে অন্য কারোর কথা বলার এক্তিয়ারই নেই।'

পৃথা লিপস্টিক লাগাচ্ছিল। বলল, 'এটা কিন্তু সুমিদির খুব অন্যায়। তোকে কেন লেহেঙ্গা পরতে দিলো না বলতো'?

কঙ্কনা বলল, 'আহা থাক না, নাহয় মৌসুমীদি যা চাইছে তাই করলাম। তুই ভাবতো নিজের বিয়ের দিনে কেউ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে? অবশ্য আইডিয়াটা মৌসুমীদির মাথা থেকে বেরোতেই রঞ্জনকাকু, অমিতকাকুরা এমন লুফে নিলো। ছাদ থেকে দেখলাম অর্কদারা রকে বসে আড্ডা দিচ্ছে। সব রক্ত দিয়ে এসেছে বুঝলি তো'।

শ্রীতমা বলল, 'তা বলে সুমিদি সবসময় সব সিদ্ধান্ত ঠিক নেয় না। তোর মনে আছে সুবীরদাদু সেবার যখন অসুস্থ হল আর কানাডা থেকে বৌ-ছেলেকে নিয়ে অপূর্বদা প্রায় সপ্তাহখানেক পরে দাদুকে দেখতে এলো, তখন মৌসুমীদি এমন কান্নাকাটি করলো, এমন অভিমান ভরা চোখে অপূর্বদার দিকে তাকালো যে বৌদিই অপূর্বদাকে বলল, শুনছ, আর কানাডায় ফিরে কাজ নেই। বাবা একা থাকেন, তুমি একমাত্র ছেলে, তোমারই তো দেখার দায়িত্ব। অপূর্বদাও কেরিয়ার ফেলে থেকে গেল। তোর কি মনে হয় এটা ঠিক'?

—'শোন শ্রীতমা আমি মৌসুমীদিকে একদিন বলতে শুনেছি যে পৃথিবীতে সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট হল কাছের মানুষেরা, কাছের মানুষের কাছে কেরিয়ার নস্যি। আর তাছাড়া তোর কি মনে হয় কেন কেউ মৌসুমীদির কথা ফেলতে পারে না? আসলে সুমিদি এত্ত ভালোবাসতে পারে না, মানে এত মায়া, সুমিদিকে না বলা খুব কঠিন'।

পৃথা খোঁপায় চাঁপা ফুল লাগাতে লাগাতে বলল, "বীথিদি, মৈত্রেয়ীদিরা সব দিদাদের সঙ্গে সুমিদিকে সাজাবে আজ। সুমিদির বেনারসীর রঙ অফ-হোয়াইট জানিস। একদিন না বীথিদিদের সঙ্গে সুমিদি গঙ্গার ধারে বসে আড্ডা মারছিল। আমি না কাছেপিঠে ছিলাম, চুপিচুপি শুনে ফেলেছি, মৌসুমিদি বলছিল, 'জানিস বীথি আমাকে সবাই ভালোবাসে। কিন্তু

সেটা জীবন কাটানোর ভালোবাসা না, অন্যরকম ভালোবাসা। এই যে অর্কদারা সবাই আমাকে বলেছে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু ওরা না আমার সঙ্গে সংসার করতে পারবে না। আমাকে ভালোবাসা যায়, কিন্তু সেটা সংসার করার মতো ভালোবাসা নয়'। তোদের কি মনে হয় বিয়ে হলে মৌসুমীদি সংসার করতে পারবে? কোথায় যেন বিয়ে হচ্ছে? ছেলে মেক্সিকোতে থাকে, তাইনা?"

শ্রীতমা বলল, 'আরে ধুর, পশ্চিম বর্ধমান'।

কঙ্কনা বলল, 'মোটেই না, ব্যাংককে ব্যাংকের ম্যানেজার'।

৪

তিনটে টগর গাছ পাড়ায় ঢোকার মুখে টগর ফেলল কিছু। টগর ১ বলল, 'মৌসুমী মেয়েটা খুব ভালোবাসতে পারে। এত ভালোবাসতে পারে যে ও যা চায় তাই হয়। কেউ ওকে না বলতে পারে না'।

টগর ২ — 'সেইজন্যই আজ ওর বিয়েতে আমরা সাদাফুল দিলাম। ভালোবাসার রং যেমন লাল, তেমন কিছুটা ধীর-স্থির-শান্ত সাদাও বটে। ওর ওই মাটি রঙের শরীরে অফ হোয়াইট বেনারসী, কাজল কালো চোখ, একঢাল চুল... আমি অপেক্ষা করে আছি মৌসুমীকে কনের সাজে দেখব বলে'।

টগর ৩ — 'মৌসুমীর শরীর মাটি রঙের নয়। মৌসুমীই মাটি। আর তাই এ পাড়াটা অন্যরকম পাড়া। ভালোবাসার পাড়া। এখানে ঘেন্না ঢোকে না'।

টগররা ঝমঝম করে ফুল ফেলল।

৫

তো মৌসুমীদের পাড়ায় ঢোকার জন্য ট্রাম লাইন, সৌরভ সুইটস, রাজুস গ্যারাজ, রথবাড়ি পাশে রাখতে হয়। তারপর তিনটে লম্বা টগর গাছ। তারপর গলি। তারপর চক্ররেলের লাইন। কিন্তু খটখটে সূর্যের দিনে, ভালো করে দেখলে দেখা যাবে গলিতে কোনো বাড়ি নেই, মৌসুমী নেই, অর্ক-আলতাফ নেই, বীথি-শ্রীতমা নেই, দাদুরা-দিদারা নেই, রঞ্জনকাকুরা নেই, অফ হোয়াইট বেনারসীও নেই। শুধু টগর গাছেদের দীর্ঘশ্বাস আছে। ও টগরগাছেরা, এটাই কি মৌসুমীদের পাড়া?

টগর ১ — 'মৌসুমীদের পাড়া? সে আবার কি? এখানে কোনো পাড়া নেই'।

টগর ২ — 'কোনোদিন ছিল না'।

টগর ৩ — 'পৃথিবী থেকে মৌসুমীদের পাড়া খসে গেছে, তুমি জানো না বুঝি'?

তাহলে আছে কি?

ট্রাম লাইন, সৌরভ সুইটস, শহর, ব্রিজ, ল্যাম্পপোস্ট আর মেঘে ঢাকা একখানা নদী। এছাড়া সব ভোঁভা।

মরণকাঠি

অনিন্দিতা গোস্বামী

ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল নরেন। তার গলায়, ঘাড়ে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। পাশ থেকে শ্যামলী বলল, কী হল আবার? নরেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, বাগানের পুব কোণে লাউডগায় পোকা লেগেছে, দেখেছ? শ্যামলী বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, কই কেমন ফনফনিয়ে উঠেছে লতা, ফুল এসেছে মাচা ভরে। যত্তসব। ঘুমাও দেখিনি। সারাদিন খাটাখাটনির পরে একটু শুই তা তোমার এই স্বপন রোগে আমার ঘুমের বারোটা।

নরেন কিছু বলল না, মশারি উঠিয়ে নিচে নামল, নতুন মাটির জালা থেকে মগ ডুবিয়ে জল তুলে খেলো ঢকঢক করে। খেতে গিয়ে থুতনি আর গলা বেয়ে জল গড়িয়ে নামল বুকে। একটু ঠান্ডা হলো শরীর।

কী করবে নরেন, আজ কিছুদিন হলো এই রোগ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কাউকে সে বোঝাতে পারে না, কাউকে সে বলতে পারে না। কাকে বলবে? যাকে বলতে যাবে সেই মুখ টিপে হাসবে কিংবা বলবে তা বাপু অতই যখন ভয় তোমার, করতে গেলে কেন অমন কাজ। এ কাজ কি সে নিজের ইচ্ছায় করেছে, বাধ্য হয়ে করেছে। নিজের দোষ ঢাকতে সব লোকই তাই বলে। সেই তো, তার বউ, তার মা, তাদের কথা মানেই নরেনের কথা।

শ্যামলী বলেছিল ভয় কী, আমি তো আছি।

ও শ্যামলী, কেউ দেখেনি তো?

—না বাবা না।

—কী করে বুঝলে?

—আমি তো চারপাশে চোখ রেখেছিলাম।

—ধড়ফড় করছিল?

—তোমার মাথাটাই গেছে, ধড়ফড় করতে পারে?

—কেন পারে না?

—জানি না যাও। তোমার যত সব আজুরে কথা।

শ্যামলী ঘুমিয়ে পড়ে। কী সুন্দর ঘুমায় শ্যামলী। বুকদুটো ওঠে নামে। নরেন ঝুঁকে পড়ে শ্যামলীর মুখের ওপর। বালিশ উঠিয়ে নিয়ে চেপে ধরতে যায় নাকে মুখে। তারপর আবার কুলকুল করে ঘামতে থাকে, নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখে সে ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে।

এক ছটাক জমি। কতদিন আগে চলে যাওয়া এক ছটাক জমির শোক আজও ভুলতে পারেনা মানুষগুলো। এখনও এত হিংসা মনে? ওই এক ছটাক জমি যদি বেশি থাকত নরেনদের নরেন কি তবে মোটর হাঁকিয়ে ঘুরত? আছে তো তাদের বারো-চোদ্দো বিঘে জমি। শীতের সবজিপাতি,ধান টুকটাক হতো তাতে। বাগানের ওই পুবকোণেই শ্যামলীর লাউমাচা তোলার শখ। নরেন বলেছিল বাড়ির বাগানে লোকে ফুলগাছ লাগায়, তুমি লাউগাছ লাগাবে কি?

শ্যামলী বলেছিল, যে গাছ ফল দেয় না সে গাছ আবার গাছ না কি। ওসব কেয়ারি গাছে আমার শখ নেই কোনও। তারপর আরও বলেছিল, দেখো তোমাকে অনেকদিন বলছি কিছু করো, এরপরও তুমি যদি গা না করো তবে আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা নেব।

নরেন ভয়ে ভয়ে বলে, কী ব্যবস্থা নেবে?

—সে তোমাকে বলে নেব না।

নরেন আমতা আমতা করে বলে, কী হবে ঝগড়াঝাঁটি করে, তোমার ভয় করে না?

শ্যামলীর সদর্প উত্তর, কীসের ভয়?

—এই ওদের হাট্টাগোট্টা তিন-তিনটে ছেলে, সেখানে আমার ছেলেটা তো দুবলা-পাতলা, পারবে ওদের সঙ্গে লড়তে?

শ্যামলী উত্তর করেছিল, তোমার ওইরকম বুদ্ধি দেখেই তো আজ আমাদের এই হাল। এখন তাকতে নয়, শক্তি আসে মেশিনে। তোমার ছেলের বুদ্ধি থাকলে একাই একশো হবে দেখো।

—গুন্ডামি করতে শেখাবে?

—বুদ্ধি করে নিজের টা গুছিয়ে নেওয়ায় গুন্ডামি হবে কেন? তোমার বাবা ঠিকই বলতেন, তোমার মত হাবলা ছেলের জন্ম দিয়েছেন বলেই তিনি সব দিক দিয়ে হেরে গেলেন ঘোষদের কাছে।

নরেন দেখেছে মানুষের আর কিছু দেবার ক্ষমতা না থাকলেও হিংসাটা ঢুকিয়ে দিয়ে যায় বংশধরের মধ্যে। সেই কোনকালে পাশাপাশি দুই বাড়ির সীমানা প্রাচীর তোলার সময় নাকি ঘোষকাকারা কায়দা করে এক ছটাক জমি ঢুকিয়ে নিয়েছিল ওদের সীমানায়। আর সেই রাগে দু' বাড়ির সম্পর্ক দাঁড়ায় আদায়-কাঁচকলায়। দেখ না দেখ এ ওকে শাপশাপান্ত, তিন চোদ্দোং বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার। এক সময় যে দুই বাড়ির মধ্যে কচুর শাক আর মোচার ঘন্টর বাটি চালাচালি হত সে সব দুই পরিবারই ভুলে গেল পরিপাটি।

নরেনের ওইটুকু ছেলে, পড়ে মাত্র ক্লাস সিক্সে, সেও কিনা সুযোগ পেলেই খেলার মাঠে ঘোষকাকার নাতির সঙ্গে ঝাড়পিট করে আসে। আজও তার বল হারিয়েছে, কালও তাকে ধাক্কা মেরেছে। নরেনই শুধু আপ্রাণ চেষ্টা করে দু'বাড়ির রাগটাকে কমিয়ে আনার,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

রাস্তাঘাটে ঘোষবাড়ির কারওর সঙ্গে দেখা হলেই একমুখ হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করে, ভালো আছ? ঘোষণা ঠোঁটটা একটু একপাশে ঝুলিয়ে দেয় মাত্র।

নরেন বোঝায়, শ্যামলী মিটিয়ে ফেলো, সেই পুরোনো কাসুন্দির জের আর ক'দিন টানবে? শ্যামলী কানই করে না। সঙ্গে নরেনের মা। এই একটা ব্যাপারে শাশুড়ি বউয়ের দারুণ মিল। বরং অন্য সব ব্যাপারের ঝামেলাও এই বিষয়কে কেন্দ্র করে মিটে যায়। নরেনকে কেউ পাত্তাই দেয় না।

অনেক কষ্ট করে নরেন লেখাপড়া শিখেছিল। বি এ পাশ করেছিল। অনেক চাকরির পরীক্ষা দিয়েও একটা চাকরি পায়নি। অবশেষে সার্টিফিকেট জমা রেখে লোন তুলে বাজারে একটা দোকানঘর ভাড়া নিয়ে বইয়ের দোকান করেছে। লোন এখনও শোধ হয়নি। বাবার বারো- চোদ্দ বিঘে জমির আয় আর দোকানের আয়ে তার সংসার চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সে তুলনায় ঘোষেদের বাজারে ছিট কাপড়ের দোকান ফুলেফেঁপে উঠেছে। শ্যামলী আর মা'র রাগ নরেনের ওপরেও কম নয়। নরেন তাই ধীরে ধীরে জোর হারিয়ে ফেলছে ওদের থামানোর। দু'বাড়ির মধ্যে হিংসা বাড়ছে লকলক করে।

অশান্তি চরমে উঠল একটা নারকেল গাছকে ঘিরে। পাতাগুলো অনেকদিন থেকেই একটু একটু করে হলুদ হয়ে আসছিল। নরেন ওষুধ এনে স্প্রে -ট্রে করে অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গাছটা বাঁচল না। গোড়ায় উই লেগেছিল মনে হয়, ঘাড় মটকে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল একদিন। নরেনের মা ডাকল, নরেন! পোলাডার যে গায়ে জ্বর, পেট নামছে দেখছস?

নরেন বলল, হ্যাঁ। ওষুধ এনেছি। যদি না সারে কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।

মা গম্ভীর হয়ে বলল, ও, এই বুঝছস! ডাক্তার দেখায়ে ওই জ্বর নামব না। কেন তর কি কিছুই চোখে পড়ে না?

—কেন? এতে আবার চোখে পড়ার কী আছে? নতুন গরম পড়েছে, বসন্তকাল। এ সময় এমনিই একটু জ্বরজারি হয়।

—ও, গাছডাও মরল আর পোলাডারও পেট নামল, হেইডাতেও তর কিছুই মনে আইল না? শোন, ঘোষেণা বাণ মারছে ওই গাছডায়। অমন তাগড়াই গাছ না হলে অমনি অমনি মইরা যায়?

নরেনের অনেক সাধ ছিল ইস্কুলে পড়ায়। পারেনি। তাই বইয়ের দোকান দিল। কি না অন্তত বইয়ের কাছাকাছি তো থাকা যাবে। তার বইয়ের দোকানে সন্ধেবেলায় আড্ডা দেন এলাকার জ্ঞানীগুণী মানী লোকেরা। কেউ কবি, কেউ মাস্টার, কেউ বা দূরের শহরে কলেজে পড়াতে যান। আসেন কুসংস্কার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা, আসেন সর্বশিক্ষা, সাক্ষরতা মিশনের লোকজন। নরেন মাসে একদিন কলকাতায় গিয়ে খুঁজে খুঁজে নিয়ে

আসে নানান ছোট বড় পত্রপত্রিকা। বিক্রিবাটা হয় হয়তো দু'চার টাকার, কিন্তু তৃপ্তি মেলে আকণ্ঠ।

মায়ের কথা শুনে নরেন কানে আঙুল দিল, আঃ মা তোমাকে বলেছি না ওসব বুজরুকি গল্প আমার কাছে করবে না। মা ফণা তুলে উঠল,অ দুই পাতা পুঁথি পইড়া এক্কেবারে বিদ্যা দিগগজ হইছস। তাও যদি একডা সরকারি চাকরিবাকরি বা নিদেন একডা মাস্টারি জুটাইতে পারতস তো তর লেকচার শোনতাম।দিছিস তো একডা দুকান। তাও এহনও ধার শুধতে পারস নাই। তর কথা অত কেন শুনুম রে?

নরেন দমে যায়। সত্যি তার কথা শুনবে কেন লোকে? জোর কোথায় তার?

শ্যামলী এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে, বলে মা যা বলছে শোন না।

নরেন বলে,তা কী বলতে চাইছ তোমরা?

নরেনের মা বলে, অনেক দিন থাইক্যা ঘোষেদের বলতাছি কাঁঠাল গাছডা কাট, তা কেউ কানই করতাসে না। বাগানডার পুব কোণাডা কেমন আওতা পড়ছে দেখছস?

শ্যামলী যোগ দিল, শুধু বাগান কেন মা,আমাদের ঘরের জানলা দিয়ে একটু রোদ ঢোকে না, স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে ঘরটাও।

নরেন বলে, তো?

নরেনের মা বলে, তো আবার কী? ওই কাঁঠাল গাছডায় বাণ মার।

—বাণ মারতে গেলে কী করতে হবে?

—ওই একজন সাধু ডাইকা মন্ত্র পইড়া গাছডায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা কইরা একডা ডালে একখান সুতা বাঁইন্ধা দিতে হইব।

—তাতে কী হবে?

—ওই গাছডাও মরব, বাড়ির লুকের অমঙ্গলও হইব।

—ও, বিষ-মাখানো সুতা বাঁধতে হবে গাছে তাই তো? তা আমাদের নারকেল গাছে তো কোনও সুতা বাঁধা ছিল না।

—সুতা বাঁইন্ধাও হয়, জলপইড়াও হয়, যে যেইডা করে।

—মোদ্দা কথা গাছটাকে মারতে হবে, এই তো?

—হ।

গাছটা নিয়ে ঘোষকাকাদের ওপর নরেনও যে বিরক্ত নয় তা নয়। বাড়ির পূব কোণাটা সত্যি আওতা করে রেখেছে গাছটা। গাছটা ঘোষেদের বাড়ির একেবারে প্রাচীর ঘেঁষে। আর ওদিকে ঘোষেদের দোতলা দালান উঠেছে। গাছটা ওপাশে জায়গা না পেয়ে ঝুঁকে এসেছে নরেনদের বাড়ির দিকে। সে অনেকবার ঘোষকাকাকে ডেকে বলেছে গাছটা কেটে দিতে, প্রতিবারই ঘোষকাকা বলেছেন, তোমাদের অসুবিধা হলে ডালপালা ছেঁটে নাও। এমন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ফলন্ত গাছ কেউ কাটে! নরেন ও বলতে পারে না কী আশ্চর্য ঘোষকাকা গাছ আপনার, আমি প্রতিবার লোক ডেকে পয়সা দিয়ে ডালপালা ছাঁটাতে যাব কেন? আর গাছটায় সত্যি ফলও হয় তেমনি। একেবারে গোড়ার থেকে থরে থরে কাঁঠাল। আর কাঁঠালের সাইজ কী এই এত বড় বড়! আর যত গাছে কাঁঠাল উপচে পড়ে তত পাল্লা দিয়ে বাড়ে মা'র আর শ্যামলীর রাগ। তা রাগের মাথায় নরেন বলল, গাছ মারতে চাও তো? তা অত কিছু করার দরকার কী? এক টিপ হিং এনে গাছের গায়ে গর্ত করে ঢুকিয়ে দাও গাছটা মরে যাবে।

শ্যামলী চোখ বড় বড় করে বলে, সত্যি! কী আশ্চর্য এত সহজ ব্যাপারটা তুমি আগে বলনি কেন? নরেনের মা বলে,তাইলে তো খুবই ভালো হয়,খরচপাতিও বাঁইচা যায়, তবে ওডার যা মাথামোটা ওডার কথায় বিশ্বাস নাই।

প্রমাদ গোণে নরেন। আর কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না গাছটাকে। এত সহজ ব্যাপারটা জেনেও নরেন এতদিন বলেনি। কারণ সে যে চায়নি গাছকে মেরে দিতে।ঘোষকাকা ডালপালা ছেঁটে দিক তার ঘরে বাগানে একটু আলোবাতাস ঢুকুক এই টুকুই চেয়েছে।

সেদিন দোকান থেকে ফিরতেই শ্যামলী শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলো নরেনের। নরেন বুঝল সময় হয়ে এসেছে। বলল, কবে করতে হবে কাজটা?

শ্যামলী বলল, শুভ কাজে দেরি করা ঠিক না, আজই করো না।

নরেন বললো, কিন্তু আমি তো হিং আনতে ভুলে গেছি।

শ্যামলী বলল, সে আমি জানতাম, তুমি সাত তালে থাকো, তোমার কী অত মনে থাকে? আমি আনিয়ে রেখেছি।

নরেন চমকে উঠে বলে, পাড়ার দোকান থেকে আনলে, কেউ সন্দেহ করবে না তো?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে শ্যামলী খুকখুক করে হাসে, বলে বাব্বা তুমি এমন কচ্চ যেন মানুষ খুন কচ্চ। তাও আমি পাড়ার দোকান থেকে কিনিনি। ছেলেকে সাইকেল দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ওই রোডের ধারে দোকান থেকে এনেছে।

নরেন বলল, ছেলেটাকেও জানালে?

শ্যামলী এবার রেগে উঠে বলল, দেখো বেশি ন্যাকামি আমার সহ্য হয় না, কেন এটা কী এমন কাণ্ড হচ্ছে যে ছেলেকে জানানো যাবে না?

নরেন চুপ করে গেল। আজকাল বেশি কথা বলতে গেলে হাঁপ ধরে তার।

কাজটা সারতে কোন অসুবিধা হয়নি। শ্যামলী টর্চ নিয়ে পিছন পিছন গিয়েছিল, দা এগিয়ে দিয়েছিল হাতে। খুব সাবধানে গাছের গায়ে গর্ত করেছে নরেন। শব্দ হয়নি খুব একটা। হিং-টা পুরে দিয়ে চলে এসেছিল নিঃশব্দে। ঘরে ফিরতেই মা বলেছিল বাব্বা বউমা তুমি পারলা এই হ্যাবলাডারে দিয়া একডা কাজের কাজ করাইতে।

হ্যাঁ, গাছটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল। ফলগুলো কালো কালো হয়ে বোঁটা থেকে খসে পড়ল, পাতা হলুদ হয়ে ঝরে গেল। ঘোষ কাকিমা চিৎকার করে শাপ শাপান্ত করেন, ফলন্ত গাছডারে এইভাবে মারলি, অরে নিঃবংশ হবি, অরে নিঃবংশ হবি।

নরেন কানে আঙুল দিলে শ্যামলী বলে, রাখ তো, শকুনের অভিশাপে গরু মরে না। নরেনের ঘুম আসে না, চোখ বুঝলেই সে স্বপ্ন দেখে গর্ভবতী শ্যামলীকে সে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। ধড়ফড় করে সে উঠে বসে বিছানায়। কাউকে কিছু বলতে পারে না।

শ্যামলী বলে, কী হল আবার?

নরেন কাঁপতে কাঁপতে বলে, আমার ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

—জগদীশ বোসের।

—সেটা আবার কে গা?

—জগদীশচন্দ্র বসুর নাম জানো না? একজন মহান বিজ্ঞানী। উনি তো আমাদের শিখিয়েছিলেন গাছেদেরও প্রাণ আছে।

এবার খিলখিল করে হেসে ওঠে শ্যামলী। আর নরেন মাথাটা পেট আর হাঁটুর মধ্যে গুঁজতে গুঁজতে বলে, আঃ চুপ কর, চুপ কর শ্যামলী, আমার তোমাকেও ভয় করছে।

অনুভবে তোমাকে যে চাই

দেবযানী বসু কুমার

মহারানী বিড়লা কলেজে ফেস্ট। ছাত্রীরা সব সেজেগুজে মহা ব্যস্ত। জয়ন্তী তখন ওই কলেজে ফার্স ইয়ারে পড়ে। এস্থেটিক সেন্সটা ওর বেশ আছে বলে দায়িত্ব পড়েছে স্টেজ সাজাবার। ফেস্ট তাই অন্যান্য কলেজে থেকেও অনেক ছাত্র ছাত্রীরা এসেছে। আর পাঁচটা দিনের মত খুব কড়াকড়ি নেই আজ। কলেজের আইডি দেখাতে পারলেই সবার জন্য অবারিত দ্বার।

এত ভিড়ের মধ্যেও জয়ন্তী অনুভব করে কেউ যেন আলাদা করে বারে বারে ওর ফটো তুলছে। খেয়ালও করেছে একটা ছেলেকে। বেশ ঝকঝকে চেহারা। খবর নিয়ে জানতে পারে কলেজের তরফে অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার হয়ে এসেছে। অনুষ্ঠান শেষে যখন অডিটোরিয়াম থেকে বেরোতে যাবে হটাৎ ছেলেটি সামনে এসে বলে, আমি চঞ্চল, অনেক ছবি তুলেছি আপনার। পাঠিয়ে দিতাম যদি আপনার ফোন নম্বর দিতে আপত্তি না থাকে। এতো ভালো সাবজেক্ট পেয়ে লোভ সামলাতে পারিনি। অনুমতি না নিয়েই অনেক ছবি তুলেছি।

জয়ন্তী বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। চেহারাতে আদুরে আদুরে ভাব তবে সত্যি ফটোজেনিক। পড়াশুনোতে তেমন মন নেই। করতে হবে বলে করা। আর্থিক স্বচ্ছলতাতে মানুষ। বাবা মার সাথে থাকে কাঁকুলিয়ায় নিজেদের বাড়িতে। আর চঞ্চল অতি সাধারণ ছেলে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ফোটোগ্রাফি শিখেছে। হাত বেশ ভালোই তাই মন্দ রোজগার হয়না। কালীঘাটে ভাড়া বাড়িতে থাকে বাবা মা ও পাঁচ ভাই বোন মিলে। পারতপক্ষে চেষ্টা করে সারাদিন বাড়িতে না ফিরতে কারণ সত্যি জায়গার ভারী অভাব।

কিন্তু তাতে প্রেমে পড়তে কোনো অসুবিধে হয়না। ছবি দেবার নাম করে প্রথম দেখা সাক্ষাৎ আর তারপর প্রেম গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। প্রথম যেদিন জয়ন্তীর বাড়িতে জানাজানি হয় সে এক দারুন অশান্তির পরিস্থিতি। বাবা মেয়েকে যতই বোঝায় প্রেমে অন্ধ মেয়ে তখন ততই অবুজ। শেষে একমাত্র আদুরে মেয়ের জেদের কাছে হার মানতে হয়। যদিও মনের সাথে অনেক লড়াই করে ওনারা বিয়েতে মত দেন কিন্তু মনে মনে বোঝেন এই বিয়েটা না হলেই ভালো হতো। ততদিনে জয়ন্তীর গ্র্যাজুয়েশন শেষ। এত তাড়াতাড়ি বিয়েতে অমত থাকলেও মাত্র বাইশ বছর বয়সে মেয়ের আবদারে বিয়ে দিতে বাধ্য হন ওনারা।

অগত্যা সানাই বাজে, চার হাত এক হয়। এই ছেলের রোজগারেই সংসারের অনেকটা চলে বলে ছেলের বাড়ির খুব একটা আগ্রহ থাকেনা। তাই ধুম ধাম নাহোলেও বিয়ের উৎসব শেষ হয়।

শশুরবাড়িতে জায়গা অকুলান। কিন্তু জয়ন্তীর খুব অমত ঘর জামাই থাকার। তাই বাবামায়ের হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া করে মনোহর পুকুরে। বছর না

ঘুরতেই সংসার বাড়ে দুজন থেকে তিনজনে। ঋক আসে ওদের জীবনে। প্রাচুর্য্য না থাকলেও স্বচ্ছলতা আছে। তাই হেসে খেলেই দিনগুলো কাটে বেশ।

ইতিমধ্যে জয়ন্তীর মা মারা গেছেন। ছেলে ভর্তি হয়েছে দামি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। চঞ্চলের কাজ বেড়েছে, সাথে বেড়েছে অর্থ সমাগম, কমেছে সংসারে দেওয়া সময়। এই কাজের জন্যই গেছে একটা জন্মদিনের অনুষ্ঠানের ছবি তুলতে। আর সেখানেই আলাপ অর্পিতার সাথে। অর্পিতা ডিভোর্সি, সুন্দরী, শিক্ষিতা। এছাড়া আছে নিজের একটা এড এজেন্সির ব্যবসা। অর্পিতার সম্মোহনী-স্বভাব চঞ্চলকে আকৃষ্ট করে। চঞ্চলের সংসারের সব কথা জেনেও অর্পিতা সরে দাঁড়ায় না। উল্টে শুরু হয় গোপন প্রেম। চঞ্চল পাকে পাকে জড়িয়ে পরে। ছিন্ন করতে পারেনা অর্পিতার আকর্ষণ।

জয়ন্তী কিছুই জানতে পারে না এসবের। বরাবরই উচ্ছল প্রকৃতির। ছেলে বর সংসার বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করে দিন কাটায়। চঞ্চলের ফোনে অর্পিতা চঞ্চল এর একটা ঘনিষ্ঠ ছবি দেখে পৃথিবীটা যেন দুলে ওঠে। চঞ্চল বোধহয় ভুলে গিয়েছিলো ডিলিট করতে। শুরু হয় অশান্তি। চরম আকার ধারণ করে যত দিন যায়। কারো কথা না ভেবেই জয়ন্তী আত্মহত্যা করে গলায় দড়ি দিয়ে।

তিন মাসের মাথায় জয়ন্তীর বাবা শোক সহ্য করতে না পেরে মারা যান। ঋকও কেমন কুঁকড়ে গেছে। কারো সাথে কথা বলে না। বন্ধুদের সাথে মিশতে পারেনা। স্কুল থেকে প্রায়ই অভিযোগ আসে পড়াশোনোতে অমনোযোগ ব'লে। বরাবর মার কাছে পড়ার অভ্যাস। বাড়িতে টিউটর রেখেও কোনো সুরাহা হয়না। ঋককে নিয়ে চঞ্চল কাঁকুলিয়ায় জয়ন্তীদের বাড়ি উঠে আসে।

সময় থেমে নেই। খালি যেদিন অর্পিতা আসে দিনগুলোতে কেমন একটা অস্বস্তি হয় চঞ্চলের? কেমন গা ছম ছম করে। বেশি বেশি করে মনে পড়ে জয়ন্তীকে। চঞ্চল মনে মনে ভাবে আগে তো কখনো এমন হতো না। নিজেরই কেমন রহস্য লাগে। কে কীভাবে নেবে এই কথা ভেবে কারো কাছে মন খুলে হালকা হতে পারে না।

আর ভালো লাগেনা অপেক্ষা করতে। অর্পিতার তাগাদায় আর আবদারের কাছে হার মানতে হয় চঞ্চলকে। জয়ন্তীর মৃত্যুর এগারো মাসের মাথায় কাগজে সই করে বিয়ে হয়ে যায়। ওদের নির্লজ্জতায় সবাই ছিছিক্কার দেয়। আর বন্ধুরা যবে থেকে শুনেছে অর্পিতার সঙ্গে সম্পর্কের কথা তবে থেকে বয়কট করেছে চঞ্চলকে।

বিয়ে করে অর্পিতা এসে ওঠে জয়ন্তীর বাড়িতে। বিয়ের প্রথম রাতে একটা অজানা ভয় গ্রাস করে চঞ্চলকে। কিন্তু অর্পিতার মন রাখার জন্য যতবার ছুতে যায় ওকে হাতটা কিছুতেই পৌছোয়না অর্পিতা অবধি। অনুভব করে ওদের মাঝখানে তৃতীয় কারো উপস্থিতি। ঘুমের অজুহাতে চঞ্চল শুয়ে পড়ে। কিন্তু এটা হয়ে ওঠে নিত্যদিনের সমস্যা। চঞ্চল অর্পিতা যেই কাছাকাছি আসতে চায় কিছু না কিছু ঘটে ওই চরম মুহূর্তে। কোনোদিন চঞ্চল অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখনো ছেলে দরজা ধাক্কা দিয়ে বলে ভয় করছে। আবার কখনো গভীর রাতে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ফোনে ব্ল্যাঙ্ক কল আসে। একদিন মন শক্ত করে সবে অর্পিতা কে জড়িয়ে ধরেছে দেখে সামনের মানুষটা অর্পিতা নয় জয়ন্তী। ভয় পেয়ে বিকট চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায় চঞ্চল।

এদিকে অর্পিতা এসবের কিছুই বুঝতে পারে না। অবুজ হয়ে ওঠে দিন দিন। বিশ্রীভাবে অপমান করে চঞ্চলকে। একটা একটা করে দিন চলে যায় কিন্তু ওরা একদিনেও এক হতে পারে না। কয়েকমাস পরে তিতিবিরক্ত হয়ে একদিন অর্পিতা চঞ্চলকে মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার বলে, ভয়ের কিছু নেই। একদম জয়ন্তীর কথা ভাববেন না। কিছু ওষুধ লিখে দেন। বলেন, আপনি মনে মনে অপরাধ বোধে ভুগছেন। সব ঘটনা মনের ভুল। যে চলে গেছে সে কি করে আসবে। বরং ক'দিন বাইরে থেকে ঘুরে আসুন। পরিবেশ বদলালে সম্পর্কটা সহজ হবে। নিজেরা কাছাকাছি আসতে পারবেন।

মুশকিল হয় ছেলে কোথায় থাকবে? শেষে চঞ্চল অনেক বুঝিয়ে নিজের বোনের কাছে কালীঘাটে ছেলেকে রেখে দুজনে মিলে বেড়াতে যায় পাঁচদিনের জন্য আরাকু ভ্যালি। হোটেলে ওঠার পরপরই চঞ্চলের ধুম জ্বর। জ্বর লাফিয়ে ১০৩। চোখ মেলতে পারে না। লোকাল ডাক্তার আসে। ওষুধ খেয়েও একই অবস্থা। রেজারভেশন করা আছে তাই পাঁচদিনের দিন ওই অবস্থায় ট্রেনে উঠতে হয়। ওঠার একঘন্টার মধ্যেই একদম সুস্থ বোধ করে চঞ্চল।

অর্পিতার কাছে মরমে মরে যায়। কোনো যুক্তি দিতে পারে না। আর অর্পিতা ভাবে চঞ্চলের এই আচরণ ইচ্ছাকৃত। প্রথমে মনে মনে তারপর প্রকাশ্যেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অর্পিতা। শুরু হয় চরম অশান্তি। চঞ্চল অসহায় হয়ে অর্পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সব বিফলে যায়। নিজের অক্ষমতার জন্য লজ্জিত হয় নিজের কাছে। তাও চেষ্টা করে অর্পিতাকে একা পাবার, কিন্তু তখনি দুজনের মাঝে অশরীরী জয়ন্তীর ছায়া হাজির হয়। জয়ন্তীর এই উপস্থিতি কাউকে বোঝাতে পারে না চঞ্চল — না ডাক্তারকে, না অর্পিতাকে, না নিজের মনকে।

আড়াই বছরের মাথায় অর্পিতা ডিভোর্সের জন্য দরখাস্ত করে। কারণ দেখায় চঞ্চল পুরুষত্বহীন।

ইচ্ছে করলে চঞ্চল এই অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণ করতে পারতো, কিন্তু নিজের প্রতি ঘৃণায় সব অভিযোগ মাথা পেতে নেয়। অর্পিতা চঞ্চলকে ছেড়ে চলে যায়।

চঞ্চল একা হয়ে পড়ে। অর্পিতার জন্য ছেলের সঙ্গে ততদিনে এক বিরাট দূরত্ব তৈরী হয়েছে। সে নিজের মতো থাকে। বড় হয়েছে। মায়ের মৃত্যুর জটটা ততদিনে খুলতে শিখেছে। তাই বাবার কাছে সহজ হতে পারে না। চঞ্চল এখন মনে মনে চায় জয়ন্তী আসুক। বার বার আসুক। অশরীরী জয়ন্তীকে ও কাছে পেতে চায়। জয়ন্তীর অভাবটা পাগল করে ওকে। কিন্তু যেদিন অর্পিতা চলে গেছে তারপর থেকে আর একদিনও জয়ন্তী আসেনি। কিন্তু জয়ন্তীর ছবির সামনে প্রতিদিন চলল আকুতি জানায়—অনুভবে তোমাকে যে চাই।

ধারা-বিবরণী

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

"আমার কেউ নেই এই নশ্বর পৃথিবীতে আমার কেউ নেই" অগোছালো অন্যমনস্কতার ভিতর এই কথাগুলো বিড়বিড় করতে করতে হাঁটছিল সৃজন। রাস্তা দিয়ে।

শেষ শ্রাবণের কালবর্ষণে পথ—ঘাট প্রায় বেহাল। নর্দমা পুকুর রেনওয়াটার পাইপ দিয়ে তোড়ে নেমে আসা ধারাপাত ধীরে ধীরে শহরটার পেট পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছে। হয়তো সময়ের বোধ হারিয়ে গিয়ে গলা, তারপর মুণ্ডু শেষে চলে যাবে গোটা কলকাতাই। হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিকের মত ফ্যাদম—ফ্যাদম গভীরতার নিচে ঘুমিয়ে পড়বে। পরিতক্ত, বিলুপ্ত নগরীরা যেমন।

শরীরে কাঁটা দিল কি। কে জানে। ঝাপসা পৃষ্ঠার মতন আকাশ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে সূক্ষ্ম—মোটা—কৃশ নানান প্রকৃতির জলবিন্দু। স্নান করছে সৃজন। যন্ত্রণাময় অবগাহনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বৃষ্টি, না কাচ! ফোঁটাগুলো এত তীক্ষ্ণ কেন? এত তীব্র! যেন অগুনতি কাচের টুকরো মাথায়—ঘাড়ে খোলা ত্বকের অংশে বিঁধে যাচ্ছে। আর রক্ত নামছে। বৃষ্টিফোঁটার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে রক্তের রং। মেটে রঙের ঘোলাজলে থই থই করছে মহানগর।

আঃ কী আরাম। যন্ত্রণায়—ব্যথায় বুঝি লুকিয়ে থাকে এত উপশম। সুখশান্তি। সুখশান্তি। পাতলা চামড়ার চটিটা জল খেয়ে খেয়ে ঢ্যাবঢ্যাপ করছে। পাঞ্জাবী লেপ্টে গিয়েছে দেহকাঠামোয়! চুলের রন্ধ্রপথ দিয়ে মগজে প্রবেশ করছে জলপোকা! কাচপোকা।

হাঁটো সুজন হাঁটো। হাট শালা পথের কোনও শেষ হয় নাকি। যতদূর যাবি দেখবি সেখান থেকে আবার শুরু হয়ে গেছে পথ। অনন্ত। মসৃণ। এবড়োখেবড়ো। পথ কেবলই পথেই মিশে যায়। পৌঁছায় না কোথাও। মানুষ পৌঁছায় না। শুধু ঘুরতে থাকে। ভূতগ্রস্তের মত। নিশি পাওয়ার মত।

সুজন কি একটু থমকে গিয়েছিল! কে জানে! তবে যদি দাড়িয়েও থাকে তা সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য। ওই আবার হাঁটতে শুরু করেছে। এই গলি থেকে ওই গলি। এই সিগনাল পেরিয়ে অন্য সিগন্যাল। লাল পাড় হেয় হলুদ ক্রস করে সবুজ।

ছাতা আবিষ্কারক যেন কে ছিলেন! কিছুতেই মনে পড়ছে না! মনে মনে সেই আবিষ্কারক ভদ্রলোকটিকে গাল পাড়ল সুজন। এই ছাতা শালা এই ছাতা এই শুয়োরের বাচ্চা ছাতাই মানুষকে আড়াল করে রেখেছে কতকাল। অস্তিত্বকে ঢাকাচাপা দিয়ে রাখছে। সুজনের কোন আব্রু নেই। ছাতা নেই।

আচ্ছা ছাতাও তো একপ্রকার মুখোশই না কি! শুধু মেলায় বিক্রি হয় না এই যা।

কর্পোরেট অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকা কর্তাব্যক্তির মুখে ফুটে ওঠে না এই যা। সুজন মুখোশ ছিঁড়তে ভালবাসে। মুখোশ কিনতেও।

ধুর ধুর গোটা কলকাতাই তো মুখোশ এঁটে রয়েছে। ছাতার আবডালে উঁকি—ঝুঁকি দিচ্ছে। এই যেমন, সুজন, কলকাতার খণ্ডাংশের প্রতিনিধি হয়ে, ছাতা—সংস্কৃতির বিরুদ্ধতার দলনেতা হয়ে, কেবল জল ভাঙছে। ছাতাও খুঁজছে কী! পথচলতি সারি সারি রং-বেরংয়ের ছাতা দেখতে দেখতে তার ভেতরে প্রতিরোধ জন্মাচ্ছে। বিচিত্র রকম আক্রোশ জেগে উঠেছে। এক্ষুনি সবলে কারোর ছাতা কেড়ে নেবে সে। হয়ে উঠবে ছাতা—সভ্যতার অনুগামী। ঝমঝম ঝিরঝির ঝপাসঝপ।

দৃশ্য এক

উত্তর কলকাতার প্রাচীন এক রেস্তোরাঁর পর্দাঘেরা ছায়াময় টেবিল। ঠিক মাঝখানে একটু আগে—পরে রাখা ধোঁয়াওঠা চাউমিন দু—প্লেট। দুটো জলভর্তি—জলশূন্য কাঁচে গেলাস। মুরগি না পাঁঠা। সুজনের উলটো দিকে সবুজ সালোয়ার, কী যেন নামটা! অন্বিতা বোধ হয়।

—তুমি এত এত ভেঙে পড়ছ কেন সু? হলই বা ক্যানসার গলায় হলেও আজকাল তো সেরে যাচ্ছে। অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠছে। তুমিও হবে। শোনো, ডাক্তার ভগবান নয়। তুমি না করলেও আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরে। কিচ্ছু হবে না, ডাক্তার তোমায় দু—মাস সময় দিয়েছেন তো, তার মধ্যে তোমার কেমোথেরাপি হবে। তোমার কিচ্ছু হবে না, দেখো

—আমি বাঁচবো না অনু তুমি জান না আজকাল সবসময় আমি মৃত্যুকে বরণ করে বেড়াই। আমি মৃত্যু দেখতে পাই। আমার মুখে এই দেখো মরণের ছায়া। তুমি শুধু বলো, তুমি আমার, তুমি আমারই আর কারো নয়।

— শান্ত হও, শান্ত হয় সোনা আমি তো তোমারই, আর কারো নয়।

— না, অনু, না, আমি ভয়ানক ফোবিয়ার মধ্যে ঢুকে গেছি। জানো কাল রাতে আমার ঘরের ভেন্টিলেটারে একটা চামচিকে ঢুকেছিল, কী বীভৎস কালো আর বিছানায় শোয়া আমাকে জুলজুল করে দেখছিল। উফ কী ভয়ানক ওর পুঁতির মতো কালো চোখ দুটো। ও—না আমাকেও আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল অনু, তুমি আমাকে বাঁ—বাঁচাও, আমি আর বাঁচবো না অনু।

— চুপ করো আমার কথা শোনো

— না, না, অনু।

— চুপ, না হলে আমি কিন্তু এবারে বকবো তোমায়।

— ওহ আচ্ছা ব—বলো।

— শোনো, আমি বলছি, তোমার কিছু হবে না — ওসব তোমার মনের ভুল। তুমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলো তো।

— না অনু, আর পারছিনা আমি আমার পাশে তুমি আছো তো? আছো তো? বলো আছো?

— আমি তো তোমার পাশে সবসময় আছি সু।

— না না এই দু'মাস আর মাত্র দু'মাস।

— কিচ্ছু দু'মাস—টু'মাস নয়! ওসব উদ্ভট কথা একদম বলবে না—

— মাত্র দু'মাস, অনু মাত্র দু ...

— চুপ! এই তোমার ঠোঁটে আঙুল রেখেছি এবার বলো দেখি দু'মাস বল দেখি? যতো জোরে বলবে, ততো জোর দিয়ে আমি তোমার ঠোঁট চেপে ধরবো এইরকম করে ঠোঁট কামড়ে দেবো — উ মম এবার বলো? বলো দেখি?

দৃশ্য দুই

কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে একটি স্বল্পখ্যাত নির্জন পার্ক। একটা জারুল গাছের নীচে বড় একফালি প্লাস্টিকের ওপর একজোড়া মানুষ। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন যেন। শেষ বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে হাওয়ায় হাওয়ায়।

সুজন শুয়ে আছে নীলশাড়ী—পরা কারো কোলে। সম্ভবত একটু আগে সে কেঁদেছিল। চোখের কোণ বেয়ে গালে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুরেখা জিভ দিয়ে চেটে দিচ্ছিল তৃণা।

একটু তফাতে আশেপাশে, বিচ্ছিন্নভাবে একাত্ম হয়ে শুয়ে আছে আরও কয়েকটি জুটি।

— তুমি আমার কথা কেন বুঝছো না তিন্নি, আমার দুটো কিডনিই যে শেষ! ভয়ঙ্কর নেফ্রাইটিস গ্রাস করেছে আমার শরীর, আমার আমার হঠাৎ হঠাৎ জ্বর হয় তিন্নি আমি, স্বাভাবিকভাবেই ইউরিন করতে পারি না আজ কতকাল হয়ে গেছে

— অ্যাই আমি—আমি না তুমি তো আমার ধেড়ে বাচ্চা না না কাঁদবে না আমি তো রয়েছি কিচ্ছু হবে না, আমি তোমায় আদর দিয়ে সুস্থ করে দেব।

— না, তিনু দুটো কিডনি বিকল হলে, মানুষ স্বাভাবিক থাকে না। আমিও নেই। মানুষ বাঁচে না তিন্নি, আমিও আর আর বাঁচবো না!

— আবার এসব অলক্ষুনে কথা? বারণ করছি তো।

— না, তিন্নি ডাক্তার ডাক্তার বলেছেন,

— গুলি মারো ডাক্তারকে। আমি বলছি কিছু হবে না। এই তো তোমায় জাপটে ধরে আছি।

— তিনু আমার, তিন্নি আমি

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি তুমি চলো তো আমার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ কলেজের এক্সকারশনে সবাই যাচ্ছে। আমিও বাড়িতে তাই বলেছি। তোমাকে নিয়ে চলে যাব বহরমপুর, দুটো দিন, আমার সঙ্গে কাটাও তো তোমার সব অসুখ আমি নিয়ে নেব।

— তুমি, তুমি, আমাকে এত ভালোবাস তৃণা?

— হ্যাঁ সুজন, আমি নিজেও তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমি কিছুতেই হারাবো না। হারতেও দেব না।

— কিন্তু কিন্তু

— কোনও কিন্তু নয় এই দ্যাখো, আমার কোল জুড়ে আমার বুকের ভেতর তুমি শুধু তুমি।

দৃশ্য তৃতীয়

রাত বোধহয় ন'টা সাড়ে নটা ও হতে পারে। থমথম করছে, একদম বন্ধ করার সংকীর্ণ বলি সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকার মাখা গলির মুখে মিটমিট করছে একটাই আলো, রাতারাতি ক্রমশ অন্ধকার আরও অন্ধ হয়ে যাচ্ছে

এই বাইলেনের কোনো নিরাপত্তা নেই কানা গলি সুজনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে তার নাম সোহিনী হলেও হতে পারে আর দুজনের মধ্যে কার ফাঁক টুকু ইঞ্চির বেশি নয়, সেখানে নিস্পন্দ আকার নিয়ে জমে আছে।

— বাবুই, তুমি কেন বুঝতে পারছ না এই রোগটার নাম ডিমনেশিয়া আমার মাথা আস্তে আস্তে কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। স্মৃতিশক্তি প্রতিদিন কমছে। আমার ব্রেন ধুঁকছে বাবুই ব্রেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমিও

— শোনো সু, আমি থাকতে তোমার কোনো অসুখ হতেই পারে না।

— না, ডিমনেশিয়া

— ইন্দোনেশিয়া

— তুমি ইয়ার্কি মারছ?

— হ্যাঁ, মারছিই তো। যতসব আজেবাজে চিন্তা!

— না, এটা আজেবাজে নয় আমার স্মৃতি দ্রুত চলে যাচ্ছে! এই অবস্থায় তুমি আমার সঙ্গে জীবন কাটাতে চাইছো কেন? পারবে?

— একশোবার পারবো। হাজারবার পারবো।

— আমি আমি যদি একদিন তোমাকে ভুলে যাই, যদি চিনতে না পারি? লং টার্ম লস—অফ—মেমোরি কী জিনিস তা তুমি জান না!

— নিকুচি করেছে মেমরির। ওকে মেমারিতে পাঠিয়ে দাও।

— আমি সত্যি বলছি—

— হ্যাঁ, আমি জানি তো তুমি সত্যিই বলছো। আমার সু মিথ্যে বলতেই পারে না কোনদিন শেখেনি তো।

— হ্যাঁ বাবুই ফর গড সেক।

— শোনো আমি তোমার মনের ভেতর ঢুকে চুপট করে বসে থাকবো, সারাজীবন। আর আমি তোমার ভেতর থাকলে তুমি ভুলবে কী করে?

— না, বাবুই আজকাল তোমার ভালো নামটাও আমার আর মনে পড়ে না, এমন কী মাঝে মাঝে নিজের নামটাও ভুলে যাচ্ছি। এই মনে আসে আবার হারিয়ে যায় দ্যাখো আমার বুকে হাত রেখে দ্যাখো কেমন ধককরছে।

— উঁহু, তুমি আমার বুকে হাত রেখে দ্যাখো কেমন ধকধক করছে

— বাবুই!

— কোনও কথা নয়। এই আমি তোমার হাত আমার বুকে রাখলাম ধকধক করছে টের পাচ্ছো তো?

— না, বাবুই শোনো

— এই আমার বুকে কান পাতো। স্পষ্ট শুনতে পাবে

— বা

— শোনো, শুনতে পাচ্ছ না? কোথায় গেলো তোমার ডিমনেশিয়া?

— আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না বাবুই!

— কে বাঁচতে বলেছে, আমাকে ছাড়া?

— কিন্তু আমার যে

— হ্যাঁ, তোমার যে সোহিনী আছে, বাবুই আছে না তাকে ছাড়া তুমি আর কেউ নও

— হ্যাঁ বাবুই, হ্যাঁ, আমার তুমি আছো। তুমি তুমি সোহিনী।

বৃষ্টি আবার শুরু হলো বুঝি ওই! রাত কত হল কে জানে! চটির প্রতিটি ধাক্কায় কাচগুঁড়োর মতো জল ভাঙতে ভাঙতে এগোচ্ছিল সুজন। একা। এই বৃষ্টির শরীরে পরতে পরতে নিজেকে মুড়ে নিচ্ছিল সে। সে জানে না, সে কোথায় এসেছিল! যাবেই বা কোথায়! তবু কোথাও একটা পৌঁছানো দরকার। হয়তো কোনও এক ছাতার তলায়। গাঢ় মিশমিশে ছাতা। তার অন্তরে একটা অজানা উদ্বেগ জন্ম নিচ্ছিল আবার মরে যাচ্ছিল। জন্মাচ্ছিল আবারও।

যদি কাল সকালে আর বৃষ্টি না হয়! সমুদ্র না হয়ে ওঠে এই শহর, তখন কী হবে!

ছাতা আবিষ্কারকের নামটা যেন কী বাড়িটাই বা কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে, অসংখ্য সহস্রা নানা মাপের বেমানান— মানানসই ছাতা!

আরো অনেকগুলো নাম বাকি আছে যে; আরো কত শত অসুখ। ওই যে আবার শুরু বিড়বিড় করল, "কেউ নেই এ জগতে আমার কেউ নেই"।

মিষ্টিমাসির বৌমা

চুমকি চট্টোপাধ্যায়

— হ্যালো

— টুলু, তথার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল রে!

— আরে তাই নাকি? দারুণ খবর তো মিষ্টিমাসি! তোমার হাড় জুড়োলো একটু? হাহাহাহা...

— শুধু হাড়? সারা অঙ্গ জুড়িয়েছে রে বেটি! বিনুটার বিয়ে হয়ে যাবার আগে থেকেই গরু-খোঁজা খুঁজছি জানিস তো! কিছুতেই চালে ডালে খিচুড়ি পাকছিল না। অথচ দেখ, ভগবানের এমন মহিমা যে ঘরের কাছেই ভালো মেয়ে পেয়ে গেলাম।

— খুবই আনন্দের কথা মিষ্টিমাসি। কবে আসবে তুমি আমাদের বাড়ি? রবিবার দেখে এসো প্লিজ যাতে আমি থাকতে পারি।

— আসব তো বটেই। কত্ত গল্প করতে হবে। মাকে বলিস টুলু, আমি আসব। এই সময়টা তোর মা বিশ্রাম নেয় ধরে নিয়ে তোকে ফোন করলাম। আচ্ছা রে, এখন রাখছি।

— আচ্ছা মাসি।

মিষ্টিমাসি -- আমার মায়ের মাসতুতো দিদি। আমার সবথেকে প্রিয় মাসি। বলতে গেলে, চারদিকে যত আত্মীয় আছে, মিষ্টিমাসিই সেরা। এত খোলামেলা বড় মনের মানুষ আমি এখনও অবধি দেখিনি। সংস্কারহীন, উদার এক মানুষ। আমার মা ও যথেষ্ট প্রোগ্রেসিভ কিন্তু মিষ্টিমাসি আলাদা রকম।

এক রবিবার হইহই করতে করতে এল মিষ্টিমাসি। হাতে ঝুলছে গরম কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুর তরকারির পলিব্যাগ। মিষ্টিমাসি আমার প্রিয় কি, তা জানে।

খাবারের প্যাকেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সটান চলে গেল মায়ের ঘরে। যেতে যেতে আওয়াজ দিয়ে গেল, "টুলু, কচুরি নিয়ে চলে আয়; খা আর গল্প শোন।"

প্লেটে কচুরি আর বাটিতে তরকারি নিয়ে মিষ্টিমাসির পাশে গিয়ে বসলাম।

— খুব ভালো একটা মেয়ের সন্ধান পেয়েছি রে ডলি। আমি তো দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। বিনু নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে, এদিকে বড় ভাইয়ের জন্য একটাও উপযুক্ত মেয়ে পাচ্ছিনা।

আসলে তথাটার মাথার চুল পড়ে গিয়েই হয়েছে সমস্যা। আজকালকার মেয়েদের তো ওপর দেখনাই খুব বেশি। ছেলের স্বভাব-চরিত্রটাই যে আসল, তা ভাবেনা। যাক বাবা, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই। এই মেয়েটি, সম্পূর্ণা, ডাক নাম রিয়া, যেমন মিষ্টি দেখতে তেমনি গুণের। ডক্টরেট করা। কলেজে পড়ায়। চমৎকার গান করে। শান্ত...

মিষ্টিমাসির কথার মাঝখানেই মা বলে উঠল, "তা একে পেলে কোথায় রাঙাদি? এমন গুণের মেয়ে এতদিন অবিবাহিত রয়েছে?"

মায়ের কথায় আমার একটু অস্বস্তি লাগলেও মিষ্টিমাসির কোনো হেলদোল নেই। বরং চনমন করে বলে উঠল, "তথার এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে দেখা ওদের দুজনের। সেই বন্ধু হল কমন ফ্রেন্ড। এতদিন অবিবাহিত কেন জিগ্যেস করছিলি না? ওর একটা হিস্ট্রি আছে। খুবই বেদনাদায়ক।

"বছর পাঁচেক আগে রিয়ার বিয়ে হয়েছিল। তখন ও সবে থিসিস জমা দিয়েছে। ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার ছিল। একমাত্র ছেলে। অবস্থাপন্ন ঘর। বাইরে থেকে দেখলে একেবারে সোনার টুকরো ছেলে। কিন্তু...

"বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যেই মুখোশ খুলে যায় ওদের। শুধু ছেলে নয়, তার মা বাবা সবার। শুরু হয় অত্যাচার। রান্নার লোক ছাড়িয়ে দেয়, কাজের লোক ছাড়িয়ে দেয়, সব রিয়াকে দিয়ে করাতে শুরু করে।"

— সেকি? আঁতকে উঠি আমি। মাও ইস ব'লে সোজা হয়ে বসে।

— হ্যাঁ গো রাঙাদি। অনেক সহ্য করে মাস তিনেক বাদে যখন অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়েছে, তখন এক কাপড়ে কোনরকমে পালিয়ে আসে রিয়া। বলো, কি সাংঘাতিক লোকজন! আমার তো শুনে থেকেই মেয়েটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। আহা রে, কত কষ্টই না করেছে বেচারি!

মিষ্টিমাসির এই কথাগুলো শুনে আমি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। মিষ্টিমাসি এত ভালো! মিষ্টিমাসির বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। এই বয়সের ক'জন মহিলা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মেয়েকে নির্দ্বিধায় ছেলের বউ করে ঘরে আনবে? যেখানে ছেলের এটা প্রথম বিয়ে।

আমার মায়েরই তো মুখটা সামান্য হলেও গম্ভীর হয়ে গেল। আমার দিকে একবার তাকিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, "ভালো করে খোঁজখবর নিয়েছ তো রাঙাদি ? বিয়ে তো ছেলেখেলা নয়।"

— যাদের কাছেই খবর নিয়েছি তারাই রিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আমার আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই মনে।

মিষ্টিমাসির মনের উদারতা দেখে মুগ্ধতা ছেয়ে গেল আমাকে। বললাম, "যাক, এবারে তোমাদের ঘরে আসছে, আনন্দে আহ্লাদে থাকবে। তথাগতদা তো খুবই ভালো কিন্তু তোমার মতো শাশুড়ি পেতে অনেক জন্মের পুণ্যি লাগে। তোমার মধ্যে ঈশ্বরের বাস করেন গো মিষ্টিমাসি। তাই তুমি এত নিঁখুত।"

উদাত্ত গলায় হেসে মিষ্টিমাসি আমার গাল টিপে বলে, "দুর পাগলি।"

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

তথাগতদার বিয়েতে খুব হইহই করলাম আমরা সবাই। মেসোমশাইয়ের চামড়ার তৈরি গ্লাভস, ব্যাগ ইত্যাদি অনেক জিনিসের এক্সপোর্টের ব্যবসা। টাকা প্রচুর। আয়োজনও তাই এলাহি। ধূলাগড়ে বিরাট ফ্যাকটরি। তথাদা আর বিনুদাও বাবার সঙ্গেই ব্যবসা দেখে। বেশ একটা হ্যাপি ফ্যামিলি ওদের। বিনুদার বউ পিংকিও বেশ ভালো হয়েছে। রিয়া ভালো থাকবে ওদের পরিবারে।

প্রথমে নাকি বিয়েতে রাজি হয়নি রিয়া। হবে কি করে? যা ট্রমাটিক অভিজ্ঞতা হয়েছে বেচারির! তথাদা এদিকে রিয়াকে দেখে মুগ্ধ। প্রেমে মশগুল। রীতিমতো কাউন্সেলিং করে তবে রাজি করিয়েছে। এসবই আমার মিষ্টিমাসির কাছে শোনা। মিষ্টিমাসি খুব সুইট। ছেলের প্রেমের গল্প বলছে বোনঝিকে। হাহা!

বাবার ফোন বাজছে। বাবা তো বাথরুমে। আমি গিয়ে ধরলাম। মিষ্টিমাসির বর, মেসো ফোন করেছে।

— মেসো বলো, আমি টুলু, বাবা স্নানে গেছে।

— শেখরদা বাথরুম থেকে বেরলেই ফোন করতে বলিস টুলু, আর্জেন্ট দরকার। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল! ফ্যাকটরিতে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই... ফোন কেটে দিল মেসো।

আমি ছুটে গিয়ে মাকে বললাম। মা অস্থির হয়ে বলল, শিগগির মিষ্টিকে ফোনে ধর... কি সব্বোনাশের কথা...

পাঁচ বারের চেষ্টায় ফোনে পেলাম মিষ্টিমাসিকে।

— মিষ্টিমাসি... মা কথা বলবে...

— আর কী বলার আছে বল টুলু। আমাদের তো সব পুড়ে গেল। এই মেয়েটা সত্যিই অপয়া রে... বউ হয়ে এসেই খেয়ে ফেলল সব... আঁ.. আঁ...আঁ.. কান্না ভেসে আসছে ফোনের মধ্যে।

হতভম্ব হয়ে গেলাম। কীসব বলছে মিষ্টিমাসি! মিষ্টিমাসি?

মাকে বললাম, "পরে কথা বোলো। ওরা ব্যস্ত এখন।" মনটা কেমন এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেল আমার। পরদিন ফোন এল আমার মোবাইলে।

— বলো মাসি। ধরো, মাকে দিচ্ছি।

'মিষ্টি' কথাটা বলতে ঘেন্না করল আমার।

ডিভোর্স।। ক্রাইম থ্রিলার

অভিজিৎ চৌধুরী

১/

সক্কাল সক্কাল কলিং বেল বেজে উঠল। বারান্দায় গাছগুলির পরিচর্যা করছিল অর্ণ। শীতের ভোর। এখন মানুষজন লেপের তলায় রয়েছে। কলকাতায় এবার জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। অর্ণের কাছে শীতকাল খুব উপভোগের। ভোর রাত থেকে জগিং, মেডিটেশন এসব একপ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু এতো সকালে কে আসতে পারে!

চড়ুই দেখা যাচ্ছে কয়েকদিন ধরে। ভাল লাগছে বেশ। চড়ুই ধরে ছেলেবেলায় প্রায় রং করে দিত। বিচিত্র দেখাত পাখিটাকে। এখন মনে হয় ঠিক হতো না। চড়ুইয়ের এই অদ্ভুত রংটা ওর দুর্বল শরীরেও যথেষ্টই উজ্বল। আলাদা করা যায়। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হয় না।

দরজা খুলেই অবাক হল অর্ণ।

আরে এতো সকালে তুই! কমিশনার সাহেব!

এ সি পি সরখেল সাহেব সিভিল ড্রেসে এসেছেন।

আসতে পারি না! বারণ!

অর্ণ জড়িয়ে ধরলেন সরখেল সাহেব।

কিশোরবেলার বন্ধুত্বের আস্বাদই আলাদা।

কি খাওয়াবি!

ব্ল্যাক কফি আর ডিমের পোচ।

Precisely splendid.

প্রিসাইজিলি শব্দটা তোর সেই কবে থেকে প্রিয়।

ফ্রম কলেজ, স্টার ওয়ারস। এখন কেউ জানিস, এই সিনেমার নাম জানে না।

নিলকন পার্কারের ফিজিক্স — কলেজ স্ট্রিটও জানছে না।

আর তুই আর আমি কি জানতাম এমন কথায় কথায় ডিভোর্স, লিভ টুগেদার।

অর্ণ বলল, না। আমাদের বেলা তো সেই বারোয়াঁ সুরে সানাই, গায়ে হলুদ, হালুইকর, মাছের মাথা দিয়ে সেই আশ্চর্য ডাল।

সময়টা খুব দ্রুত বদলে গেল। অর্ণ, মানুষ কি এখনও ভালোবাসে!

তুই তোর বউকে ভালোবাসিস!

সরখেল সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, অভ্যেস হয় তো।

সেই অভ্যেসটা মানুষ বদলে ফেলছে।

বিয়ে তো করলি না, প্রেম করেছিস!

দাঁড়া, ব্ল্যাক কফি আর পোচ নিয়ে আসি।

ঠিক আছে।

ঘরটা ঘুরে দেখছিলেন সরখেল সাহেব। অগোছালো স্টাডি রুম। প্রচুর বই। পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ার। বেশ কিছু অ্যান্টিক পুতুল। বারান্দায় সারি দিয়ে টব। ফুলের গাছ, টবে সবজি চাষেরও প্রচেষ্টা রয়েছে।

ব্ল্যাক কফি আর পোচ চলে এলো।

পোচে কামড় দিয়ে সরখেল সাহেব বললেন, তোর প্রেমের গল্প বলবি এখন।

ঝকঝকে মুক্তোর মতোন দাঁত অর্ণের। হেসে বলল, হয়নি।

ট্রাই করেছিলি!

করেছিলাম।

হয়নি কেন!

এতো পুলিশি জেরা হয়ে গেল।

তাই ধরে নে।

একজন বলল, আমি খুব কথা বলি। আরেকজন বলল, বোবা আরেকজন বলল, এক্সপ্রেশন বলতে কিছু নেই। যন্ত্রমানব।

ওরা তোকে সেভাবে জানতে চাইনি।

হয়তো। তবে আমি বেঁচে গেলাম।

ডিভোর্সের হাত থেকে!

রাইট। আসল কথা বলে ফেল এবার।

সবটাই আসল। পুলিশি পোশাকে নকল দেখায় বলে সিভিল ড্রেসে এসেছি।

এবার বলে ফেল।

একজন মেয়ে, বেশ শিক্ষিতা।

তারপর।

প্রচণ্ড পার্সোনালিটি। খুন হতে পারে।

আমাকে আবার সুন্দরবনে গিয়ে আটকাতে হবে।

লোকেশন, এখনই বলা যাচ্ছে না। মেয়েটার এক অদ্ভুত অভ্যেস রয়েছে।

কী?

বিয়ে করার সময় ডিভোর্স পেপারেও সই করায়।

ক-টা বিয়ে, ক-টাইবা ডিভোর্স!

একটাও না। তবে যতোবারই কাউকে ভালোবেসেছে, এরকমটা বলতো।

আর সেই প্রেমিক খুন হতো।

রাইট।

তাহলে মেয়েটা তো খুনি!

না, ও একটাও খুন করেনি। কেউ করছে।

এসব কি ডেফিনিটলি বলা যায়!

নো। কেস রেকর্ড আগামীকাল লালবাজারে গিয়ে নিস।

নেবো। অর্কেস্ট্রা শুনবি!

শুনব।

অর্ণ পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ারের কাছে গিয়ে বাজাতে শুরু করল।

Amercan Recordings. Billy Vaughn and His Orchestra.

কিছুক্ষণ পরই দুই বন্ধু সুরের তালে নাচতে থাকল।

কতো কথা তাদের যে মনে পড়ল ইয়ত্তা নেই। মানুষের মন কি ব্রেনের চেয়েও বেশী ক্রিয়াশীল — কে বলবে!

রেকর্ড থামার পর সরখেল সাহেব বললেন, এবার আসি। খুব ভাল কাটল অর্ণ।

অর্ণ বলল, ঠিক আছে, কেসটা নিচ্ছি।

তুই মানেই তো জয় আর জয়।

তবে প্রেমে নয়!

দুজনেই জোরে হেসে উঠল।

আরেকটা কথা বলব! অর্ণ বলল।

কি!

খুন হয়নি একটাও। সে ভাবত খুন হচ্ছে। ফোবিয়া।তাই না!

অসাধারণ অর্ণ। তুই,যাক!

আর কিছু বলবি!

তারপর অর্ণ হেসে নিজেই বলল, সবাই বলে আমার কিছুই হল না জীবনে।

আমি বলব না কারণ তাহলে তো এ সি পি সরখেল অর্ণ সেনকে পেতো না।

২/

লালবাজার পরের দিনই এলো অর্ণ সেন। নীল শার্ট, নীল সানগ্লাস আর কালো জিনসের প্যান্ট।

সরখেল সাহেব ফাইল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হাতে দিলেন।

আমাকে কোথায় যেতে হবে!

আমার গাড়িতে ওঠ, যেতে যেতে বলব।।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

সরখেল সাহেব বললেন চাপা গলায় বললেন, নীলু আমরা বালিগঞ্জ প্লেসে যাব।

স্যার, ম্যাডামের কাছে যাব!

রাইট।

সরখেল সাহেব এবার বললেন, শি ইজ আওয়ার অফিসার। কয়েক দিন লিভে আছেন।

হোয়াট!

রাইট বস।

কলিং বেল টিপে বাইরে থেকে ডাকলেন, মীনাক্ষী।

কি-হোল দিয়ে কেউ ওদের দেখে নিল।

তারপর দরজা খুলে হাসিমুখে বলল, স্যার আসুন। তবে অর্ণকে দেখে খুশী হয়েছে বলে মনে হল না।

সরখেল সাহেব বললেন, মাই ফ্রেন্ড অর্ণ সেন।

মীনাক্ষী বলল, ক্যান আই বিলিভ হিম!

সারটেইনলি। হি ইজ অ্যা সাইকোলোজিস্ট।

অর্ণ বলল, একটু জল দেবেন ম্যাডাম।

মীনাক্ষী জল নিয়ে এসে হাতে দিল।

অর্ণ বলল, বসবো ম্যাডাম!

বসুন।

আমি খুব ভাল ব্ল্যাক কফি বানাতে পারি।

আমার কিচেনেও পারবেন!

অবশ্যই।

মীনাক্ষীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বলল, ইউ আর ভেরি কেয়ারিং।

অর্ণ খানিকটা যদিও খুব সামান্য বুঝতে পারল মীনাক্ষীকে।

কিচেনটা সুদৃশ্য তবে রান্না হয় বলে মনে হয় না।

ব্ল্যাক কফি বানিয়ে চট করে টেবিলে এলো।

অর্ণ বলল, কেমন হয়েছে ম্যাডাম, দেখুন।

মীনাক্ষী বলল, ইউ ফার্স্ট টেইক।

অর্ণ মৃদু হেসে কফিতে চুমুক দিল।

তখন মীনাক্ষীও নিলো।

ফাইন। আই নিড সাচ টাইপ অফ হাজব্যান্ড। আর ইউ ম্যারেড!

নো। ম্যাডাম।

লাইয়িং।
হোয়াই!
হি ডিড দিজ।
কে ম্যাডাম!
যাকে আমি সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছিলাম।
কে তিনি!
মীনাক্ষীর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।
অর্ণ এবার বলল, অনেকগুলি পোট্রেট দেখলাম আপনার আঁকা!
হ্যাঁ। মানুষগুলির মুখগুলি দেখে কি মনে হয়!
প্রত্যেকেই অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত।
ফাইন। আপনাকে আমার মন্দ লাগছে না। বাট আই ডোন্ট বিলিভ অ্যানিবডি।
অর্ণ বলল, আজ আসি ম্যাডাম!
একটু যেন চমকে উঠল মীনাক্ষী।
অর্ণ বলল, আমি কি আবার আসব!
দেট ইজ ইউর চয়েস। অ্যাম নট ইনভাইটিং ইউ।
আপনি খুব ভালোবাসতেন যাঁকে তাঁর পোট্রটও রয়েছে।
ইয়েস। হি ডিড নো মার্ডার বাট হি ডিসিভড মি।
আপনি এখনও ভালোবাসেন তাঁকে।
কি করে বুঝলেন!
আপনার সেই পোট্রেটটায় একটা মায়া আছে। মানুষটার মুখে নিষ্ঠুরতা রয়েছে কিন্তু আপনি একটা মায়া এনেছেন।
তাকিয়ে রইল মীনাক্ষী। ওর অলকদাম কেঁপে কেঁপে উঠছিল।
হাতটা বাড়িয়ে দিলো অর্ণ। না চাইতেও ছোঁয়া হয়ে গেল।
হঠাৎ অসম্ভব রিঅ্যাক্ট করল মীনাক্ষী। ডোন্ট টাচ মি।
অর্ণ কোমল স্বরে বলল, সরি ম্যাম।
পথে নেমেই একটা ওলা ধরল। গন্তব্য লালবাজার।
সোজা এ সি পি সাহেবের রুমে চলে যায়। অর্ণকে সকলেই সমীহ করেন।
সরখেল নেই। ওর রুমে বসতেই এ. সি অন করে দেওয়া। ব্ল্যাক কফি ও স্ন্যাকস চলে আসে।
কিছুক্ষণ পরেই সরখেল সাহেব চলে আসেন।
উঠে দাঁড়ায় অর্ণ।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ধুস, তোকে উঠতে হবে না।
তারপর বলেন, ব্ল্যাক কফি!
হয়ে গেছে।
প্রেম তো করিস নি। একটা চান্স দিলাম। সেটা সেলিব্রেট করতে আরেকবার ব্ল্যাক কফি হোক।
জানিস, কাকে ভালোবাসত!
বলেছে।
ম্যারেড পারসন। লোয়ার সার্কুলার রোডে থাকে।
পেশা!
জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।
ও কি তোদের আর্টিস্ট!
না- রে। কিন্তু নিজেকে মনে করে আর্টিস্ট।
সব কটা পোর্টেট তোদের পাঠানো। একটা ছাড়া।
হাসলেন সরখেল সাহেব।
ওর প্রেমিকেরটা নিজের আঁকা। ফলে ওই ছবিতে আশ্চর্য মায়া আছে।
তুই প্রেম করলি না কেন- রে!
করলে তোর ইনভেস্টিগেশন কি হতো!
বলেই আর দাঁড়ালেন না অর্ণ।

৩/

শখের গোয়েন্দার কি মন খারাপ হতে নেই! আজ কেন জানি মন খারাপ। এই সময় অর্ণের বুদ্ধির চর্চা তার বেশ ভাল লাগে। দাবা তার প্রিয় খেলা। কিন্তু এবারের কেসটায় তার অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। বিয়ে করলে তার মেয়ের বয়সটা এরকমই হতো। বাইরে থেকে দেখে বোঝা না গেলেও সে এখন পঞ্চাশ পেরিয়েছে। চুলে পাক ধরেছে। শরীরটা নির্মেদ। ফিজিক্যাল ফিটনেস ঈর্ষণীয়। কিন্তু এই যে শহরে হেমন্তের মিষ্টি হাওয়া, একটু বিষণ্ণতা আসছে নাকি! আসছে নাকি সেই হারিয়ে যাওয়া মন খারাপ।
বাড়ি ফিরে বেশ একা লাগে। এমন তো নয় প্রতিদিনই নতুন নতুন রহস্য সমাধানের আহ্বান আসবে!
অভিমন্যুকে রিং করল।
কেমন আছ!
স্যার।
নো স্যার।
হ্যাঁ দাদা।

এখন কোথায় আছ!

কলকাতায় এসেছি।

গুড। আমার বাড়ির ঠিকানা তো আছে! চলে আসতে পারবে!

কখন!

এখনই।

পারব।

সুন্দরবনে কাজ করার সময় অভিমন্যুর সঙ্গে আলাপ। এরপর কয়েকটা কেসে যোগ্য সংগত করেছিল।

ঘরে ঢুকেই আলো জ্বালতে মনে হল সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠছিল এবং তার দরজার কাছে এসে মিলিয়ে গেল।

বন্দুকের লাইসেন্স নেওয়া আছে। পয়েন্ট নাইন এম এম। ড্রয়ার খুলে পকেটে নিল।

এই সময় কলিং বেজে উঠল।

দরজা খুলতে গিয়েও সতর্ক হল অর্ণ।

চলভাষে রিং করল অভিমন্যুকে।

হ্যাঁ, দরজার ওপারে খুব কাছ থেকেই উত্তর এলো, দাদা, আমি।

হাসিমুখে দরজা খুলল অর্ণ সেন।

বলল, এসো।

তোমার কাছে কেউ এসেছিল দাদা!

না-তো। ইন ফ্যাক্ট আমি এইমাত্র এলাম।

একজনকে তোমার দরজার কাছ থেকে চটপট নেমে যেতে দেখলাম।

কেমন দেখতে!

সুদর্শন মনে হয়। ব্ল্যাক শার্ট। মুখে মাস্ক ছিল, তাই মুখটা সবটা বোঝা যাচ্ছিল না।

আরেকবার দেখলে চিনতে পারবে!

চেষ্টা করতে পারি।

ভদকা খাবে উইথ লাইম। সঙ্গে প্রন।

দারুণ দাদা। তবে এক পেগ। একটু বেশী নিলেই মাথা ধরে।

একটা পোট্রেট মোবাইলে তুলে এনেছি।দেখাব।

আমি চেষ্টা করব চিনতে।

ফাইন। খেলাটা জমে গেল।

৩/

রাতেই ছবিটা দেখিয়েছিল। অভিমন্যুর শাণিত দৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। মাস্কের আড়ালে এক ঝলক দেখায় চিনে ফেলেছে।

জগিং করতে করতে বাজারে গেছিল। টালিগঞ্জ পুরোনো একটা ফ্ল্যাটে থাকে। বাজারে যাওয়াও এক্সারসাইজ। শীতের মুখে বাজার বেশ সেজে ওঠে। বেশ কিছু সবজি কিনল। পাবদা মাছ অভিমন্যুর খুব প্রিয়। কিনল।

বাড়িতে ফিরে দেখল অভিমন্যু স্নান সেরে ফেলেছে!

কোথায় যাবি!

হাসল অভিমন্যু। বলল, এবার দারুণ লাগছে।

কেন!

গতকাল তুমি করে বলছিলে। আজ নিজের ফর্মায় ফিরেছ। তুই করে বলছ।

কিন্তু যাবি কোথায়!

ইন্টারভিউ রয়েছে!

জয় হোক তোর। কোন স্কুলে!

না। কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ইনস্টিটিউটে টিচিং। অন লাইনেও করা যাবে।

বাহ। ফাইন। ফিরে আসবি কখন!

দুটোর মধ্যে চলে আসব।

ফিরে আয় আড্ডা হবে। তোর জন্য পাবদার ঝাল করব!

দারুণ। ওয়ান্ডারফুল।

পথে নেমে অভিমন্যু অটো পেয়ে গেল। মনটা বেশ নির্ভার। দাদার কাছে এলে বেশ লাগে। প্রথম দেখা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে। তারপর পাথরপ্রতিমায় যাওয়া। সেই আখড়া। ভার্গব চৌধুরী। দীপশিখা। কেমন যেন স্বপ্নের মতন

মনে হয়। ডক্টর ওয়াটসন না হলেও অভিমন্যুকে সাদরে গ্রহণ করেছিল অর্ণ সেন। সহজে আপন করে নিতে পারে।

ইন্টারভিউ ভাল হল। ঘরে বসে রোজগার। সময়টাও হাতে থাকবে। অর্ণদা বলে চাকরি করতে গিয়ে মানুষ জীবনটা দেখার ফুরসৎ পায় না। এটাও তো একটা কাজ।

একটার মধ্যে ফিরে গেল। কলিং বেল বাজাতেই অপেক্ষা করতে হল না।

অর্ণ বলল, কেমন হল!

হয়ে গেছে চাকরিটা। অন লাইনে পড়ানো।

ব্রেভো। পাবদার ঝাল, ডাল, আলুভাজা, ভাত -- খেয়ে নিবি চল।

খেতে বসলে কোন কথা বলে না অর্ণ।

খেয়ে ওঠার পর বলল, তুই বাড়িতে থাকবি। আমি একটু বের হবো।

আজকে কিছু হতে পারে!

চান্স আছে।

৪/

গাড়ি ড্রাইভ করছিল মীনাক্ষী। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়েছে কয়েকদিন।

ড্রাইভ করতে করতে ফোন করল, তুই এখন কোথায় আছিস!

বাড়িতে।

একটু রবীন্দ্র সরোবর আসতে পারবি!

চাপা গলায় উত্তর এলো, কেন!

আজ তোর জন্মদিন না! সেলিব্রেট করব।

বাড়িতে মিতু করবে।

আর আমারটা!

এখন হবে না। বাড়িতে গেস্ট আসবে।

একটা শার্ট কিনেছিলাম।

পরে নিয়ে নেবো।

আনোয়ার শাহ রোডে আসতে পারবি!

আমার পক্ষে সম্ভব না।

কোনদিনই সম্ভব ছিল না। আমি এবার বিয়ে করব।

খোচরটাকে!

মানে! ভদ্রভাবে কথা বল।

আরে না, সরি। এল আই সিটা করলি!

কেন করব! আমার মৃত্যুর পর লাভ দিয়ে কি করব! কে আছে আমার!

তোকে মরতে কে দিচ্ছে!

বলে হেসে উঠল ঋষি।

মীনাক্ষীর ভাল লাগল। একটু নরমও হয়ে গেল।

এল আই সি করলে তোর উপকার হবে!

হবে।

কি করে! আমি তোকে তো নমিনি নাও করতে পারি। বিয়ে করব এবার।

করিস না, টিকবে না। আমি ভেঙে দেবো।

বলেই হেসে উঠল ঋষি।

মিতুকে ডিভোর্স দিবি সত্যি!

তোকে বিয়ে করলে ক্লান্ত হয়ে পড়বি। তার চেয়ে এটাই ভাল।

ফোনটা কেটে দেয় ঋষি।

রবীন্দ্র সরোবরে একা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। দই ফুচকা খায়। দাম দিয়ে আসার সময় ঋষির জন্য কেনা শার্টটা হাতে দিয়ে বলে, তোমাকে দিলাম।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

তারপর ড্রাইভারকে স্টিয়ারিং দিয়ে বলে, বাড়ি যাব।

অর্ণও আসে মীনাক্ষীর ফ্ল্যাটে। তখন মীনাক্ষী ফিরে এসেছে। ঘরের আলো জ্বালায়নি।

সে মরে গেলে ঋষির যদি লাভ হয়, সে না হয় তাই করবে। কাউকে বিয়ে করলেও সে তো ঋষিকে ভুলতে পারবে না।

এই সময় সরখেল সাহেবের ফোন আসে।

কবে জয়েন করবে!

মীনাক্ষী এর জন্য অপেক্ষা করছিল। উত্তর দেয়, সামনের সপ্তাহে করি।

সরখেল সাহেব হেসে উত্তর দেন, তাই করো।

এই সময় বেল বাজায় অর্ণ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মীনাক্ষী। তারপর দরজা খুলে দেয়। বলে, আপনি!

কেন আসতে পারি না!

পারেন কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিছু তো ছিল না।

অনেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো ঠিকঠাক হয় না। কথা দিয়েও কেউ আসে না।

আপনি কি আমায় ফলো করছিলেন!

আমি সাইকিয়াট্রিস্ট। গোয়েন্দা নই।

আশ্বস্ত হয় মীনাক্ষী।

আমি কি পাগল!

মোটেই না, তবে নিজের ভাল বুঝতে পারছেন না।

আপনি হাত দেখতে জানেন!

অর্ণ মনে মনে ভাবে কিনা তাকে হতে হবে — সাইকিয়াট্রিস্ট, পামিস্ট।

হাত বাড়িয়ে দেয় মীনাক্ষী।

অর্ণ স্পর্শ করে না। সতর্ক হয়।

আপনি এখন টাচ করতে পারেন। আমি অ্যালাউ করছি।

পোখরাজ, গোমেদ, নীলা — তিনটেই আছে আপনার!

আমার সব কিছু খারাপ।

মোটেই না। চমৎকার বুধরেখা। শিল্পী সত্তা রয়েছে।

মীনাক্ষী বলে, একটা মাত্র পোট্রেট আমার আঁকা। বাকি সব স্যারের কাছ থেকে নিয়েছি।

বাইরে হেমন্তের সন্ধে ঘন হয়ে নামছে। কুয়াশা এখনও শীতের মতোন ব্যপ্তি নিয়ে নামেনি। নিয়নের আলো আর কুয়াশা মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

বারান্দায় যাবেন ম্যাডাম!

হাসল মীনাক্ষী।

চলুন।

বেড়াতে যাবেন!

কোথায়!

টাকি। ইছামতীর তীরে।

আপনি আমায় নিয়ে যাবেন!

যাব।

কতোদিন বেড়াতে যাইনি!

কবে যাবেন!

আগামীকাল ভোরে যাবেন!

হ্যাঁ। তাই হোক। আমার গাড়িতে যাবেন।

ঠিক আছে তাই হবে।

আমার চোখের ফ্লুয়িড নাকি কমে যাচ্ছে। এখন একটা আই ড্রপ দিতে হবে।

আমি হেল্প করছি।

এর আগেও একদিন করেছিলেন।

বোধহয়। মনে পড়ছে না।

আপনি খুব নির্লিপ্ত।

ওরা বাইরে এসে দাঁড়ায়।

অনেক দিন পর ভাল লাগে মীনাক্ষীর।

এক শান্ত নির্জনতা দক্ষিণ কলকাতার এই প্রান্তে রয়েছে। শীতকাল হলে এই নির্জনতা বাড়ে। তখন আর একা লাগে। আজ বেশ লাগছে।

মীনাক্ষী বলে, আপনি বিয়ে করেছেন!

না।

কতো বয়স আপনার!

আটান্ন।

বোঝা যায় না কিন্তু। আপনার মতোন একজন হাজবেন্ড হলে বেশ হতো সামান্য হেসে ওঠে অর্ণ।

তারপর বলেন, হতো না। আমার সঙ্গে আইনক্স যেতে ইচ্ছে করত! বা শপিং মল!

সে না হয় অন্য কারুর সঙ্গে যেতাম।

দূরে বোধহয় কোন ডাহুক ডেকে উঠল। গরমকালের দুপুরে ওরা ডাকে পরিশ্রান্ত হয়ে। কলকাতায় বেমানান তবু মন্দ লাগল না।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

আমার বাবার কাছে যাবেন!

আপনার বাবার সঙ্গে থাকেন না!

না।

মা আছেন!

সব কিছু জানতে চাইছেন কেন!

গোয়েন্দা, গোয়েন্দা লাগছে।

আপনি নিজেই তো ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে রয়েছেন।

কিন্তু নিজের জীবনের জট ছাড়াতে পারছি না।

বাবার কাছে কেন যাবেন!

তাও বলতে হবে! আমি কিন্তু এতো কৌতূহল ভালোবাসি না।

বাবার কাছে থেকে টাকা নেবেন!

একটু চমকে উঠল মীনাক্ষী।

হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন!

ঋষিকে দেবেন!

জীবন বীমা করাবে। তাই তো!

সাইকিয়াট্রিস্ট কি এসবও জানে!

জানতে হয়, না জানলে আপনার মনের খবর কি করে পাব!

ওকে আমি এখনও খুব ভালোবাসি। জানি আমাকে ঠকাচ্ছে।

বাবাকে কি বলবেন!

টাকাটা দিয়ে দেবো।

উনি বুঝতে পারবেন আপনি যে কাউকে দেওয়ার জন্য নিচ্ছেন।

হ্যাঁ পারবেন।

এরকম প্রতারককে ভয় করে না আমার!

ও আমাকে খুন করবে না। এতোটা নীচে নামবে না।

তা করবে না হয়তো কিন্তু এই যে উদ্দেশ্যহীন জীবন আপনাকে আত্মহননের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

বহুবার চেষ্টা করেছি। একবার তো অনেকগুলি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিয়ে ছিলাম।

তারপর!

ঋষি হাসপাতালে নিয়ে গেছিল। খুব সেবা করেছিল।

ক্যারেক্টারটা মোটেও ফ্ল্যাট নয়। ঋষির মধ্যেও অনেক লেয়ার আছে।

মনে মনে ভাবল অর্ণ।

আমরা তবে টাকি যাব তো! ইছামতীর তীর খুব সুন্দর।

আগেও বলেছেন। তবে যাব না। গাড়িটা অফিসের। সরকারি গাড়িতে ঘুরতে যাওয়া ঠিক নয়।

গাড়ি ভাড়া করা যাবে। ড্রাইভারের নাম অভিমন্যু। আপনার ভাল লাগবে।

যাব তবে!

চলুন না!

আর বাবার কাছে!

যাব না। ঋষির লোভ বেড়ে যাচ্ছে।

কোথায় আলাপ হয়েছিল আপনাদের!

জঙ্গলমহলে। ও ছিল প্রশাসনে, আমি তখন সদরের এস ডি পি ও।

আপনাকে ভালোবাসত খুব।

না। এক তরফা।

কেন ভালোবাসত না!

আমি অতো দেখতে সুন্দরী নই। সাধারণ পরিবারের মেয়ে।

আপনি তো বেশ সুন্দরী।

মীনাক্ষী ঠোঁট উলটে বলল, কি জানি!

তখন জানতেন ওর অন্য কোথাও বিয়ে হবে!

পরে জেনেছিলাম। ওদের পরিবার রক্ষণশীল। প্রেম মেনে নেবে না।

তারপর।

পুরোটা মিথ্যে, সাজানো। ও তখন যার সঙ্গে বিয়ে চুটিয়ে প্রেম করছিল।

এখন কি বলে — ভুল হয়েছে। তোকে বিয়ে করলে সুখী হতাম।

আপনি কি করে জানলেন!

সাইকিয়াট্রিস্ট যে।

সোমবার জয়েন করছি অফিসে।

গুড। টাকি যাচ্ছি না তবে!

না, ভাল লাগছে না।

অর্ণ বললেন, চলি তাহলে।

মাথা নাড়ল মীনাক্ষী।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অর্ণ শুনলেন মীনাক্ষী ডাকছে, শুনছেন!

ফিরে এলো অর্ণ, বলুন।

কাছাকছি কোথাও গেলে হয়!

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

হয়। ইঁটের দোকানে বেঞ্চে বসে চা খাবেন!

জঙ্গলমহলে তো তাই খেতাম। এনকাউন্টারে একবার বুলেট লাগল শিরদাঁড়ায়। দেখবেন, আমি একটু কুঁজো হয়ে হাঁটি।

হেমন্তের সকাল কে কি বলে জানেন!

কী?

নবফাল্গুন।

আমার আবার কি নবফাল্গুন হবে!

তাই তো। কিন্তু আপনারই হওয়া উচিৎ।

বিয়ে খুব ঘ্যানঘ্যানানি বিষয়।

আমি তো জানি না।

ও তাই তো। ঋষি বলে।

এখন বারবার বলে, আপনাকে বিয়ে করলে বেশী সুখী হতো।

হয়তো তাই ভাবে।

ভাবে না, আপনার একটা শার্ট নিতে পারল না। আপনি ফুচকাওয়ালাকে দিলেন শেষমেশ।

আপনি কি আমাকে ফলো করেন! পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের অফিসারকে!

আমার ডিউটি।

এই যে ভোরে বেড়াতে যাব, সেটাও ডিউটি!

না, ভালোলাগা।

কি করে বুঝব!

না হলে হেমন্তের ভোরকে নবফাল্গুন বলি কখনও!

হাসল মীনাক্ষী। রাগী মেয়েটাকে হাসলে বেশ দেখায়। রাগটাও খুব সুন্দর। কোথাও একটা অভিমানের রেশ থাকে। প্রেমিকের ওপর অভিমান হয়তো।

আজ যাই, কাল আসব।

আপনার গাড়ি আছে!

নেই।

গাড়ি পাঠাব!

সরকারি গাড়ি!

না, আমার নিজের গাড়ি।

পাঠাতে হবে না। এখানে এসে উঠব।

আমি কিন্তু কাল ড্রাইভ করব না।

জানি।

ড্রাইভারও নেবো না।

বলে মুচকি হাসল মীনাক্ষী।

কি হবে তবে!

মীনাক্ষী বলল, আপনি তো চালাতে পারেন নিশ্চয়। ব্যোমকেশ গাড়ি ড্রাইভিং জানতেন!

জানতেন!

প্রদোষ মিত্র!

জানতেন।

আপনি শুধু জানেন না। আপনি অর্ণ সেন। শখের গোয়েন্দা। প্রফোইল চেক করে পেলাম।

ধরে ফেললেন।

ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের অফিসার আমি। প্রথম দিন থেকেই জানি।

সরখেল তো ভুল করল তাহলে!

স্যার জেনে শুনে দিয়েছেন। আপনি খুব কেয়ারিং। মেয়েদের সম্মান করেন।

আর গোয়েন্দা!

এখনও বুঝতে পারছি না।

আগামীকাল ভোরে দেখা হবে।

অর্ণ বললেন।

৫/

মিতু একটা কাজ করতে হবে।

সারারাত আদরে ভরিয়ে রেখেছিল ঋষি। শরীরের খিদে সে চমৎকার মেটাতে পারে। তারপর মিতুরা ওঠার অনেক আগেই জগিং করে এসেছে।

কি বলো!

আমি একটা ডিভোর্স পেপার দেবো সই করতে হবে।

মানে!

একটা বড় ডিল করব।

আমাকে ছেড়ে দেওয়ার!

ঋষি একটা ফ্লায়িং কিস দিলো।

তারপর বলল, জাস্ট পেপারে সাইন। ওটা মীনাক্ষীকে দেখাব।

দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা।

নৌকো একটায়, তবে মজবুত করতে হবে।

টাকা দিয়ে আর কি হবে! দুটো গাড়ি রয়েছে। বাড়ি ফ্ল্যাট সব।

ইন্ডাস্ট্রি করতে পারব কি! আমি শিল্পপতি হতে চাই।

চাকরি ছেড়ে দেবে! তোমার পুরোনো রোগ।

কাছে এসো ডার্লিং।

মিতুকে সংক্ষেপে বলল। এটা দেখালেই জীবন বিমা। মীনাক্ষীর আত্মহত্যা।

মিতু জানে, ঋষি আসলে জানোয়ার। রাজী না হলে ওকেই খুন করবে।

৫/

অন্ধকার থাকতেই অভিমন্যুকে নিয়ে রওনা দিল। গাড়ি বলা ছিল। নিজের নাইন এম এম পরখ করে নিলো একবার।

অভিমন্যু বলল, সরখেল স্যারকে ফোন করবে!

এখনই নয়।

ফ্ল্যাটের গ্যেটে সিকিউরিটি ঘুমোচ্ছিল। হয়তো সবে ঘুমটা এসেছে ওর।

সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল অর্ণ। অভিমন্যু বাইরে থাকল।

মীনাক্ষীর ফ্ল্যাটে ভিতর থেকে আলো জ্বলছে।

এবার গোঙানির শব্দ শুনতে পেল।

মীনাক্ষীর গলা থেকে নির্গত অস্পষ্ট কিছু শব্দ বোঝার চেষ্টা করল অর্ণ।

আমি সই করব না। তুমি আমায় ডিচ করছ। এটা ফলস ডিভোর্স পেপার।

এবার ফ্যালফ্যাল গলায় শুনতে পেল, মরতে তোমায় হবেই।

কি হোল দিয়ে দেখল অর্ণ, একটা নাইলনের দড়ি ফাঁসের মতোন ঝুলছে।

এতোটা ভুল ঋষি করবে আশা করেনি অর্ণ। দরজায় একটা মৃদু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল।

কোন সময় নষ্ট না করে নাইন এম এম ঋষির পীঠে ঠেকাল।

আপনার খেলা শেষ।

ইশারায় মীনাক্ষীকে বলল, ঋষিকে বেঁধে ফেলতে।

মীনাক্ষী তাই করল।

অভিমন্যুকে ডাকল এবার।

ম্যাডাম, চলুন। বাইরে নব বসন্তের ছোঁয়া মন খুলে উপভোগ করুন। পুলিশ এসে বাকী কাজ করবে। আমি আপনার সরখেল স্যারকে ফোন করছি।

এই কারণে ফ্ল্যাটের একটা চাবি আপনি রেখেছিলেন।

হাসলেন অর্ণ।

রাইট, ওটা সরখেলের কাছে আছে।

আপনি জানতেন সবটা!
অনুমান করেছি।
আমাদের ডিপার্টমেন্টে আসুন না! এক সঙ্গে কাজ করব।
নো ম্যাডাম। প্রয়োজন হলে ডাকবেন।
এখন কি করব!
ইঁট বের করা দোকানে চা পান করব।
হাততালি দিয়ে উঠল মীনাক্ষী।
মনে হল, ও আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে।
সবাই মিলে চা আর ডিমের পোচ খেতে খানিকটা সময় লাগল।
ইতিমধ্যে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে ঋষিকে।
কংগ্রাচুলেশনস পাঠিয়েছেন এ সি পি সরখেল স্যার।
মীনাক্ষী নিজের গাড়ি ডেকে নিল।
গাড়িতে ওঠার আগে আরেকবার বলল, আর কখনও দেখা হবে না!
না হওয়াই তো ভালো।
এমন নব বসন্তের সকাল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা।
হাসলেন অর্ণ। বেদনাও কি হলো না একটু!

প্রবন্ধ

নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানামাত্রা : বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস

মহম্মদ সামসুর রহমান

ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন আদমকে। কিছুদিন পরে আদমের নিঃসঙ্গতা কাটাতেই ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন ইভকে। ইভের প্ররোচনায় আদম নিজের 'ইচ্ছা' বা 'স্বাধীনতা'র বীজ বপন করতে গিয়েই করে ফেললেন পৃথিবীর আদি পাপ (Original Sin)। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের জন্য আদম-ইভ উভয়েই পতিত হল মর্ত্যে পৃথিবীর আদি মানব-মানবীর স্বর্গ থেকে মর্ত্যে গমন এবং সভ্যতার ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই ক্লাসিক্যাল মিথ-পুরাণের নেপথ্যেই জমে আছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণ। বস্তুত ইভের প্ররোচনাতেই আদম করে ফেলেছিল আদি পাপ। আর সেই থেকে ইভকে তথা সমগ্র নারীজাতিকে প্ররোচনাকারী ও লোভ-লালসার প্রতীক হিসেবেই গণ্য করে সাধন মার্গে তাকে বর্জন করাই শ্রেয় বিবেচনা করা হয়।[১] ক্ল্যাসিক্যাল মিথ-পুরাণের আনাচে কানাচে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ছড়িয়ে আছে এমন অজস্র পুরাবৃত্ত। শ্রেণিহীন ও শোষণহীন আদিম সমাজ ছিল মূলত মাতৃতান্ত্রিক। পরিবার ছিল না, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল না সম্পত্তির ধারণা। মানুষের ধর্মনৈতিক বিশ্বাস এবং পাশাপাশি সভ্যতার বিবর্তনে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের উৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ রূপান্তরিত হয় পিতৃতান্ত্রিকতায়। দেশ-জাতি-সমাজ ভেদে বিবর্তিত হয়ে যায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি আগে সিমোন দ্য বোভোয়া তাঁর The Second Sex বইতে লিখেছিলেন:

One is not born– but rather becomes– a woman. No biological– psychological– or economic fate determines the figure that the human female presents in society— it is civilization as a whole that produces this creature– intermediate between male and eunuch which is described as feminine.[2]

নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, সমাজ তাকে নারী হিসেবে গড়ে তোলে। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ যখন বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনে মুখর হয়ে উঠেছিল। সমস্ত সংস্কারের মূলে ছিল নারী সমস্যার অগ্রাধিকার, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে নারীকে মুক্তির প্রচেষ্টা। অন্যদিকে সেই সময় পাশ্চাত্যের সমাজ ও সাহিত্যে আছড়ে পড়েছে 'নারীবাদী' আন্দোলনের ঢেউ। বিশেষ করে ১৮৪৬-এ কার্ল মার্কসের The German Ideology এবং ১৮৪৮-এ ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের The Origin of the Family– Private Property and the state বই দুটি প্রকাশিত হবার পর মানুষের জীবন, পরিবার ও সম্পত্তির অধিকার

নিয়ে তৈরি হয় নানা প্রশ্ন। শ্রেণিদ্বন্দ্ব ভেঙে দিয়ে আদিম সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ইউরোপের রেনেসাঁ মানুষের ভাবনার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তার জোয়ার এসে পড়ে বাংলাদেশে, বিশেষত কলোনিয়াল এবং কসমোপলিটন্ শহর কলকাতায়। এরফলে উনিশ শতকের শেষে বাঙালির রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পরিবার ও দাম্পত্য ভাবনায় অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। বিশ শতকের শুরুতেই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে মাতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানামাত্রিক দিকদিগন্ত উন্মোচিত হয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিমোন দ্য বোভোয়ার The Second Sex (১৯৪৯) প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে কেট মিলেটের Sexual Politics (১৯৭০)-এ নারীর ব্যক্তিগত অধিকার ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-সংস্কৃতির মোড়ক থেকে নারীমুক্তির কথা বলা হয়। ইউরোপের নবজাগরণের হাত ধরেই বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে এসেছে অজস্র পরিবর্তন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও ড. বি.আর আম্বেদকরের প্রচেষ্টায় সংবিধানে নারীদের নিয়ে কিছু আইন তৈরি হয় এবং তাতে নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলা হলেও আইনের ভেতর যে ক'টা ফসকা গেরো ছিল, তা পিতৃতান্ত্রিক মৌলবাদকে চাঙ্গা করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। আসলে সবদেশের আইনের আপাত নিরপেক্ষ বিমূর্ত শরীরের মধ্যেই ঘাপটি মেরে আছে নারীকে নির্বাসিত, উপেক্ষিত, অত্যাচারিত রাখার মারণাস্ত্র।[৩] তবুও স্বাধীনতা উত্তর সমাজ আগের চেয়ে অনেক বেশি বিবর্তিত। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং নারীবাদী আন্দোলনের বহু মতবাদ ও মতাদর্শের ফলে নারীরা স্বাবলম্বী হয়েছে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পেয়েছে। পুরুষ আধিপত্যবাদকে অস্বীকার করতে শিখেছে।

বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাসের নারী-পুরুষেরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ এবং নাটক-নভেলে তাদের আগ্রহ প্রবল। জীবনকে তারা যুক্তির বোধ দিয়ে বুঝতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্কের বিচারে তারা লিঙ্গ-সাম্যের সম্পর্কে বিশ্বাসী। সমান দায়িত্ব, সমান অধিকার কিংবা বন্ধুত্বের সম্পর্ককে তারা বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে মনে করে। আধুনিক মানুষের জটিল কুটিল সমস্যাসঙ্কুল জীবন এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়েই তাদের যাত্রা। এত তর্ক-বিতর্ক ও যুক্তি-প্রতিযুক্তির মাঝেও ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই তারা বেশি চিন্তিত। স্বাধীন ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বুদ্ধদেব গুহর তিনটি উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি 'স্বগতোক্তি' (১৯৮১), 'একটু উষ্ণতার জন্যে' (১৯৮৭) এবং 'সবিনয় নিবেদন' (১৯৮৯)।

দুই.

'স্বগতোক্তি' (১৯৮১) উপন্যাসের কথক নিরুপমা। এ উপন্যাস নিরুপমার দাম্পত্যজীবনের আখ্যান। পরিবারের সকলের অমতে নিরুপমা বিয়ে করেছিল রমেনকে,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

আগের বৌ মমতার সঙ্গে রমেনের ডিভোর্স ঘটিয়ে। রমেন অনেক স্বপ্ন দেখিয়ে নিরুপমাকে বিয়ে করেছিল। রমেনের চোখ দিয়ে নিরুপমা দেখেছিল তাদের অনাগত স্বপ্নের পৃথিবী। অথচ বিয়ের অব্যবহিত পরেই নিরুপমা বুঝতে পারে রমেন একজন ঠগ, মিথ্যেবাদী। রমেনকে আগের মতো ফিরে পাওয়া তার সাধ্যে নেই। নিজের অশেষ রূপ এবং সেই রূপ সম্পর্কে সচেতন নিরুপমা সব স্বপ্ন তছনছ হবার পরেও রমেনের সঙ্গে থাকে। দাম্পত্য জীবনের অশান্তি নিয়ে সে ক্ষতবিক্ষত হয় রোজ। সে আত্মসম্মান নিয়ে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারেনি, অন্যদিকে দাম্পত্য সংসারের মধ্যেও সুখের সন্ধান পায়নি। এই সময় কারখানার অনুষ্ঠানের দিন রমেনের সহকর্মী সেন অতর্কিতে নিরুপমার সঙ্গে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হতে চেয়েছে। সেন নিরুপমার প্রতি মুগ্ধ ও মোহগ্রস্থ হয়ে দৌর্বল্যের বশে এ কাজ করেছিল। সে কথা সে বারবার নিরুপমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে। নিরুপমার অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও রঙহীন দাম্পত্যের সংসারে একদিন আবির্ভাব ঘটে সুশান্ত নামক এক যুবকের। যে নিরুপমার প্রতিবেশী ও মুগ্ধ 'এলিজিবল্ ব্যাচেলর'। সুশান্তের কথার ঝলকানিতে নিরুপমার মনেপ্রাণে অদ্ভুত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। রমেনের প্রতি তিক্ততা এবং সুশান্তের মুখে রুপ-লাবণ্যের প্রশস্তি শুনে নিরুপমা পুনরায় আবিষ্কার করে সে সুন্দরী। সে অনুভব করে সুশান্তর মতো যুবকই তার অসমাপ্ত জীবনকে পূর্ণ করতে পারে। রমেন টাকা ধার নিয়ে কখনও শোধ দেয় না। জুয়ার আড্ডায় রমেন পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সুশান্ত ছাড়িয়ে আনে জেল থেকে। রমেনের বুঝতে বাকি থাকে না যে তার স্ত্রী সুশান্তের গুণমুগ্ধ। এরপর রমেন সুশান্তের কাছে থেকে টাকা দোহন করতে থাকে। তার কাছে এটা 'বউয়ের সঙ্গে প্রেম করার ট্যাক্স'। নিরুপমার সব গয়না নিয়ে রমেন কানাডা যাবার কারণে কলকাতার পাসপোর্ট অফিসে যায়। এদিকে নিরুপমা খবর পায় রমেনকে রেসের মাঠে দেখা গেছে। নিরুপমা আপাদমস্তক ভালোবাসায় বিশ্বাসী। দাম্পত্যের প্রতি বীতরাগ নিয়ে সে জড়িয়ে পড়ে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে। বাহ্যিক রূপ নিয়ে গর্বিত নিরুপমার অন্তররাজ্যে ফুটে উঠেছে সেই কথা :

আয়নার সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়ালে এখনও আমার গর্ব হয়। আমার ফিগারটা সত্যিই ভালো। নীলামে চড়ালে এর দাম কত হত জানি না। হয়তো এক বহুমূল্য বস্তু, অন্যদের চোখে, পুরুষের চোখে, কিন্তু এই সুন্দরী নারী শরীরের আড়ালে যে একটা নরম ভালোবাসার কাঙাল কাঠবিড়ালির মতো মন আছে, সে মনটার খোঁজ কেউ রাখল না। এই সুন্দরী শরীর না থাকলে আমার আমি কখনো রমেনের মতো লোকের শিকার হতাম না। সত্যিকারের সুন্দর মনের কেউ হয়তো একদিন আমাকে আদর করে, সমস্ত সম্মানের সঙ্গে তার ছোটো মধ্যবিত্ত সংসারের রানি করত।'[৪]

নিরুপমার অপরাধবোধের পাশাপাশি প্রেম ও সম্পর্ক নিয়ে তার বিচারবোধ ও মূল্যায়নে

উঠে এসেছে স্ববিরোধীতার স্বর। দাম্পত্যের সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হয়ে সে শরীর বা রূপকে পণ্য করে তুলেছে। বিবাহ বহির্ভূত বা পরকীয়া সম্পর্কে পা বাড়ালেও সে বারংবার দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় নিয়ে জর্জরিত হয়েছে। সম্পর্কের ভয়েডনেস ও শূন্যতা নিয়ে সে সুশান্তের সান্নিধ্যে এসে হারিয়ে দিয়েছে সমস্ত দ্বন্দ্বময়তাকে। এমনকি এক উচাটন মুহূর্তে সুশান্তের সঙ্গে নিরুপমা যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়। বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের এই অন্তরঙ্গতা দেখে ফেলে নিরুপমার প্রেম প্রত্যাশী যুবক সেন। নিরুপমার প্রতি একরাশ ঘেন্না উগরে দিয়ে ফিরে যায় সেন। সেই মুহূর্তে নিরুপমা আবিষ্কার করে সুশান্তের কাপুরুষতাকে। যে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়স্পর্শের মাদকতা ও শরীরী প্রেমের রম্যতায় বিশ্বাসী সুশান্তের এই রূপ দেখে হতাশায় মুষড়ে পড়ে নিরুপমা। সবকিছু ছেড়ে সে কলকাতা ফিরে যাবে মনস্থির করে এবং এমন সময় তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যুবক সেন। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সেনের ভালোবাসার কাছে নিজেকে সঁপে দেয় নিরুপমা:

সেনের বুকের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই আমার মনে হল, এই ঠিক ভেবে ভুল করা এবং ভুল ভেবে ঠিক করা, এই সব ভুলের দুঃখ, সব ঠিক করার আনন্দ, এই টুকরো টুকরো সুখ ও দুঃখ নিয়েই তো আমাদের জীবন। মনে হল, কারও জীবনেই, কেউই কাউকে সুখের গ্যারান্টি দিতে পারে না। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত দুঃখ হয়তো পেতেই হয় তবুও এই অনেক দুঃখের মধ্যে যেটুকু সুখ যে ছিনিয়ে নিতে পারে, সেই-ই সুখী; সেই-ই তা পেল। যে ছিনিয়ে নিতে পারল না; পেল না। এর কোনো বিকল্প নেই।[৫]

নিরুপমা সুখের প্রত্যাশী হলেও সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসার তেমন সৎসাহস ছিল না তার। বস্তুত রমেনের চারিত্রিক অধঃপতনই তাকে শেষ পর্যন্ত স্বস্তি দিল সেনের অন্দরমহলে। আমরা ধরে নিতেই পারি, রমেন থাকলে হয়তো নিরুপমা তার অসুস্থ দাম্পত্যের সংসারেই হয়তো ফিরে যেত। স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণ থাকলেও বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটানোর মতো মনোবল তার ছিল না।

তিন.

'একটু উষ্ণতার জন্যে' (১৯৮৭) উপন্যাস সুকুমার বোস ও রমার বিড়ম্বিত দাম্পত্য এবং সুকুমার ও ছুটির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের আখ্যান। সুকুমার বোস নামকরা ব্যারিস্টার এবং প্রথিতযশা লেখক। ছুটি সুকুমার বোসের অনুরাগী পাঠক। লেখার প্রতি মুগ্ধ হয়েই লেখকের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেয় ছুটির। সে সুকুমার বোসের কাছে চেয়েছিল আশ্রয়। সুকুমার স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পেতে এবং কলকাতার নাগরিক কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির নিবিড়তার মধ্যে শান্তি পেতে চেয়েছিল। দাম্পত্যে অশান্তি, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখায় দায় এমন সম্পর্কের জালে বন্দি হয়ে অনুভূতিপ্রবণ মানুষ সুকুমারের মনপ্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

উঠেছিল। সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে এবং স্ত্রী রমার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের জঙ্গলে বেড়াতে আসে। রমার সঙ্গে সুকুমারের মনোমালিন্য মূলত ইগোর লড়াই। সুকুমারের জীবনের আর এক অনুচ্ছেদ, তার অনুরাগী পাঠক ছুটি। অবিবাহিতা ও সুন্দরী ছুটির সান্নিধ্যেই সুকুমার খুঁজে পেত ক্ষণিক শান্তির নিশানা। আশ্রয়হীন ছুটি এবং সুকুমার দুজনেই দুজনের কাছে হয়ে উঠেছিল তাদের আশ্রয়। একাকিত্বের অসহায়ত্ব নিয়ে ছুটি সুকুমার বোসের কাছে ছুটে আসত। সুকুমারের বারংবার মনে হয়েছে, রমার সঙ্গে কখনও মিটমাটের সম্ভাবনা থাকলেও ছুটির আগমন সে সম্ভাবনায় জল ঢেলে দিয়েছে। রমা ও সুকুমারের দূরত্ব বেড়ে যায়, এবং একসময় দুজনেই বুঝতে পারে বদলে গেছে তাদের সম্পর্কের ধরন। নতুন করে আর একসঙ্গে থাকতে পারে না। তখন শুধুই অনুভব করে "দুরত্ব জানে শুধু একদিন খুব বেশি নিকটে ছিলাম", অন্যদিকে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে ছুটির অন্তঃমানসে জেগে উঠেছিল অপরাধবোধ:

আপনি কি মনে করবেন জানি না, মাঝে মাঝে রমাদির জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে যে, যা তাঁর একান্ত ছিল, তাঁর সর্বস্ব ছিল, তা ধীরে ধীরে আমার হস্তগত হচ্ছে। এতে হয়ত আমার জয়ের আনন্দ বোধ করা উচিত ছিল স্বাভাবিক কারণে, কিন্তু সত্যি বলছি, এতে আনন্দের বদলে এক গভীর দুঃখ বোধ করি আমি।... রমাদিরা কোনো পুরুষকে নির্ভর করে তার জন্য বাঁচতে শেখেননি। তাঁরা যেহেতু শিক্ষিতা, যেহেতু তাঁরাও মাস পোয়ালে মোটা অঙ্কের চেক নিয়ে বাড়ি ফেরেন, তাঁরা ভাবেন তাঁরা বুঝি পুরুষের সমকক্ষ![৬]

স্বাবলম্বী নারীদের সামাজিক অবস্থানটা চিহ্নিত করে দিয়েছে ছুটি। স্বাধীনতা উত্তর যন্ত্রনির্ভর সংস্কৃতি ও নাগরিক সমাজের মানদণ্ডে আটকে থাকেনি নারী-পুরুষ কেউই। তারা আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতাসম্পন্ন এবং কিছুটা নার্সিসিস্ট। নিজের সুখটাকেই তারা অগ্রাধিকার দেয়। ছুটির সঙ্গে রমার চারিত্র্যে বিস্তর ফারাক। ছুটির মধ্যে দোলাচলতা কাজ করেছে। সে নিরঙ্কুশভাবে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে নিজের করে ভাবতে পারে না, অন্যদিকে তাকে সামাজিক বা দস্তর মতো আনুষ্ঠানিক রূপ দিতেও অসমর্থ। চিঠিতে সুকুমার বোসকে লেখা কথায় সেই সত্যই উচ্চারিত হয়েছে:

আমার কিন্তু চিরদিন মনে হয় এ ভাবনাটা ভুল। ঘরের বাইরে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির যতই বড়াই থাক না কেন, ঘরের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাটা মূর্খামির কাজ। প্রাকৃতিক নিয়মেই আমরা জীবনের সব নরম ক্ষেত্রে পুরুষের পরিপ্রেক্ষিতে প্যাসিভ রোলেই অভিনয় করি। আপনারা ভালোবাসতে জানেন, আমরা ভালোবাসা গ্রহণ করতে জানি। এমনকি আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব, মাতৃত্বের সমস্ত গর্বও আপনাদেরই দান-নির্ভর। ঘরের মধ্যে অথবা শয্যালীন হয়ে যে মেয়ে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায়, তার

কপালে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। আমি এ যুগের মেয়ে হয়েও এ কথা জোর গলায় বলতে ভয় পাই না। আমি গোঁড়াও নই, আমি প্রাচীন-পন্থী নই, (নই যে তার প্রমাণ হয়ত আপনি পেয়েছেন) তবু আমি বলব যে, আমি একজন মেয়ে এবং সেই সুবাদেই আমার স্থান কোথায় তা আমি জানি। ভাগ্যক্রমে আমাদের স্থান এত সুবিন্যস্ত যে, যে-সব মেয়ে সেই উচ্চাসন থেকে নেমে এসে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে গার্হস্থ্য পরিবেশ অসহনীয় করে, তাদের বোকা না বলে পারি না।

... আমার শরীর, আমার জীবন, আমার সুখ, মনের সুখ, আমার শরীরের সুখকে আমি বড় ভালোবাসি।

আমি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ভালোবাসি, আমি অনেক অনেকদিন বাঁচতে চাই। শুধু আমার এই আপনাকে ঘিরে যা ইচ্ছা তা আমাকে এ জন্মে সফল করতে দিন। আপনার কাছে আমার শুধু এইটুকুই প্রার্থনা।[৭]

বিশ শতকের আটের দশকের নাগরিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষদের গল্প লিখেছেন বুদ্ধদেব গুহ। যারা ভালোবাসার মূল্য সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন। তাদের ভালোবাসা তাড়িত হয় কার্যত কর্তব্যবোধের ভাবনার দ্বারা। আসলে তদানীন্তন সময়ের গল্প-উপন্যাসে, সিনেমা-নাটকে প্রতিফলিত নারীবাদী মতকে নারীরা এবং বহু পুরুষই সাদরে গ্রহণ করেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছি নারী। বৈবাহিক সম্পর্কে সন্তানের অভিভাবকত্ব ও গৃহকর্মের সমান দায়িত্ব গ্রহণ সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে বদলে গেছে যুগলের যাপন চিত্র। দাম্পত্যের ভেতরের প্রেম, শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ ও বিশ্বাসে ভাঙন ধরছে। একে অপরের প্রতি হারিয়েছে বিশ্বাস। পবিত্র বন্ধন হয়েছে ভঙ্গুর। এর ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ যেমন হয়ে উঠেছে অতি স্বাভাবিক, পাশাপাশি শুরু হয়েছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ও ছদ্ম দাম্পত্যের বাড়বাড়ন্ত। উনিশ শতকের সমাজ রোহিনীকে হত্যা করে, কুন্দনন্দিনীকে ঠেলে দেয় আত্মহননের পথে সময়ের বিবর্তনে এই দৃশ্য আর আবর্তিত হয় না। বিশ শতকের কপিলা অনায়াসে কুবেরের সঙ্গে ময়নাদ্বীপে পাড়ি দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারে, লাবণ্য অমিতকে ভালোবেসে শোভনলালকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এর অর্ধ শতাব্দীর পর সুকুমার-রমার আখ্যান লিখছেন বুদ্ধদেব গুহ। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের জবানিতেও উঠে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখী হবার আকাঙ্ক্ষা। সেইসঙ্গে দাম্পত্য টানাপোড়েনের বহুকৌণিক স্বর। সুকুমারের মননরাজ্যে ভেসে উঠেছে সেই কথা:

হয়ত আমাদের মতই আরো লক্ষ লক্ষ বিবাহিত দম্পতি এমনি করে দাম্পত্যের অভিনয় করে চলেছেন, ক্লাবে, পার্টিতে, সামাজিক উৎসবে। সকলের সামনে ভাব দেখাচ্ছেন কত প্রেম। হাসছেন, একে অন্যকে ডার্লিং বলছেন, তারপর বাড়ি ফিরে এয়ার কন্ডিশানডবেডরুমে মোটা ডানলোপিলোর গদির উপর দুটি প্রাণহীন মোমের মূর্তির মতো

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

দু'জন দু'দিকে শুয়ে থাকছেন। গায়ে গায়ে লেগে থেকেও হাজার মাইল ব্যবধানে আছেন।

কিন্তু কেন? কেন আমার সাহস হয় না, আমার জোর আসে না হৃদয়ে এই মিথ্যে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলার? জীবন কি সত্যিই এত অবহেলার জিনিস? জীবন তো একটাই একবারই আসে। তবে সে জীবনও আমরা নিজেদের ইচ্ছা নিজেদের সাধ অনুযায়ী ভোগ করতে পারি না কেন?[৮]

সুকুমারের কাছে নারীর সৌন্দর্যের মাপকাঠি তার শারীরিক গঠন বা 'ফিগারে'। সে কল্পনাপ্রবণ মানুষ এবং নিজেকে 'অতিমাত্রায় রোমান্টিক' বলেই মনে করে। বস্তুত সেই কারণেই সুকুমার মেয়েদের সঙ্গে প্রকৃতির, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতির এবং সঙ্গতির সঙ্গে সৌন্দর্যের একটা ওতপ্রোত ও অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ খুঁজতে চেয়েছে। সুকুমার বোসের আত্মকথনে নারীর রূপসর্বস্বপ্রিয়তা-ই প্রাধান্য পেয়েছে। মনের সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্বের নিটোল বোধ ও বুদ্ধিদীপ্ত কথনের চেয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যের অস্তিত্বেই যেন সে অধিক বিশ্বাসী। কল্পনাপ্রবণ মানুষ সুকুমার নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যতটা সচেতন, অন্যের জীবন নিয়ে ততটা নয়। আর এই কারণেই স্ত্রী রমা কী চায়, না চায় সেটা কোনোদিনই সে বুঝতে পারেনি। দাম্পত্যের ভেতরের অবিশ্বাস ও সংশয় নিয়ে স্বজাত্যভিমানী স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হলে আশ্রয় খুঁজতে চেয়েছে তার একনিষ্ঠ পাঠিকা ছুটির কাছে। ছুটি মানেই তো অবসর, মুক্তি। ছুটির সান্নিধ্যে সেই মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছে সুকুমার। শীতার্ত জীবন ছেড়ে উষ্ণতার দিকে তার নিরুপম যাত্রা। সুকুমার তার স্ত্রী রমার ভেতরে যে সৌন্দর্য দেখেছিল, ছুটির মধ্যেও সেই সৌন্দর্য দেখেছে। বস্তুত রমার সঙ্গে শারীরিক দূরত্ব বাড়ার কারণেই দাম্পত্যে অশান্তি ঘনিয়ে ওঠে। ছুটির হৃদয়ের উপান্তে নিজেকে সঁপে দিয়ে সুকুমার খুঁজে পায় 'ভালো থাকার' মন্ত্র। তাদের সম্পর্ক নিয়ে সে গর্বিত ও উৎফুল্ল। সুকুমারের আত্মকথন:

এ সম্পর্ক ত' শুধু ওর এবং আমার। এ সম্পর্কের যতটুকু দাম, যতটুকু নৈকট্য সে ত' শুধু আমার এবং ছুটির কাছেই। বাইরের কেউই ত' এ সম্পর্ক বুঝতে পারবে না। আমরা দু'জনেই শুধু এ সম্পর্কে স্বীকার করেছি, শ্রদ্ধা করেছি, সমস্ত সামাজিক ঝড়-ঝাপটা ন্যাপাম-বোমা থেকে আড়াল করে রেখেছি। এ সম্পর্কের ত' নাম নেই, একে ত' ছাঁচে ফেলে কোনো বিশেষ আভিধানিক নামে ডাকা যায় না। এ যে এক দারুণ সম্পর্ক।

শুধু ছুটি জানে, আর আমি জানি। ছুটি আমার কে হয়।[৯]

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কোনও নাম হয় না। ভবিষ্যৎহীন এক সম্পর্ক, মুহূর্তেই সুখ। আর ছুটি সেই মুহূর্তের সুখেই বিশ্বাসী। সে তার প্রিয় লেখককে দেহ-মন সর্বস্ব দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়। বিবাহিত পুরুষকে নিজের মতো করে পেতে চাওয়ার মধ্যেই ছুটির অনুভূতিপ্রদেশে মেয়েলি সুলভ হিংসা এবং গভীর ঈর্ষার বোধ জাগ্রত হয়েছে। তাদের কথোপকথনে বারবার উঠে এসেছে রমার কথা। নিজের মতো করে আলগা যুক্তিকে বৈধতা দিয়ে তারা ভালো থাকতে চায় পরস্পর। ছুটির বেদনার মনোলগ:

বর্তমান মানে, জাস্ট একটা মুহূর্ত নয়। শুধু এই মুহূর্তই নয়। বর্তমানের বিস্তৃতি অনেক। বর্তমান মানে সমস্ত জীবন, আপনার আমার, সকলের প্রতি-মুহূর্তের অস্তিত্ব। আমরা যদি প্রতিটি মুহূর্তই নিজেদের ফাঁকি দিই, একে অন্যকে ফাঁকিতে ফেলি, তাহলে সে জীবনের কি বাকি থাকে বলুন?[১০]

নবনীতা দেবসেন তাঁর 'পাণিগ্রহণ' কবিতায় লিখেছিলেন:

কাছে থাকো। ভয় করছে। মনে হচ্ছে
এ মুহূর্ত বুঝি সত্য নয়। ছুঁয়ে থাকো।
শ্মশানে যেমন থাকে দেহ ছুঁয়ে একান্ত
স্বজন। এই হাত, এই নাও হাত।
এই হাত ছুঁয়ে থাকো, যতক্ষণ
কাছাকাছি আছো, অস্পৃষ্ট রেখো না।
ভয় করে, মনে হয়, এ মুহূর্ত বুঝি সত্য নয়।
যেমন অসত্য ছিল দীর্ঘ গতকাল,
যেমন অসত্য হবে অনন্ত আগামী।

ছুটি এই মুহূর্তের সুখের প্রত্যাশী এবং বিশ্বাসী। ছুটির ফিরে যাবার পর সুকুমারের কাছে অতর্কিতে এসে পড়ে তার স্ত্রী রমা, বন্ধু সীতেশ ও মাধুরী। সীতেশের ও রমার ঘনিষ্ঠতায় বিরক্তি হয়ে একদা সুকুমারের দাম্পত্যে শুরু হয়েছিল ভাঙন। রমা বা সুকুমার কেউই কারোর কাছে কিছু স্বীকার করতে নারাজ। চারপাশের লোকজনকে দেখিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের চূড়ান্ত অভিনয় করে চলেছে দুজন। সুকুমার সম্পর্কের প্রতি সিনসিয়র হতে চাইলেও রমা তার বান্ধবীর মতো বিশ্বাস করে 'মানি ইজ মাই ফার্স হাজব্যান্ড'। বন্ধু সীতেশের প্রতি সুকুমারের রাগ-ঘেন্না স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে উদগত হয়েছে। মানুষ কনসাসলি অনেক কথা সরাসরি বলতে পারে না, যা আনকনসাসের কুঠুরিতে জমা থাকে। সুকুমার ঘুম ভাঙার পর রমাকে দেখে মুগ্ধ হবার পাশাপাশি অতীতচারিতায় নিমগ্ন হয়। হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে অতীতের রমাকে, তাদের সফল দাম্পত্যকে। আবার নতুন করে সুখের নীড় রচনার সাধ জাগে তার হৃদয়ে। সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা তাকে কখনও রমা কখনও ছুটির দিকে ঠেলে দিয়েছে। সে নিজেই জানে না কাকে চায়! ম্যাকলাস্কিগঞ্জের পেয়ারা তলায় বালুচরী শাড়ি পরিহিতা স্ত্রী রমাকে দেখে তার ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, স্বপ্ন দেখতে শুরু করে সে। রমাকে কাছে পেয়ে ছুটিকেও ভুলে যেতে ইচ্ছে করে তার। রমার প্রতি তার মুগ্ধতার কথা এক অপরাধবোধ নিয়ে চিঠিতে জানায় ছুটিকে। অন্যদিকে উপন্যাসের উপচরিত্র নয়নতারার প্রতি শৈলেনের মোহাচ্ছন্ন প্রেম এবং শৈলেনের আত্মহত্যা। কিশোর লাবু ও নুড়ানির প্রেমপর্ব, প্রেমের জন্যে পরিবার ছেড়ে লাবুর পলায়ন সম্পর্কের এই বহুবিধ স্তর

দেখে সুকুমারের অন্তর্লোকে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। দোলাচলতায় অস্থির হয়ে সুকুমার রহস্যময় প্রকৃতির কাছে আশ্রয় খোঁজে। বিশ শতকের ছয়ের দশকে অজয় কর পরিচালিত 'সাত পাকে বাঁধা' (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুচিত্রা সেন অভিনীত) ছবি দেখিয়েছিল স্রেফ ইগোর বশে একটা নিটোল দাম্পত্য কীভাবে খান খান হয়ে যায়। সুকুমার ও রমার পরিণতিও অনেকটা তেমনই। রমা কলকাতা ফিরে যায়। এবং পুনরায় ফিরে এসে জানায় সে সীতেশকে বিয়ে করবে। সঙ্গে জানিয়ে দেয় ছুটির বিয়ের সংবাদ। সুকুমার এ কথা বিশ্বাস করে না। রমা সুকুমারকে বুঝিয়ে দেয় "হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়/ সারাজীবন বইতে পারা সহজ নয়"। রমা ফিরে গেলে সে বন্ধু প্যাটকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছুটির উদ্দেশ্যে। যে ছুটির পৃথিবী ছিল সুকুমার, সেই ছুটিই রমার কাছে তিরস্কৃত হয়ে অন্য ছেলের সঙ্গে লিভ-ইন বা ছদ্ম দাম্পত্যের জীবন শুরু করে। ছুটির অবসর যাপনের নিভৃতকক্ষে উদভ্রান্তের মতো ছুটে গেছিল সুকুমার। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর সে একবুক আশা নিয়ে ছুটির কাছে গেছিল সর্বস্ব সমর্পণ করতে। অথচ সেই ছুটিও তার জীবনের বৃন্ত থেকে ঝরে গেল সহসা। "মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়!" সবকিছু খুইয়ে দেউলিয়া হয়ে যায় সুকুমার। সুকুমারের জীবনটাই ছিল নারীনির্ভর। সে বড়ো লেখক বা ব্যারিস্টার হলেও সে অর্থে স্বনির্ভর ছিল না কোনোদিনই। প্যাটের উদাত্ত কণ্ঠের গান:

Show me the way to go home–
I am tired–
And I want to go to bed—
Show me the way to go home.

পৃথিবীর সমস্ত করুণা, করুণার ভিক্ষা ও তার প্রতিশ্রুতিকে লাথি মেরে স্বনির্ভর প্যাট এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। রাতের বনের অন্ধকারে স্বয়ংসম্পূর্ণতায় স্বপ্নবিলাসী একজন অভিশপ্ত একাকী ভঙ্গুর পুরুষমানুষকে দেখে সুকুমার হয়তো নিজেকে চিনতে শিখল নিজের মতো করে। নিঃসঙ্গতার হাহাকার নিয়ে সে যেন থিতু হতে চায় এবার। জীবনের সব আশ্রয় হারিয়ে প্যাটের মতোই সুকুমারও হয়তো একদিন হয়ে উঠবে নিজেই নিজের আশ্রয়।

চার.

'সবিনয় নিবেদন' পত্র উপন্যাস। বর্তমানে ইন্টারনেট ও টেকনোলজির দ্রুত উন্নয়ন ও প্রসারের ফলে চিঠির গুরুত্ব কমে গেছে, অথচ একটা সময় ছিল চিঠিই মানুষের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এ উপন্যাস প্রায়ই অচেনা, অদেখা দু'জন মানুষের আত্মিক যোগের আখ্যান। চিঠির মধ্যে দিয়ে দু'জন দু'জনকে আবিষ্কার করে এবং ক্রমশ সৎসাহস নিয়ে অকপটে অমায়িকভাবে জীবনের খোলস খুলে নিজেকে উন্মুক্ত করে গড়ে তোলে এক অভিনব সম্পর্ক। শিক্ষিত, স্বাবলম্বী এবং উদারমনা ঋতি রায় বেড়াতে গেছিল পালামৌর বেতলার জঙ্গলে। ঋতি রায় এবং তার সঙ্গীরা হাতির দলের সামনে পড়লে এক চরম বিপন্ন

মুহূর্তে বিপদত্রাতা রূপে আবির্ভূত হয় ঝকঝকে ও ব্যক্তিত্ববান টাইগার প্রজেক্ট অফিসার রাজর্ষি বসু। এক ঝলক দেখাতে কেউই কাউকে তেমন করে চিনতে পারেনি। কলকাতায় ফিরে ঋতি বিপদত্রাতা এই মানুষটিকে আন্দাজি ঠিকানায় ধন্যবাদজ্ঞাপক এক চিঠি পাঠিয়েছিল। আর এই পত্র বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের পারস্পরিক বোধের বিন্যাস ও আধুনিক সময়ের নানান জটিল স্বর।

এ উপন্যাসের রাজর্ষি ও ঋতি দুজনেই পরিণত মনস্ক এবং জীবনের নানান দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাদের চিঠিতে সেই নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। দু'জন দু'জনের প্রতি অদম্য কৌতূহল নিয়ে একের পর এক চিঠি লেখে। গড়ে তোলে আত্মিক যোগাযোগ। কেউ কাউকে চেনে না এবং জানেও না তেমনভাবে, তবুও কোথাও দুজন মানুষ একে অপরকে পড়তে পড়তে সবটুকুই জেনে যায়। রাজর্ষি বসু লিখেছিল:

শরতের রোদে ইউক্যালিপটাসের পাতারা যেমন হাতছানি দেয় রোদ চমকিয়ে, তেমন করে চিঠির মধ্যে দিয়ে যেন এক অনাস্বাদিত অদেখা, অননুভূত জগতের আভাস দাও প্রতিনিয়ত আমাকে। যে জগৎ ঠিক কেমন আমি জানি না। সেই জগতে হয়তো আমার প্রবেশাধিকারও থাকবে না কখনো।[১১]

ঋতি রায় লিখেছিল:

আপনার মতো পুরুষকে দুঃখ দিতে পারে এমন সাধ্য কোনো মেয়েরই নেই। এটা আমার বিশ্বাস। আপনার সম্বন্ধে সামান্যতম জেনে এবং আপনাকে অন্ধকারে এক ঝলক দেখেই এই কথা বলছি। অনেককে দীর্ঘদিন কাছ থেকে জেনেও জানা হয়ে ওঠে না, আবার কারো সঙ্গে স্বল্পকটি চিঠির আদান-প্রদানের মাধ্যমেও এমন এক সখ্য গড়ে ওঠে যে তা অতি নিবিড়। সম্পর্কের নানা রকম হয়। জানার নানা ধরন।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল, আমি আপনার কেউই নই, কিছুই করতে পারি না আমি আপনার দুঃখের নিরসনের জন্যে তা অত্যন্ত স্থিরভাবে জেনেও।

আপনি ভালো না থাকলে আমার ভারী খারাপ লাগবে। ভালো থাকবেন। আনন্দে থাকবেন সবসময়ে।

প্লিজ!

এবং নিরুত্তর থাকবেন না।[১২]

মাত্র কয়েকটি চিঠি বিনিময়ের পরই ঋতি ও রাজর্ষি হয়ে ওঠে একে অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী। 'ছিন্নপত্র'-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আর একটু বেশি

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরো একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যেরকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না। আবার লেখায় যতখানি করতে পারে মুখের কথায় ততখানি করতে পারে না। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে।... যাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখির অবসর ঘটেনি তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে। যেমন বাছুর কাছে গেলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়। অন্য উপায়ে হবার জো নেই।[১৩]

এক নতুন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যেন চিঠি বিনিময়ের মাধ্যমে রাজর্ষি বসু ও ঋতি রায় একে অপরকে জানা এবং বোঝার চেষ্টা করেছিল। রাজর্ষি বসু বিবাহিত এবং এক সন্তানের পিতা। রাজর্ষির স্ত্রী বনীর সঙ্গে রাজর্ষির দস্তুর মতো ডিভোর্স না হলেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এ খবর জানতে পারে ঋতি তার বন্ধু শ্রুতির কাছে থেকে। পরে রাজর্ষি নিজেই চিঠিতে ঋতিকে জানায় তাদের বিবাহ বৃত্তান্ত এবং স্ত্রীর সঙ্গে তার দূরত্বের কথা। বনী গর্ভবতী হয়ে রাজর্ষিকে বিয়ে করেছিল এবং সে সন্তানের পিতা ছিল বনীর পূর্ব প্রেমিক। অন্যদিকে ঋতি রায়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল অশেষের সঙ্গে। অশেষ বিদেশে থাকে এবং বাঙালি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি থেকে তার অবস্থান শতযোজন দূরে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে অশেষ ও ঋতির বোধের ভিন্নতা তাদের একে অপরকে দূরে ঠেলে দেয়। রাজর্ষির চিঠির সান্নিধ্যে ঋতির মন ধাবিত হয় জঙ্গলের মুক্ত প্রকৃতি ও অরণ্যদেব রাজর্ষির দিকে। দীর্ঘ উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং সাসপেন্স ভেঙে ঋতি একদিন ছুটে যায় রাজর্ষির কাছে। আধুনিকতার উপত্যকায় দাঁড়িয়ে দুজন মানুষ নিজেদের ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ রূপ দেয় প্রকৃতির নির্জনতায়। নারী-প্রকৃতি তখন একাকার হয়ে যায় মিলনের পূর্ণতায়।

এ উপন্যাস বিবাহবিচ্ছিন্ন পুরুষ রাজর্ষি এবং অবিবাহিত ঋতির প্রেমের আখ্যান। তাদের কাছে যে সম্পর্ক কালিমাহীন ও কলুষমুক্ত। যেখানে কামভাব নেই, আসক্তি নেই, লোভ নেই, আছে শুধু এক দৃপ্ত প্রসন্নতা, শান্ত প্রকৃতির মতো পরিতৃপ্তি। যা বোঝার মতো ক্ষমতা শুধু বনজ এবং মনজ মানুষদেরই থাকে।

পাঁচ.

বাংলা কথাসাহিত্যের আদিপর্ব থেকেই নারী-পুরুষের বহুমাত্রিক সম্পর্ক ও সম্পর্কের রহস্যময় বুনন দেখতে পাওয়া যায়। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্ববোধের বিকাশ ঘটেছে, বিশেষ করে নারীর। উনিশ শতকের সামাজিক সমস্যা ও ঘটনাকেন্দ্রিক আখ্যানে বিধবা চরিত্রের নির্মাণে লেখকরা সামাজিক মানদণ্ড ও নৈতিকতার বাইরে বেরিয়ে

আসতে পারেননি। সময়ের স্রোতে বাংলা উপন্যাসেরও পালাবদল ঘটল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'এক দাম্পত্যের মিথ' ভেঙে গেল বিশ শতকের কথাসাহিত্যিকদের কলমে। নিজের পছন্দের মানুষকে নির্বাচন করার মধ্যে দিয়েই সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বদলে গেছে অনেকখানি। পাশাপাশি আত্মকেন্দ্রিক কিংবা নিজের সুখ খুঁজে নেবার মানসিকতা সম্পর্ককে করে তুলেছে আরও জটিল। একটু উষ্ণতার জন্যে উপন্যাসের সুকুমার বোস বলেছিল "এ জগতে কেউই কাউকে কিছু নিজে থেকে দেয় না যা পাবার তা নিজের অধিকারে শক্ত হাতে সুপুরুষের মতো কেড়ে নিতে হয়।"[১৪] স্বগতোক্তি উপন্যাসের নিরুপমা বলেছিল "জীবনে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত দুঃখ হয়তো পেতেই হয় তবুও এই অনেক দুঃখের মধ্যে যেটুকু সুখ যে ছিনিয়ে নিতে পারে, সেই-ই সুখী;"[১৫] প্রকৃতি ও পরকীয়া এবং নারীর যৌনতাকে প্রকৃতির আদিমতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক। একগামিতা-বহুগামিতা আধুনিক নারী-পুরুষের খোশখেয়ালকে ফ্যান্টাসাইজ করে বুদ্ধদেব গুহ মানুষের অরণ্যপ্রীতি এবং আদিম প্রবৃত্তির যোগসূত্র তৈরি করতে চেয়েছেন।

আধুনিক নারী-পুরুষ নিজেদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় ভুলে যায় অনেক সময় জীবনের মূল্যবোধ এবং ঔচিত্যবোধ। কেউ নিঃশব্দে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কেউবা প্রত্যাখ্যান ও স্বেচ্ছায় গ্রহণের মধ্যে দিয়েই নিজের সুখকে খুঁজে নিতে পারে অনায়াসে, নির্দ্বিধায়। বিবাহ ও দাম্পত্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছিলেন:

প্রেম কিছু আত্মত্যাগের প্রেরণা দেয় যা শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ বা পাতিব্রাত্য দিতে পারে না। এইখানেই প্রেমের অপরাজেয় শক্তি, যা মৃত্যুর মতোই অমোঘ। যে বিবাহ বা দাম্পত্য এই প্রেম থেকে সঞ্জাত, তার অগ্নিপরীক্ষা নিজের মধ্যেই ঘটে এবং সে পরীক্ষায় জয়ও আসে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে। সে প্রেমে ভয়ের স্থান নেই এবং সেই প্রেমেই গান্ধর্বমিলন, বিবাহ বা দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা। প্রেমনির্ভর মিলন ও বিবাহ আনুষ্ঠানিকই হোক বা নিরনুষ্ঠানই হোক, তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত যুগলজীবনের দাম্পত্যের যে সুষমা ও দীপ্তি যা যুগে যুগে মানুষকে আকর্ষণ করেছে, করবেও। তার কারণ, মানুষ এখনও এর কোনো বিকল্প পায়নি।[১৬]

এই 'বিকল্প' পায়নি বলেই মানুষ প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ নিয়ে যুগে যুগে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেছে। বিবাহ বহির্ভূত বা ছদ্ম দাম্পত্যের শিকার হয়ে মানুষের জীবন যে ভঙ্গুর হয়েছে তা সমাজ ও সাহিত্যে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে।

তথ্যসূত্র ও উৎস নির্দেশ :

১. দে, রামকৃষ্ণ; 'প্রসঙ্গ: পিতৃতন্ত্র' (সম্পাদনা) পুলক চন্দ, নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৮ পৃ. ৬১৮

২. Beauvoir– Simone de— The Second Sex 1949– Trans and Ed. H.M. Parshley. Harmondsworth– Penguin– 1987– Page– ২৯৫

৩. সেনগুপ্ত, মল্লিকা; স্ত্রী লিঙ্গ নির্মাণ, মল্লিকা সেনগুপ্ত গদ্য সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ , কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৬ পৃ. ৫৩২

৪. গুহ, বুদ্ধদেব; স্বগতোক্তি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১ পৃ. ১৭

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৬. গুহ, বুদ্ধদেব; একটু উষ্ণতার জন্যে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০০ পৃ. ৫৬

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১১. গুহ, বুদ্ধদেব; সবিনয় নিবেদন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৯, পৃ. ১৬

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; ছিন্নপত্র, (শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লেখা। ছিন্নপত্রের ১৪১-সংখ্যক পত্র) বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৪৫ আষাঢ়, পৃ. ২৬৬

১৪. গুহ, বুদ্ধদেব; একটু উষ্ণতার জন্যে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০০ পৃ. ৬৪

১৫. গুহ, বুদ্ধদেব; স্বগতোক্তি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১ পৃ. ৮৭

১৬. ভট্টাচার্য, সুকুমারী; 'ভবিষ্যৎ', দাম্পত্যের স্বরূপ, প্রবন্ধ সংগ্রহ- ২, গাঙচিল, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৪০৫

বুদ্ধদেব গুহর ছোটগল্প ঃ আধুনিক বাঙালির বিবর্তননামা

সমরেশ ভৌমিক

খুব সাম্প্রতিক কাল ২৯ আগস্ট ২০২১ বিশ্বত্রাস করোনা জীবাণু আমাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে একাধারে কথাশিল্পী চিত্রশিল্পী, ভ্রামণিক ও বিচিত্র আরও নানা সত্তার অধিকারী সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহকে। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় জন্ম, পড়াশোনা এখানকার সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে। পেশাগত জীবনে চ্যাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট হয়ে ভারতসরকারের অধীনে কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গের আয়কর বিভাগের উপদেষ্টা, আকাশবানীর কলকাতা কেন্দ্রের অডিশন বোর্ডের সদস্য থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বোর্ডের উপদেষ্টার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলালেও তাঁর সাহিত্যসৃজন পিপাসু মন কখন তার কেন্দ্র থেকে সরে যায়নি বরং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আধুনিক ভোগবাদী ও পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির কেন্দ্র থেকে উঠে আসা ঘাত-প্রতিঘাতে পাল্টে যাওয়া বাঙালি মানসের বিচিত্রসব অভিব্যক্তি তাঁর কলমে উঠে এসেছে সাহিত্যিকের স্ব-মূল্যায়নে। মানবজীবন ও সমাজের অলিগলির ঘোর প্যাঁচ ওয়ালা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কখনও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আবার কখনো নিজস্ব বিবেক ও বুদ্ধির মাপকাঠিতে ঠিক বেঠিক, ভাল-মন্দ, উচিত অনুচিতের একটি নির্মোহ প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন সচেতন পাঠকের মনে। গল্পের আঙ্গিক, শব্দচয়ন চরিত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ সর্বত্র আছে এই বিচিত্র প্রতিভাধর মানুষটির নব নব স্বাক্ষর।

'প্রবেশ' নামক গল্পটিতে আছে বর্তমান জীবন ও জীবিকার জন্য যেনতেন প্রকারে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে নিজের আর্থিক অবস্থা ফেরানোর কথা। একবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শহরে মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে যেকোনভাবে ভর্তি করার আপ্রাণ চেষ্টা ও তা ব্যর্থ হলে সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণার শিকার হওয়া যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা আজও ক্রমবর্তমান। লেখক আধুনিক সময়ের এই সমস্যাদীর্ণ বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছেন বাঙালি উচ্চবিত্ত চাকুরীজীবী অশেষ, তার স্ত্রী সুমিতা ও পাঁচ বছরের সন্তান চাঁদু চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে।

পরিবারটি আধুনিক। গৃহ, আসবাব, পরিধেয় ও বিনোদন সামগ্রী সবকিছুর মধ্যে আছে চলনশীল জীবনের ছাপ। অশেষের স্ত্রী সুমিতা আসলে আধুনিক আবেগহীন জীবনসম্পর্কে দার্শনিকতাহীন এক ভোগপ্রবণ নারী। তাই বীণাদির সুপারিশে অনৈতিকভাবে তাঁর পাঁচ বছরের শিশু চাঁদুকে সেন্টফেজিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করতে চায়। অশেষ কিন্তু মফস্বলের বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করেই আজ বৃত্তিগত জীবনের শীর্ষে উঠেছে। যে দেখেছে তার অফিসের সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে যেমন— চ্যাটার্জী, যোগেশদা সবই গ্রামের বাংলামাধ্যম স্কুলে থেকে পাঠ নিয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তাই ছেলের ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ভর্তি করার জন্য দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত সহকর্মী অশেষকে যোগেশদা বলেন—

"তোমরা, ভাইডিরা কোন ইস্কুলে পড়ছিলা?"

আধুনিক ভাষা শিক্ষায় উদ্বেল মানুষদের মাঝে এই যোগেশদা একজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম—

"যোগেশদা সেই মুষ্টিমেয় বাঙালদের একজন যিনি আজও বাংলা বলে গর্ববোধ করেন। পুববাংলার ভাষায় কথা বলেন। বলেন, যাই কও আর তাই কও। 'আইস্যেন বইস্যেন' কইলে যতটা ভালবাসা ভালবাসা গল্প পাওন যায় তোমাগো আসুন বসুনে তার ছিটাফোঁটাও নাই।"

মানুষটি বহু বছর ইংল্যাণ্ডে ছিলেন যৌবনে। ইংরেজি বলেন সাহেবদেরই মত অথচ বাংলা, 'বলবেন, ইচ্ছে করে এমন করে'। ওরা বুঝতে পারেনা বললে বলেন হেইডাই তো ভাষা আমার। বাঙাল হইয়া করলুম খেলুম, মরলুম চললুম কইর‍্যা জাত খোয়াইতে পারুমনা। আমি হইতাছি গিয়া লাস্ট অফ দা মোহিকানস বোঝলানা।" ইনি মাতৃভাষায় কথা বলেন। ইংরেজি ইংরেজের মত জেনেও তার নিজস্ব ভাষার মহিমা বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত বাঙালি আধুনিকদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি।

অশেষ চারিত্রটির মধ্যে একদিকে আধুনিক নাগরিকতার অপর দিকে তাকে জীবনের সর্বস্ব হিসাবে গ্রহণ করতে না পারার এক প্রচ্ছন্ন আনন্দ তাকে এক মানসিক জটিলতায় বিভ্রান্ত করেছে। তার সামনে সে নিজে সহ, একাধিক বাংলা মাধ্যমে পড়া সফল মানুষদের ভিড়, অন্যদিকে আধুনিক উচ্চ ও মাধ্যবিত্ত বাঙালির ইংরেজি পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা খোঁজা; এদু'য়ের মাঝে পড়ে সে বার বার পথ গুলিয়ে ফেলেছে। চাঁদুকে ঘুমের ঘোরে হাত জোড় করে বাবা মায়ের মত সেন্টফেজিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে দেখে পিতা অশেষের হৃদয়ে জেগে ওঠে গভীর বেদনাবোধ।

"পাঁচ বছর বয়স থেকে পরীক্ষার শুরু হল চাঁদুর। চলবে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। জীবন মানেই পরীক্ষা। এই জীবন চাঁদুদের বড়ই সংগ্রামের, খেয়োখেয়ির, বড় দ্বেষ, ঈর্ষা, বড়ই রেষারেষির হবে।

চাঁদুর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিল অশেষ এই পৃথিবীতে কেন যে আনল ও আর সুমিতা, বেচারীকে, শিশুর শৈশব নেই; কিশোরের কৈশোর নেই, যুবকের যৌবন নেই, প্রৌঢ়ের বানপ্রস্থ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত টেনশনের প্রতিযোগিতার। অথচ এই প্রতিযোগিতা কিসের জন্য? ভাল চাকরী ভাল রোজগার, স্ট্যাটাস, ভাল ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফ্রিজ ভিসিআর? শুধু এটুকু পাওয়ার জন্য কি একজন মানুষকে পৃথিবীতে আনা। এই প্রতিযোগিতাতে যদি ছিন্ন ভিন্নই হতে থাকে সবসময় তবে ওরা বাঁচবেটা কখন? জীবন মানে শুধু কি এই, এইই সব?"

আসলে—এই প্রশ্ন কেবল অশেষের নয়। গল্পকার তাঁর বিবেকের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন সেই আধুনিক পিতা মাতার প্রতি যাদের লক্ষ্য সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই ইঁদুর দৌড়ে সামিল করে কেবল ভবিষ্যতের এক অর্থ উপার্জনকামী ব্যক্তি হিসাবে পরিণত করা।

শেষ পর্যন্ত পিতা অশেষ সন্তানের অসহায়তায় বিপর্যস্ত হয়ে নিজের বাল্যকালের স্মৃতিসত্তার অববিষ্ট হয়। বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে লেখক বলে গেলেন।

"চাঁদুর পাশে শুয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল একদা ব্রিটিশ, অধুনা মাড়োয়ারী কোম্পানীর ইংরেজী ফুটানো চাকর।" শহরে বিত্তবান ইংরেজী শিক্ষাকে ধ্যানজ্ঞান করা বাঙালিকে এভাবে "ইংরেজি ফুটানো চাকর" বলা যথেষ্ট দুঃসাহসের কাজ। সর্বোপরি বিত্তবান সমস্ত বাঙালি পিতার অন্ধ ইংরেজি প্রীতি থেকে এক সময় অশেষকে ফিরিয়ে দেন তার আলোকিত বাল্যজীবনে; যেখানে গ্রামের রাত পাখির শীতার্তস্বর, নদীর হু হু শব্দ ভোরের খেজুর রসের গন্ধ, কই মাছ ও ধনে পাতা দিয়ে রাঁধা ঝোলের গল্প সব মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। এই জীবন থেকে অশেষ যদি আধুনিক জীবিকার প্রতিযোগিতায় স্থান করে নিতে পারে তাহলে চাঁদু পারবে নাই বা কেন?

গল্পের পরিণতিতে তাই বাঙালি সন্তান চাঁদু বাংলিশ হয়ে উঠতে পারেনি। পিতা অশেষ ঘুমন্ত চাঁদুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে—

"তোকে আমি শিশুকাল থেকেই এই আপমানের অসম্মানের জগৎ থেকে বাঁচাব। শিশুকাল থেকে এই হিউমিলিয়েশানের মধ্যে বাঁচতে হলে তুই অমানুষ হয়ে যাবি। তোকে জবরদস্ত বাঙালি করে তুলব। দেখি তুই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিস কিনা জীবনে, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, বিধান রায়, সত্যজিৎ রায় এবং অনেকেই যদি ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে না পড়েও বড় বাঙালি হতে পেরে থাকেন তো তুইই বা পারবিনা কেন? তোকে আমি আমার মত এয়ার কন্ডিশনড অফিসের স্যুট পরা ফ্যাকাসে পুতুল করবনা, রক্ত-মাংসর বিবেক সমৃদ্ধ মানুষ করে তুলব। যেমন অনেক মানুষের দরকার, এই মুহূর্তে এই হতভাগ্য রাজ্যে। দেখিস, চাঁদু।

বাবা, দেখিস তুই"

গল্পটির শেষে পুত্রের মধ্যে পিতার প্রত্যয় জাগানোর জন্য পিতার অন্তরে উত্থিত স্বগতোক্তি আসলে তথাকথিত আধুনিকতায় বিপর্যস্ত বাঙালি সত্তার এক অমোঘ ভয়। গল্পের শুরুতে যা ছিল এক শহুরে উচ্চবিত্ত বাঙালির গল্প গল্পের শেষে তা প্রাদেশিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে একই পরিস্থিতির জন্য এক বিশ্বজনীন মাত্রা পেয়ে যায়।

বুদ্ধদেব বসুর "টি টি চিকোরি" আমাদের বাস্তবের কঠোরতা থেকে বাঁচার জন্য কল্প মায়ালোকের জগতে নিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের বাস্তব প্রয়োজন, বেঁচে থাকার রশদ, নির্ধনের প্রতি ধনবান পরিজনের অবজ্ঞা কী নির্মম সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে তার বাস্তব উদাহরণ বোধ হয় আলোচ্য গল্পখানি। গল্পের মুখ্য চরিত্র জগৎ রায় যৌবন বয়সে তিরিশের দশকে ডালটনগঞ্জের লাতেহার, বেতলা, ছিপদোহারের জঙ্গলে বাঁশ আর কাঠের ব্যবসা করতেন। ব্যবসায়িক কৌশলে অপক্ক, রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ এই মানুষটি তাঁর ব্যবসার ব্যর্থ হয়ে চলে আসেন কলকাতায়, তাঁর দাদা ভাইদের যৌথ পরিবারের

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ভাড়া বাড়িতে। রায়পরিবারের ছোটবাবু ছিলেন জগৎ রায়, উপার্জনহীন ও অবিবাহিত।

বাস্তব কলকাতার শহুরে মানুষ যেমন হয় জগৎ রায় ঠিক সেরকমটি নয়। বিষয় ও বৈষয়িক চিন্তার বাইরে ভাই বোনেদের কিশোর-কিশোরী সন্তানদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব কিংবা তাঁকে ঘিরে এই সমস্ত কিশোর-কিশোরীর রাকিবের দুপুরে গল্পের রোমান্টিক জগতে ভ্রমণ তাঁকে পরিচিত করে তোলে 'ছোট কাকা' হিসাবে। কাকাও মামার সংমিশ্রণে একটি সংকর শব্দে পরিচিত জগৎ রায় তখনকার কলকাতার রেডিও-টিভিহীন বালক বালিকাদের মানস পরিভ্রমণ করাণ পালামৌ-এর গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক নির্জন সরোবরে। যার নাম 'টি টি চিকোরী।'

তাঁর গল্পের নায়ক ও তাঁর বন্ধু ঘনুমামা; ঘনুমামা কীভাবে বাঁড়েযাণের জঙ্গল পেরিয়ে সাপ, বাঘ, ভালুকের দুর্ভেদ্য প্রহরা পেরিয়ে টিটিচিকোরীতে পরীদের স্নান দৃশ্য দেখার জন্য দুঃসাহসিক অভিযান করে তা শুনতে শুনতে কখন বড় হয়ে যায়—বোনপো বোন ঝি—টুলু, ডুনা, কাপি, শীলা, তিমির, সুকু, গাগা আর পাপা।

শেষ দু'জন ছাড়া আর সকলেই চল্লিশ বছর বয়সে এসে জীবন জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত। টুলু নামকরা ইঞ্জিনিয়ার, ডুনা বিলিতি কমার্শিয়াল ফার্মে ভাল চাকরি করে, কাপি স্টেটস এর নেভাতে সেটল করেছে, শীলা ইংলণ্ডে থাকে, তার স্বামী নিউক্লিয়ার মিশাইল বানায়। খুকু থাকে বম্বেতে তার বর চ্যাটার্ড একাউনটেন্ট। পাঁচ বছর পরপর কলকাতায় আসে, তার ছেলেরা বাংলা বলতে পারেনা, মারাঠী বলে মারাঠাদের মত।

গল্পের শুরুতে যারা ছিল কিশোর কিশোরী চল্লিশ বছর পেরিয়ে তাদের মন-মানসিকতা শিক্ষা দীক্ষায় অনেক পরিবর্তন হলেও কেবল পাল্টায়না তিনজন ছোটকামা, গাগা ও পাপা। গাগা আসলে কিছুটা জড় মস্তিষ্কের। শরীরের বয়স বাড়লেও চল্লিশ পেরিয়েও তার মনের বয়স সাত আটবছরের শিশুর মত। ছোটকামার গল্প শুনে অন্য সবাই মানুষ হলেও সচলমস্তিষ্কের কারুর হাতে সময় নেই আজ এই উপার্জনহীন নিঃসঙ্গ ছোটকামাকে দেখা ও সাহায্য করার। কেবল পাপা ও গাগা যারা ছোটকামার মতই উপার্জনহীন তারা তিনজনই বন্ধুত্বের সূত্রে আজও পরস্পরের পাশে থাকে। "মনের বয়স হয়নি ছোটকামারও। ব্যবসা ডুবে যাওয়ার তিরিশ দশকের শেষের দিকে সেই যে পালামৌ এর স্বপ্নময় কাব্যিক পরিবেশ ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে, তখন থেকেই ভাগ্যের হাতে মার খেতে খেতে একেবারেই ডানা ভেঙে পড়ে আছেন। এখন সম্পূর্ণই সমাহিত। প্রত্যেক পরাজয়ের মধ্যেও জয়ের মুহূর্ত নিহিত থাকে। আর কিছুই হবার নেই, হবেও না। তবু ও প্রায় বিনা রোজগারেই যে এই নিঠুর শহরে কী করে এত দীর্ঘদিন হাসিমুখে বেঁচে থাকা যায় তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ ছোটকামা। হয়ত পাপা ও এবং গাগাও। টি টি চিকোরী ওদের চোখে স্বপ্নের অঞ্জন দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। নির্লোভ সরল, উচ্চ আশাহীন এক আশ্চর্য জীবন যাপন করে যাচ্ছে তখনও এই তিনজনে মানুষ এই লোভ সর্বস্ব ভণ্ডামির শহরে।" এক

সময় সব ভাইদের প্রয়োজন পরিবর্তনে সবাই বিচ্ছিন্ন হলে ছোটকামাকেও তার আশ্রয়চ্যুত হয়ে সামান্য উপার্জনের জন্য কলকাতা শহরের বাইরে এক বাবুর বাগান বাড়ি দেখার কাজ নিতে হয়। তাঁর এই প্রায় নিঃসঙ্গ জীবনে প্রতি রবিবার কেবল উপার্জনহীন গাগা ও পাপাই আসে।

এভাবে একদিন ছোটকামা তাঁর নির্জন অরণ্যের গল্পের মত নির্জন বাগান বাড়িতে গাগা ও পাপার সামনে পাড়ি দেন জীবন থেকে মৃত্যুর পরপারে। আধুনিক জগতের এত বিত্ত, বাসনা এত ব্যস্ততা, প্রিয় মানুষরা যার প্রয়োজনে অর্থহীন আত্মীয়কে দূরে সরিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনা তাদের সময় কোথায় এমন মানুষদের পাশে থাকার। তাই কল্পনাপ্রবণ মানুষটি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও 'টি টি চিকোরী' বলে বাস্তব জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে কোথায় চলে যান। তাঁর বাস্তব জগতের কোন কিছুর প্রতি কোন প্রত্যাশা ছিলনা, কেবল গাগা ও পাপাকে বলেছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর দাহ যেন 'কোয়েলেড পাড়ের শ্মশানে হয়। কিন্তু অর্থ বিত্তহীন পাপা ও গাগা কলকাতার নোংরা শ্মশানে ছোটকামার দেহ দাহ করে। তাঁর শেষ যাত্রায় ডুনা ছাড়া আর কেউ আসতে পারেনি কারণ কারুর সময় নেই—

'কেউই আসতে পারেনি। কারণ, একজন ভ্যাগাবন্ডের জন্যে নষ্ট করার মত সময় কলকাতায় কারও নেই। সকলেই ব্যস্ত, সাকসেসফুল অনেক রকম কাজ তাদের প্রত্যেকেরই....'

গল্পকার আসলে আর পাঁচজন ব্যস্ত মানুষের মত হলেও ছোটকামার মত এক রোমান্টিক মন নিয়ে এক কল্পবাস্তবের জগতে চাওয়া পাওয়ার বাস্তব থেকে দূরে বসে উপভোগ করেন অন্য এক জগৎকে যেখানে কেবল যথার্থ রসিকই পৌঁছাতে পারে অন্য কেউ নয়।

'ভি সি আর' গল্পটি আট ও নয়ের দশকের শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালির বলা ভাল কলকাতা শহর কেন্দ্রিক চাকুরীজীবী বাঙালি পরিবারের আধুনিক ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের আপ্রাণ চেষ্টা ও তার থেকে উঠে আসা মানসিক দ্বন্দ্বের এক বাস্তব কাহিনি গ্রাম বাংলার একান্নবর্তী পরিবার বিশ শতকের শেশার্ধে জীবন জীবিকা ও আধুনিক জীবনের ভোগবাসনা পূরণের জন্য শহরকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়েছে। এই জীবনে ভোগ্যপণ্য পাওয়ার জন্য মানুষে নানা প্রচেষ্টা, প্রতিবেশির জীবন যাপনের ধরণ দেখে যেনতেন প্রকারে তা নিজের পরিবারে গ্রহণ করার হীন চেষ্টার মধ্যে যে গ্লানি আছে গল্পকার এই গল্পটির মধ্যে সেই বাসনা ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্বগত এক চলমান ছবি এঁকেছেন।

গল্পটির সূচনার রুরু নামক একটি কিশোরের সন্ধান করেছে তার চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত বাবা সৌম্য। উত্তর দিতে এগিয়ে আসে সীমা। ইনি সৌম্যর স্ত্রী ও রুরুর মা, গল্পটির শুরুতেই স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। বোঝা যায়। সৌম্যের মধ্যে আধুনিক জীবনের ভোগবাদ, সবাই যে ভাবে চলছে তাকেও সেভাবেই চলতে হবে না হলে জীবন বৃথা এই ধারণার সঙ্গে তার চিরাচরিত গ্রামীণমূল্যবোধের একটি দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু তার স্ত্রী সীমা এসবের ধার ধারেনা। সে ঠিক এই ধারণার বিপরীত চিন্তা ও প্রতিপালনে

তৎপর। নানা ঘটনার সংঘাতের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালির মূল্যবোধের বিনষ্টির ছবি আঁকতে আঁকতে লেখক একটি ভি. সি. আর বা ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার পাওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে তার ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে দিয়েছেন পাঠককে।

সৌম্যর ধারণা আধুনিক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে কেবল বিত্তবান লোকের সন্তানেরা ভর্তি হয়। যেখানে বিত্তের প্রদর্শন, মেকি ও লোক দেখানো জাঁকজমক পূর্ণ জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠার সংস্কারই কেবল শিশুরা গ্রহণ করতে শেখে। সৌম্যর স্ত্রী সীমা আবার এসবকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে তার সন্তান রুরুকে সেভাবেই মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

রুরুর খোঁজ নিতে গিয়ে সীমার কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন তাঁর পুত্র রুরু সহপাঠী সাঙ্গেনারিয়ার জন্মদিনের পার্টিতে গেছে। ছেলেটির সারনেম সৌম্যর কাছে অপ্রচলিত হওয়ায় তিনি বলেন অদ্ভুত সারনেম তো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সীমা বিরক্তির সঙ্গে বলতে থাকে ব্যাপারটির মধ্যে অদ্ভুতের কী আছে? রুরুদের স্কুল কসমোপলিটন স্কুল তাই বিভিন্ন প্রদেশের নানা পদবীর সহপাঠী রুরুর বন্ধু হওয়াই স্বাভাবিক। বোঝা যায় রুরুর স্কুল তার জীবনযাপনের বোধ, যে ধরণ সে তার স্কুল থেকে শিখছে তা সৌম্যর পছন্দ নয়। তাই স্ত্রী সীমার মুখে রুরুর কসমোপলিটন স্কুলের কথা শুনে সৌম্য বিরক্ত হয়ে বলে—

"এই স্কুলই, ছেলেটার বারোটা বাজাবে। তোমাকে বলেছিলাম। তার উত্তরে সীমা জানায় বাংলা মিডিয়াম স্কুলে এখন কি কেউ সন্তানদের পাড়ায়। তাই তার কাছে স্কুলিংই আসল। বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়া স্বামীকে খোঁচা দিয়ে সে তাই বলে—বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়লে—

"মানুষ না হয়ে তোমার মত বাঁদর হয়েই যাক, তাই-ই তো তুমি চাও" গল্পটির নাম ভি সি আর। আট ও নয়ের দশকে শহুরে বিত্তবান পরিবারে টিভির সঙ্গে জুড়ে যে কোন সময় ভিডিও ক্যাসেট লাগিয়ে যে কোন ছবি দেখা যেতো। বিষয় আসলে এটি নয়। সৌম্য ও সীমার মধ্যে পণ্যটিকে পাওয়ার বাসনা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত তারতম্য যা সেকালের শহুরে মধ্য বা উচ্চবিত্ত পরিবারর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন গল্পকার।"

রুরু তার সহপাঠী বন্ধুদের জীবনযাপন, ভিসি আর, মার্সিডিজ, এয়ারকণ্ডিশান দেখে তার মায়ের কাছে গল্প করে। মাও ভাবে রুরু এই বয়সে কতকিছু জেনেছে। ছেলের মুখে সহপাঠী শঙ্কুর বাবার বিত্তের কথা শুনে অভিভূত হয়ে পড়লে তা তার নিম্নবিত্ত জীবন থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্ত স্বামীর চোখে হ্যাংলামি মনে হয়। সৌম্য যেখানে তার বিনোদন হিসাবে নানা ধরনের বই পড়াকে পছন্দ করে সেখানে সীমার পছন্দ হিন্দি ছায়াছবি 'হাম কিসিসে কম নেহি'। নিজের সন্তান ও স্ত্রীর মধ্যে আধুনিক নাগরিক জীবনের এভাবে বদলে যাওয়ার ছবি দেখে সংবেদনশীল সৌম্য বিভ্রান্ত হয়—

"আজকাল কিছু ভাল লাগেনা ওর। হয় ও নিজে বদলে গেছে, ভীষণভাবে, নয়ত

বদলে গেছে ওর চারপাশের পৃথিবী।"

তবে সৌম্য জানে বদল চলমানতাই জীবন, কিন্তু বদল যদি ভালর দিকে না হয় মূল্যবোধের বিনষ্টির উপর যদি সেই ভালর ভিত্তি হয় তাহলে সে ভাল মূল্যহীন একথা বোঝে সৌম্য। তার মনে হয় পৃথিবীতে মানুষ যে আর সব প্রাণীর থেকে আলাদা তার কারণ মানুষের মধ্যে থাকা শুভাশুভ বোধ। মূল্যবোধ, দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানো, সমাজের কল্যাণে নিজের সামর্থ কে বন্টন করা এসবই তো মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। সৌম্য ভাবে এগুলি যে কারুর মধ্যে নেই এমন নয়—

"কিন্তু সকলেরই ভাবনা, চিন্তা বুদ্ধি, মেধা পরিশ্রম সব কিছুই যেন টাকা আজ টাকা, আরও টাকার দিকে মুখ করে আছে। মানুষ যে মানুষই; সৃষ্টির অন্য সমস্ত জীবের থেকে যে তার অনেকই তফাৎ ছিল; তফাৎ থাকার কথা ছিল এই কথাটাও বোধ হয় মানুষ ভুলে গেছে আজকাল। পুরোপুরি। এক আশ্চর্য সময় এখন।"

এরপর গল্পের মধ্যে আসে সৌম্যর মাসতুতো বোন খুকু ও তার স্বামী বীরেশ। বীরেশ সি এম ডি এর অফিসার। এধরণের অফিসারের যা বেতন তাতে ডাল আলুপোস্ত খেয়ে কোনরকম চলতে পারত কিন্তু তার থেকে অনেক উঁচু জায়গায় থেকেও মূল্যবোধ রক্ষা করতে গিয়ে সৌম্য যা পারেনি তা পেরেছে বলা ভাল বহুগুণ বেশি পেরেছে বীরেশ। "সাত বছরের মধ্যে সল্টলেকে বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে, সুখের বন্যা বইয়ে দিয়েছে একেবারে।" সবসময় অসৎ পথে অর্থ উপার্জনের চিন্তার' অর্ধ নির্মিলিত চোখে মাদকাসক্ত ব্যক্তির তত বুঁদ হয়ে থাকা বীরেশকে তবু সহ্য করতে পারে সৌম্য কিন্তু উঠতি বড়লোক হওয়ার তার মাসতুতো বোন খুকু তার কাছে অসহ্য। কারণ—"হঠাৎ বড়লোকের স্ত্রীরা প্রায়শই অসহ্য হয়ে থাকেন পরিচিতদের চোখে। খুকুও ব্যতিক্রম নয়। এত বেশি কথা বলে। বোকা বোকা। কাঁচাটাকার গন্ধ ছাড়ে ভেঙে যাওয়া হাঁসের ডিমের মত।" মূল্যবোধের বিনষ্টিকে ঘৃণ্যভাবে ব্যবহার করার জন্য যেভাবে ভেঙে যাওয়া হাঁসের ডিমের উৎকট গন্ধের সঙ্গে উপমিত করা হয় সেখানেই ধরা পড়ে গল্পকারের, মূল্যবোধের অভাবে বিভ্রান্ত নাগরিক সভ্যতার প্রতি চরম তাচ্ছিল্য ও গভীর দুঃখবোধ।

একসময় সীমা রুরু খুকু বীরেশ সৌম্যর কাছে উপস্থিত হয়। বীরেশ জানায় তার এক সাপ্লায়ার তাকে খুব কম দামে সনি কোম্পানীর ভি সি আর খুব কম দামে এনে দিয়েছে। বেশ সৌম্য রাজি থাকলে তাকেও সে জলের দরে এনে দিতে পারে। হঠাৎ পাওয়া এই প্রস্তাবে সৌম্য এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললে রুরু বলে —

"ডোন্ট বি সিলী বাবা" সীমা বলে—

"দ্যাখ খুকু। কাকে নিয়ে ঘর করি তাই-ই দ্যাখ। একটা বেরসিক ব্যাকডেটেড মানুষ। আন প্রাকটিক্যাল। কে বোঝাবে একে বল? চান্স ইন আ লাইফটাইম। মাত্র কুড়ি হাজারে হয়ে যাবে। ওয়াইড স্ক্রীনের কালার টিভি প্লাস ভি সি আর। ভাবা যায়?"

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

সৌম্য বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়না। জানে বীরেশের সাপ্লায়ারকে অন্যায় সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার উপহার তার বদান্যতা হয়ে সৌম্যর উপকার হয়ে আসবে; এখানেই সৌম্যর দর্শনের সঙ্গে আধুনিক সময় ও মূল্যবোধহীনতার দ্বন্দ্ব বেঁধেছে।

ধীরে ধীরে ভিসি আর কে কেন্দ্র করে রুরুও সীমার সঙ্গে সৌম্যর দূরত্ব অনেক বেড়েছে। সৌম্য এটি দাম অনেক বলে সীমাকে বোঝালে সে বলেছে, সৌম্য এটিকে দশ হাজারে কিনে রুরুর কোন বড়লোক, মাড়োয়ারী, গুজরাটী কিংবা পাঞ্জাবী সহপাঠীকে বিক্রি করে দিতে পারত। তাতেও দশহাজার টাকা লাভ হত যাতে তারা বেড়াতে যেতে পারত। সীমার মধ্যে এভাবে ভোগবাদের পঙ্কিল আবর্তে হাবুডুবু খাওয়া মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির স্ত্রীকে দেখে হতাশ হয় সৌম্য—মুখে কিছু না বললেও মনে মনে যা ভাবে তার বর্ণনায় লেখক সমস্ত মানুষের মূল্যবোধের জাগরণে বিবেক বোধ সম্পন্ন সৌম্যর চিন্তায় সংযুক্ত হন—

"তার সামনের হৃষ্ট পুষ্ট সুন্দরী যুবতীর মুখে সে গরিব কিন্তু শিক্ষিত পরিবারের ছিপছিপে বুদ্ধিমতী, ন্যায়-অন্যায় বোধ সম্পন্না বেনারসী শাড়ি মোড়া একটি অল্পবয়সী মেয়ের মুখকে খুঁজ ছিল। নিঃশ্বাস ফেলল সৌম্য। হারিয়ে গেছে। সেই মেয়ে সেই মুখ সেই মানুষটি, সেই সময় সবই হারিয়ে গেছে।"

এভাবে বদলে যাওয়া সময় বদলে যাওয়া প্রিয়মানুষ, ভোগ্যপণ্য আরাম বিলাসকেন্দ্রিক জীবন কীভাবে মানুষকে অসৎ পথে তা উপার্জনের নিরন্তর প্রচেষ্টায় তাড়িত করছে তার একটি ছোট্ট উদাহরণ সৌম্য, সীমা ও রুরুর পরিবার। আসলে তা সমকালীন সমাজ বাস্তবতার ছবি। গল্পের সূত্র ধরে উঠে আসে নারী পুরুষের শারীরিক চাহিদা মেটানোর নামে বিবাহ বহির্ভূত উদ্দাম যৌনতার কথা, ঘুষ খাওয়ার মধ্যে ন্যায়হীনতার কোন ব্যাপার নেই; যে কোন মূল্যে যা চাই তা পাওয়ার; পাওয়ার চেষ্টা করাই সফল জীবনের মূল কথা। সৌম্য যা না চাইলেও রুরুকে এই শিক্ষাই দিতে চায় সীমা। একসময় স্ত্রীর জেদের কাছে নতি স্বীকার করে সৌম্য সীমাকে ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙিয়ে ভিসিআর কেনা জরুরী কিনা ভাবতে বললে সীমা তা সম্মতির প্রাথমিক স্তর ভেবে—

"ও-ও. ও. ও. তুমি কী ভালো ও-ও-ও.ও বলে দৌড়ে এসে সৌম্যর বুকে পড়ে চুমু খেলো"—এখানে সৌম্যর অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তিটি অসাধারণ—

"সৌম্যর গা সিরসির করে উঠল। গল্প উপন্যাসে বেশ্যাদের যে বর্ণনা পড়েছে তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে সীমার ব্যবহার। নিজের সন্তানের জননীকে বেশ্যা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল খুবই। তবুও না ভেবে পারল না"। সৌম্য ভি সি আর কিনতে রাজি হয়েছে ভেবে সীমা এবার তাকে তা কেনার যে উপায় বাতলে দেয় তা মানুষের নৈতিক ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। গল্পকার সীমা ও সৌম্যর জীবন দর্শনে এই পর্যায়ে এসে সংঘাত যে গড়ে

দেন তা সচেতন পাঠককে বিষয়টি ভাবতে ও মূল্যবোধের অভাব জনিত যন্ত্রণায় কাতর করবে।

সীমা সৌম্যকে বলে—

"আচ্ছা তুমি ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙবে কেন?

ভি সি আর কিনতে?

না ভাঙলে কোথা থেকে পাব কুড়ি হাজার?

তোমার চাকরিতে কোন উপরি নেই মানে ঘুষ? এতবড় চাকরি তোমার?"

বিরক্ত বিভ্রান্ত সৌম্য সীমার প্রকৃত ইচ্ছা জানতে চাইলে সীমা যেভাবে ঘুষ নেওয়ার সপক্ষে নানা যুক্তিজাল রচনা করে তা আকাট্য হলেও আধুনিক নাগরিক জীবনের ভোগ সুখ প্রবণতায় মানুষ কত নীচে নামতে পারে সেই নির্মম বাস্তবকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন লেখক।

"ঘুষ না নিয়ে সৎ থেকে তুমি ভালমানুষ সাজছ কার কাছে? সরকার সাহেব, সুরজিৎ সিং ঘুষ নেননা? সুরজিৎ সিংয়ের ড্রয়িংরুমে যে ইরানীয়ান কার্পেটটি পাতা থাকে তারই যা দাম, সেই টাকা তার সারা জীবনের চাকরীর সঞ্চয় যোগ করলেও হয়না; চোর উপরওয়ালা, চোর নীচুওয়ালা, চোর আত্মীয়স্বজন, চোর প্রতিবেশী তাদের মধ্যে সৎ থেকে কার হাত থেকে সততার পুরস্কার নিতে তাও তুমি? তোমার কি চোখ নেই? সৌম্য? তোমাকে ভালবাসি বলেই বলছিনা, উ্য আর লিভিং ইন্ ফুলস্ প্যারাডাইস। একটু ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, বেড়ানো টেড়ানো, ভি সি আর এর জন্যে না হয় ঘুষ খেলেই তুমি। অন্য কিছু তো করছনা, চ্যাটার্জীর মত বৌকে তো আর পাঠাচ্ছনা সুরজিৎ সিং আর সেনগুপ্তর জন্যে কোম্পানীর গেস্ট হাউসে, চাকরি উন্নতির জন্য। আরও টাকা রোজগারের জন্যে, তবে? এতে তোমার লাগল কেন?"

সীমা জানায় সৌম্যর সততা মূল্যবোধ আসলে এক ধরণের চালাকি। যা কেবল তাদের আধুনিক সুখস্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত করে। তাই দ্বিতীয় পর্বের শেষে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে সীমা—

"তোমার ও সব চালাকি ছাড়ো। ভি সি আর আমাদের চাই-ই। ওরা সকলে কিনতে পারে। তুমি পারোনা? আমাদের স্ট্যাটাস, সম্মান কি কিছুই নেই।" সৌম্য এক সময় বুঝতে পারে আধুনিক সময়, সমাজ তার পরিবার আত্মীয়স্বজন সবাই তার কাছে কেবল অর্থের প্রত্যাশা করে, যদিও কারুর প্রয়োজন একান্তই জীবনের প্রয়োজনে আবার কারুর অতিরিক্ত প্রয়োজনে।

গল্পের শেষে এক অসাধারণ ব্যঞ্জনায় লেখক আধুনিক ভোগবাদ সর্বস্ব জীবনের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে ক্লান্ত বিনিদ্র সৌম্যর মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের জয় ঘোষণা করেন। যদিও সেপথ খুব কঠিন কঠোর নির্মম। সেই রাত্রে স্বামীর সঙ্গে তীব্র মনোমালিন্যের পরও

সীমা নাক ডেকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলে বাইরে প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যে ছটপট করতে থাকা সৌম্যকে বাড়ির পর্দার খসখসে আওয়াজ ভুতুড়ে ভাবে যেন বলতে থাকে।

" মানুষ হোস্, মানুষ হোস্, মানুষ হোস্। আর সীমার নাক ডাকছে ভিস্ ভিস্ ভিস্স....ভি. স্স্ভি....আর....র.....র.....র ভিস্স ভিস্স্ ভিস্সি আ.....র"।

বাস্তবের এক সামরিক ভোগ্যপণ্যকে কেন্দ্র করে আধুনিক মানুষের অন্তর্দর্শন অধরা থেকে যেতো যদি ক্লাইম্যাক্সে ভি সি আর এর ব্যঞ্জনা প্রকাশিত না হত।

"জে' ফর জেলাসী' গল্পটি আধুনিক সময়, নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, অসংখ্য অসম্ভবের মধ্যে মধ্যে নিজের স্বপ্ন পুরণের সাফল্য থেকে উঠে আসা নীতি-অনীতির দ্বন্দ্বে জীবনকে দেখার বলা ভাল বিশ্লেষণ করার এক মরমী আখ্যান। বম্বে এয়ারপোর্টে কলকাতার বিমান ধরার জন্য উপস্থিত দুই বাল্য প্রতিবেশি ও সহপাঠী বন্ধু গৌতম রায় ও স্নিগ্ধর দেখা হয়। তাদের কথোপকথনের সূত্র ধরে পাঠকের গল্পে অনুপ্রেবেশ ঘটে। দুই বন্ধুর অবস্থাও অবস্থান ও সামর্থ্য থেকে জীবনকে যেভাবে দেখার সম্ভাবনা সাধারণত পাঠক কিংবা সমাজ আশা করে এখানে ঘটেছে ঠিক তার উল্টো। গৌতম আবাল্য প্রতিভাবান, পড়া কিংবা খেলাধূলা সব ক্ষেত্রেই সে সপ্রতিভ ছিল। তার মূল্য হিসাবে যে এখন বড় কর্পোরেট অফিসের বেশি মাইনের চাকুরে। অফিসের পয়সায় তার এগজিকিউটিভ ক্লাসে ভ্রমণ; ওবেরয়, তাজের মত তারকা খচিত হোটেলে রাত্রিযাপন।' কিন্তু এসবের বাইরে আছে তার এক কল্পনার জগৎ, যেখানে সে বইপড়ে, কিংবা ছেলেবেলার সেইসব সংস্কৃতি, তুমুল বৃষ্টির মধ্যে খালিপায়ে ফুটবল খেলা; ঘুড়ি ওড়ানো, রাসবিহারী, এ্যাভেনিউর, রথের মেলা দেখা, পাঁপরভাজা, আর তালপাতার ভেঁপু কেনার জন্যে পদ্মপুকুর যাওয়া; নির্জন ফাঁকা রাস্তায় ট্রামলাইনের পাশের ইলেকট্রিক পোস্বে কান লাগিয়ে দূরাগত ট্রাম যাওয়াতের শব্দ শোনা। বিনা পয়সার এই আনন্দ সে এখন তার বৈভবপূর্ণ জীবনে পায়না। সে আরও কষ্টপায় নাগরিক স্বাচ্ছন্দের হরেক রকম সুবিধা পেলেও তার মেয়ে মিষ্টির জীবন ও তাদের ছোটবেলার এই নির্ভেজাল আনন্দ থেকে বঞ্চিত। নিজের মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে এক রোমান্টিক দার্শনিকতা অন্তর্বেদনায় আক্রান্ত হয় গৌতম। ভাবে—

"তখন বিনি পয়সাতে অনেক আনন্দ পাওয়া যেতো। অনেক সহজ সুন্দর অবসরের ছিল জীবন। মিষ্টিদের এত বিষয়ের জ্ঞান, এই দ্রুতগতির জেটেপ্লেন এইসব ফাইভস্টার তাজমেহাল বা ওবেরায় শেরাটন না না করলেও জীবন তখন পরিপূর্ণ ছিল কানায়-কানায়। আনন্দর, আনাভাবের জীবন। আজ এতকিছু হয়েও লাভ বোধ হয়নি কিছুই; মানুষের আসলে কী চাইবার ছিলো, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য তাইই তো ভুলে গেছে আজকের মানুষ।"

এয়ারপোর্টের এত ব্যস্ততার মধ্যে বসে গৌতমের মনে হঠাৎ হঠাৎ এই ভাবনার উদয় হয়নি; হওয়ার কারণ তার দীর্ঘদিনের পুরানো সহপাঠী হঠাৎ বড়লোক হওয়া স্নিগ্ধর সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা। অর্থের গৌরবে তার সদম্ভ প্রকাশ অপ্রতিভ করছিল গৌতমকে। গল্পের

সূচনায় বর্ণনা এরকম—স্নিগ্ধর। শুনতে পেল "...পেছন থেকে কে যেন ডাকলো নাম ধরে ওকে দাঁড়িয়ে পড়ে, পেছনে তাকাতেই দেখল স্নিগ্ধ। ছাইরঙের দামী সাফারি স্যুটের বুক পকেট থেকে এগজিক্যুটিভ ক্লাসের চওড়া লাল আর সাদা রঙা বোডিং পাস উঁচিয়ে রয়েছে সাম্প্রতিক বড়লোক স্নিগ্ধর উঁচু হয়ে থাকা দন্তের মতো।"

'জে ফর জেলাসী' কেবল দুই বন্ধুর হঠাৎ দেখা, তাদের গল্পগুজব অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের চাওয়া, না পাওয়া বা অনেক অনেক পাওয়ার একটি নির্ভেজাল কাহিনি নয়। উভয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখক সাম্প্রতিক কাল, ভোগ্যপণ্য বিলাস ব্যাসনকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির মানুষের মেকি জীবনাচার ও দাম্ভিক পদক্ষেপ কে পাঠকের ভাবনার উপর বিচারের দায়িত্ব দিয়ে ভালমন্দের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন। আবার অপরদিকে অনেক কিছু পেয়েও অনেকের মধ্যে আধুনিকতার উপভোগ্য আচারে যে ক্লান্তি আছে; ঝলমলে আলোর উল্টো দিকে মূল্যবোধহীনতার যে কলুষ অন্ধকার আছে তাকে ও বেআব্রু করেদিয়েছেন।

স্নিগ্ধ ও গৌতম দুজনে সহপাঠী হলেও গৌতম যেখানে, বিদ্যা বুদ্ধির সম্মিলনে বিত্তবান উঁচুতলার মানুষের জীবন উপভোগ করে স্নিগ্ধ সেরকম নয়। বিদ্যা বুদ্ধির অপ্রাচুর্য থাকলেও স্নিগ্ধ—জীবনের প্রায় মধ্য বয়সে ব্যবসায়িক সাফল্যে হঠাৎ বড় লোক হওয়া মানুষদের একজনে। চাকুরী সূত্রে গৌতমকেও বিমানের এগাজিক্যুটিভ ক্লাসে ভ্রমণ করতে হয়। পাঁচতারা হোটেলের বিলাস বহুল কক্ষে রাত্রিযাপন তার নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে উঠলেও সে কোথায় যেন এতকিছুর মধ্যেও ক্লান্তি অনুভব করে। তার মনে হয়—

"চাকরি করতে হয় বলেই গৌতম চাকরি করে। চাকরি করলে ট্রাভেল করতে হয় বলেই ট্রাভেল করে। প্রতিটি ফ্লাইটেই উড়ন্ত প্লেনের মধ্যে এই ব্যস্ততা, এই হোটেল সংক্রান্ত কথাবার্তা চেনাও অচেনা মানুষের মুখে শুনে শুনে ও সত্যিই ক্লান্ত। মালিকের পয়সায় ঘোরে বলেই যাওয়া আসা করেও। তাজমেহাল হোটেলে থাকে। নিজের খরচে এসি চেয়ারকার বা রিজার্ভড সেকেণ্ড ক্লাসেই আসতো। কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে, নয়তো খুঁজে পেতে কোন সস্তার হোটেলেই উঠতো হোত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই আসাটা হতো অনেকেই আনন্দর। ট্রেনের জানালার পাশে বসে মিষ্টি তার অফুরন্ত প্রশ্নে তার বাবাকে ভরিয়ে তুলতো। বলতো এটা কি বাবা? এটা কি বাবা? আর পিয়া বুদ্ধিমতী হাসি হাসি মুখ নিয়ে অপলকে তাকিয়ে বাবা আর মেয়ের কথোপকথন শুনতো।"

গৌতমের মত এবং আধুনিক সময়ে বিরল হলেও লেখক তার অন্তর্দর্শনে পাঠকের চোখের সামনে কখন যেন নিজেই গৌতমে পরিণত হন। জীবনে সাফল্য বলতে আমরা যা কিছু বুঝি, শিক্ষা, বিত্ত অর্থই সুন্দর পরিবার সন্তান সবকিছু পাওয়ার পাওয়ার পরেও জীবনানন্দের বোধ কবিতার নায়ক যেমন অস্তিবাদের চিন্তায় বিষন্নতা অনুভব করে; তেমনি অনেককিছু পেয়েও গৌতম যেন জীবনের পথে এক নিরাসক্ত পথিক। স্নিগ্ধ যে যে বড়লোক

প্রচণ্ড আরাম বিলাস ব্যাসন যে তার প্রত্যহিক দিন যাপনের সঙ্গী তা তাকে প্রকাশ করতে হয় গৌতমের কাছে বা পাশে বসা কোন সহযাত্রীর কাছে। গৌতমের বর্তমান অবস্থা জানার নামে নিজের বাড়ি, গাড়ি দামি ব্রান্ডের সিগারেট সেবন, স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে ছুটির দিনে টলীগঞ্জ ক্লাবে বিনোদন এরকম নানা কথা অনর্গল বলে চলে স্নিগ্ধ। গৌতম কানে শুনলেও স্নিগ্ধর পাশে বসে মনের মধ্যে মন লুকিয়ে ভাবছিল—

" এই কথোপকথন আসলে দুজেনের জন্য আদৌ নয়। স্নিগ্ধ নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলে যাচ্ছিল আসলে। নিজেকে অ্যামপ্লিফাই করছিলো। গৌতম উপলক্ষ্যমাত্র। গৌতমের সঙ্গে দেখা না হলে ও অন্য কাউকে ধরেই এ কথাগুলো বলতো।"

ধীরে ধীরে গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে বোঝা যায় বিত্ত বিলাস সম্পদ গৌতমের কিছু কম নেই স্নিগ্ধর থেকে। কিন্তু তার মনে একটি প্রচ্ছন্ন অহং কাজ করে চলে নিরন্তর। হঠাৎ বড়লোক হওয়া মানে ক্লাবে যাওয়া; মদখাওয়া সপ্তাহ শেষে পার্টিতে হৈ হুল্লোড়, দামি সিগারেট সেমন, প্লেনের এগাজিকিউটিভ ক্লাসে ভ্রমণ এরকম নানা কিছু কিংবা এক বিনয় থেকে অন্যকোনো বিষয়ের দিকে অবিরাম ছুটে চলাই জীবন নয়। এরকমভাবে চলা মানুষ কিংবা বন্ধু বা গৌতমের পরিচিত যেই হোকনা কেন তাদের পাশে বসে ভ্রমণ কিংবা গল্প করার সুযোগ এলেও সে মিলন একান্ত আটপৌরে থেকে যায়। তাই স্নিগ্ধ গৌতমকে তার কার্ড চাইলে যে তাকে নিয়ে আসতে ভুলে যাওয়ার নাম করে দেয়না। অফিসের নাম ও ফোন নম্বর চাইলে তার ভুল তথ্য দেয়। কারণ গৌতম নিজেকে এদের থেকে আলাদাভাবে। গৌতম স্কুলজীবনে ছিল স্কুলের গৌরব আর স্কুলফাইনালে শেষের দিক থেকে তৃতীয় হওয়া স্নিগ্ধ ছিল স্কুলের কলঙ্ক। তারপর অনেকদিন পর বম্বে এবারপোর্টে গৌতমের সঙ্গে দেখা হয় স্নিগ্ধর তারপর এখানে ওখানে। সে দেখেছে রোটারীক্লাবের মিটিংয়ে গৌতম দেখেছে স্নিগ্ধ হয়েছে চেম্বার অফ কমার্সের সাবকমিটির চেম্বার। গৌতম ভাবে—

"স্নিগ্ধ হয়তো কোনদিন চেম্বারের প্রেসিডেন্টও হয়ে যাবে। তাতে গৌতমের যাবে আসবেনা কিছুমাত্র। ও চিরদিনই নিজেকে এই স্নিগ্ধদের থেকে অন্যক্লাসের বলে জেনে এসেছে। স্নিগ্ধ আজ যত বড় ব্যবসাই করুক সিভাস-রিগ্যালাই খাক রোজ অথবা স্ট্যাণ্ডার্ড-টু-থাউজ্যান্ড বুকই করুক অথবা একজিক্যুটিভ ক্লাসে ট্রাভেল করুক গৌতমের ক্লাসে ও কোনদিনই উঠতে পারবেনা।"

পাঠক আসলে এত সময় এক প্রচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে কাটাচ্ছিল। গৌতমের শিক্ষা, রুচি অভিপ্রায় নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে যত জানছিল ততই তার মধ্যে গৌতম সম্পর্কে অন্য এক ভাললাগা, আদর্শ কিংবা অনাদর্শ উভয়কে চিনে কীভাবে পথ হাঁঠতে হয় সেইরকম বিমিশ্র অনুভূতি গড়ে উঠছিল। কিন্তু গল্পলেখক তাঁর এক গভীর সহানুভূতিতে স্নিগ্ধর বিত্তবান জীবনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক নিঃশব্দ মানুষের বেদনার জগৎকে উন্মোচিত করেন। নিরন্তর কথা বলে চলা স্নিগ্ধ এক সময় নিজের সিটে বসতে যায়। জে

ক্লাসের সিটে বসে চলমান বাস্তব ও নাগরিক মানুষের মনস্তত্ত্বের জটিল ভাবনাগুলোকে ছাড়াতে ছাড়াতে "স্নিগ্ধ ভাবছিলো, জীবনের পথে কে কোথা থেকে রওয়ানা হয়েছিল সেটা কোন ব্যাপারই নয়, কে কোথায় পৌঁছলো সেটাই আসল। পৌঁছতে পারাটাই....। জীবনে স্বচ্ছল হওয়ার স্বপ্ন দেখে সব মানুষই। কিন্তু স্বচ্ছল হতে পারার মধ্যে যেমন আনন্দ আছে এক ধরণের, তেমন দুঃখ ও আছে গভীর। বড় একা লাগে, পরিত্যক্ত স্বচ্ছল মানুষ মাত্রই তা জানে। সকলকে জড়িয়ে ধরে থাকতে চাইলেও হাত ছাড়িয়ে চলে যায় সকলেই। যাদের জড়াতে চায়, তারা কাছে থাকেনা, যারা থাকে তাদের চায়নাও। তারা সব ধান্দাবাজ, নিজেদের স্বার্থেই ভিড় করে শুধু।"

স্নিগ্ধর জীবনে বিত্ত ও জৌলুষ থাকলেও তার মধ্যে যে অন্তর্দহন আছে তাতে তার নিজেকে লোক দেখানো বড়লোক পানা করার পরেও ক্ষমা করে দেওয়া যায়। ক্লাইম্যাক্সে এসে গৌতমকে গল্পের আদর্শবান চরিত্র হিসাবে যে ভাবে জ্বলজ্বল করতো দেখা যাচ্ছিল, গল্পকার স্নিগ্ধর দার্শনিক চিন্তার মধ্য দিয়ে তা নিরসন করেন।

"স্নিগ্ধ বড় করে আরও একটা হুইস্কী ঢাললো। খুবই দুঃখ হলো ওর। নিজের জন্যে, গৌতমের ও জন্যে। কিছু মানুষ নিজেদের গড়ে তোলা একটা শক্ত খোলার মধ্যেই জীবনটা কাটিয়ে যায়। নিজেদের মতো আর 'কেউই' নয় এই ভেবে। খোলাটা ভেঙে বাইরে বেরোতে পারলে তারা জানতে পারতো জীবনে সত্যিই অনেক আনন্দ আছে। এত কষ্টের মধ্যেও। নিজের জন্যও কষ্ট হল স্নিগ্ধার। ভাবলো, কিছু পেলে কিছু ছাড়তে হয়ই। জীবনের খেলাতে এই রকমই নিয়ম। ফুলফুটলে কাঁটার ঘোর থাকেই।

কিছুই করার নেই।

আসলে কী ভালো, আর কী ভালো নয়, তা যে মানুষ হিসাবে, জীবন হিসাবে আপেক্ষিক গল্পকার তার দুই চরিত্রের নাগরিক মননের আড়ালে বিচারকের দৃষ্টিতে উপস্থিত থেকে সুনিপুণভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন। প্রতিভাবান, বিত্তবান মানুষের তথাকথিত বিত্তহীন কমপ্রতিভার মানুষের প্রতি যে অবজ্ঞা তাও আসলে এক প্রকার হীনমন্যতা। আবার উল্টোদিকের মানুষের তথাকথিত উপরতলার সব মানুষকে খারাপ ভাবা এক প্রকার জেলাসী। গল্পের শেষে সেই ব্যঞ্জনাই প্রমাণ করে স্নিগ্ধর স্বগতোক্তির মধ্যদিয়ে—

"স্নিগ্ধ ভাবছিল, একজিক্যুটিভ ক্লাসকে, জে' ক্লাস বলে কেন কে জানে? 'জে' ফর জেলাসী। তাই জন্যেই কি?

'লেখক হওয়া' গল্পটি চলমান বাস্তবের সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালির মানস পরিবর্তনের দ্বন্দ্বে এক সহানুভূতিশীল লেখকের প্রতক্ষ্য জীবনদর্শনের ফলিত কাহিনি। সত্য ঘটনার আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিষ্ঠুরতা লেককের কলমে যে করুণরস সৃষ্টি করে তা ঘটনাচক্রে কোন পাঠকের জীবনের সঙ্গে মিলে যেতে পারে কারণ সাহিত্যতো বাস্তবের দর্পণ। গল্পের রস অভিব্যক্তি যদি পাঠকের হৃদয় পরিবর্তনে সহায়ক হয় তবে তা লেখকের

অবশ্যই বড় প্রাপ্তি কিন্তু তা ব্যক্তি আক্রমণ হিসাবে বিবেচনা করে পাঠক যদি লেখককে প্রতি আক্রমণে প্রয়াসী হন তবে তা যে পাঠকের জয় নয় বরং লেখক বাস্তবের ঘটনা প্রকাশে সফল তা অতিসহজেই বোঝা যায়।

গল্পটির মূল ঘটনা একজন লেখক আশিস কর ও তাঁর দুই-সহপাঠী বন্ধু সুগত চ্যাটার্জী ও শ্যামল সরকারকে নিয়ে। পড়াশোনার পর পর ব্যক্তিগত জীবনে আশিস একজন সাহিত্যিক, সুগত ও শ্যামল চাকুরীজীবী। সকলের বাসস্থান পরস্পরের থেকে দূরবর্তী হলেও মানসিক দূরত্বে সবাই ছিল অভিন্ন হৃদয়। একদিন শ্যামলের কাছ থেকে আশিস জানতে পারে সুগত শ্বশুর মশায়ের বদান্যতায় জীবনে সাফল্যের অনেক উপরে উঠে বিত্ত ও বিলাস ব্যাসনে অভ্যস্ত হলেও তাকে তিল তিল করে মানুষ করে তোলা তার নিজের বৃদ্ধ বাবা মা শারীরিক ও আর্থিক অসহায়তায় বিপন্ন।

বন্ধু মুখে শোনা ঘটনাটির গল্পরূপ দিয়ে দিল্লির একটি পত্রিকায় প্রকাশ করলে তা সুগতর হাতে পড়ে। পিতা মাতার অসহায় তার গল্প পড়ে বিবেকযন্ত্রণায় কাতর না হয়ে সুগত ও তার স্ত্রী লিলি যিনিও লেখক আশিস করের বন্ধু উভয়েই লেখকের সঙ্গে বন্ধুদের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। লেখক আসলে কোন ব্যক্তি আক্রমণ নয় বরং নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেন—

"সুগতকে ছোট করতে আমি চাইনি। সত্যিই নয়। সুগতকে নয় বরং আমাকে শ্যামলকে, আমাদের প্রজন্মের সকলকে ছোট করতে চেয়েছিলাম। আমাদের এই প্রজন্মের স্বার্থপরতা সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলাম, যাতে এই লেখাটি পড়ে একটু ভাবেন এই প্রজন্মের সবাই, তাইই চেয়েছিলাম যদি মাসীমা মেসোমশাইদের বয়সী কেউ এ লেখাটি পড়েন তাহলেও তারা জানতে পারেন যে তাদের ছেলের বয়সী কেউ তাদের অসহায়তাকে মন দিয়ে ছুঁতে পেরেছে সহানুভূতির হাত বুলিয়েছে তাঁদের গায়ে। কিছু করতে পারুক আর নাইই পারুক।"

একজন ব্যক্তি ও তার হৃদয়ে বাসকরা গল্পকার দুজন ভিন্ন ব্যক্তি। গল্পকারের গল্পে কারুর ব্যক্তিজীবনের অভিঘাত ধরা পড়লে তার জন্য লেখককে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক নয় বরং জীবনের প্রতি কোন ধনাত্মক বার্তা থাকলে তাকে শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে আত্মরূপ সংশোধিত হলে তাতে ব্যক্তিও সমাজ উভয়েই উপকৃত হবে। বুদ্ধদেব গুহ কেবল নিরাসক্ত জীবন দৃষ্টি দিয়ে নয়। বরং জীবনের নানা আসক্তি কীভাবে আধুনিক বাঙালির মানস পরিবর্তনে অনুঘটকের কাজ করছে তা নানাভাবে নানা স্বাদের মোড়কে উপস্থিত করেছেন তাঁর নানা প্রকার ছোটগল্পে।

‘গামহারডুংরী’ : বুদ্ধদেব গুহ’র পরিবেশচিন্তার একটি ‘ইকোক্রিটিক্যাল’ পাঠ

অরিত্রী দে

ক. পেশায় সফল চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বুদ্ধদেব গুহ’র জন্ম ২৯ জুন ১৯৩৬ এ কলকাতায়। যুক্ত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের আয়কর বিভাগ বোর্ড, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অডিশন বোর্ড ও কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সঙ্গেও। তাঁকে একাধারে সংগীত শিল্পী, অঙ্কণ শিল্পী, শিকারী ও লেখক হিসেবে পাই। বাংলা সাহিত্যে মূলতঃ ঋজুদার গোয়েন্দা ও শিকারমূলক দাদাগিরির জন্য বুদ্ধদেব গুহ সমধিক পরিচিত হলেও রচনা করেছেন ‘বাবলি’, ‘মাধুকরী’, ‘কোজাগর’, ‘কোয়েলের কাছে’, ‘চাপরাশ’, ‘একটু উষ্ণতার জন্য’, ‘মহুল সুখার চিঠি’, ‘সবিনয় নিবেদন’, ‘মাণ্ডুর রূপমতী’, ‘পামরি’র মত উপন্যাসগুলি। ২০০৪ এর দিকে একে একে যখন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘ঘুণপোকা’, ‘দূরবীন’, ‘মানবজমিন’, সমরেশ মজুমদারের ‘উত্তরাধিকার’, ‘কালবেলা’, ‘কালপুরুষ’, রমাপদ চৌধুরির ‘বনপলাশীর পদাবলী’ প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন তারই মাঝে বেরোয় ‘মাধুকরী’। ‘আরণ্যকে’র পরে এই সেই লেখা যেখানে প্রকৃতির বর্ণনা, মধ্যপ্রদেশের পাহাড় বন জঙ্গল চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বললে অত্যুক্তি হয়না যে বুদ্ধদেব গুহ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, উভয়ের লেখাতেই ‘প্রকৃতি’ অত্যন্ত জরুরি হয়ে থেকেছে। মনে রাখতে হবে—প্রকৃতিপ্রেম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রের অনিবার্য শর্ত; তাঁর গল্প-উপন্যাসে চরিত্রের সুখ-দুঃখের ভারবাহী হয়েছে প্রকৃতি, কমিয়েছে জীবনযন্ত্রণা, অরণ্যে লিপ্ত মানুষকে আর অরণ্যসম্বন্ধীয় যাপনকে ভালোবাসিয়েছে। কিন্তু ‘আরণ্যকে’ প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত নাড়া বইহার, লবটুলিয়া জঙ্গল কি ছিল আর কি হয়েছের আক্ষেপে পর্যবসিত হয়েছে। মানবসভ্যতায় অরণ্যের গুরুত্ব ও প্রতিবেশ রক্ষায় অরণ্যের ভূমিকা, নগরায়নের চাপে সে ভূমিকা কিভাবে খর্ব হয়ে সভ্যতার সঙ্কট ঘটাচ্ছে তার সচেতন নির্মাণ নেই।

‘মাধুকরী’র কেন্দ্রীয় বিষয়ও কখনোই প্রকৃতি না, কয়েকজন চরিত্রের দৃষ্টিতে জীবন অথবা সম্পর্ক। বুদ্ধদেব গুহ প্রকৃতিকে দেখেছিলেন রোমান্টিক দৃষ্টিতে, তিনি প্রকৃতি ও নারীকে এক করে দেখেছেন, যেন তার সঙ্গে প্রেমে মজেছেন। তাঁর মতে একজন নারীর সঙ্গে বিছানায় শুলে তাঁকে যেভাবে জানা যায়, তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন সেভাবে। বিশেষত জঙ্গুলে প্রকৃতির (Wild Nature) মাঝে তিনি কখনও বন্য নায়িকা ও শহুরে নায়কের প্রেমকাহিনী স্থাপন করেছেন, কখনও বা অরণ্য সংরক্ষণের তাগিদে অরণ্যলগ্ন গোষ্ঠীর জীবনযাপন, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির মধ্যে পাঠকদের এনে ফেলেছেন। ‘গামহারডুংরী’

উপন্যাসে (২০০৮) লেখক যদিও প্রথমেই বলে দেন যে তমাল আর তার দল ছোটনাগপুরের রুক্ষ, ন্যাড়া, জীববৈচিত্র্য হারানো একটি বড় টিলাকে কেন্দ্র করে সবুজায়নের স্বপ্নে মাতে, কারণ তারা পৃথিবীকে সবুজায়নের মাধ্যমে প্রাণিত করতে চায়। তবু আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে একটি বিশেষ এলাকার ভূমিপুত্রদের নিজস্ব পরিবেশ ও সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই এর কেন্দ্রীয় বিষয়। দশ বছর বয়স থেকে বুদ্ধদেব গুহ জঙ্গলে যাওয়ার কাহিনী নিয়ে লিখতেন রবিবাসরীয়তে, যা ‘জঙ্গলমহল’ নামে প্রকাশিত হয়। ‘জঙ্গলের জার্নাল’ গ্রন্থে আসামের কাজিরাঙ্গা, বিহারের পালামৌ, ওড়িশার জঙ্গলের কথা পাই। কাজিরাঙ্গায় ঘুরতে গিয়ে লেখক বলেছিলেন—সবকিছুই যে বাংলার বাইরে ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, তার জন্য আমরাই দায়ী। এর ফলটা বোঝা যাবে আরো পনেরো-কুড়ি বছর পর। যেন সেই সংস্কৃতি মরে না যাওয়ার দায় গামহারডুংরীর তমালদের হাতে বর্তেছে। বুদ্ধদেব গুহ শিকারী এবং জঙ্গলের শত্রুর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে বলেছেন যে শিকার মানেই খারাপ নয়, আগে শিকারের সঙ্গে পৌরুষের সম্পর্ক ছিল, ব্যবসায়ীসুলভ লোভ বা ধূর্ততার না। কিন্তু শিকারীরা প্রাণী ও জঙ্গলকে ভালোবাসতে না পারলে তার সঙ্গে লোভের সম্পর্ক জড়িয়ে অরণ্য, প্রকৃতি ও তার সন্তানের ক্ষতি হয়। এই লোভ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ভারসাম্যকে প্রতিদিন নষ্ট করছে। বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথেই ফসিল জ্বালানি অপচয়ের যুগ শুরু হয়ে যায়, যথেচ্ছভাবে ভোগের পরিমাণ বাড়ে, বৃদ্ধি পায় মাথাপিছু ‘কার্বন ফুটপ্রিন্টের’ হার। যেমন—যৌবন ধরে রাখতে গন্ডারের খড়্গ চূর্ণ ব্যবহার করে অনেকে, তারা যেকোনো আর্থিক মূল্যে বাজার থেকে সেটা কিনতে প্রস্তুত, এই লোভই চোরা শিকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়ে তোলে। গন্ডার সহ বিভিন্ন প্রাণীদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে। কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্যে দুর্ধর্ষ চোরা শিকারীদের মোকাবিলা করতে ফরেস্ট রেঞ্জারদের জন্য নতুন ব্যবস্থা করার কথা বলেন। তাঁর মতে চোরা শিকারী সমস্যা এদেশে এতই বেড়ে গেছে যে তাদের মোকাবিলা করতে ফিল্ড ট্রেকিং এর কোর্স করা দরকার। তিনি পাহাড়, জঙ্গল আর জঙ্গললগ্ন আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কথা বারবার মনে করিয়েছেন। যখনই জঙ্গলের কাছাকাছি গেছেন, সেখানকার জীবন থেকে জেনারেটর প্রভৃতি যন্ত্রচালিত অত্যাধুনিক সভ্যতার লক্ষণগুলিকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। মনে করেছেন যে এই সচেতনতা ও অপরাধবোধটুকু বাঁচিয়ে রাখা আবশ্যক। জোছনারাতে হরিণের পায়ের খচমচ শব্দ, পিউ কাহার ডাক, প্রকৃতির নিজস্ব গন্ধ-বর্ণ-শব্দ লেখকের কাছে পাঁচতারা হোটেলের তুলনায় অনেক প্রিয় বলে মনে হত। পরিযায়ী পাখিদের ঠিক একই সময়ে একই জায়গায় আসার প্রসঙ্গে গ্রীক মিথলজির দেবী ‘নোমাসীন’ এর কথা মনে করেছেন, যেন স্মৃতিশক্তির সেই দেবী পথ দেখিয়ে আনেন পাখিদের। বারবার মনে করিয়েছেন—প্রকৃতি সকলের জন্যই

সংস্থান রাখে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলি, জীব বৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষায় পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন—'বুনো কুকুররা প্রকৃতির বন্য প্রাণীদের ভারসাম্য বজায় রাখে। জলের মধ্যে বোরাস ও চিতল মাছ যেমন অন্য মাছ ধরে খায়, তেমন তারা মাছেদের সবসময় দৌড় করিয়েও বেড়ায়। তাদের ওপরও ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব যেমন বর্তেছে, বুনো কুকুরদের উপরও তাইই।'[১]

খ. সবুজায়ন ব্রতকথা :

পরিবেশ চেতনার স্বরূপ সন্ধানসূত্রে পাশ্চাত্য ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখব—১৮২৮ সালে থমাস কার্লাইল 'এনভায়রনমেন্ট' শব্দটি প্রয়োগ করেন, ১৮৬৬ সালে আর্নেস্ট হেকেল 'ইকোলজি'র ধারণা প্রচার করেন এবং ১৯৩৫ সালে আর্থার ট্যান্সলে 'ইকোসিস্টেমে'র কথা বলেন। এরপর ১৯৯৬ সাল নাগাদ গবেষক চেরিল গ্লটফেল্টি 'ইকোক্রিটিসিজম'কে একাডেমিক ডিসকোর্সে জনপ্রিয় করে তোলেন। 'ইকোক্রিটিসিজম' বলতে পরিবেশ আর সাহিত্যের অন্তরঙ্গ পাঠে অভিনব সমালোচনা পদ্ধতিকে বুঝি। 'গামহারডুংরী' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ২০০৮ সাল। মোহিত রায়ের মত পরিবেশকর্মী ও প্রাবন্ধিকেরা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে পরিবেশ বিপন্নতার কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী উক্ত সময় থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালপর্ব প্রসঙ্গে 'Apocalyptic age' বা ধ্বংসের যুগ—এই বিশেষ পরিভাষাটি প্রয়োগ করেছেন। ক্রমে পরিবেশ সঙ্কট একবিংশ শতকীয় নিজস্ব সমস্যা হয়ে ওঠে, ফলে এই আখ্যানে অবধারিত ভাবেই ধরা পড়েছে তার স্পষ্ট ছবি। ছোটনাগপুরের ডুংরী পাহাড়ের মাথায় একসময়ে থাকা প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা গামহার গাছের অবস্থান থেকেই নামকরণ 'গামহারডুংরী'। গামহার গাছের অভাবে সে নামকরণ মাহাত্ম্য নষ্ট হতে বসেছে। কৃষ্ণনগরের নেদের পাড়ার গাছগাছালি ঘেরা একটি বাড়িতে থাকার দরুণ তমাল গাছকে ভালোবাসতে শেখে। প্রতিবেশ রক্ষার দায় সম্ভবত সে তখনই নিয়ে নিয়েছিল যখন নদী থেকে বালি তোলার জন্য অসাধু চট্টখন্ডীকে সে গুলি করে মারে। ঋদ্ধি, রেবতী, রুরু, বিশাল কাকা, বুধাই, মুনরী, পাখি, গৈরিকা আর সুনয়নীকে নিয়ে তমাল যে দলটি গঠন করে, তার সবুজায়ন ব্রত অরণ্য সপ্তাহ কিংবা সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের চেয়ে আলাদা। বলে দেওয়া হয়েছে যে ফুলের বাগান করতে তারা আসেনি, অর্থাৎ বনবিলাসিতা তাদের উদ্দেশ্য নয়। বিভিন্ন সংগঠন বা রাজনৈতিক দল পরিচালিত অরণ্য সপ্তাহে, সামাজিক বনসৃজনে সরবরাহ করা হয় ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি জাতীয় গাছ। মাঠকে মাঠ, এমনকি ধান জমিতে কোনোরকমে মাটি টেনে এনে ঢিবির মত করে গাছগুলি পোঁতা হয়। বলাই বাহুল্য এই গাছগুলো ফুল, ফল, গাছ, পাতা, ছায়ায় একটি সমগ্র বাস্তুতন্ত্র (whole ecosystem) নির্মাণ করে না; তাতে পাখিরা এসে বসেনা, পথিক আশ্রয় নেয় না, স্থানীয়দের ব্যবহারিক চাহিদা মেটেনা। এজাতীয় গাছ মাটি থেকে

দ্রুত অতিরিক্ত খাদ্য শোষণ করে, মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তুলনায় সামান্যই। কিন্তু তমালরা রোপণ করে বৃক্ষ জাতীয় গাছ, যেমন—পেয়ারা, শ্বেত শিমুল, কুল, কয়েতবেল, চালতা, আতা, নারকেল, হিজল, যজ্ঞিডুমুর, তেঁতুল, অশোক, অর্জুন, পলাশ, কৃষ্ণচূড়, আমলকী, হর্তুকি ইত্যাদি। রেবতী উদ্ভিদতত্ত্বের ছাত্র, পাখির মত কেউ কেউ মুন্ডাদের সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহী, কেউবা শহুরে মানুষের কাছে গাছের ভূমিকা স্পষ্ট করতে চায়। সব মিলিয়ে তাদের প্রচেষ্টাটা কখনোই জনপ্রিয়তার খাতিরে নয়, তা কোনো প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তও নয়, দেশ ও পরিবেশের সংকটকালে সংরক্ষণের সংকল্প নিয়ে নিজেদের ধন-প্রাণ সমর্পণ করেছে তারা। দেশের মঙ্গল এই অর্থে যে ইউরোসেন্টিক আধুনিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিকতার উল্টোদিকে নিজের পরিবেশগত ঐতিহ্য, মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী স্তর গঠিত হয়। মুন্ডারি মিথ অনুযায়ী দেবতা হারাম পৃথিবী বানিয়েছিলেন মানুষের জন্য। তিনি মানুষকে চাষবাস শিখিয়েছিলেন, লাঙল-মাছ-পুকুর-গাছ সবই সবই দিয়েছিলেন ব্যবহারের জন্য। কিন্তু অসুররূপী মানুষ তথা হাসুররা তাঁর নির্দেশ না মেনে লৌহ-আকর গলিয়ে লোহা তৈরি করে পৃথিবীকে দূষিত করেছে, দিনরাত হাপর চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বানিয়েছে, প্রকৌশলের চরম উন্নতি ঘটাতে গিয়ে মেরেছে মাছ, শুকিয়েছে জল। এই চরম লোভ, দুর্বিনয়, বিশৃঙ্খলায় হারাম ব্রহ্মান্ডের চালক ও পালকের ভূমিকা ছেড়ে দিয়ে নিছক সূর্য দেবতা হয়ে গেছেন।[২] অথচ পৃথিবীকে তিনি মানুষের জন্যই বানিয়েছিলেন, মানুষ যাতে ব্যবহার করে নিজের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে পারে। আমাদের মনে পড়বে জেমস লাভলকের গেইয়াতত্ত্বের কথা। গ্রীক মিথলজি অনুযায়ী 'গেইয়া' (Gaia) হলেন পৃথিবীর ঈশ্বরী। তিনি পৃথিবীতে জীবনধারণের অনুকূল জলবায়ু আর রসায়ন গঠন করেন। কিন্তু মুন্ডাদের মাত্রাহীন লোভ, কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের বিধ্বংসী কার্যকলাপে পৃথিবী মাতার প্রাকৃতিক ধনসম্বলের পারস্পরিক ঐক্যটি বিপর্যস্ত। ফলে এমন এক কালে এসে উপনীত হওয়া গেছে যখন প্রকৃতি তার সমগ্রতা (Totality) হারিয়ে প্রক্রিয়াকরণ (Processed) যোগ্য হয়ে উঠেছে, প্রচলিত হয়েছে 'প্রাকৃতিক উপাদান' শব্দবন্ধটি। তমালরা সেই প্রাকৃতিক খন্ডায়নকে রুখতে চায়। যেসকল গোষ্ঠী প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, তাদের কাছ থেকে প্রকৃতি মাতার বিশাল ভান্ডার ব্যবহার করার অধিকার কেড়ে নেওয়া, তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ছিনিয়ে নেওয়া তো শিড়দাঁড়া ভেঙে দেওয়ারই সমান। সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে শাসক আর তার রাষ্ট্রযন্ত্র ভূমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দখল নিয়েছে এই অজুহাতে যে প্রান্তিক অরণ্যগোষ্ঠীগুলির হাতে প্রকৃতি ক্রমাগত ধ্বংস হচ্ছে, বরং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত একচেটিয়া অধিকার থাকলে সেটা কমবে। ১৯৬৮ সালে গ্যারেট হার্ডিন 'Tragedy of commons' এ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জন-অধিকারের ঋণাত্মক দিকগুলি ও একচেটিয়া ক্ষমতাকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন।[৩]

এটি আসলে আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শোষণের পরিকল্পিত রূপ। রাষ্ট্র নিজের স্বার্থে প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তর ঘটিয়েছে ক্রমাগত, অথচ স্বীকৃত হয়না প্রকৃতিলগ্ন মানুষদের আর্থ-সামাজিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দাবি। একদল সুশিক্ষিত যুবক-যুবতী মুন্ডাদের সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবহারের বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল পদ্ধতি শেখাতে বদ্ধপরিকর। একসময়ে ছোটনাগপুরের টাঁড় ও ডুংরীতে ঘন জঙ্গল ছিল, আষাঢ়- শ্রাবণ- ভাদ্রের বৃষ্টিতে জঙ্গল আরো ঘন হত। স্বভাবতই খরগোশ, ময়ূর, তিতির, বটের, হরিণ, শুয়োর, লেপার্ড সহ জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র এর হৃদপিন্ডে রক্তসঞ্চালন অব্যাহত রাখত। এখন প্রায় তার কিছুই নেই। দলের প্রধান সকলের তমাল দা ডুংরীর হারানো পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে ফতোয়া জারি করে যে একটাও গাছ বা চারা কাটলে ডুংরীবাসীকে দৃষ্টান্তযোগ্য শাস্তি পেতে হবে। গাছকাটা যে মানুষ মারার মতই অপরাধ এ কথা বুঝিয়ে দেয় তমাল এই অঞ্চলের মুন্ডাদের। গাছ না বাঁচলে, বন না বাঁচলে যে তারা নিজেরাও বাঁচবেনা-এই কথা প্রতি গ্রামে মিটিং করে, হাটে গিয়ে প্রচারও করেছে। বেঁচেবর্তে থাকা গাছগুলো কাটা নিয়ে করাতকলের মালিক, মুনাফাবাজ ঠিকাদার আর অসৎ পুলিশদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভে অর্থাৎ 'উলগুলানে' পিছপা হয়নি তার দল। তাদের উদ্যোগে ডুংরীর উপরে লাগানো গাছগুলো পাঁচ-সাত বছর ধরে প্রতি বর্ষাতে জল পেতে পেতে বেড়েছে, ফলে ঘন জঙ্গল, পাখপাখালি আর খরগোশ-বেজি-সাপ-ইঁদুর-ব্যাঙ সহ সুস্থ স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র এবং তার অন্তর্গত খাদ্যচক্র নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। কার্যত তারা প্রাকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ 'বায়ো-রিজিয়ান' (Bioregion) গামহারডুংরীর ভূগোল, জলবায়ু, পশু ও উদ্ভিদজীবন দ্বারা অধিবাসীদের এমনভাবে প্রভাবিত করতে চেয়েছে যাতে প্রতিবেশের কোনো ক্ষতি না করেই তার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় বাস করতে পারার পাঠ দান সম্ভব হয়। এমন একটি সমাজের মডেল নিয়ে ভাবা আছে যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিকতার সম্পর্ককে স্বীকার করা হবে এবং প্রকৃতি, মানুষের অভিভাবকত্বে থাকবে না। তমাল, ঋদ্ধিদের এইসমস্ত কার্যকলাপ মুন্ডাদের স্বনির্ভর জনগোষ্ঠীগত পরিচয়কেই ফিরিয়ে দিতে আগ্রহী। 'রিঙ্গি চিঙ্গি চিকনপিন্ডা' তথা ঝকঝকে তকতকে পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেয় তমাল, আবার তাজনা নদী পারে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় প্রাইমারি স্কুল তৈরি করে যথার্থ অর্থেই গোষ্ঠীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এমনকি তারা নিজেরাও সহনশীল (Sustainable) জীবনযাপন অনুশীলন করেছে। শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলেও বাজার চলতি তথাকথিত পিউরিফায়েড জল আর খাবারের মোহে পড়েনি, বরং গামহারডুংরীর অতিসাধারণ চা, তেলেভাজা আর হ্যান্ড পাম্পে পলিথিন ট্যাঙ্কে জল তুলে তাতে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দিয়ে খায়। প্রত্যেকে নিজের নিজের বাজার নিজেরা করে, হঠাৎ অতিথি চলে এলে তার রসদও স্ব-স্ব উদ্যোগে জোগানোর অভ্যেস করে। কোনোরকম জেনারেটর, টিভির বদলে ট্রানজিস্টর রেডিও রাখা

হয়েছে অবসর বিনোদনের জন্য। নয়ের দশকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (১৯৯৫), যোগাযোগ ব্যবস্থার আশাতীত জোয়ারে এমনটা ভাবা হচ্ছিল যে পশ্চিমা শিল্পের বাজার ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বায়নের অভিঘাতের মূলে। এটাকে দেখা হচ্ছিল বিশ্বব্যাপী সমসংস্কৃতির বিন্যাস হিসেবে, সংস্কৃতিগুলির প্রথাগত বৈচিত্র্যের বদলে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যাচ্ছিল। ঋদ্ধি 'মাল্টিন্যাশানাল' মুখী সংস্কৃতির চর্চাকে নাকোচ করে দেয় এই কথায়—'এইসব ঝিংচ্যাক ব্যান্ডই বাংলা ভাষাটাকে গলা টিপে মারছে। বাংলা ভাষার এমনিতেই ভীষণই বিপদ, তার অস্তিত্বের সংকট এতখানি গভীর আগে কখনওই হয়নি।'[৪]

গ. নাম-মঙ্গল :

উপন্যাসে একাধিকবার ঝাড়খন্ডী আন্দোলন, বিরশা মুন্ডার বিদ্রোহের কথা এসেছে। বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ১৮৯৯-১৯০০ সালে রাঁচির দক্ষিণাঞ্চলে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মুন্ডা-সংস্কৃতির রাজ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ হয়েছিল। উপন্যাসের ঘটনাস্থল ঝাড়খন্ডের ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকা, যেখানে অনুচ্চ টিলাজাতীয় পাহাড়গুলি 'ডুংরী' নামে পরিচিত। এখন 'ঝাড়খন্ড' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে নজর দিলে দেখব-এর ভৌগোলিক ও সমাজ-সংস্কৃতিগত দুটি অর্থ রয়েছে, প্রথমতঃ ঝারি বা জঙ্গলে পরিপূর্ণ অঞ্চল, আর ঝাড়খন্ডী অর্থে এই জঙ্গলের সহাবস্থানে প্রকৃতির সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতায় জীবন কাটায় যারা। দ্বিতীয়তঃ জাহের/জাহিরা (সাঁওতালী/মুন্ডারী) স্থলে খঁড/খন্ড (যে রূপ আর্য স্বস্তিকা চিহ্ন / কেটে পূজার্চনাকারী জাতির বসবাস অঞ্চলকেই বলা হয় ঝাড়খন্ড। সেক্ষেত্রে ঝাড়খন্ডী অর্থে সাঁওতাল, মুন্ডা, খেড়িয়া, ভূমিজ, খেরওয়াড়, এবং মোহাউলি (অস্ট্রিক) ও ওঁরাও (দ্রাবিড়)। এরা ভৌগোলিক ঐ এলাকায় সুপ্রাচীনকাল থেকে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার যাপন অব্যাহত রেখেছে। ফলে তারা ঐতিহাসিকভাবেই এখানকার আদি বাসিন্দা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ঝাড়খন্ডী।[৫] পরবর্তী কালে এই জাতিগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্য যেসব জনগোষ্ঠীর আগমন হয় তাদের গান্ধীজী 'হরিজন' নামে পরিচিতি দেন। সাংবিধানিকভাবে এদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, বরং তার বদলে এদেরকে হিন্দুকরণ বা খ্রিষ্ট ধর্মের ছত্রছায়ায় আনার একটা সাংগঠনিক প্রচেষ্টা বরাবর চালানো হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষত কংগ্রেস 'গণ হিন্দু ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলন' শুরু করেছিল ১৯২০ এর পর থেকে। তাতে কার্যত অনেকেই নিজেদের মূল পরিচয় (ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উভয়তই) থেকে দূরে সরে যায়, হিন্দু-ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কিংবা অন্যান্য মূল ধারার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য (Hegimony) থেকে নিজেদের 'কালচার' কে রক্ষা করতে পেরেছিল হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র গোষ্ঠী, যেমন কুর্মিরা।[৬] গামহারডুংরীতে সেই 'আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতা' (internal colonialism) কে ধরতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন মুন্ডাদের একাংশের সংস্কৃতি রক্ষার্থে আপোষহীন মনোভাব,

বাকিদের পুঁজিবাদী উন্নয়নমুখী পরিবর্তন ও পরিবেশকেন্দ্রিক রাজনীতি। তিনি দেখাতে চান — ভূমি ও সংস্কৃতির উপর রাজনৈতিক, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আসলে আদিবাসী অরণ্যচারীদের পরিবেশ ছিনিয়ে নিয়ে তাদের পরমুখাপেক্ষী আর খোঁড়া করে দেওয়ার নামান্তর। একসময়ে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি স্বীকৃত ছিল 'সংস্কৃতি' হিসেবে। বিশ শতকে বহুজাতিক ফার্ম প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৪ এর ব্রেটন উড সম্মেলন, ১৯৪৭ এর গ্যাট চুক্তি (GATT) বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্য কাঠামোয় পরিবর্তন আনল। এরপর থেকে উৎপাদন হয়ে ওঠে মুনাফামুখী আর উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থমূল্যে ক্রয় করার সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষমতাকে বোঝালো, এমনকি ভোগ্যপণ্য উৎপাদন উন্নয়নের একটি প্রধান মাত্রা রূপে নির্ণীত হল। সঙ্গে বড় বড় বাঁধ, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইস্পাত কারখানা নির্মাণ স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নতুন উন্নয়ন মডেলে গৃহীত হল। কিন্তু বাড়তে থাকল পরিবেশ-উদ্বাস্তু সমস্যা। সাঁওতাল ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি ভারতের সবথেকে বেশি প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ অঞ্চল। ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের 50% কয়লা, 100% কপার, ও 40% বক্সাইট পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম সহ বর্তমান ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যার সুন্দরগড়, কেওনঝোড়, ময়ূরভঞ্জ, সম্বলপুর, মধ্যপ্রদেশের সরগুজা, রাইগড় ও অন্যান্য আদিবাসীদের ধাত্রী ভূমিতে। এছাড়াও হীরা, ইউরেনিয়াম সহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ উৎপাদনেও এই অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ আইন প্রণয়ন করে একদিকে ক্ষমতাধর শাসকগোষ্ঠী প্রাকৃতিক পরিবেশের ধনসম্বলকে (কৃষিজ সম্পদ, জৈব সার, খনিজ সমৃদ্ধ মাটি, গাছ) কামধেনুর মত ব্যবহার করে বড়ো বড়ো জলাধার, কারখানা, কয়লা খনি, তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে মুনাফা লাভ করতে থাকল। আর অন্যদিকে প্রকৃতি থেকে এভাবে সম্পদ নিয়ে শিল্প নির্মাণে গ্রাম আর শহর, প্রকৃতি আর সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক আবর্তন বা বিপাক চক্রটি (Socio-ecological metabolism) ভেঙে পড়ল। প্রকৃতির সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতায় যাদের জীবন কাটত তারা তাদের অখন্ড প্রকৃতির কোল হারিয়ে দেউলিয়া হল অথচ উন্নয়নের সুফল জুটল না। প্রকৃতিনির্ভর জীবিকার আকাল তো হল বটেই, উপরন্তু চরাচরের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যে দৈনন্দিন চাহিদাগুলি মিটত, সেগুলি বাজার থেকে অর্থমূল্যে কিনতে হল। যেমন উপন্যাসে বিশালকাকা জানায়, 'ডোম্বারিবুড়ু পাহাড়ের অধিবাসীরা তাদের জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত ফুল, পাতা, ফলে কেবল খিদেই মেটায়না, সেগুলি থেকে তৈরি করে প্রসাধন, সঞ্চয় করে রাখে ভবিষ্যতের জন্য। মহুয়ায় তৈরি মদ উৎসব পার্বণে ছাড়াও শুকিয়ে, সেঁকে, সেদ্ধ করে খাওয়া যায়, শালগাছের ফল সেদ্ধ করে 'Staple food' ('Staple food' is a food that is eaten routinely and in such quantities that it constitutes a dominants portion of a standard died for a given person,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

suppling a large fraction of energy needs and generaly forming a significant proportion of the intake of other nutrients as well. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এই ধরনের খাদ্যের উপস্থিতি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, খনিজ এবং ভিটামিন সহ একাধিক 'মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট' সরবরাহ করে। ফলে ব্যক্তির শক্তি ও পুষ্টির চাহিদার একটি বড় অংশ পূরিত হয়। সাধারণ উদাহরণ গুলির মধ্যে কন্দ এবং শিকড়, শস্য, লেগুম ও বীজ জাতীয় খাদ্যগুলি এর অন্তর্ভুক্ত।) হিসেবে সারা বছরের জন্য জমিয়ে রাখা যায়। পরিবেশ ধ্বংসের কারণে সেই ব্যবস্থা বিপন্ন হয়েছে, মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে।' গামহারডুংরীর মুন্ডাদের প্রধান সিরকা মুন্ডা তাই যথার্থই চিন্তা করেছে—এলাকার ছেলেমেয়েরা বেঁচে থাকার প্রাথমিক চাহিদাটুকু মেটাতে বড় বড় শহরের কারখানার তেল-কালিমাখা মজুর হয়ে যাবে, টাকা রোজগার করবে অথচ তাতে তাদের দু'বেলা গম বা বাজরার রুটি-তরকারি টুকুও কেনা হবেনা। এভাবে প্রয়োজনীয় কাঁচা টাকা পেতে বিক্রি করতে হবে নিজের গ্রাম, স্বাতন্ত্র্য; মুন্ডা সংস্কৃতি বলতে থাকবে না কিছুই।

ঘ. গামহারডুংরীর পরিবেশগত বিপন্নতা ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট :

উৎকৃষ্ট মানের কাঠের নেশায় গামহারডুংরীর ঐতিহ্যময় গামহার গাছ কাটে যোগীন্দর সিং এর মত করাতকলের মালিকেরা। গাড়িকাদুরাংবুরু পাহাড়ে কোনো হনুমান আর অবশিষ্ট নেই জঙ্গলের অভাবে। একসময়ে ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকেন্দ্রিক গ্রাম্য জীবিকাগুলিরও বৈচিত্র্য খেয়াল করা যেত। সেই গাছোয়ালের সনাতন জীবিকাও বিপর্যস্ত। তাজনা নদীতে স্নান সেরে অশ্বত্থ গাছের কোটরে কিচি-গাড়াং দেবতার পুজো দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে মুন্ডাদের মধ্যে। তবে কতদিন তাজনা নদীর জল টলটলে থাকবে, সেটা ভাবনার। নদীর সঙ্কটের রূপটি ফুটে ওঠে বিশাল কাকার কাছে পাওয়া এই তথ্যে- বাড়ি বানাতে দরকারি অপরিমেয় বালি তাজনার বুক থেকে তোলা হয়, বয়ে আনা পাথরকে ডিনামাইট দিয়ে ভাঙা হয়। তবু নদীটি একটা সময় পর্যন্ত নিজের ক্ষতিপূরণে সক্ষম ছিল, এখন সেটাও নিঃশেষিত। ঠিকাদারের লোকেরা টিলার কালো-ধূসর-সাদাটে-ফিকে হলদেটে পাথরের স্তূপ ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে গাঁইতিতে কেটে কেটে গাড়ি করে চালান দেয় রাঁচি আর চক্রধরপুরে। আবার মালভূমির অসমান জমিতে বড় বড় পাথরগুলোকেও ব্লাস্টিং করে টুকরোয় ভেঙে নিয়ে জমি সমান করতে থাকে, ভূ-প্রকৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মুছে যাওয়ার উদ্যোগ গৃহীত হয় এভাবে। টাটা আর রাঁচী থেকে আসা হাইওয়েতে, টেবো ঘাট থেকে চক্রধরপুর পর্যন্ত, বন্দগাঁওতে, সুকানবুড়ু, মাহাড়াওড়া পাহাড়ে যে নিশ্চিহ্ন জঙ্গল ছিল তা বর্তমানে উধাও। গাছ না থাকলে ভৌমজলস্তরের স্বাভাবিক উচ্চতাও হ্রাস পায়, গ্রামকে গ্রাম কুয়োর জল প্রায় ফুরোতে থাকে, বৃষ্টিও তৈরি হয়না। ফলে কৃষিব্যবস্থা

মৃত, আবার কৃষি বলতে কৃষিজ ফসল ছাড়াও সহযোগী জীবিকাগুলিকেও বোঝায়। কৃষির বিপন্নতায় গোটা গ্রামের অর্থনৈতিক প্রসার স্তব্ধ হয়ে যায়। ধুঁকতে থাকে মায়না, সুগা, সাল্লু-মায়না, রিচ্চি, ঢোঁয়সা, তোয়াও পাখিরা। যেন পুরোনো পৃথিবী একেবারেই উলঙ্গ হতে বসেছে। লেখক জানান- ঠিকাদার ছাড়াও স্থানীয় মানুষেরাও বন-বিনাশে কোনো না কোনোভাবে সামিল হয়েছিল। সিরিকা মুন্ডাও বলে- শহরের লেখাপড়া শেখা মানুষদের ধূর্তামি আর লোভের রঙ লেগে মুন্ডা গ্রামের সাধারণ মানুষদের অতি সাধারণ প্রকৃতিলগ্ন জীবন পাল্টে গেছে। ঠিকাদাররা সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাঁচী-সিংভূমের জঙ্গল তো শেষ করেছিলই। আবার গ্রামের পুরনো আম-জাম-কাঁঠাল গাছ পেতে গরিব মানুষগুলোর অবস্থা আরো খারাপ হওয়ার জন্য দিন গুনত। গ্রামবাসীর কারোর মেয়ের বিয়ে বা অন্য কোনো উপলক্ষে টাকা লাগবে বুঝলে সুযোগ বুঝে এমন দর হাঁকত যে দরিদ্র গ্রামবাসীর মাথা ঘুরে যেত। ফলে যে গাছ, বৃহদর্থে বললে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তাদের নিত্যকার পারস্পরিকতায় জীবন অতিবাহিত হয়, তাকে হঠাৎই ব্যবহারিক মূল্যের বাইরে বাণিজ্যিক বা অর্থগত মূল্যে বিচার করা শুরু হয়।[৭] আদতে সেটা ক্ষণিকের সুখ বশে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা ছাড়া আর কিছুই না। টাংলাটোরির মংলুর মতে- শহরের বাবুদের মতো মনে "সব চাই" এর লোভ জাগাটাই কাল। তাই চাটান সোনা ধাতুতে সমৃদ্ধ মাটির খোঁজ দিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কথা বললেও সিরিকা মুন্ডার সেটা পছন্দ হয়নি। তিনি স্পষ্টতই বুঝেছিলেন যে মৃত্তিকা মায়ের ওপর ধর্ষণ চালানো হবে এই লোভে, তৈরি হবে আগ্রাসন আর প্রতিযোগিতা। মুন্ডা সংস্কৃতিতে প্রাচীন ও মূল্যবান কিছু বিশ্বাস আছে যে প্রতিটি গাছ, নদী, পাহাড়ের জন্য দায়িত্বে একজন করে শক্তিশালী আত্মা (Spirit) থাকে। গাছ কাটা, নদীতে বাঁধ দেওয়া, খনি খুড়তে প্রথমে এদের সন্তুষ্ট করার দায় ছিল মুন্ডাদের। মুনরী জানায় নবান্নের সময়ে খুটকুট্টি ভূতের পুজো করা হয়।[৮] গ্রামে কোনো গবাদি পশু হারালে মূয়া ভূতে ধরে- এমনটাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বন টাঁড় অর্থাৎ ফাঁকা হওয়ায় গাই"ও হারায় না, মূয়া ভূতকেও কেউ স্মরণ করেনা।[৯] গাছ ও পাথরের অস্তিত্ব লোপ পেতে বসায় চান্ডি-চুরিণ ভূত কোথায় থাকে বলা মুশকিল হয়ে যায়। নদী ও তালাও (ছোট জলাশয় যেমন পুকুর, দীঘি) এর 'নাগে-বোঙা' ভূতও প্রায় উধাও।[১০] খাদ্যের অভাবে গভীর জঙ্গল থেকে লোকালয়ে বেরিয়ে আসা হাতির দলকে দেখে ডুইক্যার মনে হয়- নিজেদের লোভ বা 'খুম্বুরি-জুম্বুরি'র পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে বুড়ুবোঙ্গা, ইকির-বোগঙা, চান্ডি-চুরিণ, মূয়া, জলের ভূতের পুজো দিতে হবে। আসলে খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে আমাদের চরাচর, ঠিক যেভাবে ইসাবেলা বুঝেছিলেন-গামহারডুংরীতে টাওয়ার বসে একদিন প্রয়োজন সিদ্ধির তুলনায় ক্ষতিই করবে বেশি।

ঙ. উপন্যাসটিতে সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে দেখলে দেখব খুব সুস্পষ্ট দুটি গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে,

যারা ছোটনাগপুরাকে আর তার পরিবেশকে বাচিয়ে রাখতে চাইছে, অপর দল পরিবেশ-প্রকৃতিকে অর্থমূল্যে বেঁচতে চেয়েছে। বিশাল কাকার চরিত্রটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কেননা তাঁর কাছেই পাই ইকোলজির বিজ্ঞানসম্মত পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ, প্রকৃতিকে অমান্য করার ভয়ানক পরিণতির সংবাদ। 'ইকো ট্যুরিজম' শব্দবন্ধটি প্রসঙ্গে পরিবেশগত তত্ত্বের পাশাপাশি আলাদা আলাদাভাবে 'OIKOS' আর 'OLOGY' এর মানে বুঝিয়েছেন- 'বাস্তু' ও 'অধ্যয়ন', হেকেল কথিত সংজ্ঞাটিও দেন-'The investigation of the total relations of the animal in its organic and inorganic environment'[১১]

অর্থাৎ পরিবেশ বলতে যদি বোঝায় ভৌত উপাদানের সমন্বয়গত পরিস্থিতি, যা কোনো জীব বা প্রজাতির প্রাণধারণ ও বিকাশকে প্রভাবিত করে, তাহলে 'ইকোলজি' হল সেই পরিবেশ-প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক। অনেকগুলো ইকোসিস্টেম নিয়ে গঠিত হয় ইকোলজি। ইকোসিস্টেম হল একটি সমন্বিত অবস্থা, যেখানে পরিবেশের জীবজ-অজীবজ বিষয়গুলি কার্য্যকরী সম্পর্কে যুক্ত থাকে, আর এই সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই ভারসাম্যমূলক অবস্থান তৈরি করে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনে, বিশ্বায়নের অভিঘাতে গৃহীত পরিবেশনীতি ও উন্নয়ননীতি কতটা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক—তার সমালোচনা প্রতিনিয়ত জিইয়ে রেখেছেন আলাপ আলোচনায়।

চাটান চরিত্রটির প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে ফরাসী সাহিত্যিক জেন জিয়োনোর (Jean Giono) 'দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিস' রচনাটির কথা। এটি দুই বিশ্বযুদ্ধের নিরর্থকতাকে উপেক্ষা করে নিঃশব্দে বিজন খরাতপ্ত এলাকায় বীজ বুনে অরণ্য তৈরি করার আখ্যান। যখন গামহারডুংরী একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে, সকলে গ্রাম ছেড়ে একে একে চলে যাচ্ছে তখন একমাত্র চাটান সযত্নে তাজনা নদীর দুপাশে গাছের বীজ পোঁতে ভবিষ্যতের অরণ্য আকাঙ্ক্ষায়। সে যেন বৃক্ষমানব যাদব পায়ে, গর্ত করে গাছ-লতা-পাতার বীজ পুঁতে যায় বর্ষায় তা থেকে নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে বলে। আগে আমাদের দিদিমা, ঠাকুমা'রা অভাবের দিনে প্রায়ই জলাজঙ্গল থেকে কিংবা তাদের অভিজ্ঞতায় থাকা বিভিন্ন স্থান থেকে শাকপাতা তুলে গোটা পরিবারের খিদে মেটাত; এমনকি রক্তহীনতা, মেয়েলি প্রচুর অসুখের সহজ চিকিৎসা কৌশল তাদের জানা ছিল। চাটান সেই বিকল্প চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষা তার অভিজ্ঞতায় ধারণ করে পরিবেশজ্ঞানের দৌলতে। পেট খারাপ হলে আম বা পসরা বা শিমুলগাছের ছিলকার রস, বদহজমে কালমেঘের রস, জ্বরে গোলমরিচ আর রসুন, মাথা ব্যথায় বাঁশপাতা-বয়েরের পাতা-পেয়ারাপাতা-গোড়বাজ ঘাসের নিদান সে জানে।[১২]

চাটানের স্ত্রী এবং অন্যান্য অনেকেই এই কাজের কোনো অর্থ খুঁজে পায়না, কারণ পরিবর্তিত উন্নয়ন ভাবনায় এরকম কাজের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই। এই প্রেক্ষিতে

চাটান আর উসকির কথোপকথন পর্বটি একবার দেখে নিতে পারি—

"গাছের বীজ পুঁতে এলাম তাজনার দু'পাশে।
টাকা পেয়েছ কিছু?
যে কাজে 'টাকা নেই', তা বুঝি কাজ নয়?
না। কাজ নয়।"[১৩]

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এহেন চাটান সোনা মেশানো মৃত্তিকার খোঁজ দিয়ে স্ত্রীর কাছে নিজের 'মরদপনার' পরিচয় দিতে চেয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয়, সে কিন্তু এর উৎস বলে দেয়নি কাউকে। দূরদৃষ্টিতে সেও বুঝেছিল এর ফলাফল।

মূলত: পরিবেশচেতনা এই উপন্যাসের সিংহভাগ দখল করে থাকলেও সঙ্গে রয়েছে তমাল আর তার বিশালকাকার জীবনচিত্র, বিশালকাকা ও প্রেমিকা লুথেরান মিশনের সিস্টার ইসাবেলার সম্পর্কের টানাপোড়েন। এই প্রসঙ্গেও লেখক নদী ও নারীকে মিলিয়েছেন। 'গামহারডুংরী' উপন্যাসটির আরো অনেক প্রকারের পাঠ নির্মাণ হতে পারে, বর্তমান নিবন্ধটি তার বিশেষ 'শেড'টিকে ফোকাস করেছে মাত্র।

তথ্যসূত্র :

১। বুদ্ধদেব গুহ, জঙ্গলের জার্নাল, কলকাতা, দে'জ, পৃ. ৭২।
২। বুদ্ধদেব গুহ, গামহারডুংরী, কলকাতা, দে'জ, পৃ. ১১৮।
৩। অচিন চক্রবর্তী, উন্নয়নের ভালোমন্দ, কলকাতা, অবভাস, পৃ.৭২।
৪। বুদ্ধদেব গুহ, গামহারডুংরী, কলকাতা, দে'জ, পৃ. ৫৪।
৫। Mathew Areeparampil– 'Historical basis of the name of Jharkhand'– The Jharkhand Movement– Copenhagen– 2003– 349
৬। A. K Roy– 'Jharkhand- Internal Colonialism'– The Jharkhand Movement– Copenhagen– 2003– 82
৭। ঐ, পৃ. ৮।
৮। ঐ, পৃ. ৪৬।
৯। ঐ, পৃ ৬৭।
১০। ঐ, পৃ. ৮৯।
১১। ঐ, পৃ. ৬৫।
১২। ঐ, পৃ. ১৩০।
১৩। ঐ, পৃ. ৭৭।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। Garrard– Greg Ecocriticism 'The new critical idiom' Routledge publication– 2004.
২। রায় মোহিত(সম্পা.), পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন-পরিবেশবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর ২০১৫।
৩। গুপ্ত শুভেন্দু, পরিবেশ নিয়ে ভাবতে শেখালেন যাঁরা, কলকাতা, পত্রলেখা, জানুয়ারি ২০১৬।

অণুগল্পকার বুদ্ধদেব গুহ

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, সংগীতশিল্পী বুদ্ধদেব গুহর অন্যতম পরিচয় অণু গল্পকার। সত্তরের দশকের শুরুতেই অমিয় চট্টোপাধ্যায় বিশ্বের প্রথম অণু পত্রিকা 'পত্রাণু' প্রকাশ কালে বনফুল, সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনিও অণুগল্প প্রকাশ করেন। তাঁর অণুগল্প মূলত প্রেম ও সংসার জীবনের টানা-পোড়েনের প্রেক্ষাপটই বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

বুদ্ধদেব গুহর অণুগল্প কল্পনার মহাশূন্যে ভাসতে জানে না। তিনি অতি পরিচিত বিষয় অবলম্বন করে বিশ্বাসযোগ্য যে গল্পরূপ দেন তার শব্দ চয়ন ও উপস্থাপন ভঙ্গিমায় নিজস্ব সিলমোহর লাভ করেছে। রাজপথ ধরে চলা গল্পগুলি কখন বহু পথের মিলনক্ষেত্রে পৌঁছে যায় তার টের পাওয়া যায় না। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে একশ ঊনসত্তরটি অধ্যায়ে সাত হাজার আটশ ঊনচল্লিশ শ্লোকে যে কথা বলা হয়েছে তার প্রধান বিষয় ভীষ্মর যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম, মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান। ইতিপূর্বে 'ভীষ্মপর্বে' দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শুরু হলে ভীষ্ম কৌরবদের পক্ষ নিয়ে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হয়ে দশদিন ধরে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষে শরশয্যায় পড়েন। যুদ্ধশেষে পাণ্ডবরা বিজয়ী হয়। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হন। সুষ্ঠভাবে রাজকার্য পরিচালনায় শান্তি ফিরে আসে হস্তিনাপুরে। শান্তি পর্বের পর পিতামহ ভীষ্ম, ইতিপূর্বে যিনি নিজে বীর বিক্রমে রণভূমিতে পদার্পণ করে দশদিনের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের সেনাদের রক্তে কুরুক্ষেত্র কর্দমাক্ত করেছিলেন তিনিই পাণ্ডবদের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম, আপদ্ধর্ম যে শিক্ষা দেন তা যে অনেকটাই হাস্যকর ছিল এই ভাবনাটি আধুনিক ভাবনার মোড়কে ভিন্ন আঙ্গিকে রসসিক্ত রূপে মাত্র পঁয়ত্রিশটি বাক্যে ও দু'শ পঁচাত্তরটি শব্দে 'অনুশাসন' অণুগল্পে তুলে ধরেন লেখক।

অনুশাসন শব্দের আক্ষরিক অর্থ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার উপদেশ। আমরা নিজেকে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নিয়মের বিধানে না বেঁধে অন্যকে উপদেশ দিই। মহাভারতে কচ-দেবযানির গল্পে দেখা যায় দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা লাভের পর তার কন্যা দেবযানির প্রেম অস্বীকার করলে সে অভিশাপ দিয়ে বলে —এই বিদ্যা অন্যের জন্য প্রয়োগ করা গেলেও নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে না। আমরা অপরকে যে শিক্ষা দিই তা ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগে অক্ষম। এই গল্পে স্ত্রী সীমা স্বামী রাজীবকে জানাই তার ছেলে খোকা —"পাশের বাড়ির বল্টুকে 'শালা' বলেছে"।[১] রাজীব রেগে খোকাকে ডেকে বলে —"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে তুই শালা বলিস, আজ তোর

খাওয়া বন্ধ"।[২] সেদিন ছেলের জন্মদিন হওয়ায় সীমা রাজীবকে অনুরোধ করে আজ যেন সে খোকাকে বোকাঝোকা না করে। রাজীব কোনো এক ব্যক্তির বড়ো ধরণের উপকার করায় তার বাড়িতে উৎকোচ নিয়ে আসার কথা ছিল তার। মনে মনে হিসাব কষে রাজীব ভাবে কমপক্ষে ঐ ভদ্রলোক তাকে পাঁচশ টাকা ঘুষ দিবে। সেই টাকাতে সে স্ত্রীর দীর্ঘ দিনের চাহিদা সম্বলপুরী শাড়ি কিনবে তাকে নিয়ে কয়েকদিন দীঘা বেড়াতে যাবে। যথা সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। রাজীব দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে। সীমা কান খাড়া করে তাদের কথোপকথন শুনে। ভদ্রলোক একটা খাম দিয়ে চলে যায়। খামের ভিতর গচ্ছিত অর্থ দেখতে রাজীবের দু পাশে স্ত্রী ও পুত্র দাঁড়ায়। খামের মধ্যে মাত্র পঁচিশ টাকা দেখে স্ত্রীকে খামটি দিয়ে শিশু পুত্রের সামনে সম্বিত হারিয়ে সে বলে — "শালা"। "খোকা রাজীবের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল"।[৩] মহাভারতের অনুশাসন পর্বের বৃহৎ ভাবনা এ গল্পে নতুন আঙ্গিকে, রূপে, রঙে, রেখায় তুলে ধরার যে টেকনিকটি গ্রহণ করেছেন তা সার্থক অণুগল্প রূপ লাভ করেছে। অণুগল্পের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়— "আনবিক বোমা বিস্ফোরণে যেমন চেন রিয়েকশন হয় তেমনি অণুগল্প পাঠের পর রসজ্ঞ পাঠকের হৃদয়েও ভাবের বিস্ফোরণ ঘটে। নিঃশব্দে তর্জনী সংকেত অণুগল্পের গুণ বা ধর্ম। সে বলে কম বলায় বেশি, ভাবে কম ভাবায় বেশি, বস্তু কম বিষয় অধিক"।[৪]

গল্পের শুরুতে দেখা যায় রাজীব দেওয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে স্ত্রী সীমাকে বলে — 'হুঁ হুঁ দেখোই না কি করি'। তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন তার বিশেষ কৌশল বা ফন্দির স্বরূপটি। আয়নায় মুখ দেখার মধ্য দিয়ে তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং চুল আঁচড়ানোর কথা বলে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন এলোমেলো কোনো বিষয় বা বস্তুকে শ্রেণিবদ্ধ করার সাফল্য। কালো চুল অন্ধকার, অনমনীয় বিষয়ের প্রতীক। 'হুঁ হুঁ' ধন্যাত্মক কথাটি বিশেষ চালাকি বা মতলব যা দক্ষতার সঙ্গে সিদ্ধ করার অভিব্যক্তি। রাজীব নামটি তার চরিত্রের ব্যঙ্গ। পদ্মের ন্যায় সে পাঁক থেকে জাত সুশোভিত কুসুম নয় দুর্গন্ধ কর্দমাক্ত জীব। স্ত্রীর দৃষ্টিতে সে শতদল কারণ তার চাহিদার সম্বলপুরী শাড়ি কিনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ছাড়াও অতিরিক্ত তাকে নিয়ে সপরিবারে দীঘায় বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। রাজীবের কর্দমাক্ত রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তার স্বপ্নবাসর ভেঙ্গে যায়। যার কাছে সে কমপক্ষে পাঁচশ টাকা পাবার কথা ভাবছিল সে খামে ভরে পঁচিশ টাকা দিতেই তার উদ্দেশ্যে সে যে গালিগালাজ করে সেই কথাটিই ইতিপূর্বে সে শিশুপুত্রকে দিতে মানা করেছিল এবং গালি দেবার শাস্তি হিসাবে খাবার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। পূর্বসূরির কর্মফল উত্তরসূরিকে ভোগ করতে হয়। শঙ্খ ঘোষ 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় ব্যঞ্জনগর্ভ ভাষায় বলেন —

"না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে

কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?"

শিশু যা বলে তা পরিবার প্রতিবেশীর মুখে শুনে শেখে। আমরা ব্যবহারিক জীবনে সৎ, স্বচ্ছ না হয়ে অন্যকে সততার উপদেশ দিই, ধোয়া তুলসী পাতা রূপে দেখতে চাই, যা হাস্যকর ও নিজেকেই ব্যঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। গল্পটিতে প্রতিভা বলে লেখক মহাভারতের বিশেষ এক পর্বের মূল কথা বর্তমানের প্রচলিত জীবন যাত্রার সঙ্গে একাত্ম করে অভিনব ভাষা ভঙ্গিমায় যে ভাবে তুলে ধরেছেন এককথায় তা অনবদ্য বলতে হয়।

পঁয়ত্রিশটি বাক্যে তিনশ বাষট্টিটি শব্দ সংযোগে তাঁর লেখা অণুগল্প 'একটি সোয়েটার নিয়ে'। গল্পটিতে নারীচিত্তের গহন গভীরে লুকিয়ে থাকা রহস্যময় রূপটির প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নায়িকা একজনকে ভালোবেসে তাকে উলের সোয়টার উপহার দেবার জন্য দোকানে গিয়ে রঙ-বেরঙের উলের লাচি দেখে। প্রিয়জনের গায়ে কোন রঙটি মানানসই হবে তা নিয়ে রীতিমতো অঙ্ক কষে মনে মনে। গভীর রাতে সমস্ত পাড়া যখন সুনসান তখন মিস্টি গানের রেকর্ড চালিয়ে বইয়ের গোছা কোলে নিয়ে প্রিয়তমের জন্য পছন্দ করে সোয়াটার বুনে নায়িকা। এরপর পিঠের মাপ নেবার সময় তার ঘাম জড়ানো হাতের গন্ধ, উষ্ণ নিঃশ্বাস ও বুকের সুবাস মাখা সোয়াটার পিঠে ঠেকায় নতুন সোয়াটার পরার উষ্ণতার সঙ্গে প্রিয়তমাকে লাভের রোমান্টিক ভাবনায় ভরে ওঠে নায়কের হৃদয় — "কোনো শীতের বিকেলে তুমি আমার কাঁধের উপর মাথা এলিয়ে আছ। দূরের লাল মাটির পথ বেয়ে হাট ফিরতি মেয়েরা হলুদ শাড়ি পরে কথা বলতে বলতে গ্রামে ফিরছে — চারিদিকে এক অদ্ভুত শান্তি। ধুলোর গন্ধের সঙ্গে কুয়াশার গন্ধ মিশে গেছে চারিদিকে। তুমি আমার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছ।[৫]

সোয়টার বোনা শেষ হবার পর নায়িকা তা প্যাকেটে মুড়ে নায়কের বাড়ি যাবার পথে অপর এক প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হয় এবং সে যখন সোয়াটারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নায়িকা তখন তাকে খুশি করতে সোয়েটারটি দিয়ে তার কাছে প্রথম প্রেমিককে 'হ্যাংলা' বলে উপেক্ষা করে। বাড়ি ফিরে নায়িকা যার উদ্দেশ্যে সোয়াটারটি বুনেছিল সেই নায়ককে ফোনে জানায় —'সোয়েটারটি প্রায় শেষ করে এনেছিলাম, এমন সময় তোতন ।

তুমি বলবে, তোতন আমার হুলো বেড়াল। আমি বাড়ি ছিলাম না, দুপুর বেলায় নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে সমস্ত ঘর ফেলে দিল। বুঝলে? ঘরগুলো পড়ে গেছে'।[৬] শুধু সোয়েটারের ঘর নয় ভালোবাসার উলের কাঁটা দিয়ে সোজা উল্টো বুনা তরুণ প্রেমের অরুণ আলোকের স্বপ্ন বাসরও ভেঙ্গে যায়। মহাসমুদ্রের অতল জলরাশির অভ্যন্তরের সামুদ্রিক জীব, গাছ-পালা, ফুল-ফল, বস্তু সর্বস্বের সন্ধান মিললেও রহস্যঘন নারী চরিত্রের

কূল-কিনারা পাওয়া দুষ্কর। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে দেখা যায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অচলা মহিমের কাছে সুরেশকে 'কসাই' বলেছিল আবার সুরেশের কাছে মহিমকে বলেছিল 'ডাকাত'। মহিমের প্রেমে হাবুডুবু খাবার সময় সুরেশ প্রেমপ্রার্থী হলে সে বলেছিল — "আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই। তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন"। (নবম পরিচ্ছেদ) মহিমকে বিয়ের পরও সুরেশকে ভুলতে পারেনি সে তাই হাওয়া পরিবর্তনের জন্য মহিমের জব্বলপুরে যাওয়া ঠিক হলে গোপনে সে তার সঙ্গে সুরেশকে আহ্বান করেছিল। এলাহাবাদে মহিমকে ফেলে অচলাকে নিয়ে অন্য ট্রেনে সুরেশ রওনা দিলে ঘটনাটি জেনে অচলা তার পা জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। সুরেশ তখন তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে —"তুমি যেখানে খুশি নেমে চলে যাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, মহিমকে দেখিও সে ঘরে নেবে"। (অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ) তখন সে তাকে ছেড়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনী মহেন্দ্রের সেবা শুশ্রূষায় সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিযুক্ত করে তার স্ত্রী আশার ব-কলমে নিজের মনের কথা চিঠিতে লিখে মহিমকে পাঠায়। সেই মহিম যখন ঝড়ঝঞ্ঝার রাত্রে তাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল তখন তাকে ঠেলে ফেলে বিহারীর অভিমুখে যাত্রা করে সে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কুবের ও কপিলার প্রেমের রহস্য বুঝতে পারে নি। 'ওগো বধূ সুন্দরী' সিনেমায় কিশোর কুমারের কণ্ঠে গাওয়া গান —"নারী চরিত্র বেজায় জটিল/ কিছুই বুঝতে পারবে না/ ওরা Law মানে না/তাই ওদের বলে ললনা"

এই গল্পেও নায়িকা চরিত্রে দোলাচল চিত্তবৃত্তি রূপটি স্বল্প পরিসরে নিটোল রূপে ফুটে উঠেছে। 'মানসী' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেন — মেয়েরা একঘটি জল না আধখানা বেল চায় বলা মুশকিল। চিরায়ত জটিল রহস্যঘন বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে নারী চরিত্রগুলি। পুরুষ কতৃক রচিত হয় বলেই নিজের মতো করে নারীকেও আঁকে তারা। পুরুষের ক্যানভাসে নারীর বিভিন্ন রূপ ভেসে ওঠে, বিভাজিত হয় — পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী রূপে। বাৎসায়নের নারীর এই শ্রেণি বিভাজনের পথ বেয়ে চলতে থাকে যুগযুগ ধরে নারীকে দেখা। বলা হয় — স্ত্রীয়শ্চরিত্রম দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যা"। এরহস্য উদ্ঘাটন সুদূর অতীত থেকে অদ্যাবধি কাল পর্যন্ত চলছে ভবিষ্যতেও হয়তোবা চলবে। কথক নায়িকার তরুণ যৌবন বোঝাতে 'সবুজ উলের' কথা বলেছেন। উলের কাটা নায়িকার কল্প মাধুরিমা। উলের ঘরের মতে সংসারেও আছে উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না পাওয়ার দ্বিধা দ্বন্দ্ব। সোয়েটারের ন্যায় নারী শরীরেও উষ্ণ আমেজ মিলে। উল তৈরি হয় ভেড়ার লোম থেকে। 'ভেড়ার' কথাটি পরোক্ষভাবে বলে কথক বোঝাতে চেয়েছেন আদিম কাম সর্বস্ব ও আপাত নিরীহ দলবদ্ধ ভাবে পরিবারের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা নারীর কথাটি। 'হলুদ শাড়ি' পরা গ্রাম্য মেয়েটির কথা বলে নায়িকার শান্ত, বিনম্র স্বভাব ও তাকে পরিণয়ের ইচ্ছার ইঙ্গিত

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

দেওয়া হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক ভাবনার গুণেই কথক নায়িকাকে প্রতারকে রূপান্তরিত করেন হয়তোবা গল্পটিতে।

তপন রায় ও অঞ্জলি মজুমদার সম্পাদিত এপ্রিল ১৯৭০-এ অণুপত্রিকা 'বিন্দু'-তে প্রকাশিত বুদ্ধদেব গুহ-এর লেখা অণুগল্প 'সেই লোকটি'। ছত্রিশটি বাক্যে ও তিনশ সাতাশিটি শব্দে লেখা এই গল্পটিতে দাম্পত্য কলহ ও তা থেকে মুক্তির জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে নিমগ্নতার বার্তাটি দেখা যায় এখানে। রবিবার যে দিন অফিসের কাজকর্ম থাকে না ভালো মেজাজে থাকার কথা সেদিনই কথকের দাম্পত্য অশান্তি ঘটে। চাকর-বাকরদের গালিগালাজ করে। সকালের ঝগড়া-ঝাটির জন্য দুপুরে তার স্ত্রী অভিমানে খাওয়া বন্ধ করলে কথকও বিবেকের তাড়নায় অনাহারে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কথক বেসিক্যালি মানুষ কিন্তু রেগে গেলে ক্যাজুয়ালি অমানুষ হয়ে যায়। ওর মা, পুত্র, পুত্র-বধূ উভয়কেই ভালোবেসে খেতে বলেন। কথক মাকে মেজাজ দেখিয়ে রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। চড়া রোদে অনেক দূর হেঁটে বাস স্টপেজে দাঁড়ায়। কিন্তু যাবে কোথায়? সদ্য বিবাহিত বন্ধু প্রদীপ তো খওয়া-দাওয়া সেরে স্ত্রীকে নিয়ে নিভৃতালাপে মত্ত থাকবে তায় সেখানে যাওয়া যাবে না। বন্ধু সমীরের কাছে যে দুশো টাকা ধার নেওয়া হয়েছিল তা পরিশোধ না করায় সেখানে যাবার রাস্তাও বন্ধ। বহুদিন মামাবাড়ি না যাওয়ায় এই অসময়ে গেলে তারাও বিব্রত হবে। শ্বশুর বাড়িতে শালারাও খুব একটা ভালোবাসে না তায় সেখানে না যাওয়াই উচিৎ। অফিসে লালাবাবু নোটিস দিয়েছে ছুটির দিনে সেখানে যাওয়া যাবে না। বাস স্টপে বহুক্ষণ এভাবে চিন্তাভাবনার পর সবশেষে বাড়ির দিকেই ফিরে সে। যাত্রাপথে দেখে ড্রেনের নোংরা জলে স্নান সেরে একটি কাক আরামে তারপাশে বসে আছে। দূরে বারান্দার ছায়ায় একটা কুকুর শুয়ে আছে কিন্তু - "ওর জন্যে কোথাও শান্তি নেই, ওর জন্যে কারো বুকে এক কণা সহানুভূতি নেই, কোথাও ওর এক-দুপুরে বসার জায়গা নেই, একমুঠো খাওয়ার জায়গা নেই একবেলা। রাস্তার কাকের যেমন ড্রেন, পথের কুকুরের যেমন গাড়ি বারান্দা; ওর জন্যে তেমন ওর লেখার টেবিল।'[৭] লেখকের একমাত্র শান্তির পীঠস্থান লেখার ক্ষেত্র। সৃষ্টি স্রষ্টাকে নতুন জগতে নিয়ে যায়। সৃষ্টির মধ্যেই তিনি আনন্দ মদিরা পান করে মত্ত থাকেন। সংসারের দায়দায়িত্ব, ঝড়ঝঞ্ঝা, চাওয়া-পাওয়া, চিন্তা-ভাবনা থেকে তা বহুদূরে বিছিন্ন এক দ্বীপে নিয়ে যায় স্রষ্টাকে। সেখানে আনন্দের অমৃতহাসি বর্ষিত হয়।

গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার বর্ণনা নেই। ভূমিকাহীন সূচনা — "ঝগড়া-ঝাঁটি লাগে। লাগেই"।[৮] পরের প্যারায় কথকের চরিত্র, তৃতীয় প্যারায় দাম্পত্য কলহের ফল এবং ব্যক্তি মানুষের দুটি রূপের কথার স্পর্শ করেই তার প্রতিক্রিয়ার রেখাচিত্র এঁকে গল্পটি বাঁক নেয়। কথকের বন্ধু প্রদীপের নতুন বিয়ে, দাম্পত্য সুখ, খুনসুটি। কথকের অন্য বন্ধু সমীরের কাছে কোন পরিস্থিতিতে, কিভাবে দুশো টাকা ধার নেওয়া হয়েছিল তার বর্ণনা। অথবা তার

মামাবাড়ি, শ্বশুরবাড়ির মানুষজনদের চিত্র-চরিত্র, ক্রিয়া-কর্মের বর্ণনা দিয়ে লেখাটি উপন্যাসদের কাছাকাছি যেতে পারত কিন্তু শক্ত হাতে কাহিনির লাগাম টানেন তিনি। ঝাঁ ঝাঁ গ্রীষ্মের দুপুরে কাক, কুকুরের প্রশান্তি দৃশ্য তুলে ধরে মনুষ্যতর জীবের চেবৎ মানুষের চরিত্র চিত্রের পার্থক্য এবং প্রশান্তির ক্ষেত্রটি অত্যল্প কথায় আটকীয় ভঙ্গিমায় সার্থক অনুগল্পে রূপান্তরিত হয়েছে রচনাটি। "যেখানে বিরাট ভাবাকাশের বিস্তৃতি। সমুদ্রের গর্জন, অরণ্যের রোদন যেখানে অণুগল্পের ছোট্ট দীপশিখাটি উপস্থিত হয়ে ঘরের কোণের শাঁখের মধ্যে সমুদ্রের গর্জনের সংকেত দেয়, দীপের মধ্যে আনে নক্ষত্রের আলোর প্রতিবিম্ব। এতে বেশি কথা, স্থূলদেহ না থাকলেও ভার ও ধার অসামান্য"।[৯]

বুদ্ধদেব গুহ কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্পের জগৎ ছাড়া অনুগল্পের জগতেও যে দাপটের সঙ্গে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গল্পকে এখানে তিনি বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যা না করে ভাঁজে ভাঁজে পাট করে তুলে ধরেন। কম কথায় বেশি বলার টেকনিক যুক্ত অণুগল্পগুলি তাঁর প্রতিভার অন্যতম সূচক বললে ভুল হয় না।

সঙ্গ নিঃসঙ্গতার আখ্যানকার আফসার আমেদ
তরুণ মুখোপাধ্যায়

আট দশক বা আশির লেখক আফসার আমেদ (জ. ১৯৫৯), তাঁর জন্ম হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামে। ঘর গেরস্তি (১৯৮২) উপন্যাস দিয়ে তাঁর লেখক জীবনের শুভযাত্রা শুরু। তাঁর গল্প—উপন্যাসের বিষয় মুসলমান সমাজ। আমাদের আধো চেনা মুসলমান-সমাজ, সংসার, তার সদর—অন্দর নিয়ে একালে আবুল বাশার ও আফসার আমেদকে বিশেষভাবে চর্চা করতে দেখা যায়। তাঁর লেখক সত্তার স্বীকৃতি হিসেবে আফসার পেয়েছেন বাংলা অকাদেমি পুরস্কার, সোমেন চন্দ পুরস্কার। অনুবাদের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। অনেকগুলি উপন্যাসের স্রষ্টা তিনি। তবে তাঁর স্বল্পালোচিত উপন্যাস 'সঙ্গ নিঃ সঙ্গ' (১৯৯৪) যেখানে লেখক সমকালীন একটি আখ্যানকে আন্তরিকভাবে ব্যাখ্যা করতে ও সমাধান সূত্র খুঁজতে চেয়েছেন।

মেয়েটির নাম দীপা। ছেলেটি নিজাম, পড়াশুনার সূত্রে আলাপ, প্রেম ও বিবাহ। বলা বাহুল্য, হিন্দু মেয়ের পক্ষে মুসলমান যুবকের বধূ হওয়া সব সময়ে স্পর্ধা ও সাহসের ব্যাপার। সেকালে যা প্রায় অসম্ভব ছিল; একালে তা বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সম্ভব হয়। কয়েক বছর আগে রিজওয়ানুর—প্রিয়াঙ্কার প্রেম ও ট্র্যাজিক মৃত্যু কারোর অজানা নয়। এছাড়া উত্তরপ্রদেশে আজও মেয়ের বাবা—মা—দাদা—কাকারা পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে মেয়ে ও প্রেমিককে হত্যা করেন; সংবাদপত্রে তা ছাপতে হয়। কাজেই পরিবারের অমতে শুধু ভালোবাসার টানে দুই যুবক—যুবতী জাতি—ধর্ম—আচার—প্রথা অগ্রাহ্য করে মিলিত হয়েছে, এটা অভিনন্দনযোগ্য। নিজের চেষ্টায় নিজাম ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছে। ফ্ল্যাট কিনেছে। সুখী, সুন্দর, নিভৃত দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করেছে।

কিন্তু জীবপ্রবাহ কখনো সরলরেখায় চলে না। বিয়ের এগারো বছর কেটেছে। একদিন যে সম্পর্ক ছিল অতি মধু-মাখা, সেখানে কাঁটা উঁচিয়ে থাকে। মধুরালাপ তিক্তালাপে পর্যবসিত। নিজাম ভাবে, যদি তাদের একটি সন্তান থাকতো, তার এই শূন্যতা, দূরত্ব তৈরি হতো না। দীপা ভাবে, সন্তান ধারণে সে সক্ষম নয় বলেই স্বামীর টান—ভালোবাসা আর নেই। দুজনেই দুই দ্বীপের বাসিন্দা। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের বনের পাখি ও খাঁচার পাখির মতো।

দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মারে পাখা,
কাতরে কহে 'কাছে আয়'। (সোনার তরী)

নিষিদ্ধ বিবাহের জন্য তারা স্বজন-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন। আফসার জানান :

'কেউ কারোরই আত্মপরিবারের স্নেহ দয়া পায় না, দুজন মানুষ দুটি দ্বীপ হয়ে একই ঘরে কাল কাটায়।'

জাতি—বর্ণ বিভাজন মেনে নিলে নিজাম টানে তাকে হয় দীপাকে ফেলে অথবা ত্যাগ করে আরামবাগে আত্মপরিবারে ফিরে যেতে হয়, না হয় দীপার সঙ্গেই থাকতে হয়।

দীপাকে সে ভালবাসে। ত্যাগ করতে পারবে না। দীপার হিন্দুত্ব-হরণে সে রাজি নয়। যে যার মত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে থাকুক। শুধু হৃদয়-ধর্মে তারা একাকার। বন্ধ্যাত্ব ছাড়াও দীপার মানসিক বিকারের কারণ নিজামের মনে হয় 'তারা হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে করেছে বলেই এই বিচারের এমনতর ধরণ, জটিলতা'। অথচ এগারো বছর আগে কী ছিল : কোন হিসেবনিকেশ না করে ওরা বিয়ে করেছে। প্রেমই ওদের প্রেরণা। অনেক কিছু ত্যাগ করেছে ওরা। নিজামও, দীপাও। বিয়ের পাঁচ বছর ভালো ছিল, তারপর থেকে সম্পর্কের ভেতর চিড় ধরতে শুরু করেছে।

এখন তারা যেভাবে বেঁচে আছে, নিজামের ধারণা 'একে বাঁচা বলে না। একে অপরের প্রতি আস্থা তারা হারিয়েছে, প্রেম হারিয়েছে।' তাহলে কি এই অসম বিবাহই তাদের দুর্দশার মূল কারণ? নিজাম ভাবে। মৃতসন্তান প্রসবের পরই দীপার বন্ধ্যাত্ব, সন্তান ধারণের অক্ষমতা তৈরি হয়েছে। নিজাম ও দীপা ভাবে তবে পরিবারের শুভেচ্ছা, সমর্থন না পেয়েই কি এই অভিশপ্ত জীবন এলো? অন্তত দীপার ধারণা এটাই। ক্রমশ 'সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে উঠেছে ওদের। ভয়ানক বিচ্ছিন্নতা।'

দাম্পত্যজীবনের সংকট নিয়ে উপন্যাস লেখা নতুন নয়। এমনকি মুসলমান সমাজ নিয়েও। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বা 'রাজসিংহে' এমন সংকট চিত্রিত হতে দেখা যায়। আবুল বাশার তাঁর 'ফুল বউ' উপন্যাসে মুসলিম সমাজে চিত্রার বিয়ে নিয়ে যে সমস্যা কেমন তাও দেখিয়েছেন। এ তো বাহ্য। আফসার এইভাবে কোনো ঘটনার বর্ণনা দিতে চাননি। তাঁর লক্ষ্য দুই ভিন্ন ধর্মের যুবক-যুবতীর মনোলোক পরিক্রমা করা। একই ছাদের তলায় কত যে মানুষ নিজস্ব বৃত্তে নিঃসঙ্গ দেখাতে চেয়েছেন শুধু শরীরই নয়, মনের দরকার। দুয়ে মিলে পূর্ণতা। সেতু হতে পারে; কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। শরীর বাসনা দ্রুত নিঃশেষিত হয়। তার পর থাকে মনের টান, অনুরাগের রঙ। যা দুই নরনারীর জীবনকে সরস সজীব উজ্জ্বল করে। 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসে আমরা দেখি দীপা ও নিজামের গভীর প্রেমের ছবি। বাথরুম-প্রেমিক নিজাম আয়নায় নিজেকে দেখে ও আত্মসমালোচনা করে। দীপা স্বামীর জন্য তেল—সাবান—গামছা সাজিয়ে রাখে। ভুলোমন স্বামী তোয়ালে নিতে ভোলে। বাথরুমে মন তাজা হবে বলে, সে সুগন্ধ ছড়ায়। যত্ন করে চা করে। স্বামী ঘুম থেকে ওঠার আগে বাজার করে। মাছ মাংস আনে। ঘুমন্ত স্বামীকে ঠেলে জাগিয়ে বেড—টি দেয়। স্বামী

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

অফিসে গেলে সারাদিন ধরে ঘর সাজায়, গোছায়। সন্ধ্যেবেলা নিজাম ফিরে এলে তার জন্য সাজগোজ করে, জলখাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করে। একসঙ্গে খায়। চমৎকার এক দাম্পত্য জীবন ও সংসারের ছবি।

এমন ছন্দেগাঁথা জীবনে নিঃসঙ্গতা তৈরি হয় পাঁচ বছর পর। সন্তান হারানো আর চিরতরে বন্ধ হওয়ার বেদনা দীপাকে মানসিক রোগী করে। ক্রমশঃ সে ভয়ের, নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। যেভাবে তার মুসলমান স্বামী যেকোনো সময় তালাক দিতে পারে। একাধিক বিয়ে করতে পারে। নিঃসন্তান অনুর্বরা নারী ভেবে অন্য নারীর সঙ্গ করতে পারে। কার্যত নিজাম এসব করে না। কিন্তু অভিযোগের তীরে বিদ্ধ হয় দুজনের মধ্যে অবিশ্বাস ও প্রেম বাসা বাঁধে। সেই বেড়া টপকাতে পারে না নিজাম। সাধ্যমত সংযত রেখে, বুঝিয়েও পারে না।

তাদের দাম্পত্য কলহের এক টুকরো এইরকম —

— আমাকে তুমি ভুল বোঝ।

— না না।

— আমারও একটা মন আছে।

— জানি।

— সারাদিন একা থাকি, আমি কী নিয়ে থাকব?

— সে আমি জানি।

— ভগবান আমার ছেলে কেড়ে নিয়েছে।

দিপার কপালে হাত রাখে নিজাম।

কোন কোন দিন দীপা খুব স্বাভাবিক ছন্দময় হয়ে উঠে। সাজগোজ করে। স্বামীকে আদর করে। দুজনে কোথাও বেড়াতে যাবে ভাবে। সেই মধুর মুহূর্তকে নিজাম আনতে চায় 'আমরা ঝগড়া করি কেন?' দীপা বলে, 'জানি না' এরপর ''নিজাম দীপাকে বুকের ভেতর চেপে ধরে। নিজাম বড় দুঃখী, দীপার আক্রমণের শিকার। বড় বিচ্ছিন্ন, বড় একা সে, ক্ষতবিক্ষত বটে।''

প্রায় নিস্তরঙ্গ এই দাম্পত্য জীবনে একদিন দোলা লাগে। এক দুপুরে আরামবাগ থেকে নিজামের বন্ধু হোসেন আসে তার যুবতী বোন সাহানারাকে নিয়ে। ব্যাঙ্কের কাজ সেরে নিজাম সাহানারাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাতে নিয়ে যায়। এক সদ্য যুবতীর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে, ঘুরতে ভালোই লাগে। যদিও সে কথায় কথায় জেনে যায় সাহানারা এক হিন্দু যুবককে ভালোবাসে। বাড়ির অমত জেনে তার জেদ সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। হোসেন এলে সাহানারা চলে যায়। বাড়ির গুমোট পরিবেশে কিছুতে মন চায় না নিজামের। অন্যদিকে দীপাকে আজকের ঘটনাও বলতে ইতস্তত করে। যদি ভুল বোঝে।

ইদানিং, সে বারে যায়, মদ খায়, কর্লগার্লদের সঙ্গে নাচে। দীপা জানে না। শুধু মদ্যপ হয়ে বাড়ি ফিরলে দীপা গম্ভীর হয়। কিন্তু সাহানারা প্রসঙ্গ দীপাকে না জানানেনাটা তার যুক্তিযুক্ত মনে করে। কিন্তু হঠাৎই পরদিন চমক দিয়ে তাদের ফ্ল্যাটে হোসেন সাহানারা আসে। কথা প্রসঙ্গে দীপা জানতে পারে, কাল নিজাম মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল। শোনবার পরই তার মধ্যে যন্ত্রণা, রাগ, সন্দেহ জেগে ওঠে। দুপুরের খাওয়া সেরে হোসেন ও সাহানারা সিনেমা দেখতে যায়। তার আগেই নিজাম চলে যায় ব্যাঙ্কে। সেদিন ব্যাঙ্ক ছুটির কিছু আগে পিওন জানায় নিজামের জন্য এই ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন। তবে কি সাহানারা এলো? এমন দোলাচলে নিজাম তাকিয়ে দেখে দীপা এসেছে। কোনদিন সে ব্যাঙ্কে আসেনি। তাহলে বিপদ কিছু ? দীপা—তা নয়, তেমন কিছু না। গড়িয়াহাটে শপিংয়ে এসে ব্যাঙ্কে এসেছে। যাতে একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যায়। নিজাম থাকতে পারে না। ফেরার পথে পাঁচ কথায় সে জানতে পারে, সাহানারার সঙ্গে নিজাম সিনেমা দেখতে গেছে ভেবেই সে সরেজমিন তদন্তে এসেছে। ফ্ল্যাটে ঢুকেই দীপা বোমার মত ফেটে পড়ল পড়ে। নিজাম তাকে ছুঁতে বলে—বলে, 'আমাকে ছোঁবে না।' কী তাঁর অপরাধ জানতে চায় নিজাম। প্রত্যুত্তরে শোনে, 'তুমি একটা ছোটলোক ইতর'; 'তুমি দুশ্চরিত্রের লোক'। কারণ, মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার কথা চেপে গিয়েছিলে যে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত; আমাকে জানাওনি, তার মানে তোমার মনে পাপ ছিল।' হাঁটুর বয়সী মেয়ে এবং অন্যের বাগদত্তা যে, তার সঙ্গে নিজামের প্রেম? সে হেসে ওঠে। বহুকষ্টে স্ত্রীকে ব্যাপারটা সে বোঝায়। সাহানারার প্রেম, বিয়ের সন্ন্যাস নিয়েও বলে, শান্ত হয় দীপা। পরিস্থিতি অনুকূল দেখে নিজাম বৌকে প্রস্তাব দেয় 'তুমি একটা বাচ্চা নাও দীপা।' জানায় অনাথ বাচ্চাদের দায়িত্ব নেওয়া কত পুণ্যের কাজ। দীপার মন সায় দেয় না। অন্যের সন্তান নিয়ে শূন্যতা পূর্ণ হবে? নিজাম বোঝায়, শিশুটিকে নিজের ভাবলে আর অভাববোধ থাকবে না। স্বামী-স্ত্রী মাঝখানে শূন্যতা ও ভুল বোঝাও থাকবে না। দীপা এবার বোঝে। সে শান্ত নদীর মতো হয়ে ওঠে ?

দীপা ও নিজামের সংসারে আবার সুর ফিরে আসে। আগের মতন দীপা সংসারে, সাজগোজে মেতে ওঠে। স্বামীর সুখে মন দেয়, স্নানের জন্য নিজাম বাথরুমে গেলে আদুরে গলায় দীপা বলে, 'বাথরুম প্রেমিক কোথাকার।' যেটুকু সময় নিজাম বাথরুমে যাবে; দীপার নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়। ধাক্কা দেয় দরজায়। একসময় দরজা খুলে নিজাম 'হাসিমুখে দীপার মুখোমুখি হয়।' সঙ্গ নিঃসঙ্গতাকে মুছে দেয়।

আফসার আমেদের গল্প : নারীর কথা

নিরুপম আচার্য্য

গল্প বলা ও গল্প শোনার বিষয়টা সুপ্রাচীনকালের। মুখের বয়ান লেখার রেখায় রূপ পেয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পঞ্চতন্ত্র বা জাতকের গল্পে। তারও আগে রূপকথা, উপকথা লেখা হয়েছে। তবে একথা ঠিক সাহিত্য প্রকরণ (Types of Literature) হিসেবে গল্পের বিশ্লেষণ, তার সংজ্ঞা দান, অবয়ব বিচার ইত্যাদি খুব বেশি দিনের নয়। বিশ্বসাহিত্যের মতো আমাদের ভাষায় এ নিয়ে প্রথম আলোকপাত করলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাংলায় সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা। তাঁর আগে স্বর্ণকুমারী দেবী (তাঁর অগ্রজা) গল্প লেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন 'মালতি', 'লজ্জাবতী', 'গহনা', 'যমুনা' ইত্যাদিতে। তারও আগে নীতিমূলক গল্প অনূদিত হতে দেখেছিলাম। দেখেছি ইসলামিক গল্প 'চন্দ্রকান্ত', 'চন্দ্রবংশ', 'কামিনীকুমার', 'হাতেমতাই', 'লায়লামজনু' প্রভৃতি রচিত হতে। সে তো অনেককাল আগের কথা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী', প্রভৃতি সাময়িকীতে। পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যে দেখা যায় ফরাসি কথাসাহিত্যিক মপাশাঁ (১৮৫০—১৮৯৩) লিখেছেন 'গোলোয়া' ও 'জিলেব্লা'র পাতায়, রাশিয়ার কথাকার চেকভ (১৮৬০—১৯০৪) লিখেছেন অসফলকি ও বুদিলনুকিতে, অ্যামেরিকার অ্যালান পো (১৮০৯—১৮৪৯) লিখেছেন 'স্যাটারডে ক্যুরিয়ার' ও 'স্যাটারডে ভিজিটার'—এ। এই কথাগুলো বলছি যে এঁরা প্রত্যেকেই সংবাদ সাময়িকীতে লিখতে শুরু করেছেন সমকালীনতা ও সংক্ষিপ্ততার কথা মেনেই।

বাংলায় উনিশ শতক নানা ঘটনায় উত্তাল এক শতক। এই শতক নবজাগরণের শতক। আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনাসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা ঘটনাক্রমে মানুষ তখন আন্দোলিত। একদিকে ইংরেজ শাসনকালে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল—কলেজের প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত, দৈবী ভাবনায় আচ্ছন্ন ধর্মান্ধতার বেড়াজাল থেকে বের করে আনা ইত্যাদি কাজগুলি চলছিল। একথা সকলের জানা। তবে এই সময়ের সবচেয়ে বড়কাজ মেয়েদেরকে সামনের সারিতে তুলে আনা। যদিও কাজটি সহজ ছিল না। এদেশের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ইংরেজদের সাহায্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এ নিয়ে গোঁড়া সংস্কার বিরোধীদের সঙ্গে সংস্কারবাদীদের বিবাদ কম হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই শতকের শেষের দিকে নারী পুরুষ উভয়ের উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। পুরুষরা এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেননি। কেমন ছিল সেই বিষয়টি :

"পুরুষদের কাছে সেদিন নারী ছিল জীবন্ত সম্পত্তি, শুধু ভাত কাপড় দিয়ে পোষা বিনা মাইনে দাসী মাত্র। ইচ্ছের হাড়িকাঠে তাদের যতবার খুশি বলি দেওয়া চলত। সমাজের

সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা নারীর অঙ্গে পাকে পাকে জড়ানো শৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল খুব সহজে, কারণ সকল অনর্থের মূল অর্থ এবং অর্থোপার্জনের যাবতীয় উপায় ছিল পুরুষের হাতে।"[১]

পুরুষসমাজ মেয়েদের নিরুপায়তার সুযোগ নিয়ে অধিকারের নামে অবাধে স্বেচ্ছাচার করে গেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকে সমাজ সংস্কারের প্রধান কথা ছিল নারীমুক্তি — আধুনিক অর্থে নয়, তখন নারী শিক্ষা, নারীর অধিকার এবং নারী প্রগতির দেখেই মনীষীদের দৃষ্টি পড়েছিল।

এই সমস্যাগুলোই শেষ নয়। লেখাপড়া শেখা, জামা জুতো পরা, বাইরে বেরোনো, গান গাওয়া, গাড়ি চড়া, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলা সবই পড়ে।

দীনবন্ধু ১৮৬০—এ 'নীলদর্পণ' নাটকে সরলার মুখ দিয়ে বলেছিলেন, 'রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই।' কেননা পাঁচজন সঙ্গিনী নিয়ে বাগানে যাওয়া, শহরে বেড়াতে যাওয়া, মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের জন্য কলেজ, কাছারি, সভাসমিতি কিছুই ছিলনা। ঊনিশ শতকের লড়াইটা ছিল এখানে। সমস্ত 'না' এর বন্ধ দরজা খুলে দিতে হবে। এই লক্ষ্যে তৎকালীন সমাজ সংস্কারকেরা কাজ করছিলেন। পাশাপাশি সাহিত্যিকরা তাঁদের গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে নারীমুক্তির ছবি আঁকছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সবলা' কবিতায় লিখলেন:

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা !'
আর নারীর উদ্দেশ্যে তার জিজ্ঞাসা — 'শুধু শূন্য চেয়ে রব।'

বহু গল্পে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দরা নারীর নির্মম ভাগ্য পরিহাসের কথা লিখলেন। আর তখনই পট পরিবর্তন হল। তখন মানুষ ভাবতে শুরু করলো —

'Men and Women are better than heroines'

উনিশ শতকের গোড়ায় মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা সমানাধিকার, নির্যাতন, বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে অনেক গল্প লেখা হলেও ছবিটা আমূল বদলে গেল না বিশ শতকেও। বিশ শতকে বহু লেখক এলেন সমাজ বাস্তবতার কথা বললেন। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই দশকে সমাজ বদলে যাওয়ার কথা, দেশবিভাগ ও পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা—সহ, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—সহ নারীদের কথা এল।

বঞ্চিত নারীর হাহাকার, নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিবাহ পূর্ব ও পরবর্তী সংকট, নারীদের যৌন লাঞ্ছনা, চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় অভিঘাত, মুসলমান মেয়েদের তালাক প্রসঙ্গ, বোরখা জাতীয় পোশাক ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বিংশ

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

শতকের আট ও নয়ের দশকের কথাকার আফসার আমেদ অন্যতম। ভেতর থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র আফসার জন্মেছিলেন ১৯৫৯ সালে হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামে। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হওয়ায় খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন সেই মানুষগুলোকে, একেবারে ভেতর থেকে দেখা। ফলে প্রামাণিকতা সত্যে ও আখ্যানশিল্পের সজীবতায় তিনি দ্রুত পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিলেন। কোনরকম ধর্মীয় গোঁড়ামী বা কুসংস্কার তাঁর রচনায় আমরা পাই না। আমরা তাঁর লিখিত গল্প অবলম্বনে নারীভাবনার কথা আলোচনা করব। তাঁর লেখা অসংখ্য গল্পের ভেতর থেকে নির্বাচিত করে নিয়েছি এমন কিছু গল্পকে যেখানে মেয়েদের কথা দৃপ্তভঙ্গীতে তিনি বলেছেন।

আমাদের আলোচ্য প্রথম গল্প 'দুই নারী'। প্রথমজনের নাম নাসিরা চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবন তার। এখন বয়স বত্রিশ—তেত্রিশ। তার স্বামী মৌলানা যার বয়স বর্তমানে পঞ্চাশ। 'বেশ জাঁকালো ও সুন্দর শরীর স্বাস্থ্য তার। চমৎকার পরিণত ও গম্ভীর।' এই মৌলানার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর নাসিরা সংসারে আসে। প্রথম পক্ষের দুই সন্তানকে বিয়ের পর থেকেই ভাল করার দায়িত্ব এসে পড়ে তার কাঁধে। ইমরান ও ইরফান নিজের সন্তান মনে করে সে। এই সংসারে সে 'মেয়ে মানুষ' হয়েই কাল কাটিয়ে দেয়। গল্পকার নারী অবস্থানকে বোঝাতে বলেছেন — "নিজে সজাগতার মৃদুতার ভেতর ভাবনা নাড়াচাড়া করেছে, কিন্তু তার বুদ্ধি ও ফুর্তি নিজেই গড়েনি। গড়বে কী করে, একেবারে সে মেয়ে মানুষ হয়েই এ সংসারে কাল কাটিয়ে আসছে।"[২] মৌলানার জুতোর ব্যবসা। দুই ছেলে জুতা বিক্রি করে বাবা সামলান।

বাড়ির বাইরে যাওয়ার তার অধিকার নেই। মৌলানার নিষেধ আছে। তীব্র নজর রাখে বিবির উপর মৌলানা। যদিও নাসিরা বের হয়, বোরখা তার সঙ্গী হয়। তবুও বহু মানুষের ভেতর থেকে মৌলানার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার দেওয়া যায় না। গল্পটি ১৯৯২—এ প্রকাশিত হয়। বিশ শতকের শেষে মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থানটি কেমন ছিল তা চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই গল্পে।

এই গল্পে আর এক নারী হলো মৌলানার দূর সম্পর্কের চাচী। চাচী বয়স্কা ও বিধবা। তিনকুলে তার কেউ নেই। এই চাচী তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। দুজনের মধ্যে সুখ-দুঃখের নানা কথা হয়। গল্পকার যখন বলেন — 'দুজনের মধ্যে বয়সের তফাত যথেষ্ট হলেও দুজনেই এক্ষেত্রে নারী'[৩] — তাই দুজনের মধ্যে এত ভাব—সাব যে একে অন্যকে সান্ত্বনা দিয়ে বাঁচে।

বোরখা যে সব নারী স্বাভাবিক ভাবে পরে না তার প্রতি তীর্যক ইঙ্গিত গল্পে আছে। চাচী হতাশার সুরে বলে — ভাইপো মৌলানা বলে আমাকেও বোরখা পরতে হয়। গল্পে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি লেখক বলেছেন তা হলো যতই মৌলানার নিষেধ থাক,

যতই বোরখা পরতে বাধ্য হোক, তৎকালীন মেয়েরা—নাসিরা কিন্তু বাড়ির বাইরে পা রাখে। সেদিন তরমুজ কেনার জন্য মৌলানার চোখে ধুলো দেয় নাসিরা। ফিরে এসে চাচীকে যখন বর্ণনা দেয় তখন যুদ্ধ জয়ের আনন্দে তার চোখদুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে। সময়ের সঙ্গে, সঙ্গে বদলায় সবকিছু কিন্তু নারী সেই এক জায়গায় থাকে — পর্দানসীন, পুরুষের অধীন—এর বিরুদ্ধেই 'দুই নারী' গল্পের অবতারণা।

নারীকে ভোগ্যপণ্য রূপে ব্যবহার করা যেন পুরুষের একচেটিয়া অধিকার। তাতে কোনো পাপ বা গোনাহ নেই। আমাদের সমাজে নানা ঘটনা আমরা দেখি যেখানে নারীকে অসম্মানিত হতে হয়, ধর্ষিতা হতে হয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহবাস করতে হয়, বিয়ে করতে হয়। দুর্বল নিম্নবিত্ত, সহায় সম্বলহীন নারীদের উপর এই অত্যাচার স্বাধীনতার এত কাল পরও একটুও কমেনি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবিত ও মৃত' গল্পে দেখিয়েছেন হতভাগ্য কাদম্বিনীকে মরিয়া প্রমাণ করিতে হইল যে সে মরেনি। হত ভাগ্য নারীর কথা যুগে যুগে লেখা হচ্ছে। এই মুহূর্তে সচেতন পাঠকের মনে পড়বে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর 'নারীমেধ' গল্পের কথা। জমিদার অর্থবানদের তো সাতখুন মাপ। মধুসূদনের প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র কথা মনে আছে? ধর্মদরদি বৃদ্ধ জমিদারের পরস্ত্রী লোলুপতার কথা। নাটকের অন্তিমে যে জমিদার ভক্তপ্রসাদ নারায়নের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন —

"বাইরে ছিল সাধুর আকার।
মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া।
পণ্য খাতায় জমা শূন্য
ভন্ডামিতে চারটি পোয়া।"

এই ভণ্ড ভক্তপ্রসাদ তার অধীনে থাকা প্রজা হারিফের সুন্দরী স্ত্রী ফাতেমাকে হস্তগত করতে চেয়েছিল। কিল চড় বিনিময়ে জুটেছিল।

"শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া
যেমন কর্ম ফলল ধর্ম
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।"

কামকাতর, পরস্ত্রী লোলুপ, ধর্মের ধ্বজাধারীদের দ্বারা যুগে যুগে মাতৃরূপে নারীরা ধর্ষিতা হচ্ছেন। এইরকম একটি গল্প লেখেন আফসার। গল্পের নাম 'গোনাহ'। জয়নুদ্দিন কাজীর বাড়িতে মিলাদ মহফিল বসবে। কলকাতা থেকে মৌলানা এসেছেন। চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছেন মাত্র। জয়নুদ্দিন—এর স্ত্রী ও পুত্র মালেক ও তাদের পরিচারিকা ফরিদার তাই খুব কর্মব্যস্ততা। ফরিদা রান্নাবান্না থেকে বাড়ির সব কাজ সামলায়। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অনেকেই চায়। জয়নুদ্দিনের ছেলে মালেক। যে কিনা তার মায়ের কাছ শান্ত ছেলে, মেহফিলের দিন আসরের বাইরে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

অন্ধকার পেঁপে গাছতলায় ফরিদাকে টেনে নিয়ে গিয়ে 'মিথুন মূর্তি' হয়ে যায়। একদিকে মৌলানা ইসলামের কথা বলে, নামাজ-রোজা হজ-জাকাত—এর কথা বলে, অন্যদিকে নারীর প্রতি লোলুপতা তার কম নয়। আফসার চমৎকার বর্ণনায় ছদ্মবেশী ধার্মিকদের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দিয়েছেন এই গল্পে। একদিকে নারী তার দৈহিক শ্রম দিয়ে পরিবারের কাজ করে দেয় দু'মুঠো অন্নের বিনিময়, অন্যদিকে রশিদ, মালেকরা তার দেহের টানে ছুটে আসে তাকে ভোগ করার জন্য।

নারী মানে কন্যা, জায়া, জননী — সৃষ্টির কাজে সে সবসময় ব্যস্ত। ভাঙতে নয়, ভালোবাসে সে। স্বামী, সংসার সন্তানকে পালন করে নীরবে। নিজের পরিবারের মুখে অন্ন তুলে ধরে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। বিনিময়ে সংসারে লাথি ঝাঁটা, অসম্মান মুখ বুজে সহ্য করে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বাঙালি পরিবারে সেই মায়েদের বোনদের কন্যাদের কথা লিখেছেন যত্ন করে। আফসারও তাঁর গল্পে এমন এক নারীর কথা বলেন — যার নাম নমিতা। নমিতার স্বামী অবিনাশ মদখোর—মাতাল। মদখেয়ে স্ত্রী নমিতাকে পেটায় অবিনাশ।

"প্রায় প্রতিরাতেই অবিনাশ দাস মদ খেয়ে এসে ঝামেলা পাকায়। নমিতার সঙ্গে প্রতি রাত্রেই টানাহেঁচড়া দাপাদাপি চলে। গায়ে হাত দেয় নমিতার। আলফাল গালাগালি দেয়।"[৪]

এই সংসারে কদর্যতার ভেতরও নমিতা হাসে, রীতার সঙ্গে হাসি বিনিময় করে। পরের দিন সেজেগুজে মদখোর স্বামীর সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ে স্বাভাবিকভাবে, যেন আগের দিন কিছুই হয়নি। গল্পের নাম 'কারা যেন রঙিন ঘুড়ি ওড়ায় নীল আকাশে'।

নারী শুধু সহ্য করবে না, প্রতিবাদ করবে। সে তার মনের বিরুদ্ধে বেশিদিন চুপ করে বসে থাকবে না। স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে আসে সোহিনী সুহাসের কাছে। এক কামরার ফ্ল্যাট, তবু তো শান্তি আছে। দুজনের ভালবাসায় মাখামাখি হয়ে আছে সোহিনী সুখী। স্বামীর অত্যাচারে বাড়ি ছেড়ে চলে আসার গল্প 'নীল ডুরে শাড়ি আর এলো খোঁপা'। বাবা মার আদরের পরিবার থেকে আর দশটা মেয়ের মতোই সোহিনী শ্বশুর বাড়ি যায়। কিন্তু স্বামী 'অষ্টপ্রহর তাকে গঞ্জনা দিত, মারত'।[৫] বাবা, ভাইয়ের যত্ন করতে পারত না বিয়ের পর। কিন্তু তার মন খারাপের দিন শেষ হয় সুহাসের কাছে এসে। আজ সে 'শীতের দিনে মিষ্টি রোদ্দুরের মতো।'[৬] সোহিনী আজ সুহাসের ভাড়া বাড়িতে। কারণ দুজনের পরিবারে এই বিষয়টা মেনে নেয়নি। তবু তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। সাহসে ভর করে দুজনে Live in করে। নারীকে এভাবে সাহসিনী করে আঁকেন আফসার। সমাজ, সংসার, লোকলজ্জার উপরে যে ব্যক্তিগত ভালো লাগা, শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয় — একথাই বুঝাতে চেয়েছেন গল্পকার। এটি স্বেচ্ছাচারিতা নয়, প্রতিবাদ ও উত্তরণের গল্প।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বয়স মস্ত বড় ফ্যাক্টার। এই পার্থক্য অনেক সময় একে অপরের চাওয়া-পাওয়া ও কামনা-বাসনার মধ্যে সংকট ডেকে আনে। ফলে দাম্পত্য জীবনে চরম অশান্তি নেমে আসতে পারে — এরই গল্প 'সন্ধ্যার মেঘমালা'। শোভানের প্রথমা স্ত্রী মারা

যায় দুর্ঘটনায়। নাম তার রুকসানা। তার পরে শোভান বিয়ে করে না। গল্পকার বলেন— সংগ্রহ করে আফসানাকে। আফসানারও প্রথম স্বামী মারা যায় ব্লাড ক্যান্সারে। ওর বয়স বাইশ। শোভানের বয়স পঁয়তাল্লিশ। প্রায় দ্বিগুণ। ওদের সংসারে নেহা — শোভানের প্রথম পক্ষের কন্যা বর্তমান।

অসম বয়স যে আফসানার জীবনে নানা অতৃপ্তি বয়ে আনে তা জানা যায় নিহার শিক্ষক মনোদীপের প্রতি তার দুর্বলতা বা প্রেম প্রেম ভাবের জন্য। বছর পঁয়তাল্লিশ যা বোঝে না তেরোর কিশোরী তা বোঝে। চাপা অভিমানে সে গুমরাতে থাকে। ভোরে ছাদে যেতে, কিংবা সন্ধ্যায় সব ঘরের আলো জ্বেলে দিতে ইচ্ছে করে আফসানার। একথা শোভান জানে অনেক পরে। বিবাহ যা শুধু শারীরিক সম্পর্ক বা সন্তান উৎপাদনের জন্য নয়, শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে মন, সেই মনের ক্ষিদে না মিটলে মানুষ একসময় বিপথগামী হয়ে যায় — তার প্রমাণ আফসানা। একদিন তার স্বামীকে বলে বসে — 'তোমার আছে নাকি যে বুঝবে? তুমি কিছুই বোঝনা।' স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা একদিন শোভান শুনতে পায়। তা জানার পর ক্ষুব্ধ হয়। এই বিষয় আফসানা বোঝে তা সত্ত্বেও রবিবারে বাড়িতে মনোদীপকে নেমন্তন্ন করার কথা বলে স্বামীকে। এখানেই নারীর খোলোস ছেড়ে বেরিয়ে সমাজ সংসারকে উপেক্ষা করে ব্যক্তির ইচ্ছে অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যে দিয়ে নারী বিপ্লব জাগরণের ছবি এঁকেছেন গল্পকার।

মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হয়ে লেখক ঐ সমাজের নানা বিষয়কে, কুসংস্কার, অন্ধ গোঁড়ামিকে কাছ থেকে দেখেছিলেন ও দেখার পর গল্পে রূপ দেন, বিষয়গুলিকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন শোধনের উদ্দেশ্যে। তিনি সুস্থ, রুচিশীল, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা দেখতে চান। বোরখা পরে শিক্ষিত হওয়া গেলেও আধুনিক উন্নততর সমাজে বা কর্মস্থলে তা উপযুক্ত নয় 'এলাটিং বেলাটিং সইলো' গল্পে লেখক তা বলতে চান। বোরখার অন্ধকার থেকে মেয়েদের বের করে আনতে চান লেখক। শুধু তাই নয় অল্প বয়সে হাসিনার বিয়ে হয়েছিল। আরিফ পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। পনেরো দিনের ছুটিতে কুয়েত থেকে এসে বিয়ে হয় তাদের। তারপর শ্বশুর— শাশুড়ির কাছে হাসিনাকে রেখে আরিফ চলে যায়। মাঝে মাঝে ফোন করে এছাড়া কিছু না। সদ্য বিবাহিতের মনের কষ্টের কথা কেউ জানে না। "মূক পাথর সে। তার কোনো ভাষা নেই। ভাষার আশ্রয় খুঁজতে চায় না"।[৭]

নিজেকে তৈরি করে আধুনিক হয়ে সেও কুয়েতে যেতে পারে। তাই বি.পি.ও অফিসে আসে। কিন্তু বোরখা পরে। সে এই পোশাক পরেছে এটি পছন্দ করেছে বলে। এই পোশাক নিয়ে গল্পকার চমৎকার ব্যাখ্যা দেন —

"পছন্দের চেয়ে এই পোশাকের প্রতি তার বিশ্বাস তৈরি হয়েছে বলে। তার সঙ্গে একটা ধর্মবিশ্বাসও জড়িত। অনেক সময় যারা বোরখা পরে, তাদের পরতে বাধ্য হতে হয় যে তা নয়, তাদের নিজেদেরও পছন্দ।"[৮]

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

প্রোষিতভর্তৃকা হাসিনা ধীরে ধীরে কিভাবে নিজেকে বদলে ফেলে ও অন্য পাঁচজনের সঙ্গে খোলা মনে কথা বলে। আড়ষ্টতা কাটিয়ে সাহসিনী হয়—তার কথাই গল্পকার বলেছেন। গল্পে আর একটি বিষয় চমৎকার প্রকাশিত। মুসলিম সমাজে বোরখা পরিহিতা শিক্ষিতা বধূকে টেনে আনা হল বাড়ির গন্ডীর বাইরে যেখানে স্বতস্ফূর্ত সামাজিকতার মেলবন্ধন আছে।

সন্দেহ এমন এক রোগ যার ফলে সুন্দর দাম্পত্য জীবন নষ্ট হয়ে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হতে হয়। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বিশ্বাসের ওপর ভরসা রেখে নবদম্পতি রাজীব ও মণিদীপা পথ চলতে শুরু করে। কিন্তু সেই নবদম্পতির হৃদয়ে অবিশ্বাস জন্মে তখনই টানাপোড়েন তৈরি হয়। এই টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত নারী পরাজিত হয়। রাজীবের হাতে মনিদীপা খুন হয়। এ গল্প তো আমাদের চিরচেনা। বিশ্বাসভঙ্গে নারীকে সর্বদা দায়ী করা হয় এ গল্প তো সে কথাই তুলে ধরে। 'সুখের অন্দর মহল' সে কারণে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। সবচেয়ে বড় কথা এটি জীবনের গল্প।

দেবর—বউদির মধুর সম্পর্ককে ছিন্ন করে যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির গল্প 'রক্ত লজ্জা'। স্বামীর কাজের জন্য শহরে চলে যাওয়ার পর ফাতেমা ও হাসান—এর শরীরি প্রেম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গল্পকার পুরুষের কাপুরুষতা দেখাচ্ছেন যখন ধরা পড়ে যাওয়ার পর হাসান কোরাণ ছুঁয়ে এই সম্পর্ককে অস্বীকার করে।

সাম্প্রতিক কালে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী নারী—পুরুষ উভয়ে যে বিবাহ বহির্ভূত উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত তার পরিচয় আছে 'সুধা অ্যাপার্টমেন্ট' গল্পে। লাগাম ছাড়া জীবন, অবৈধ প্রেম এই বিষয়গুলিকে গল্পে ফুটিয়েছেন গল্পকার।

সবশেষে বলব আফসার প্রকৃতই নারী মনস্তত্বের সুনিপুণ রূপকার। এই গল্পগুলি তাঁর সমাজ বাস্তবতার পরিচায়ক।

তথ্যসূত্র :

(১) ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৬
(২) গল্প দুই নারী, আফসার আমেদ, পঞ্চাশটি শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ. ১৭৬
(৩) ঐ
(৪) কারা যেন রঙিন ঘুড়ি ওড়ায় দূর আকাশে, পৃ. ১৭২
(৫) নীল ডুরে শাড়ি আর এলো খোপা, পৃ. ৩৯৮
(৬) ঐ
(৭) এলাটিং বেলাটিং সইলো, পৃ. ৩৫২
(৮) ঐ, পৃ. ৩৫৪

আফসার আমেদের ছোটোগল্প : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে যাত্রা

পঞ্চানন নস্কর

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে আফসার আমেদ(১৯৫৯-২০১৮) এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। গত শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষে যখন তাঁর জন্ম, তাঁর কাকা— জ্যাঠা-পিসিরা এ-পারের বসত উঠিয়ে চলে গেছেন ও-পার বাংলায়। সেই স্রোতের টানে তাঁর বাবাও ঠিক করেছিলেন চলে যাবেন, বাদ সেধেছিলেন আফসারের মা সেখ খলিলুর। রয়ে গেলেন হাওড়ার কড়িয়া, বাইনানেই। ফলে আফসার আমেদের জীবন হাসান আজিজুল হকের- 'আগুন পাখি' হল না।

আফসার আমেদকে নিয়ে প্রায় নিয়মিত কথা বলে গেছেন দেবেশ রায়, অমর মিত্র প্রমুখরা। দেবেশ রায় বলেছেন — "বাংলা গল্প-উপন্যাসের জগৎ প্রধানত বর্ণ হিন্দু লেখকদের রচনায় পুষ্ট হিন্দু সমাজেরই জগৎ-এ কথা বৃহদাংশে সত্য"।[১] তাঁর গল্প-উপন্যাসের এই ভুবনে মুসলিম পল্লীর ঘের-দেওয়া গড়ন, তার ভিতরকার অলিগলি, অলিগলির সঙ্গে বড়ো রাস্তার সংযোগের ভূগোল, ইমাম—বুজুর্গ-মুয়াজ্জিনদের কর্তৃত্ব বিন্যাস, দেবেশ রায়ের কথায় এসবের আখ্যান তো গ্রহান্তরের আখ্যান এবং আফসার আমেদ সেই গ্রহান্তরের আখ্যানকার। তাঁর সম্পর্কে হিন্দোল ভট্টাচার্য বলেছেন- "আফসার আমেদ ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই সেই নিখোঁজ মানুষটি, যিনি এক আধুনিক রূপকথার মতোই আমাদের এই বাংলা সাহিত্যে এনে দিয়েছিলেন নিম্নবর্গ ও মুসলিম সমাজের ভাষ্য, তাদের জীবন যন্ত্রণা, কাহিনি ও সমাজের অন্দরমহলের কথা"।[২] তিনি নিজেও কবুল করেছেন সে কথা- "জন্মগতভাবে আমি মুসলমান। আমি মুসলমান সমাজেই বড় হয়েছি। অনিবার্যভাবে আমার লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে মুসলমান জীবন। মুসলমান সমাজ আমার লেখায় এসেছে 'মানবিক' অন্তর্মূল সন্ধানের দিক থেকে"।[৩] আফসার আমেদ শিকড়ের গহন থেকে গহনতরের সন্ধানে ক্রমশ বাঁধা রেখেছেন তাঁর যাবতীয় আখ্যান আবাদ। সূচনা থেকেই সক্ষম হয়েছিলেন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্মাণে, আর গল্প বলার এই বিশেষ মাধ্যমটি লেখক পরিকল্পিতভাবেই নির্বাচন করেছেন। যার সঙ্গে মিশে আছে মুসলমান সমাজ-শরীর, অখণ্ড সমাজ সত্তা, যা মুসলিম বিশ্বের এক অন্বয় খুঁজতে সাহায্য করেছে।

আফসার আমেদের জীবনের অজস্র ঘটনা - উপাদান থাকলেও জীবনের ইতিবৃত্ত কোথাও লেখেননি। গল্প - উপন্যাসই লিখবেন তা কাঁচা বয়সেই স্থির করে নিয়েছিলেন। কালি ও কলম নিয়েই কাটিয়ে দেবেন সারাটা জীবন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন- "আর কিছু পারি না বলে গল্প লিখতে শুরু করলাম। গল্প বা উপন্যাস লেখার ভেতর দিয়ে আমি কিছু বলতে চাই বলেই এই কলমচিগিরি। এখন কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়ার

উপান্তে পৌঁছে লেখাকে অবলম্বন করে শেষ জীবনটা নির্বাহ করতে চাই। কেননা বলার অনেক কিছু বাকি আছে, অধরা থেকে গেছে অনেক কিছু। নতুন আঙ্গিকের চর্চা করা যেতে পারে। আমার কলম সেভাবে লিখিয়ে নেবে"।[৪] আর এই স্থির আভিপ্রায়ে ১৯৮১ সালে পত্রিকায় এবং পরের বছরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'ঘরগেরস্তি' থেকে ২০১৪ সালে প্রকাশ পাওয়া যে ত্রিরিশ-বত্রিশটি উপন্যাস এবং ২০১৬ অবধি 'দাঁতের ব্যথার চেয়ে বেশি শুশ্রুষা' পর্যন্ত যে শ-তিনেক ছোটোগল্প লিখেছেন সেখানে আফসার আমেদের আখ্যান অবদানের প্রধান কথা হল তাঁর গল্প বলার কেরামতি। কখনও তিনি সত্য এবং মিথ্যার একটি পাক তৈরি করেছেন, কখনও তৈরি হয়েছে মিথ্যারই এক গূঢ় বয়নশৃঙ্খলা, ঘটনা-চরিত্র ক্রমশ ভূমিকা হয়ে উঠবে, অথবা একটি চরিত্র অনেকগুলি চরিত্রের সঙ্গে ক্রমশ বদলে নেবে এবং অবশেষে গাঢ় আলস্যে পড়ে থাকবে এক কথাকুণ্ডলী। প্রতিটা গল্পই একে অপরের থেকে আলাদা। তাঁর লেখা অজস্র ছোটোগল্পের মধ্যে কয়েকটি হল- 'পক্ষীরাজের ডানা', 'জিন্নতবেগমের বিরহমিলন', 'হাড়', 'আদিম', 'নোঙর', 'অর্থহীন কথা বলার নির্ভরতা', 'জনস্রোত জলস্রোত', 'সুখ অসুখ', 'একটি গিটার', 'এলাটিং বেলাটিং সইলো', 'নষ্ট দুপুর', 'অভিসার', 'সন্ধ্যার মেঘমালা'। উপন্যাসও লিখেছেন- 'সানু আলির নিজের জমি', 'স্বপ্নসম্ভাষ', 'খণ্ড বিখণ্ড', 'আত্মপরিচয়', 'ধানজ্যোৎস্না', 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা', 'অশ্রুমঙ্গল', 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' ইত্যাদি।

প্রথম জীবনে কবিতা দিয়ে শুরু করলেও অচিরেই গদ্য লিখতে শুরু করেন। মূলত তিনি লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক। তাঁর লেখা গল্পগুলো 'সারস্বত', 'বারোমাস', 'কালান্তর', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। 'বাঙালি মুসলমানের বিয়ের গান' বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে ব্যাপক পরিচিতি ঘটায়। অভিন্ন বাঙালি জাতিসত্তার মানস, সংস্কৃতি, ভাষা ঐতিহ্যের সগোত্র যাত্রাপথকে নির্দেশ করে বইটিতে সমাজ আলেখ্যর অভিমুখ যে যে সত্য ব্যক্ত করেছে, জীবনাকাঙ্ক্ষার আকুলতা, বাসনা উন্মুল করেছে, সমাজবেত্তাদের কাছে তা প্রামাণিক হয়ে উঠেছে। তিনি ছিলেন 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' যিনি বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ ও মুসলিম সমাজের ভাষ্য, জীবন যন্ত্রণা, কাহিনি ও সমাজের অন্দরমহলের রূপসজ্জাকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর কথন সোজাসাপ্টা, ন্যারেটিভ নয়। মূলত, বাস্তবের এক পরাবাস্তবিক রূপের মধ্যেই তিনি বাস্তবের কঠিন কাঠামোগুলিকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে, 'ঘরগেরস্তি', 'দ্বিতীয় বিবি', 'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাসে আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এনেছিলেন বলা যায়। তাঁর ছোটোগল্পেও ঘটনার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ক্যানভাস তৈরি হয়েছে, তা যেন গল্পগুলির মধ্যে অন্য এক বৃত্তান্ত ফুটে ওঠে, পাঠককে চলে যেতে হয় তার পাঠক্রিয়ার মধ্যে। পাশাপাশি উঠে আসে আরেকধরনের কাহিনি। 'শুধুমাত্র মৃত্যু অপেক্ষায় যাওয়া', 'গোনাই', 'জিন্নতবেগমের বিরহ

মিলন', 'একটি গিটার', 'সন্ধ্যার মেঘমালা', 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' প্রভৃতি ছোটোগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে কথন—এর ধারা বদলে দিয়েছিল।

'একটি গিটার' গল্পে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা ও চর্চার দ্বারা প্রগতিশীল এক মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলের কথা ফুটে উঠেছে। পরিবারের উচ্চশিক্ষিত মেয়ে নেহা পরিবারকে উপেক্ষা করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এক যুবককে বিয়ে করে। তার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল তার ভাই আবিদ। 'প্রেমের আবার হিন্দু-মুসলমান কী?'[৫] দিদির স্বাধীন সিদ্ধান্তের পাশাপাশি পরিবারের আবেগও তার কাছে সমান মূল্যবান। তাই পরিবারের শোকার্ত মানুষগুলির জীবনে ছন্দ ফিরিয়ে আনতে আশ্রয় নেয় প্রিয় স্প্যানিশ গিটারের কাছে। তার সুরের মূর্ছনায় সকলেই ফিরে পায় জীবনের ছন্দ — "গিটার হাতে কৃষ্ণচূড়া ফুল ছোঁয় আবিদ।. আর বাজায় একটা সুর। দাদির চোখে আনন্দ ফুটে ওঠে"।[৬] ধর্মীয় পরিচয়ের গণ্ডীকে অতিক্রম করে মানুষের পরিচয়ে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

আফসার আমেদের অন্যতম গল্প 'শুধুমাত্র মৃত্যু অপেক্ষায় যাওয়া'। চরিত্র, পরিবেশ সাদামাটা, এক যুবককে এস.এস.কে.এম হাসপাতালে রাত কাটাতে হবে যে ব্যক্তির সঙ্গে তাকে সে চেনে না। গল্পের যুবকের নাম সুহাস মাইতি। সে কলকাতার মেসে টিউশন করে জীবন চালায়। শীত রাত, সম্পর্কহীনতা, জনৈক অগ্নিদগ্ধা মহিলার মৃত্যুর খবর পাওয়ার অপেক্ষা তাকে যেন এক আবেশে জড়িয়ে রাখে। এই গল্পে চরিত্রের মানসিক অন্তর্লীনতা আমাদের আবিষ্ট রাখে, বিশ্বাস — অবিশ্বাসের সীমারেখা কখন অতিক্রান্ত হয়, সচেতন পাঠক ও তা খেয়াল করেন না। আফসার আমেদের সফলতা বোধহয় এখানেই।

আফসার আমেদ কোনও নির্ধারিত নীতি ও তত্ত্বের বাঁধনকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "গল্প লেখার ক্রাফট বা লেখার কৌশল আমাকে ধরেনি, আমি নিজেই লিখতে লিখতে তৈরি করেছি। তিনশোটি গল্প লিখেছি, একটা আর — একটার মতো নয়"।[৭]

'সমুদ্রের নিলয়' গল্পে আঠারো বছরের আলেয়া আর পঞ্চাশোর্ধ গহর আলির দাম্পত্য জীবনের এক বিচিত্র কাহিনি এখানে উপস্থাপিত। বহুবিবাহ, অসম বিবাহ, পুরুষতন্ত্রের দাপট, লোভ, যৌনতা, হিংস্রতা ইত্যাদি সংকেতের তীব্রতায় উদ্ভাসিত। আফসার আমেদ বহতা সময়ের কথাকার তাই বর্তমানের কদর্যতা ও বিভিন্ন সংকট তাঁর রচনাকে অবলম্বন করে আবির্ভূত। বর্তমান সমস্যা — জর্জরিত বিশ্বের বিচিত্র বিষয় তাঁর গল্পের পট হিসেবে এসে পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। তাঁর কথার স্রোত বর্তমান সময়কে ঘিরেই আবর্তিত ও বিবর্তিত, যার ফলশ্রুতি বিশ্বায়নের বেনোজল। 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' গল্পে বিশ্বায়নের প্রভাবে সংঘটিত এক মুসলিম সমাজের পুরুষদের দ্বারা চালিত ধর্মীয় পোশাকে মোড়া হাসিনার মানবীতে উত্তরণের কাহিনি বর্ণিত। কালো বোরখার আড়ালে ঢাকা উনিশ বছরের

হাসিনাকে বিপিও কেন্দ্রে আসতে দেখে কর্মীদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়। তবে প্রথম ক্লাসে গিয়ে তার ধর্মীয় আবরণে মোড়া মানবীসত্তা উপলব্ধি করতে পারে জীবনের মানে- "হাসিনা চোখের দৃষ্টি শুধু খুলে রেখে বোরখায় বন্দী হয়ে বসে থাকে। গা কেমন শির শির করে। অদ্ভুত সম্ভ্রম-জাগানো তাদের ব্যস্তভঙ্গি। সোহম ও সুলগ্না তাদের শেখাচ্ছে। নিকটপ্রাণতা তা একভাবে হাসিনাকে আলোড়িত করল। বুঝতে পারল, বাঁচার সবকিছু এদের মধ্যে আছে"।[৮] কেউ তাকে বদলানোর কথা বলেনি। একসময় পরিস্থিতির দ্বারা সে নিজেই নিজেকে বদলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শেখে।

নতুন কিছু শেখার আনন্দ হাসিনা সকলের সঙ্গে ভাগ করতে চাইলেও অন্তরায় হয় বোরখা। নিজেকে উন্মুক্ত করার বাসনা জাগে। তানিয়াদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচরিতায় জানা যায় সে চুলে কন্ডিশনার লাগায়। জানা যায় তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বপ্নের কথা। তার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে, তানিয়ার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে 'তারা দুজনের হাত ধরে কিছুক্ষন এলেটিং বেলেটিং খেলেছে'।[৯] এইভাবে নিজেকে আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই হাসিনার মনের রূপান্তর ঘটতে থাকে। পরিবর্তনের ছোঁয়া তাকে কেবল বাহ্যিকভাবে নয়, মননের গভীরে প্রবেশ করে তার সুপ্ত স্বাধীনসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। উপযুক্ত পরিবেশে সে তার প্রকৃত সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছে। ঘটেছে তার চরিত্রের রূপান্তর। জীবনের রূপ-রস-গন্ধ উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে বাঁচার মানে সে খুঁজে পায়। সেই আনন্দের অনুভূতির তীব্রতার কাছে বোরখাও তুচ্ছ হয়ে যায়- "সেদিন ক্লাস শেষ হতে বেশ কিছুটা দেরি হয়েছিল। আর ফিরে যাওয়ার সময় হাসিনা বোরখাটা নিয়ে যেতে ভুলে গেল"।[১০]

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার আলো-বাতাস গ্রামকেও স্পর্শ করেছে তীব্রভাবে। দূরদর্শন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেসবুক শব্দগুলো গ্রামের মাটিকেও কামড়ে ধরেছে। বিশ্ব আজ সকলের হাতের মুঠোয় বন্দী। ফলে গ্রামীণ সভ্যতা এখন আর পিছিয়ে নেই। প্রত্যেকের হাতে এখন স্মার্ট ফোন। আফসার আমেদের চোখে এই বিষয়গুলি এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাঁর 'সন্ধ্যার মেঘমালা' গল্পে মাতৃহারা নেহা পিতার দ্বিতীয়পক্ষ আফসানার প্রতিপক্ষ নয়, তার সই- "নতুন মাকে 'সই' বলে নেহা। দারুণ বন্ধুত্ব ওদের"।[১১] সম্পর্কের রসায়ন বদলে যাচ্ছে। এই বদল কেবল আফসানার সঙ্গেই নয়, পিতা-কন্যার বাক্যালাপেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। পার্থিব সুখের উপকরণ আফসানার থাকলেও নেই মনের খোরাক। স্বামী হিসেবে শোভান তা দিতে ব্যর্থ। কিন্তু আফসানা বিশ্বায়নের যুগে লালিত-পালিত হওয়া নারী। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুসলিম নারী নিজের মনের চাহিদাকে গুরুত্ব দিতে শিখেছে। নির্বোধ শোভান আফসানার মনের দরজায় পৌঁছাতে ব্যর্থ। খুব সহজভাবেই আবদার রেখেছিল মনোদীপকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর, কিন্তু শোভান তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা বললে আফসানা নেহার ক্ষতির কথা ভাবে। কিন্তু যখন আফসানার চরিত্রের দিকে

খারাপ ইঙ্গিত করে তখন গর্জে ওঠে "তোমার বোধ আছে যে বুঝবে ? তুমি কিছুই বোঝো না"।[১২] নারীর মনকে উপলব্ধি করার মানসিকতা শোভানের মতো পুরুষদের আজও তৈরি হয়নি। আফসানার এই হতাশাবোধ তার একার নয়, বর্তমান সমাজ পরিবেশে অনেক নারীর হৃদয়ের হাহাকার। এই যুগ যন্ত্রণা আজ গোটা বিশ্বের যন্ত্রণা।

আফসার আমেদ এভাবেই তাঁর গল্পভুবন নির্মাণ করে চলেছেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের একান্ত নিজস্ব সংকট, অনন্বয়, শূন্যতা, কূটাভাস তাঁর গল্পবীক্ষার প্রধান অবলম্বন। তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল বাঙালি মুসলমানের আত্মিক ভুবন আবিষ্কার ও তাকে শিল্পের পদবী দান। আধুনিক বিশ্বে যা যা উদ্ভাবন হচ্ছে এবং যে বিষয়গুলোকে ঘিরে মানুষ সমস্যা জর্জরিত তাঁর গল্পে সেই বিষয়গুলিও বেশি করে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর গল্পের নামকরণ, চরিত্র চিত্রণ, বিষয় ভাবনা, তাদের জীবনাচরণ ও মুখের ভাষা চলমান সময়ের ধারক ও বাহক, যা পাঠককে প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করে চলেছে। তাঁর গল্পে বিশ্বায়নের বান ডেকেছে। তাঁর কল্পনার বিষয়ও যেন বাস্তবের রূঢ়তায় মিশে একাকার হয়ে যায়। আফসার আমেদ এভাবেই তাঁর গল্পকে ভাঙেন ও গড়েন। আমরা পাঠক বিস্ময়াভিভূত হয়ে কেবল চেয়ে থাকি। শিল্পীর সার্থকতা বোধহয় এখানেই।

তথ্যসূত্র :

১. দৈনিক এইসময় (সম্পাদকীয়), রবিবার, ১২ আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৮
২. Bengali indian express.Com
৩. দৈনিক এইসময় (সম্পাদকীয়), রবিবার ১২ আগষ্ট ২০১৮, পৃ. ৮
৪. 'গল্পের ভুবন', আফসার আমেদ, সাক্ষাৎকার, অঘ্রাণ ১৪২৩
৫. আফসার আমেদ, 'একটি গিটার', 'আফসার আমেদ সেরা ৫০টি গল্প', পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ পাব্, ২০১৭, পৃ. ২৯৬
৬. তদেব, পৃ. ২৯৯
৭. 'গল্পের ভুবন', আফসার আমেদ, সাক্ষাৎকার, অঘ্রাণ ১৪২৩
৮. আফসার আমেদ, 'এলাটিং বেলাটিং সই লো', 'আফসার আমেদ সেরা ৫০টি গল্প', পুনর্মুদ্রন, কলকাতা, দে'জ পাব্, ২০১৭, পৃ. ৩৫৫
৯. তদেব, পৃ. ৩৫৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৬০
১১. আফসার আমেদ, 'সন্ধ্যার মেঘমালা', 'আফসার আমেদ সেরা ৫০টি গল্প', পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ পাব্, ২০১৭, পৃ. ৩৪৩
১২. তদেব, পৃ. ৩৪৫

প্রেমে অপ্রেমে আফসার আমেদের গল্প

সুবোধ মণ্ডল

বাংলা সাহিত্যের এক 'অন্য রকমের'[১] গল্পকার আফসার আমেদ। আফসার আমেদ বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে, তবে বাংলা গল্পের ধারায় তাঁর লেখা গল্পগুলো এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মুসলমান সমাজের সমস্যা-সংকটকে তিনি ভাষারূপ দেন। বিশেষত মুসলমান নারী সমাজের অন্দরের কথা শোনা যায় আফসার আমেদের লেখালেখির মধ্যে। তবে অল্প দিনের মধ্যে সম্প্রদায়ের গণ্ডী পেরিয়ে তিনি সামগ্রিকভাবে মানব সমাজের সমস্যা-সংকটকে তাঁর সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন। সাধারণত নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত জীবনকেই তিনি দেখতে চেয়েছেন। তবে যে জীবনকে তিনি তাঁর সাহিত্যের বিষয় করেছেন, যে জীবনকে তিনি দেখতে চেয়েছেন, তাকে সামগ্রিকভাবে তিনি দেখতে চেয়েছেন এবং পাঠককে সেভাবে দেখাতেও চেয়েছেন। আফসার আমেদের গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সোহারাব হোসেন বলেছেন,

"গল্পকার আফসার আমেদের স্বরুপ-স্বভাব-স্বকীয়তার আলোচনার আগে ওই বিশিষ্টতার ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা দরকার। বাংলা গল্প ষাটের দশকে এসে স্পষ্টত দুটি ধারায় ভাগ হয়ে যায়। একদিকে ছিল নরনারীর দেহ, দেহজ প্রেম-কামনা, দেহকেন্দ্রিক আলপনা কল্পনা, প্রেম-রোমান্স-রোমান্টিকতার চৌষট্টি কলাবিদ্যার পরতের উন্মোচন। এসবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল সাহিত্যকে বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করে, সাহিত্যের নির্দিষ্ট বাজার গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে। অন্যদিকে ছোটগল্পের আর একটি ধারা অবস্থান করছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। এই ধারার অবলম্বন হল পূর্ণাঙ্গ মানব দেহমানুষের মন, মনন, লড়াই, আপস, প্রবৃত্তি, সমাজ, আন্দোলন সমেত সম্পূর্ণ মানুষের আত্মার উন্মেষণাতে এই ধারা বিশিষ্ট হল। এঁরা গল্পের নতুন আস্তানা নির্মাণ করলেন। এই আস্তানার পরিকাঠামো ও চালচিত্র গড়ে উঠল সততা, মুক্তি, জীবনের পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতা, মানুষের চিন্তার নতুন বিন্যাস, শিল্পের ও সমাজের সত্যমূর্তি দেখার অভ্যাস ও সাহসে। এই ধারা বাংলা গল্পের আসরে নতুন পথের ইশারা ছিল। মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, বিমল কর, অসীম রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিয়দংশে সমরেশ বসু প্রমুখ এই ভিন্নমাত্রায় সাহিত্যধারাকে পুষ্ট করলেন। ষাটের পর সত্তর এসে এই ধারাটি বলবান হল, বিবর্তিত হল। সত্তরের লেখকরা জীবনের ও জগতের মুখোশকে খুললেন, ভাঙলেন এবং সেই ভাঙা-ছেঁড়া মুখোশের মধ্য দিয়ে মানুষের সত্য মুখটিকে মূর্ত করলেন। সত্তরের লেখকরা নির্মাণ করলেন ভূমিপুত্র মানুষের মুখকে মানুষের লড়াই করা, লাঞ্ছিত হওয়া, গুলি খাওয়া, মাটিতে লোটানো, মাটি থেকে উঠে দাঁড়ানো, বাঁকাচোরা, চোয়াড়ে চোয়াড়ে

এবং সত্য মানুষের মুখকে। এই ধারায় উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের ছবি রাখলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন ঘোষ, অভিজৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, কিন্নর রায়, রক্তিম ইসলাম প্রমুখ। আফসার আমেদ এই ধারার সার্থক উত্তরসূরি।"[২]

আফসার আমেদের সাহিত্যচর্চা শুরু ১৯৮২ সালে 'ঘরগেরস্তি' উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। এরপর 'বসবাস', 'সানু আলির নিজের জমি', 'আত্মপরিচয়', 'স্বপ্ন সম্ভাষ', 'খণ্ডবিখণ্ড', অন্তঃপুর', 'ধানজ্যোৎস্না', 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ', 'ব্যথা খুঁজে আনা', 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক', 'দ্বিতীয় বিবি', 'এক আশ্চর্য্য বশীকরণ কিস্‌সা', 'অলৌকিক দিন রাত' 'খোঁজ', 'অশ্রুমঙ্গল', 'জীবন জুড়ে প্রহর', 'মেটিয়া ব্রুজের কিস্‌সা', 'সেই নিখোঁজ মানুষটা', 'হিরে ভিখারিনী ও সুন্দরী রমণী কিস্‌সা'প্রভৃতি প্রায় ত্রিশটি উপন্যাস লিখেছেন, লিখেছেন তিন শতাধিক গল্প। 'আফসার আমেদের ছোটগল্প', 'প্রেমে অপ্রেমে একটি বছর', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তাঁর গল্পগুলি। সাহিত্যচর্চার জন্য বিভিন্ন সময়ে বহু পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা' উপন্যাসের জন্য 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার', 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসের জন্য 'সোপান' পুরস্কার, উর্দু ভাষায় লেখা 'সাড়ে তিন হাত ভূমি' উপন্যাসের অনুবাদ করে পেয়েছেন 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার, 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসের জন্য 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার ও গল্প লেখার জন্য পেয়েছেন 'সোমেন চন্দ পুরস্কার'।

উপন্যাস সাহিত্যে আফসার আমেদের প্রতিভা বিশেষ প্রচারিত ও জনপ্রিয় হলেও বাংলা সাহিত্যের গল্পের জগতে তার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যাবে না। সময়ের দাবী মেনে তিনি মানুষের আনন্দ-বেদনা-দুঃখকে ভাষারূপ দিয়েছেন। আফসার আমেদের গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে একুশ শতাব্দীর মানব-মানবীর প্রেম। বিশ্বায়ন পরবর্তী বিশ্বের মানব-মানবীর প্রেমকে আফসার আমেদ একেবারে নির্মোহ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন। বিশ্বায়ণ পরবর্তী 'একলা ঘরের দেশে'র মানুষরা 'একলা থাকার অভ্যেস' করে নিয়েছে। বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদেরকে গণ্ডিবদ্ধ করেছে স্বনিয়ন্ত্রিত পরিসরে। ব্যস্ততম পৃথিবীর যান্ত্রিক মানুষদের ভালোলাগা, ভালোবাসা, প্রেম-প্রণয়-বিরহের চরিত্র গেছে পাল্টে। আধুনিক বিশ্বের অত্যাধুনিক মানুষদের মনস্তত্ত্বের জটিল স্তরগুলিকে একটু একটু করে উন্মোচন করার মাধ্যমে মূল বিন্দুতে পৌঁছতে চেয়েছেন আফসার আমেদ। তাই তাঁর গল্পে প্রেমের এক স্বতন্ত্র চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

আফসার আমেদ তাঁর গল্পে নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের নানাবিধ সমস্যাকে ভাষারূপ দিয়েছেন। বিশেষত মানুষের হৃদয় সম্পর্কের জটিলতা, গার্হস্থ জীবনের সমস্যা ও সংকটকে তিনি তুলে ধরেছেন গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে। বিশ্বায়নপরবর্তী সময়ের ব্যস্ততম

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

মানুষের হৃদয়ের অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন তিনি নিজের মতো করে। আধুনিক সভ্যতার অত্যাধুনিক মানুষের হৃদয়ের জটিলতা, অমানবিকতা, অবসাদ, বিষণ্ণতাকে অনুসন্ধান করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিতে। মানুষের হৃদয় সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের জটিলতা, প্রেম, বিরহ, বিষণ্ণতা, ভালোবাসার জটিলতাকে সময়ের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ কারণে তাঁর সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে মানুষের ভাঙ-গড়া সংসার জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। দেখা যায় নর-নারীর প্রেম-বিরহের নানাবিধ চিত্র। প্রেমে-অপ্রেমে তাঁর গল্পের জগৎ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

আফসার আমেদ 'বিরহ' গল্পে সইফু নামের এক হতদরিদ্র মানুষের অভিনব জীবন কাহিনি তুলে ধরেছেন। সইফু এলাকায় এলাকায় গিয়ে ঝালাইয়ের কাজ করে। ঝালাইয়ের কাজ করতে সে আমতা থেকে সুদূর বীরভূমে চলে যায়। এরপর সেখান থেকে রামপুরহাট। রামপুরহাটে গিয়ে পাথরের লরিতে কাজ করে পয়সা কামাতে থাকে এবং সে পয়সায় সাট্টা খেলা শুরু করে সইফু। এভাবে সেখানে প্রায় পাঁচ বছর থাকতে থাকতে স্ত্রী বদরনকে ভুলে যায় সইফু। গ্রামে গুজব রটে যায় বাংলাদেশে গিয়ে মারা গেছে সে। আর তাই তার স্ত্রীকে আবার বিয়ের ব্যবস্থা করে তার শ্বশুরেরা। সইফু গ্রামে এসে জানতে পারে তার স্ত্রীকে আবার বিয়ে দিয়েছে বিপত্নীক হানিফের সঙ্গে। 'সইফু বদরনকে তার বউ হিসেবেই রেখে গিয়েছিল। তারপর বদরন অন্যের বউ হয়ে যায় কি উপায়ে? আসলে বদরন ন্যায্যত এখনো তার বউ। কিন্তু বদরন তার ঘরে নেই। তার অপেক্ষায় নেই। সইফুর কাছ থেকে সে মন ফিরিয়ে নিয়েছে। ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে যায় সইফু'[৩]। সে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে স্ত্রী বদরনকে। আজব চরিত্রের মানুষ এই সইফু। সে ভাবে তার নিজের বউ বদরন যদি অন্য কারোর বউ হয়ে যায় তবে তো তার কিছু করার নেই। অসহায় হয়ে সে ঠিক করে নেয়, 'পাঁচ বছর যখন বদরনকে ছেড়েছিল, সারা জীবনই বদরনকে ছেড়ে থাকবে'[৪]। পাঁচ বছর পর নিজের বাসভূমিতে ফিরে সে লক্ষ্য করে নিজের জন্মভূমির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। আর জন্মভূমির বদলের যাওয়ার সঙ্গে সে তুলনা করে স্ত্রী বদরনের পরিচয় বদলে যাওয়াকে। আপনভোলা এই মানুষটি তার জন্মভূমির পরিবর্তন বদলে যাওয়াকে লক্ষ্য করে মেনে নিতে থাকে বদরনের পরিচয়ের বদলে যাওয়াকে :

"বদরন তার আর বউ নয়। সইফুর হঠাৎই মনে হয়। এই প্রেক্ষিতে সেটা না একটা কেউ কারো বউ হয়েই থাকে। বদরন কারো বউ। পাঁচ বছর বদরনকে ছেড়ে থেকে, পাঁচ বছর পরে ফিরে এসে একইভাবে বদরনকে দেখবে তা হয় না। বদরনের অবস্থান বদলে যেতে বাধ্য। যেমন রকম আমতা শহর বদলে গেছে। এই বদলের মধ্যেই নিজেকে সঁপে দিচ্ছিল সইফু। মেনে নিচ্ছিল বদরনের অপ্রাপ্তিকে। এটা একটা অভাববোধ ছাড়া কিছু নয়।"[৫]

এখানে আফসার আমেদ উদাসীন সইফুর পরিবার ও সংসারের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও তার ফলস্বরূপ তার সংসার ভেঙে যাওয়ার এক ট্র্যাজিক পরিণতিকে দেখাতে চেয়েছেন। অবশ্য এ পরিণতির জন্য সইফুর বিশেষ আক্ষেপ নেই। পেটের দায়ে দীর্ঘদিন স্ত্রীকে ছেড়ে থাকতে থাকতে স্ত্রীর প্রতি তার আবেগ, উন্মাদনা কেটে গেছে। স্ত্রীর প্রতি তার প্রেম-ভালোবাসা-মোহ আর বিশেষ নেই। জীবনের কঠিন পথ চলতে চলতে সে জীবনের বাস্তবতাকে চোখে দেখেছে, সব অবস্থাকে মানিয়ে নিতে শিখেছে। বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করে, মানুষের মনকে কিভাবে ভাঙা-গড়া করে তার এক নির্মম ও নির্মোহ বিশ্লেষণে নির্মাণ করেছেন সইফু চরিত্রকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে প্রেমের পরিবর্তে অভ্যাসের দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন এখানে। দাম্পত্য সম্পর্ককে আবেগের পরিবর্তে কঠিন বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন তিনি। তাই গল্পের শেষে দেখা যায় সইফুর বউ বদরনকে হানিফ বিয়ে করার পরও সইফু নির্লিপ্তভাবে বলতে পারে, 'কোনো আবেগ নয়, দেখা করলে দেখা করা যায়। না দেখা করলে কি ক্ষতি হয় সে জানে না'[৬]। বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উদাসীন, আপনভোলা সইফুকে কেন্দ্র করে প্রেম-অপ্রেমের এক ট্র্যাজিক কাহিনীকে গল্পের পরিসরে ধরতে চেয়েছেন গল্পকার।

'সমুদ্র নিলয়' গল্পে বিচিত্র এক সংসার জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আঠারো বছরের আলেয়া আর পঞ্চাশোর্ধ গহর আলির দাম্পত্য জীবনের এক বিচিত্র কাহিনি এখানে উপস্থাপন করেছেন। মুসলমান সমাজের বহু বিবাহ ও অসমবয়সী বিবাহের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন এক অষ্টাদশী যুবতী আলেয়ার প্রেম-বিরহকে।

বিবাহের পূর্বে আলেয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গাজির। গাজির সঙ্গে আলেয়ার ভাব থাকলেও তাদের প্রেমের গাঢ়তা ছিলনা কখনও, বরং আলেয়ার প্রতি গাজির ছিল এক শীতল উদাসীনতা। গাজি 'মেটেবরোজে' কাজ করতো। মেটেবরোজে যাওয়ার পর আলেয়াকে ভুলে যেত সে। চার ছ মাস পরে যখন সে গ্রামে ফিরত তখন মনে পড়ত আলেয়াকে। তার এই মনে পড়ার মধ্যে প্রেমের টান থাকে না। গাজি—আলেয়ার এই রকম এক প্রেম-অপ্রেমের পরিস্থিতিতে পঞ্চাশোর্ধ গহরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় আলেয়ার। গাজির উদাসীনতা আলেয়াকে গাজির প্রতি অভিমানী করে তোলে। আর এই অভিমান থেকে সে বাবার চেয়ে বেশি বয়সী গহরকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়। তার প্রতি গাজির উদাসীনতার প্রতিশোধ নিতে আলেয়া রাজি হয় গহরকে বিয়ে করতে :

"গাজি বলেছিল, তাকে সে বিয়ে করবে। গাজি তাকে আর বিয়ে করতে পারেনি। মেটেবরোজ থেকে চার-ছ মাস ভুলে থাকত। এই ফাঁকে গহরের সঙ্গে আলেয়ার বিয়ে হয়ে যায়। এবং আলেয়া মনে করে এটাই ঠিক হয়েছে। গাজির ওপর তার প্রকৃত প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।"[৭]

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

বিয়ের পর আলেয়া স্বামী হিসেবে বাপ বয়সী গহরকে মেনে নিলেও, পঞ্চাশোর্ধ স্বামী আঠারো বছরের আলেয়ার শরীরী কামনা বা উন্মাদনা মেটাতে পারে না। তাছাড়া স্বামীর প্রথম পক্ষ আলেয়ার 'বড়োবুবু' রাতের বেলায় আলেয়ার কাছে স্বামীকে যেতে দিলেও, দিনের বেলায় তাদের মেলামেশাকে পছন্দ করে না সে। তাছাড়া বাবার বয়সের থেকে বেশী বয়সী স্বামীর সঙ্গে দিনের বেলায় মেলেমেশা করতে এক 'অদ্ভুত জড়তা' কাজ করে তার মধ্যে। এজন্য স্বামীকে সব সময়ের জন্য পাওয়া হয় না যুবতী আলেয়ার। এসব কারণে আলেয়ার মধ্যে এক অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে; শরীরী চাহিদার অতৃপ্তি কাজ করে তার মধ্যে। স্বামীর শরীরের স্পর্শে তাই আলেয়ার 'বুকটা ভারী হয়ে ওঠে অনুভব করে। সকল জননীত্ব এসে তার বুকে ভর করছে। কলার কাঁদির মতো ভার হয়ে ঝুলে আছে তার স্তন দুটি। তার ভীষণ ভার। পায়ে শিশুর হাতের আঁচড়ানি, কাতরতা। বুক টন টন করে ওঠে। স্তন উসখুস করে। স্তন দুটি দুধে ভরে গেছে। টন টন করে ওঠে। শিশুটি পায়ের তলায়। বাড়ির পিছনে বড়োবুবুর গলা পাওয়া যায়। গহরের পিঠ থেকে হাত দুটি সরিয়ে নেয়। পায়ের তলার শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। কোলে বসিয়ে শিশুকে স্তন দেয়। বুক টন টন করছে। একেবারে পেনিয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে যন্ত্রণা সারায়"[৮]। স্বামীর বয়স, স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও অন্যান্য পারিপার্শিক প্রতিবেশে আলেয়ার শরীরী চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে না। এক অপূর্ণতা সর্বদা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে। আলেয়ার এই অতৃপ্ততা ব্যাপক আকার ধারণ করে যখন আলেয়ার পূর্বপ্রণয়ী গাজী গ্রামে আসে এবং তার স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলের মেয়ে মাসুরার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গহরকে বিয়ে করার পর 'গহর তাকে অধিকৃত করে ফেলেছে। এখানেই আলেয়ার বেশী নিশ্চিন্ততা। তবে গাজি এলে তার ভালো লাগে। তবু তো জানাশোনা ছিল। ভাব সাব। গাজিকে দেখতে পেলে ভালোই লাগে আলেয়ার।...কিন্তু গাজির প্রতি আবেগ আকাঙ্ক্ষা তার ফুরিয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে যা, তা হল চোখের দেখা। চোখের দেখার আবেগেই আলেয়া নরম হয়ে উঠেছে বার বার। ভিজে হয়ে উঠেছে। গাজি কথা বলতে এলে বলবে না। তাকে এ ঘরে আসতেও বলবে না। সে তো গাজির কাছে তার কিছু চায় না!'[৯] কিন্তু আমরা দেখি গাজির প্রতি অভিমানবশতঃ আলেয়া গহরকে বিয়ে করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার মধ্যে তার অভিমানী হৃদয়ের আবেগ ও আঠারো বছর বয়সের হঠকারিতা যতটা ছিল, গহরের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ছিল না তার বিন্দুমাত্র। তাই শেষে দেখা যায় গাজির সঙ্গে মাসুরার সম্পর্ক গড়ে উঠলে আলেয়ার মধ্যে প্রবল ঈর্ষাবোধ জাগ্রত হয়, জেগে ওঠে পূর্বপ্রণয়ী গাজির প্রতি তার অধিকারবোধ। ঈর্ষা ও অধিকারবোধ ছাড়াও গাজির প্রতি ছিল তার অপূর্ণ প্রেম পিপাসা। আলেয়াকে প্রতিনিয়ত অবহেলা করে ও আলেয়ার প্রতি উদাসীন থাকার ফলে গাজীর প্রতি আলেয়ার অভিমান, প্রতিশোধেচ্ছা যেমন কার্যকর হয়, তেমনি

ভিতরে ভিতরে তৈরি হয় প্রচ্ছন্ন আকর্ষণবোধ ও আবেগের উন্মাদনা। গহরকে বিয়ে করে গাজিকে শাস্তি দিতে গিয়ে সে নিজেই শাস্তি পেয়েছে। গহরকে বিয়ে করে গাজিকে হারিয়ে দিতে গিয়ে সে নিজেই হেরে গেছে। গাজির প্রতি অভিমান ও প্রতিশোধেচ্ছা থেকেই পঞ্চাশোর্ধ, বাবার চেয়ে বেশি বয়সী গহরকে বিয়ে করার হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয় আলেয়া। গহরকে বিয়ে করে, তার সংসার সামলে, সন্তান প্রতিপালন করে সুখে থাকতে চায় আলেয়া; আলেয়া চেয়েছিল তাকে অবহেলা করা গাজিকে দেখাতে যে, সে তাকে ছাড়া বেশ সুখে আছে। কিন্তু যখন গাজি গ্রামে ফিরে মাসুরার সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলে তখন তার মধ্যে প্রবল ঈর্ষা জেগে ওঠে। গাজির কাছে সে হেরে যেতে থাকে। মাসুরার সঙ্গে যখন গাজির প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন গাজিকে জয় করতে না পারার ব্যর্থতা তার হৃদয়কে রক্তাক্ত করে, বিচলিত করে। মাসুরার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠায় গাজির ওপর যোগ্য প্রতিশোধ নিতে না পারার যন্ত্রণা তার হৃদয়কে বিচলিত করে। তাই 'বসে বসে দাহ অনুভব করে আলেয়া। একটি মুহূর্তে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে গাজি। গাজি মাসুরার সঙ্গে কেন প্রেম করবে? এটা ঘটতে দেওয়া যেতে পারে না। অন্য কেউ নয়, সে তো গাজি। গাজি তার পূর্ব-প্রেমিক। এখনো কি দেখার টান ছিল না উভয়ের মধ্যে? যেটুকু অবশেষ ছিল, সেটুকু গোপনে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেখানে ঢুকে পড়েছে মাসুরা। মাসুরাকে ভুলিয়ে ফেলেছে গাজি। এক অসহায়তা বিপন্নতা এসে আলেয়াকে আলোড়িত করে। গাজি অন্যায় করছে। তার প্রতি অন্যায় করছে।"[১০] এভাবে গাজির উপেক্ষা, গাজির কাছে হেরে যাওয়া আলেয়াকে ব্যাথিত করে প্রতিনিয়ত। গাজির প্রেমহীনতা তার হৃদয়কে রক্তাক্ত করে।

আলেয়ার জীবন শুধু অপ্রাপ্তির। গাজিকে ভালোবেসেও সে প্রতিনিয়ত তার কাছ থেকে পেয়েছে অবহেলা আর উদাসীনতা। বাবার চেয়েও বেশি বয়সী গহরকে বিয়ে করার পরও প্রথম পক্ষের স্ত্রীর জন্য সে স্বামীর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না স্বাভাবিকভাবে। তাছাড়া বাবার চেয়ে বেশি বয়সী স্বামী অষ্টাদশী আলেয়ার আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, শরীরী চাহিদা মেটাতে পারে না স্বাভাবিকভাবেই। তার এই অচরিতার্থ কামনা, বাসনা, অপ্রাপ্তি প্রকট হয় গাজি-মাসুদার সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর। অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা আর হেরে যাওয়ার দুঃখে 'ঘাটে এসে কাঁদতে বসে আলেয়া। সমুদ্রের জলের মতো, চোখের জল তার ঠোঁটে পড়ে, লবণাক্ত স্বাদ পায়। সমুদ্রের নোনতা স্বাদ শুধু নয় সমুদ্রের মতো বিশাল আকাঙ্ক্ষা বোধ করে আলেয়া। ধীরে ধীরে কেঁপে উঠছে তার শরীর। ঠোঁট নড়ে। বুকে ভার লাগে। থেকে থেকে ধাকাচ্ছে বুক। নরম জ্যোৎস্না। চারদিক হিমেল হাওয়া জোনাকি, কুয়াশাদুরে সমুদ্রের নিলয়য়। সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে'[১১]। এভাবে আলেয়ার আবেগ-আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ-বিরহ, প্রেম-প্রেমহীনতার এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন আফসার আমেদ।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

'প্রেম' গল্পে প্রেমের এক অভিনব দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবয়সী কণিকা ও শিলাদিত্যর মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এর মধ্যে হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে যায় কণিকার। শিলাদিত্য কণিকার নতুন ঠিকানা আর খোঁজেনি, খোঁজার প্রয়োজনও বোধ করেনি, কারণ তাদের প্রথম পরিচয় ভালোবাসার পর্যায়ে যায়নি। এরপর এগারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। হঠাৎ করে আবার পরিচয় হয় তাদের। মধ্যবয়সী শিলাদিত্য ও কণিকা নিজেদের মতো করে একটা প্রেম সম্পর্ক গড়ে তোলে নিজেদের মধ্যে। মাঝবয়সী এই দুই নরনারী নিজেদের মতো করে একটা প্রেমের বলয় তৈরি করে নেয় নিজেদের মধ্যে। বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ে এই দুই নরনারীর মধ্যে যে অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছিল, সে অনুরাগ প্রেমে পরিণত হওয়ার পূর্বেই বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তাই অপ্রাপ্তির শূন্যতাবোধের জন্যই কণিকা-শিলাদিত্যর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও আলাদা সংসারে থেকে নিজেদের মতো করে একটা প্রেমসম্পর্ক তৈরি করে নেয়। এই দুই নরনারীর সুপ্ত সে প্রণয় বিবাহ পরবর্তী সময়ে পরিণতি লাভের একটা সুযোগ পায়। এরা দুজন আলাদা সংসারে থেকেও বিবাহবহির্ভূত প্রণয়ের একটা সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। অবশ্য বিবাহবহির্ভূত তাদের সে প্রণয়ের মধ্যে কোনো অবৈধ বাসনা ছিল না, নেই কোনো শরীরী চাওয়া পাওয়া, আছে কিছু সময় একসাথে কাটানো, পরস্পরের প্রতি ভালোলাগা। নিজেদের সংসারের সব কিছু দেখাশোনার পর, নিজেদের সাংসারিক ও পারিবারিক কর্তব্য পালনের পর অবশিষ্ট সময়ে কণিকা-শিলাদিত্য নিজেদের মধ্যে পূর্বপ্রণয়ের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে চায় "রমার কথা কণিকাকে বলবে না। বলার নিয়ম নেই। নিজেরাই অলিখিত এই নিয়ম চালু করছে। কেউই কারও সংসারের কথা বলে না। সংসারের কোনও সমস্যার কথা বলে না। দিব্যি একটু সময় নিজেরা নিজেদের মধ্যে থাকে। অথচ তারা ঘনিষ্ঠ স্বরে কথা বলে না। নিজেরা নিজেদের দেখে। আর প্রয়োজনীয় কথা বলে। হাত ধরার আকুলতা থাকে, কিন্তু হাত ধরে না। বয়সটা কম হলে হয়তো হাত ধরতে পারত। এই মধ্যচল্লিশ বয়সে বন্ধুত্বের নিয়মও যেন বদলে গেছে। রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটে। ভাঁড়ে চা খায়। দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে দু-একটা কথা বলে। সেই চাহনিতে যেন নিজেরা কত অচেনা। নিজেরা নিজেদের চেনেনা তেমন করে। অথচ চাহনির মধ্যে মায়া থাকে। একটু কাছে এসে দাঁড়ায় নিজেরা। এই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে মনে হবে নিজেরা নিজেদের যেন কত চেনে।"[১২]

দুজনের চলা ফেরা আচরণে বোঝা যায় যে এদের বর্তমান সম্পর্কের কারণ পূর্বের সম্পর্কের অতৃপ্ত বাসনা, প্রেমসম্পর্কের অপূর্ণতা। বিবাহপূর্ববর্তী জীবনের অনুরাগ পরিণতি না পাওয়া, বিবাহ পরবর্তী জীবনে দুজনের মধ্যে আকস্মিকভাবে পরিচয় ঘটার ফলে তাদের দুজনকে নতুন করে কাছে আনে। তবে তাদের এই সম্পর্কের মধ্যে কোনো ঘণিষ্টতা সৃষ্টি হয়নি। দু'জনের কাছে দু'জনের চাওয়া পাওয়ার কিছুই ছিলনা, দু'জন দু'জনকে নিবিড়ভাবে

পেতে চায়নি কখনও। বরং তাদের সম্পর্কের মধ্যে ছিল চরম শীতলতা, অভ্যস্ততা, অপ্রেম এ যেন এক অন্য প্রেম। তাই দেখা যায় শিলাদিত্য-কণিকা সাক্ষাৎ করার পর ঘরে ফিরতে রাস্তায় হাঁটতে দিনের শেষে কখন 'কণিকার বাস এসে কণিকাকে নিয়ে গেছে, খেয়াল করেনি শিলাদিত্য। এখন সে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রমার কথাই ভাবে'[১৩]। প্রেম ও প্রেমহীনতার এক নতুন চিত্র তুলে ধরেছেন এ গল্পে।

'নষ্ট দুপুর' গল্প একটা মৃত প্রেমের গল্প। সৌরভ-অনিন্দিতার মধ্যে প্রেম ছিল। কিন্তু অনিন্দিতাকে ফেলে সৌরভ বিয়ে করে স্বস্তিকাকে। অনিন্দিতাও বিয়ে করে সৌরভের বন্ধু শাশ্বতকে। সৌরভ এক সপ্তাহের ছুটিতে কানপুর থেকে নিজের পরিবারের কাছে আসে। কিন্তু বাড়ি ফিরে মনে পড়ে যায় তার পূর্বপ্রেমিকা অনিন্দিতার কথা। অনিন্দিতা-সৌরভের প্রেমের সম্পর্ক ছিল কলেজ জীবনে। কিন্তু হঠাৎ করে তাদের সে প্রণয়ের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। সৌরভকে অবহেলা করতে থাকে অনিন্দিতা। অভিমানে সৌরভ বিয়ে করে নেয় স্বস্তিকাকে। বাড়ি ফিরে অনিন্দিতার কাছে নির্জনে দেখা করতে যায় সৌরভ। কিন্তু স্বস্তিকার কাছে গিয়ে সে দেখে একই উদাসীনতা তার মধ্যে সমানভাবে জাগ্রত। অনেক আবেগ, আগ্রহ আর প্রেম নিয়ে অনিন্দিতার কাছে বহুদিন পর গিয়েও তার কাছ থেকে পায় একইরকম নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা। অনিন্দিতার উপেক্ষায় সে মর্মাহত ও বিষণ্ণ হয়। অনিন্দিতার কাছে নির্জনে দেখা করতে গিয়ে হতাশ হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সৌরভ ভাবে 'কেন এল সে? দুপুরের ভাতঘুম তার চেয়ে জরুরি ছিল না কি? এই নষ্ট দুপুর তার কী কাজে লাগবে? স্মৃতিকে আহত করে রাখবে সারাজীবন'[১৪]।

সৌরভের সঙ্গে অনিন্দিতার প্রেম-সম্পর্ক পরিণতি পায়নি। অনিন্দিতার অবহেলা এবং অনিন্দিতার কাছে পরাজয়ের অভিমানে সৌরভ অন্য মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে ঠিকই, কিন্তু অনিন্দিতার কাছে এই পরাজয় সে মানতে পারে না কখনও। পারে না বলেই সে বিয়ের পরও ছুটে যায় অন্যের স্ত্রী হয়ে যাওয়া তার পূর্বপ্রেমিকা অনিন্দিতার কাছে। অবশ্য এবারও গিয়ে দেখে তার প্রতি অনিন্দিতার একই রকমের উপেক্ষা উদাসীনতা। এখানে আফসার আমেদ প্রেম-মনস্তত্ত্বের এক জটিল চিত্র তুলে ধরেছেন।

আফসার আমেদের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আধুনিক মানুষের প্রেম-প্রণয় ও দাম্পত্য জীবনের গভীর সংকটের চিত্র। কখনও বিবাহপূর্ববর্তী প্রণয়, কখনও বিবাহপরবর্তী প্রণয়, কখনওবা বিবাহবহির্ভূত প্রণয়ের সংকটকে তুলে ধরেছেন তিনি সময়ের প্রেক্ষাপটে। তবে আফসার আমেদ যে প্রেমের কথা বা অপ্রেমের কথাকে তাঁর সাহিত্যে দেখাতে চেয়েছেন, তার মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের কথা শোনা যায় না। আধুনিক মানুষের মনস্তত্ত্বের বহুকৌণিক চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রেম-প্রণয়কে তিনি অন্বেষণ করেন নিজের মতো করে। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন দেখা যায় প্রেমের আবেগ, উন্মাদনা,

তেমনি আবার দেখা যায় পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সে আবেগী প্রেমের স্তিমিত হয়ে পড়া। সময়ের দাবী মেনে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের হৃদয় সম্পর্ককে তিনি দেখাতে চান। আধুনিক মানুষের প্রেম-মনস্তত্ত্বের জটিলতার সামগ্রিকতাকে তিনি দেখাতে চান তাঁর গল্পে। তাই বলা যায় প্রেমে-অপ্রেমে আফসার আমেদের গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সুর সংযোজন করে। জন্মলগ্ন থেকে বাংলা সাহিত্য যে প্রেমের চিত্র তুলে ধরে আসছে আফসার আমেদের প্রেমের গল্পগুলো তার মধ্যে স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র নির্দেশ :

১। 'আফসার আমেদের গল্প: পরিবর্তনশীল গ্রামজীবনের মহাকাব্য', 'বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি, সোহারাব হোসেন,করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২৬৭

২। তদেব, পৃ. ২৬৭-৬৮

৩। 'বিরহ', 'আফসার আমেদ সেরা ৫০ টি গল্প', আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৯৩

৪। তদেব, পৃ. ৯৪

৫। তদেব, পৃ. ৯৮

৬। তদেব, পৃ. ৯৮

৭। 'সমুদ্র নিলয়', তদেব, পৃ. ১০০

৮। তদেব, পৃ. ১০৫

৯। তদেব, পৃ. ১০৬

১০। তদেব, পৃ. ১০৭

১১। তদেব, পৃ. ১০৮

১২। 'প্রেম', তদেব, পৃ. ২৫৬

১৩। তদেব, পৃ. ২৫৯

১৪। 'নষ্ট দুপুর', তদেব, পৃ. ৩৯৭

বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চায়েতিরাজ : আফসার আমেদের ‘ধ্যানজ্যোৎস্না’

অসীম হালদার

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই কম বেশি কার্যকরী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতেও তার ব্যতিক্রম নয়। ই. এরিক জ্যাকসনের মতে ‘স্থানীয় সরকার বলতে বোঝায় গণনির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় সেবামূলক এবং অন্যান্য বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করা। এই পরিষদগুলো নির্বাচিত হয় তাদের প্রশাসনভুক্ত এলাকাগুলি থেকে।’ ব্রিটিশ শাসনের আগেই ভারতে গ্রাম পরিষদের অস্তিত্ব ছিলো। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে সজাগ থাকতো গ্রাম পরিষদ বা গ্রামসভার সদস্যরা। ইংরেজ আমলে ভারতে ১৮৭০ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সদস্যদের নির্বাচন করতেন গ্রামীণ মানুষদের শাসনে রাখার জন্য। লর্ড রিপন ১৮৮২ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাঠামোকে ঢেলে সাজাবার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান। পরবর্তীতে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাস হয়, যাতে তিনটি স্তর ছিল। যথাক্রমে জেলা পরিষদ, স্থানীয় পরিষদ, ইউনিয়ন কমিটি। ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন পাস হলে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি আরো ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ সালে পঞ্চায়েত আইন পাশ হয় এবং ১৮৫৭ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৬৩ সালে আইনের কিছু সংশোধন হয়। ১৯৭৩ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয় এই রাজ্যে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদে বিভক্ত হয় স্তরগুলি। যদিও সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি পঞ্চায়েতের অনুকূলে ছিলো না।

১৯৬৫ সালের রাজ্য জুড়ে সংগঠিত হয় খাদ্য আন্দোলন। স্ট্রাইক, বনধ, ধর্ণা, মিছিল সব মিলিয়ে রাজ্যের রাজনীতি ছিল অশান্ত। একটির পর একটি সরকারের পতন এবং উত্থান ঘটেছে এই সময়কালে। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গণতন্ত্রের সব নিয়ম—কানুনকে ধুলিস্যাৎ করে। এই সরকার ১৯৭৩ সালে নতুন করে রচনা করে পঞ্চায়েত আইন। এই আইনে বলা হয় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা। কিন্তু এই আইন কার্যকর করেনি কংগ্রেস সরকার। কারণ, প্রধানত রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং সমাজ পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার অনুকূলে ছিলো না। “দারিদ্র্যের হার ৫৮.৪ শতাংশ। জাতীয় গড় ৫১.২ শতাংশ। সমাজে বড় জমির মালিকদের দাপট। এরাই ছিলেন কংগ্রেস দলের ভোট—ব্যাঙ্ক। ‘ঘোষ মেশিন’ নামে পরিচিত এই ব্যবস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল

জমিদার, জোতদার, মহাজন এবং খাদ্যদ্রব্যের কারবারী। এঁরাই ঠিক করতেন সরকারি সুযোগ-সুবিধা কিভাবে বন্টিত হবে এবং কারা পাবেন এইসব।”[১] ১৯৭৭ সালে পরাজিত হয় কংগ্রেস দল। বিপুল ভোটে ব্যাপক জনগণের সমর্থনে এবং গণচেতনায় ও আবেগঘন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে ক্ষমতা দখল করে বামফ্রন্ট। বামফ্রন্ট সরকার বামপন্থী দলগুলির একটি কোয়ালিশন সরকার। সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে এই সরকারের শরিকরা একত্রিত হয়েছে মূলত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ দ্বারা সহমতের ভিত্তিতে। গৃহীত এই কর্মসূচির লক্ষ্যে, সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মঙ্গল সাধন করা, শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সমাজের পশ্চাৎপদ মানুষের অংশকে সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা। স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি গ্রামের প্রশাসনকে গণতন্ত্রীকরণ করা এবং শ্রমজীবী জনতাকে যন্ত্রণার যাঁতাকল থেকে মুক্তি দেবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার শীঘ্রই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জুন এ রাজ্যের সর্বত্র পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদ মোট ৫৫,৬৫০টি আসনে নির্বাচন হয়। ভারতে এই ধরনের নির্বাচন এর আগে হয়নি। দরিদ্র, ছোটো চাষিদের মধ্যে থেকেই অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কলকাতাকে দেশের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র রূপে গণ্য করা হয়। নাচ, গান, বাজনা, নাটক, সিনেমার পাশাপাশি বাঙালীর সাহিত্যচর্চার প্রবণতা সর্বজনবিদিত, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতাও যুক্ত হয়েছে। তাই বাঙালি সাহিত্যচর্চায় অনিবার্যভাবে ঢুকে যায় রাজনৈতিক চিন্তা চেতনাও। সমাজ সময়কে উপেক্ষা করতে না পারা সাহিত্যিকদের কলমে উঠে আসে পঞ্চায়েত প্রসঙ্গ। গল্প উপন্যাসের কাহিনীর পেক্ষাপটে গ্রাম এবং পঞ্চায়েতের গতি প্রকৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়। সচেতন পাঠক অনায়াসে ধরতে পারেন লেখকের রাজনৈতিক উপলব্ধিকে। দেশ, কাল, সমাজ, সময়কে ভাষার মুন্সিয়ানায় সাজিয়ে আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ্যতার সীমানাতেও পাঠকবর্গকে পৌঁছে দেন সচেতন লেখক। একসময় ভূমিসংস্কার প্রভৃতি করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত বিভাগ অনেকের সমর্থন পেয়েছে। আবার ক্ষুব্ধও হয়েছে কেউ কেউ। সমাজে এসেছে ভিন্নতা, জটিলতা। বাংলা কথাসাহিত্যে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা আফসার আমেদ—এর ‘ধ্যান জ্যোৎস্না’ (২০০৩) উপন্যাসে সেই ছবি দেখার চেষ্টা করব।

“গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা আমাদের ভারতীয় মুসলমান সমাজের ভেতরে—ভেতরে

পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে নতুন নতুন কাজের সুবাদে ভারতীয় মুসলমানরা সেখানে যাচ্ছেন ও সেই উপার্জিত বিদেশী অর্থ আমাদের গ্রামে গ্রামে এসে পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের মুসলমান সমাজ শরীয়তের ও সমাজে নানা সংস্কারে বাঁধা পড়ে আছে। সেই বন্ধন সবচেয়ে কঠিন হয়ে বাজে মুসলমান সমাজের মেয়েদের জীবনে। বিবাহ বিচ্ছিন্না সেই মেয়েরা এক সংসার থেকে আর এক সংসারে যান স্মৃতি আর নতুন সম্পর্ক নির্মাণের দ্বন্দ্বে ও প্রতিশ্রুতিতে।" আফসার আমেদের 'ধ্যান জ্যোৎস্না' উপন্যাসের পরিচয় লিপিটি পাঠ করে বোঝা যায় এই কাহিনীর কেন্দ্রে আছে একটি মেয়ে। গ্রাম্য বিবাহবিচ্ছিন্না মুসলিম মেয়ে সখিনার জীবন প্রবাহকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছেন লেখক। তারই মাঝে মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েতের প্রভাব নজর কেড়েছে আফসার আমেদের। তিনি সেই উপলব্ধিকে আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন।

সখিনার প্রথম স্বামী দরিদ্র কাঠমিস্ত্রি নুর আলি। বিয়ের আড়াই বছর পর তুচ্ছ একটা কারণে পতিপত্নীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিচ্ছেদ ঘটে যায়। আর তার কারণ "কনের বাবার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল রাজহাটি অঞ্চলের অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধান। কনের ভাসুর যাতে কৃষিঋণ পায় সে ব্যাপারে কনের বাবাকে বেশ কয়েক বার বলে কনের ভাসুর। যাতে কনের বাবা আত্মীয় অঞ্চল পঞ্চায়েত প্রধানকে সুপারিশ করে।"[২] প্রসঙ্গত দরিদ্র চাষীদের জন্য পঞ্চায়েত থেকেই ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। জওহর রোজগার যোজনা, সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি, ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি প্রকল্পগুলির সহায়তা দিতে পঞ্চায়েতই এগিয়ে আসে।

নুরের দাদা কৃষিঋণ না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়। পঞ্চায়েত অফিসে সালিসী ডেকে বিচ্ছেদ হয়ে যায় নুর ও সখিনার। এতে উভয় পক্ষই কর্তৃত্বদের সায় ছিলো। অন্যথায় পঞ্চায়েত বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতো। গ্রামের বহু সমস্যা পঞ্চায়েত আলোচনা করে মিটিয়ে থাকে। এতে আইনি ঝামেলা ও অর্থ অপচয়ের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পায় গ্রাম্যজনেরা। সালিসীর জন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের, বিশেষত প্রধানদের, অনেক সময় দিতে হয়। জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়া থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক নানা ধরনের সালিসী পঞ্চায়েত করে, গরীবদের ভেতরে কিছু ঝগড়া আগে বাড়তে বাড়তে থানা আদালত পর্যন্ত গড়াত। আজকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না। গ্রামের স্বচ্ছল ও গরিবদের ঝগড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত মিটিয়ে দিচ্ছে। আইনত বিচার করার অধিকার পঞ্চায়েতের নেই। তারজন্য 'ন্যায় পঞ্চায়েত' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা আছে, কিন্তু গ্রামের লোক বসে থাকেনি, ঝগড়া মেটাবার জন্য তারা পঞ্চায়েতের কাছে আসছে, পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছে।

পঞ্চায়েত সত্যি সত্যি বিচার করে না, সালিশী করে। কোনো পক্ষ না মানলে থানা আদালত করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই করছে না। থানা আদালত, দালাল ও উকিলদের হয়রানি থেকে গরীবরা বেঁচেছে, দুর্দশার সুযোগে যারা পয়সা করতো তারা চটলেই গরীবের মস্ত লাভ হয়েছে। এর থেকেও লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে, যেসব পঞ্চায়েত সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে সেসব অঞ্চলে গ্রামের গরিবদের বিভিন্ন অংশের ভেতরে একটা ঐক্য এসেছে, শ্রেণী হিসেবে গরিবদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে এবং গাঁয়ের ঝগড়াঝাটিগুলিতেও হয়ে দাঁড়ায় বড় বাধা। ভাল অঞ্চলগুলোতে এই বাধা প্রায় দূর হয়ে যাচ্ছে"[৩] নুর ও সখিনার বিচ্ছেদ হলেও তারা পরস্পরকে ভালোবাসত। নুরের দেওয়া পথটা তাই শত দারিদ্র্যের মধ্যেও বিক্রি করেনি সখিনা। নুর আরবে কাজ করে স্বচ্ছলতা আনে নিজের সংসারে। ফুলসরাকে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করে দেয়। তবে মেহের আলী ও সখিনাকে ভোলেনি। সামাজিক অনুষ্ঠানে নুর আমন্ত্রণ জানাতো সখিনার দ্বিতীয় পতি মেহেরকে সপরিবারে। অর্থ সাহায্য করতেও কার্পণ্য করেনি আর্থিক অবস্থা ফেরানোর লড়াইতে নামা কৃষক মেহের আলিকে। মেহের সখিনার নাকচচাবিটা নুরকে বন্ধক দিয়ে হাজার টাকা নিয়ে ঋণ শোধ করে। পরে টাকা ফেরত না নিয়েই নাক চাবিটা ঘুরিয়ে দেয় মেহের তথা সখিনাকে।

দরিদ্র চাষীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ অনৈতিক মুনাফা লুটতে চায়। উচ্চফলনশীল ধান চাষ করতে দরকার ট্রাক্টর, স্প্রে মেশিন, ধান ঝাড়া মেশিন, অথচ অধিকাংশ চাষীদের হাতে সেই সব সরঞ্জাম থাকে না, বাধ্য হয়েই ধনী ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হতে হয় তাদের। রহমতের মতো ব্যবসায়ীরা সামান্য টাকা দিয়েই অত্যাচার শুরু করে অসহায় কৃষকদের প্রতি। সখিনার মতো অসংখ্য মেয়েদের দিকে লোলুপ হাত এগিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। যদিও রহমতে ৪৩০ টাকার কর্জ মিটিয়ে দেয় সখিনার বর্তমান স্বামী মেহের আলি। সখিনা ভাবে চাষে খাটা লোকটার চাষ করবার আজ আর অধিকার নেই। উচ্চফলনশীল চাষ করবার অনুপযুক্ত মেহের। গ্রীষ্মে এই চাষ করতে হয়। জল কিনতে হয়। সার কিনতে হয়। কীটনাশক কিনতে হয়। যন্ত্রচালিত লাঙল দিয়ে চাষ করতে হয়। বীজধান আর গতর দিয়ে আজ আর চাষ হয় না। আধুনিক কৃষি পদ্ধতির হাতে পড়তে হয় তাদের। ব্যবসার মতো টাকা লগ্নি করতে পারে জমিতে। রহমতের মতো মানুষদের হাতে পড়তে হয় তাদের। রহমত ব্যবসায়ী বটে, আবার দুশ্চচরিত্রও।"[৪] রহমত শ্রেণির মানুষদের হাত থেকে চাষিদের বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এসেছে পঞ্চায়েত। লেখকের মতে "তৃণমূল পর্যন্ত পঞ্চায়েতরাজ পৌঁছে গেছে। পঞ্চায়েত আজ এই প্রশাসন। পঞ্চায়েতের হাত ধরেই

কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ। কৃষিঋণ থেকে শুরু করে কৃষি—যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাঙ্কঋণ, স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণ পঞ্চায়েতের সুপারিশ ক্রমে বাস্তবায়িত হয়। সেই সব উপকরণ কৃষিতে সংযুক্ত হচ্ছে। কৃষিকে কেন্দ্র করে নতুন এক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।"[৫]

একজন প্রান্তিক চাষির পক্ষে একই জমিতে তিন বার ফসল ফলানো কঠিন। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে ফসল ফলাতে পারে না। ট্রাক্টর, পাম্প, ধান ঝাড়াইয়ের মালিকদের সঙ্গে তারা জড়িয়ে যায় নানান জটিল লেনদেনের সম্পর্কে। এই মালিকদের অনেকেই পঞ্চায়েতের সুপারিশে লোন নিয়ে যন্ত্রপাতির মালিক। সমাজে নতুন ধরনের সম্পর্কের অবতারণা করেছে পঞ্চায়েতিরাজ। একটি উপন্যাসের অবয়বে লেখকের এই যে সমকাল চিত্রণ— এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

সূত্র নির্দেশ :

১। বিকেন্দ্রীকরণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন : পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা / প্রভা দত্ত (উন্নয়ন সংগ্রাম, গণশক্তি, ২০০৬)

২। ধান জ্যোৎস্না ও ব্যথা খুঁজে আনা / আফসার আমেদ (দে'জ, ২০০৩)

৩। গ্রামীণ জীবনে পঞ্চায়েত / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ঙ্খঞ্চজ্জ(ঞ্চ), ১৯৮২

৪। ধান জ্যোৎস্না ও ব্যাথা খুঁজে আনা / আফসার আমেদ (দে'জ, ২০০৩)

৫। তদেব

তথ্য সহায়তা :

১। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ / উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২। আমরা চলি সমুখপানে : ৩০ বামফ্রন্ট সরকার / তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩। পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০০৩ / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, CPIM

৪। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে পঞ্চায়েত / সূর্যকান্ত মিশ্র

৫। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা / অসিত কুমার বসু।

আফসার আমেদের ছোটগল্পে অন্তঃপুরের উদভাস

মনোরঞ্জন নস্কর

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য আফসার আমেদ (১৯৫৯—২০১৮) এক ব্যতিক্রমী কথাকার। মৃত্তিকালগ্ন জীবনের, বিশেষভাবে গ্রাম-নির্ভর মুসলমান সমাজের নারী জীবনের কথা তাঁর মতো সহমর্মিতা ও সমবেদনা নিয়ে আর কেউ দেখেছেন বলে মনে হয়না। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে মুসলমান নারীকে যেভাবে এবংবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে অসহায়ভাবে জীবন যাপন করতে হয়, তা মরমি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তিনি ছোটগল্পে ভাষা-শরীর দিয়েছেন। একদিকে গ্রামীণ মুসলমান সমাজের পিছিয়ে পড়ার কারণ, অন্যদিকে মুসলমান মেয়েদের দুর্দশা—বঞ্চনা, অবমাননা, লাঞ্ছনা, এবং সর্বোপরি অগত্যা মানিয়ে নেওয়া — এই পরিণতিকে তিনি নিপুণভাবে তুলে ধরেন তাঁর ছোটগল্পে। প্রসঙ্গত, সামাজিক এবং ধর্মীয় শোষণের বিচিত্র ঠিক দক্ষ পর্যবেক্ষকের মতো গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। যে চরিত্রগুলো তাঁর রচনায় উঠে এসেছে মনে হতে পারে ব্যক্তিগত জীবনে পরিচয় না থাকলে এমন প্রাণবন্ত ভাবে তাদের রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কথাকারের শব্দপ্রয়োগের আশ্চর্য কুশলতা।

সাহিত্য—সৃজনের আদিকাল থেকেই নারীই হয়েছে সাহিত্যের বিষয়। নারীর রূপ, নারীর প্রেম, নারীর ভাবনা — পুরুষের চেতনার রঙে উদ্ভাসিত। পুরুষ মনে তরঙ্গ তোলে নারীর প্রেম ভাবনা। কাব্যেও নারীর বিভিন্ন অনুষঙ্গ বর্ণনার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ ও মনোভঙ্গির স্বীকরণ আছে। জীবন-উপলব্ধি শিল্পরূপ নির্মাণে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে। বিশেষত, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন থেকে নারীবাদী চিন্তনের প্রসার দৃঢ়তর হয়েছে ও ব্যপ্তি পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে ভারতীয় সমাজ—সমর্থিত পিতৃতন্ত্রের স্বীকৃতি থাকাই স্বাভাবিক। গোটা উনিশ শতকে আমরা তেমনি পেয়েছি। "কখনও বিরুদ্ধতায়, কখনও ভক্তিতে, প্রেমে, স্নেহে, কারণ্যে এই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত।"[১] সামাজিক অনুশাসনে মুসলমান নারীর বিদ্যার্জন প্রায় নিষিদ্ধ ছিল বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। নারী ছিল প্রধানত গৃহে অবরুদ্ধ। তার ভূমিকা ছিল পুরুষের সেবায়, গৃহকর্মের শৃঙ্খলা-বিধানে, সন্তান—ধারণে ও সন্তান-পালনে সীমাবদ্ধ। পুরুষের দাবি, অনুশাসন, প্রত্যাশা, উপভোগ, স্বাধীনতা — নারীর মনে কোন অনুভূতি সঞ্চার করেছিল, তা চিরকালই থেকে গেছে গেছে অ—প্রকাশিত। আফসার আমেদ মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরবাসিনীর সেই মনোভুবনকে উদ্ভাসিত করেছেন।

দে'জ প্রকাশিত, আফসার আহমেদ "শ্রেষ্ঠ গল্প" (২০১৮ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ) থেকে কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে অন্তঃপুরের উদ্ভাসকে আমরা দেখবার চেষ্টা করব।

'সঙ্গ' প্রকাশিত হয় শারদীয় আজকাল—এ ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে। গল্পের কথাবস্তু অতি সাধারণ। স্ত্রী মরিয়ম ও স্বামী মতিনের দাম্পত্য সম্পর্কে তিরিশ বছরের। মতিন সম্পর্কে মরিয়মের রাগ ও অভিমান দুইই আছে। মেয়ে—জামাই, দুই ছেলের বউ হয়েছে। কম বয়সী আরো দুটি ছেলে ও এক মেয়ে আছে মরিয়মের। তবুও স্বভাবের বদল হয়নি মতিনের। সে স্বার্থপর, অলস, একগুঁয়ে। বাড়িতে বনিবনা হলে কথায় কথায় রাগ দেখিয়ে হুগলির এক মসজিদে ইমামের কাজ করতে চলে যায় সে। একদিন সেই মরিয়মের বাড়িতে মেয়ে—জামাই এসেছে। অনেক কিছু রান্না করেছে মরিয়ম। তাদের খাওয়ার আগে, রান্না তখনও শেষ হয়নি পুরো, মতিন ভাত খেতে চায়। জামাইকে তার জুতো কিনে দেবার কথা বলে। এমনকি জামাইয়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সে বিড়ি খায়। যখন ইচ্ছে, তখন সে খেতে চায়; নইলে হুগলিতে মসজিদে চলে যাবে। তাই সে ব্যাগ গোছাতে থাকে। মরিয়ম তখন তার ছোটো মেয়েকে বলে তার আব্বাকে ভাত দেবার জন্য। গল্পের শেষটা অন্যরকম। সব কাজ সেরে মরিয়ম পুকুর ঘাটে যাবে। তখন তার পুকুরের জলের জন্য শরীরটা ছটফট করছে।

গল্পকথা এটুকুই। কিন্তু অন্তঃপুরের উদ্ভাস জানতে গেলে আখ্যানের অনুপুঙ্খ পাঠ বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। অন্তঃপুর মানে তো শুধু শরীর নয়; নারীর সঙ্গে, নারীর জীবনের সঙ্গে নানা মাত্রায় জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বাস্তবতার কথা। 'সঙ্গ' গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদেই কথক জানিয়ে দেন "সংসারের জীব মরিয়ম"। সংসারের জীব বললে এখানে কোন বিশেষ মর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় না। বরং বোঝায় যে কোনও গৃহপালিত জীবের মতো তার অবস্থান। সে যে মানুষ, একজন স্ত্রী, তারও আছে মনোময় এক অস্তিত্ব, অনুভূতি; স্নেহ, প্রেম, রাগ, মনখারাপ করা, ভালো না লাগাসহ এক অনেকান্তিক অস্তিত্ব — তা যেন মুহূর্তেই নাস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু তার পরেই লেখক যখন মরিয়ম সম্পর্কে জানান —'বুকের পাতায় নরম ও আর্দ্যভাব আজও সে হারিয়ে ফেলেনি। সংসারে মন ও শরীরের নানা খাতে খরচ হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত তবুও স্নিগ্ধ যথেষ্ট হয়ে যায় মতিনের জন্য।' — এ কথায় বোঝা যাচ্ছে যে মনের মধ্যে আজও মরিয়মের ভালোবাসা আছে মানবিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে যে মন এখন উদ্দীপ্ত হয়। লোকালয়ের নানা আন্দোলনে আন্দোলিত হয় এখনও। কিন্তু শরীরে নানা খাতে মন যে প্রতিনিয়ত নানা খরচ হয়ে চলেছে — এ বিষয়টি বিশেষভাবে বুঝে দেখবার অবকাশ তৈরি করে।

মতিনের স্বামী। বিবাহিত তিরিশটা বছর জ্বালিয়ে খাক করেছে তাকে। গল্পের সময়ে মতিন লোকটা আরো বুড়ো, ক্ষয়াটে এবং শয়তান হয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, যে লোকটার সঙ্গে মরিয়ম তিরিশ বছর ঘর করল, সেই লোকটার চরিত্রগত কোনো উত্তরণ নেই; আছে অবনমন। অথচ সেই অবনমনমুখী লোকটার সঙ্গে মরিয়মকে আজও কেবল মানিয়ে চলতে হয়। এছাড়া তার উপায় নেই কোনো।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

ছয় ছেলে—মেয়ে ও তিন বউ—জামাইয়ের ভরা সংসার পেলেও মরিয়মের নিজের কোন জগত নেই, জগৎ যে নেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভরা সংসারের মধ্যে মতিন বিশৃঙ্খলা পাকালে মরিয়ম যখন তীব্র হয়ে ওঠে। মরিয়ম তীব্র হয়ে উঠলে স্বাভাবিকভাবে ক্ষেপে যায়। তখনই — 'লোকটা ঝোলায় লুঙ্গি গামছা নিয়ে হুগলির এক গ্রামের মসজিদে ইমামতি করতে চলে যায়। অভিমান বসত।' — অথচ আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবোধই জানান দেয় অভিমান হওয়ার কথা মরিয়মের। কিন্তু অভিমানবশত তিরিশ বছরের দাম্পত্য সঙ্গীকে ফেলে রেখে মতিন চলে যায়। যদি মরিয়মের নিজস্ব জগত থাকত, কিংবা নিজের কণ্ঠস্বরের জোর থাকত তাহলে সে আটকাতে পারত মতিনকে। এ যেন চোরের মায়ের বড় গলা। মিতিন নিজে অন্যায় করছে আবার নিজেও তেজ দেখিয়ে অভিমান করছে। নারীর কোথাও যে কেউ নেই তা কি স্পষ্ট হয়ে যায় না? 'অন্তত মরিয়মের মত মুসলমান সমাজে' নারীর ক্ষেত্রে? তাই এ ঘটনার পরে পরেই কথক জানিয়ে দেন অগত্যা — 'সংসারে থাকার অভ্যাস যে মানুষটির তার পক্ষে এ ব্যবস্থা বড় কষ্টকর। সংসারে জ্বালানো—পোড়ানো মতিনের স্বভাব। মতিনের জ্বালানো—পোড়ানো মেনে নিলে সব ঠিক আছে। না নিলে লোকটা মৌলবির বেশ ধরে পালাবে।

ফুল জমতে জমতে একসময় পাত্রি হয়ে যায়। মরিয়ম অপমান সহ্য করতে করতে গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। মরিয়ম চায় লোকটা সংসারে থাকুক। তার জন্য মতিনের অনেক বদভ্যাস ও খারাপ আচরণ মেনে নিতে হচ্ছে মরিয়মকে। তিরিশটা বছর নিয়ে তো আছে লোকটাকে মরিয়ম! অবশ্য পাঠকের তখন আর জানতে বাকি থাকেনা কী—ভাবে আছে এই মরিয়ম।

অবিচ্ছিন্ন নিশ্চিত আশ্রয় মরিয়মের যে নেই তা স্পষ্ট করে তোলেন আফসার আমেদ। রান্নাবান্না সময়। গ্রীষ্মের দিন। বড়ো বেশি অগ্নিময়তা। মেয়ে জামাই এসেছে। বেলা দশটা থেকে রান্নাঘরে ঢুকেছে মরিয়ম। জামাই—মেয়ের জন্য রান্নাবান্না ভালো মতো করতে হচ্ছে। একটু শীতল বাতাসের জন্য প্রাণ হাঁসফাঁস করছে। শরীরও আরাম পেতে চায়। দুপুরে একটু না ঘুমোলে উপায় নেই। কিন্তু সেই আরাম পাবার সুযোগ তার নেই। নেই কেননা ঘরের অভাব কথক জানান —

'দুই ছেলের বউয়ের দুটি ঘর। মেয়ে জামাই তাদের ঘরটা দখল করেছে। পাশের ঘরটাতে মতিন একাই দখল করে আছে। মরিয়ম নিজের স্বার্থের কথা ভাবলে, মতিন যদি চলে যেত, তাহলে দুপুরে অথবা রাত্তিরে পা ছড়িয়ে আয়েশ করে ঘুমতে পারত। তা পারছে না, তবুও লোকটা চলে যাক এটা চায়না মরিয়ম।'

---- লক্ষণীয়, যে পরিস্থিতিতে বিশ্রামের প্রয়োজন নারী-পুরুষ — উভয়েই; সেই গরমের দিনে পাশের ঘরটাতে মতিন একাই দখল করে আছে। মরিয়মের জন্য, মরিয়মের

বিশ্রামের জন্য তার হেলদোল নেই কোনো। মরিয়মের এই কষ্টকথা শুধুমাত্র মরিয়মের কষ্টে আটকে থাকে না; সে কষ্ট বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান পরিবারে বাস্তব হয়ে ওঠে। মরিয়ম যেন বাংলার নারী রূপের প্রতীক হয়ে ওঠে।

জীবনে দারিদ্র থাকতে পারে, কিন্তু জীবন যে কোনও ভাবেই দরিদ্র নয় — এমনই এক মায়াময় উপলব্ধির জগতে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও গল্প—কথক মরিয়মকে নিয়ে যাওয়ার অবকাশ তৈরি করে দেয়। জীবনে ছোট ছোটো স্বপ্ন, আশা, মায়ার হাতছানি থাকে বলে জীবন যে গতিশীল থাকে; — তেমনই এক মায়া — পরিবেশ রচনা করেন কথাকার আফসার। গ্রীষ্মের দাবদাহে আর ভীষণ কর্মব্যস্ততায় যখন ক্লান্ত শরীর তার আরাম পেতে চায়, তখন হঠাৎই 'কোথায় যেন একটা পাখি মিষ্টি সুরে ডাকছে। কোথায়? কোনদিকের গাছপালায়?' পাখির মিষ্টি সুর মরিয়মের কানে আসে ঠিকই। কিন্তু রান্নাঘরে রান্না করতে করতে দিক নির্ণয় করবার টুকরো অবকাশ সে পায় না। পাখির ডাক কোথা থেকে আসছে, তা বুঝতে গেলে রান্নার আয়োজন থেকে সে সরে যাবে। যদি তা সে সুযোগ থাকত তাহলে সে হয় রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখত, না হলে একটু বাইরে বেরোত; তাতেও যদি পাখিটার অবস্থান খুঁজে না পায় তাহলে 'ঘাটের দিকে তাকে আপন মনে দাঁড়াতে হতে পারে।'

বস্তুত, সংসারের নিরবচ্ছিন্ন কাজ আর ব্যস্ততার মধ্যে মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। দরকার হয় মুক্তির। অথচ সে মুক্তির অবকাশ মধ্যবিত্ত জীবনে খুব একটা আসে না। আর নারীর জীবনে তা তো আরও দুর্লভ; অন্তত মরিয়মের ক্ষেত্রে। অন্তর্গত নৈঃসঙ্গের অন্তর্লীন অন্তর্বেদনা তাই ক্ষণিকের জন্য হলেও আনমনা করে তুলতে পারত মরিয়মকে। তাই কথক এমনই একটা অবকাশ তৈরি করে দেন তার বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে। 'তাকে আপন মনে দাঁড়াতে হতে পারে।' কিন্তু বাস্তব অন্যকথা বলে। সে সুযোগ হয়ে ওঠে না। তার কারণ মেয়ে—জামাইয়ের আসা, রান্নাবান্নার ব্যস্ততা। কিন্তু এত বাস্তবনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মরিয়মের মধ্যে একই সঙ্গে চিন্তা—আর— জিজ্ঞাসার স্রোত বইয়ে দিলেন কথক। অতি মসৃণভাবে তার অন্তর্চেতনার চারিয়ে দিলেন সাহসিক সত্তা আর অন্তর্গত সত্তার এক হিমেল টানাপোড়েন। লেখকের উচ্চারণে — 'অথচ পাখিটাকে দিয়ে নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালে ভালই লাগতো তার।' এই নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানো জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত নয় কি?

যার জীবনের সঙ্গে ত্রিশটা বছর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে, তাকে না মানানো ছাড়া আর উপায় কি? তাই মতিনের নানা রকম বদভ্যাস মরিয়মের চোখে পড়লেও মতিনের পক্ষে সে থেকে যাচ্ছে। জামাইয়ের জন্য ডিম ভাজবে বলে ঘর থেকে ডিম আনতে গিয়ে মরিয়ম দেখে একটা ডিম কাঁচা, সে চুষে চুষে খাচ্ছে। নিজের মনে মনে সে বলে — 'ওই লোকটা কিনা মৌলবি, সে মসজিদে ইমামতি করে?' নিজের রাগ দাঁতে চেপে রাখল

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

মরিয়ম। কিছু বলল না। বরং একটু নরম সুরে বলে — 'কি গো, এত বেলা হ'য়ে গেল, এখুনো গোসল করে এলেনি?' সুর তাকে নরম করতেই হয়। কী সে করবে এছাড়া? তিরিশ বছরে যে শোধরাল না, তাকে বলা মানে তো পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। হৃদড় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে কারই বা ভালো লাগে?

রান্নাঘরে মতিন মাংস চাখতে থাকে। উবু হয়ে বসে। মতিন মরিয়মের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে মরিয়ম বলে —

'আলতাফকে বলে দোব; তোমার জন্যে একখানা লতুন থামি এনে দিবে।'

"আর গেঞ্জি?"

"গেঞ্জির কথাও বলব।"

"জামাইকে বলেছি, জুতোর কথা।"

— এতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু জামাইকে জুতো কিনে দেবার কথা বলতে শুনে মরিয়ম গুম মেরে থাকে। 'জামাইয়ের কাছে মান ইজ্জত সব দিয়ে দিল।' নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে, বিশেষত নারী জীবনে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত না থাক সম্ভ্রমবোধটুকু তার সম্বল। মতিন মরিয়মের জীবনে এই সম্মান বোধটুকুই তো মরিয়মের সম্বল—আশ্রয়। মতিন সে ইজ্জতটুকু পর্যন্ত জামাইয়ের কাছে রাখতে পারল না! এমনই বেআক্কেলে বেহড্ড সে। মতিনকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয় মরিয়মকে। বড়ো ক্লান্তি বোধ হয় তার। জীবনে না আছে শান্তি, না আছে সুখ, না স্বস্তি। মন তার খারাপ হয়ে যায়। সে ভাবে — 'নির্জনে কোনো গাছ পেলে মনের কথা তাকেই শোনাত এমনই তার মনের দুঃখ।' — মরিয়মের এই উক্তিতে তার দুঃখবোধের চরিত্রটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে জানিয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিত দুটি উপাদানের কথা। — একটি হল নির্জনতা এবং অন্যটি নির্জন পরিসরে কোনো গাছ। আমরা জানি মানুষ কখন নির্জনতা সন্ধান করে। যখন মানুষ চূড়ান্ত একা হয়ে যায় এবং আত্মসম্বিৎসহ আত্মজিজ্ঞাসায় উন্মুখ হয়ে ওঠে তখন সে নির্জনতা আকাঙ্ক্ষা করে। তাই মরিয়মের কাছে অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে নির্জনতা। অন্যদিকে প্রশ্ন জাগে কেন গাছ?

আসলে আমরা লোককথা ও মৌখিক পরম্পরা সূত্রে জানি গাছ মানুষ তথা সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কত নিঃসঙ্গ মানুষের দুঃখ—সুখের সাক্ষী সে; একই সঙ্গে নীরবও। সেই আবার আশ্রয়দাতা। তেমনিই মরিয়মের জীবনে যা কিছু ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণা, অপমান — সবই সে নির্জনে গাছকে বলবে। গাছের বড়োত্ব—মহিমাই একমাত্র পারবে তার যন্ত্রণাকে, তার দুঃখ কথাকে পরম মমতায় ও ধৈর্যসহ শুনবে। সংসারে এক ধরনের মানুষ আছে যারা শুধু অন্যের জন্য সারাজীবন আত্মদীপ হয় আলোই দিয়ে যায়। অথচ নিজের কথা — দুঃখ অভাব — অভিযোগ — অনুযোগ শোনাবার মতো কোন

জায়গা থাকে না। মরিয়ম তিরিশটা বছরই শুধু পরিবারের জন্য খেটে গেল। একদিনের জন্যেও মতিন তাকে বোঝেনি। বুঝবার জন্যে কোন অবকাশ দেয়নি। তার মনকে গুরুত্ব দেয়নি। এইজন্যে মরিয়ম মনের কথা শোনাতে চেয়েছে গাছকে। যে কথা মনের গভীরে নিবিড়ভাবে সঞ্চিত আছে যে কথা কেউ বোঝেনি, সে কথা গাছকে শুনাতে চেয়েছে এমনই বিবিক্ত মরিয়ম।

আবার রান্নাঘর থেকে লক্ষ্য রাখতে হয় মেয়ে-জামাইয়ের ঘরটাকে, কেননা ঘর থেকে জামাই উঠোনে বেরোলে, নিজে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। তখন সে গায়ে ঢাকাঢুকি দিতে পারে; মাথায় আঁচল তুলে দেবার সময় পাবে। তা নাহলে অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হবে। সেই তো প্রথম জামাই। জামাইয়ের সঙ্গে সলব্ধ—সম্ভ্রমের দূরত্ব রাখা—একটি সংস্কৃতির মনোভঙ্গির পরিচয় সেটা মরিয়মের আচরণ ও উচ্চারণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতঃপর যেন ড্রামাটিক রিলিফের মতো গল্পের ঘটনার কিছু পরিবর্তন হয়। মেয়ে—জামাই যে ঘরে আছে, সে ঘরে একটা আড্ডার আবহ তৈরি হয়। মেয়ে—জামাইয়ের সঙ্গে আছে ছোটো মেয়ে সাবিনা। দুলা—ভাই আর শালির চলে খুনসুটি। সে ঘরে আসে মেজ শালাজ। উদ্দেশ্য — দুদণ্ড জামাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা — ইয়ার্কি করা। সে কাঁচা পোয়াতি। বারো দিন হল খালাস হয়েছে। মরিয়ম তাকে কাজ করতে দেয় না। তোলা—জল দেয়। কন্যা—সন্তান প্রসব করেছে। মেয়েটিকে ঘুম পাড়িয়ে নন্দাইয়ের ঘরে খুনসুটি করতে গেল। মরিয়ম বলছে সে প্রসঙ্গে — 'করুক যাক।' — কথাকার অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে গ্রাম-নির্ভর জীবন যাপনের ছবি তুলে ধরেন এখানে। জামাই মানে আদরের ধন। শালাজ-শালি সকলেই মিলে টুকরো টুকরো ইয়ার্কি, আড্ডা চালাবে, — এটা প্রথালালিত বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতি। একদিকে এই জামাই-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি, অন্যদিকে মরিয়মের বক্তব্যে মমতাময়ী মায়ের স্নেহ প্রশ্রয় অনতিপ্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। মেজো বউমা কাঁচা পোয়াতি হবার কারণে তার প্রতি যত্ন ও সেবার ত্রুটি নেই তার। "তোলা ভাত—পানি দেয়।" দীর্ঘ বেশ কয়েক মাস গর্ভধারণের কারণে সেজ বউমা বেরোতে পারেনি; মন তার বদ্ধ হয়ে আছে। তাই জামাইয়ের সঙ্গে আড্ডা ইয়ার্কিতে মরিয়মের আপত্তি থাকে না; বরং ইতিবাচক সম্মতিই দিয়েছে।

মরিয়ম জানে 'নিজের সংসারে নিজে রান্না করাটা হাতে রাখলেই সুখ।' মেজ বউ যেহেতু কাঁচা পোয়াতি তাকে দিয়ে সংসারের কোনো কাজ তখন সে করায় না, বড় বউ পুকুরঘাটে "মাজাঘসা ও ধোয়াপাকলা" করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে শাশুড়ি মাকে সে রান্নার জোগাড় দেয়। কেউ কেউ রান্না বসিয়ে দেবে ---মরিয়মের সুখ নেই। আসলে এখানে নিজে রান্না করার নেপথ্যে রয়েছে স্পষ্ট অভিপ্রায়। প্রথমত দুই ছেলে মরিয়মের তেমন বড়ো রোজগারের কাজ করে না। বড়ো ছেলে পাড়ায় পাড়ায় ঘট, সরা প্রভৃতি

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

জিনিস ফেরি করে। আর মেজ ছেলে চাষা, জন খাটে। রোজগার কেমন হবে —এ থেকে বোঝা যায়। সেই রোজগারের সংসারে মরিয়ম চায় মেপেজুখে সংসার চালাতে। সেজন্যে রান্নার দায়িত্ব নিজে নিয়েছে। শুধু তাই নয় অন্য একটা দিকও এর পেছনে আছে তা বোঝার অসুবিধা হয় না। পরিবেশনে যদি মমতা না থাকে, তা হলে মন ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা অনিবার্য। আর সেই মনক্ষুন্নতার কারণে সংসারে সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য নিশ্চিত। তারই পরিণতি পৃথগন্ন হওয়া। মরিয়ম এ সবই বোঝে। বোঝে বলেই তো এত পরিশ্রম করে রান্নার কাজটা হাতে রেখে সুখ অনুভব করে। এছাড়া অন্য একটি দিক একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। হাত গেলে ভাত যাবে। কাজে কর্মে সচল থাকলে শরীর—মনও সক্রিয় থাকবে। তাছাড়া সংসারে কর্তৃত্বটা হাতে রাখা যাবে। তিরিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে যে মতিন তাকে সামান্যমাত্র বোঝার চেষ্টা করেনি। তেমন গৃহিণীর ক্ষেত্রে সংসারের এরকম টুকরো টুকরো কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে যন্ত্রণা গেলা ছাড়া আর কোন পথ আছে?

অভাবের সংসারে সবদিক থেকে যাতে আয় রোজগার হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয় মরিয়মের। যাতে দুটো পয়সা হাতে আসে। তাই বোনের কাছ থেকে সাতদিনের বাচ্চা এনে বড় করছে। সেটা আবার পোয়াতি হয়েছে। বিদগ্ধজনেরা অবশ্য এর মধ্যে উর্বরতার সংস্কৃতির সন্ধান করতে পারেন; কিন্তু সহজভাবে বোঝা যায় এই ছাগল পোষানি নেওয়ার মধ্যে সংসারে অর্থাগমের দিকে মনোযোগ মরিয়মের টনটনে। কিন্তু অন্য একটি দিকও অনতিপ্রচ্ছন্ন; — বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে হাঁস—মুরগি পশুপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষত নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে এরকম দু-একটি করে ছাগল গরু পোষা এবং মাঠের ঘাস—বিচুলি, লতা—পাতা দিয়ে তাদের খাদ্য যোগানো অতিপরিচিত ছবি। মুসলমান সমাজে এছবি তো আরও স্পষ্ট; অন্তত গ্রামীণ সমাজে। মরিয়মের — 'এই সব নিয়ে তার সংসার।'

জামাই আলতাফকে দেখি শালি সাবিনার কোনো একটি কথার প্রসঙ্গে "খপ করে" হাত ধরতে। এই হাত ধরাটা নির্জনে নয়, বউ ও শালাজের সামনে। সাবিনা শালিক পাখির মতো চেঁচামেচি জোড়ে তাতে। আরও জানাচ্ছেন, —

'জারনা তক্তপোশে বসে পা দুটি নিচে নামিয়ে দিয়ে দোলাতে থাকে। মেজ বউ সাধনার অন্য হাতটা ধরে টানছে। হাসির-হররা আর দাপাদাপি ঘর জুড়ে।'

লক্ষণীয়, কয়েকটি দিক এই পরিস্থিতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। জামাইবাবু এবং শালির মধ্যেকার প্রীতিপ্রসন্ননের সম্পর্কটুকুও অতি মসৃণ থাকে না, বরং একটু কর্কশকতার অভিমুখী ঠাট্টা-ইয়ার্কি আবহ; তা না হলে লেখক 'খপ করে' শব্দদুটি ব্যবহার করতেনই না। যেন নারীকে চাপিয়ে দেওয়া যায় পুরুষ আধিপত্যের ক্ষমতা। সে কারণে সাবিনার শালিক পাখির

মতো চেঁচামেচি। বড়ো বোন জরিনার তক্তোপশে বসে পা নামিয়ে দোলাতে থাকার মধ্যে একদিকে যেমন আছে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে তার উদাসীনতা, অন্যদিকে বাপের বাড়িতে এরকম একটা আবহে মানসিক প্রশান্তির পরিচয়। আবার কিছুটা কষ্টকল্পনা হলেও এরকম ভাবনা একেবারে অসংগত হবে না ; যে সাবিনার হাত ধরা আর জরিনার পা দোলানো — এই ঘটনা দুটি নিছক দুর্ঘটনামাত্র, নাকি দুটি ঘটনার মধ্যে একটি নেতিবাচক ইশারা প্রচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছেন কথাকার? চেয়েছেন বোধ হয়। কেননা আমরা জেনেছি **'The foot is the primitive sexual symbol already found in myth'** ফ্রয়েড—এর অপরিচিতি এই উক্তিটি যেন এই ঘটনার মধ্যে সূক্ষ্ম যোগসুত্র রচনা করে। আর মেজ বউ সাবিনার অন্য হাত ধরে যখন টানে তখন এক ধরনের নিষেধকে জানান দেওয়ার ইচ্ছে বৈকি! হাসির হররা আর দাবাদাবি চলতে থাকে ঘরজুড়ে। তখন অন্তঃপুরের চালচিত্রটা যে কি তা বুঝতে ভুল হয়না পাঠকের।

ঘষা—মাজা করে আনা থালা-বাসনগুলো নিয়ে বড়ো বউ রান্নাঘরে ঢোকে। চার বছর তার বিয়ে হয়েছে। এখনো পর্যন্ত সে পেটে ছেলে ধরেনি। বাসন-কোসন রেখে বড়ো বউ ধোয়া—পাকলা অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন কাপড়গুলো বাড়িতে টাঙানো দড়িতে শুকোতে দিতে গেল। আমরা লক্ষ করছি বড়ো বউ—এর কিন্তু অবসরের কোনো ফুরসত নেই-ই। শাশুড়ির হাতে হাতে জোগান দেওয়া, ধোয়াপাকলা করে দড়িতে মেলা—ইত্যাদি। এর উল্টোদিকে দেখি কাঁচা পোয়াতি মেজ বউকে তোলা ভাত—পানি দেওয়া হয়, নন্দাইয়ের ঘরে খুনসুটি করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। মেজ বউ—এর কথা যদি ছেড়েও দিই তাহলে এখনও থাকে মরিয়মের দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে জরিনা বাপের বাড়ি এসেছে তার দেওয়া দরকার। ছোটো মেয়ের সাবিনা কি মায়ের হাতের কোন কাজ করতে পারত না? না, তাকে নিয়ে কোন কাজ করতে চাইনি মরিয়ম। সে তো একদিন শ্বশুরবাড়ি যাবে। বড়ো বউ বিয়ের চার বছরের মধ্যে যেহেতু কোনো ছেলে পেটে ধরলো না, সে কারণে তার প্রতি সূক্ষ্মভাবে এক ধরনের বিরূপতা আছে মরিয়মের। তা না হলে একবার ঘরের কাজ একবার ধোয়া পরিষ্কার করানো — সবাই তো চলছে। সকলের তো শরীর। তার কি কোনো কষ্ট হয় না? আসলে গর্ভধারণ করেননি বলে সূক্ষ্ম একটি রাগ, সাংসারিক কূটবুদ্ধি মরিয়ম প্রয়োগ করে। কথকের একটি বাক্যে সেই বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তোলে। —'সবদিকে নজর আছে মরিয়মের।' আসলে এই "সবদিকে" শব্দবন্ধটি মরিয়মের মনোভঙ্গিকে আর প্রচ্ছন্ন রাখে না, বরং স্পষ্ট করে তোলে। না হলে অর্থহীন হয়ে যেত অনুচ্ছেদে শেষ বাক্যটি — 'সংসারের মধ্যে এক মনোরমতা আছে।'

এরপর আমরা দেখি বাইরে থেকে মতিন মেয়ে সাবিনাকে ডাকে। বাইরে থেকে ডাকার মধ্যে পারস্পরিক শালীনতার ব্যাপারটা বোঝা যায়। জামাই—মেয়ে বউমার আড্ডার

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

আবহে তার প্রবেশ রুচিকর হবে না। তাই। কিন্তু সাবিনা বেরিয়ে এলে মতিন যা বলে তা শুনে মাথায় যেন বজ্রপাত হয় মরিয়মের। মতিন বলে — 'জামাইয়ের পকেট থেকে পয়সা লিয়ে যা ত মা বিড়ি কিনতে।' কান খাড়া করেছিল মরিয়ম, লোকটা কী বলে মেয়েকে শোনাবার জন্যে। শুনে বুক ফেটে যায় মরিয়মের। মরিয়ম বলেই ফেলে — 'কি বলে বেআক্কেলে লোক!' জামাইয়ের কাছে পয়সা চেয়ে নেশার বিড়ি কেনা — ভাবতেই পারে না যে। মান ইজ্জত সব ধুলোয় মিশে গেল। সাবিনা বোনাইয়ের পকেট থেকে পয়সা নিয়ে বিড়ি কিনতে চলে গেলে মরিয়ম সাবিনার উদ্দেশ্যে গাল দিয়েছে — 'বাপ ভাতারি মেয়ে' বলে। এই গালের অর্থ তলিয়ে ভাবলে অত্যন্ত লজ্জাকর। বাপ—মেয়ের অবৈধ শারীরিক সম্পর্ককে বোঝায়। কিন্তু মরিয়ম অত তলিয়ে ভেবে মেয়েকে গাল দেয়নি। সাধারণ লোকসমাজে মহিলাদের মুখে মুখে যে সব গালাগাল লেগে থাকে অভ্যাস বসে তেমনই একটি খারাপ শব্দ প্রয়োগ করেছে মেয়েকে। এতে বরং সমাজচিত্রটা অনেক বেশি বিধ্বস্ত হয়ে ওঠে। লেখকের মুন্সিয়ানা এখানে প্রতিভাত।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে লেখক আবার ফিরিয়ে আনেন পাখির প্রসঙ্গ ও মনোরমতার আবহে। — 'পাখিটা বুঝি আবার ডাকে। সংসারের মনোরমতাকে আরো বাড়িয়ে দেয় পাখিটা।

ঘাট, আম বাগান জুড়ে ছড়ায়। পাখিটার অবস্থান খুঁজে বেড়ানোর অবকাশ নেই মরিয়মের।'

সন্দেহ নেই, পাখিটার আবার ডাক আসলে মরিয়মের ক্রম উদাসীন মনোভুবনকে উন্মোচিত করছে। গ্রীষ্মের সেই অগ্নিময়তার দিনে উনুনশালে যেখানে আগুনের জ্বলুনি আছে, সেখানে তো আছে মুক্তি প্রত্যাশী মনের ছটফটানি। পাখিটা তখন কেবলমাত্র বাস্তবের পাখি থাকেনা। একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পাখি। এই পাখিটাই সংসারের মনোরমতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কীভাবে? আসলে পাখি তখন মানুষের উন্মুক্ত সঙ্গচেতনার প্রতীকী রূপায়ণ হয়ে উঠেছে। যে মন সঙ্গকাতর, বিবিক্ত, সেই মনকে আশ্রয়ের আশ্বাস বয়ে আনে এ পাখি। চারিদিকে দেখেছি আনন্দ আবহ। মেয়ে—জামাই—বৌমা— আড্ডা দিতে ব্যস্ত সেই শুধু সাংসারিক প্রাত্যহিতকার কাজে ফুরসত পাচ্ছেনা। তার মনের মানুষটিও সম্ভ্রমহীন, আত্মমর্যাদাহীন একটি অস্তিত্ব মাত্র। সুতরাং সেই মরিয়মের মধ্যে সঙ্গলিপ্সার এক অনিঃশেষ হাহাকার জায়মান। ভরা সংসার তাই তার এমন মনোরম লাগে। আসলে 'মনোরমত্তা' শব্দের মধ্যে আছে দুটি শব্দের আভাস। একটি মন, অন্যটি রমতা। 'রমতা'—রমণীয়তার ধ্বনি সাম্যকে মনে করিয়ে দেয়। পাখিটার অবস্থান খুঁজে বেড়ানোর জীবনে নেই বলে আমরা জানছি। অর্থাৎ পাখিটার ডাক যেখান থেকে আসছে, সেখানে যাবার মত ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য ও পরিস্থিতি — কোনটাই নেই তার। সংসার কেন্দ্রে বার বার ফিরে আসতেই হবে তাকে। এমনকী মনের মধ্যে যে পাখিটা বাস করে, ইচ্ছাকে মরিয়ম রক্তমাংসের

শরীরে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে, যে ইচ্ছার স্বরূপ কেমন, তাও উপলব্ধি করার অবকাশ বা সুযোগ তার জীবনে আসবে না। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে এমনই আবর্তিত হতে হবে, যেমন আবর্তিত হতে হয় আর পাঁচজন মুসলমান সমাজের সাধারণ নারীর।

সেই অবকাশ মরিয়মের মতো নারীদের জীবনে আসতে দেয় না মতিনের মতো স্বামীরা। বেয়াক্কেল সে মতিন আঙিনায় বসে জামাইয়ের দেওয়া পয়সায় আনা বিড়ি খাচ্ছে। একটু রাগারাগি করলেই সে হুগলি জেলায় ইমামতি করতে চলে যাবে। মরিয়ম তাই আর রাগারাগি করে না। বরং সে চায় — 'না। থাক। একটু উল্টোপাল্টা করছে করুক কিছু বলবে না।' এতে রাগে গোপনভাবে নিজের কলজে ছিঁড়তে থাকে মরিয়ম। সংসারের সব গরল আত্মসাৎ করা ছাড়া মরিয়মের অন্য কোনো উপায় থাকে না।

মরিয়ম আঙিনায় এসে মতিনকে গোসল করতে যাওয়ার নির্দেশ দিলে উল্টে মতিন জানতে চায় যে গোসল করে এলেই সে ভাত পাবে কি না। মরিয়ম তাতে ইতিবাচক উত্তর দেয়। তাতেই প্রশ্রয় পেয়ে যায় মতিন। তৈরি হয় প্রেমের এক যাপন পরিস্থিতি —

"রাগ করছিস, আমার উপর?"

"না তো।"

"পিঠ চুলকাচ্ছে খুব, একটু ঘামাচি মেরে দিবি।"

"এখন কী করে পারব?"

"ও তাই তো।" বিড়ি টানতে থাকে মতিন।

লক্ষ করার বিষয় নারীর অন্তর্মনে নিহিত রমণীয়তার আকাঙ্ক্ষাকে কথাকার আফসার আমেদ আড়াল করেননি। সেই দিকটা তুলে ধরার জন্যে পাখির প্রসঙ্গটিকে ভূমিকা বা গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কথোপকথনটিতে মরিয়ম রাগ করছে কি না মতিন জানতে চাইলে মরিয়মের স্বরভঙ্গি বদলে গিয়েছে। মনোভঙ্গির কারণে এই বদল। কথা তাই সংক্ষিপ্ত 'না তো।' শুধু 'না' বললে বোঝাত একটি অন্তর্শায়ী অভিমানের কথা। কিন্তু তার সঙ্গে একটি মাত্র বর্ণ 'তো'—এর ব্যবহার বুঝিয়ে দিচ্ছে মরিয়মের প্রশ্রয় আছে মতিনের প্রতি। মতিন—এর পরে একটু ঘামাচি মেরে দেবার কথা পাড়লে মরিয়ম জানিয়েছে "এখন কী করে পারব?" অর্থাৎ ঘামাচি মেরে দিতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু সময়টা অনুকূল নয়। আর ঘামাচি মারা আসলে প্রেমের খুনসুটি যাপনের ইঙ্গিত তো! প্রিয়জন — সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন সামান্য ব্যথা দিলে বেশি করে বুকে বাজে। সে ব্যথা মতিনের বুকে বেজেছে। মরিয়ম বুঝতে পারে। মতিনকে সে চিনবে না তো আর কে চিনবে! তিরিশ বছরের দাম্পত্য যাপন। মতিনের এমন বেয়াড়া আবদার মেটানোর ফুরসৎ নেই এখন মরিয়মের। তবে মরিয়ম জানে কী ভাবে মতিনের রাগ ভাঙাতে হয়। মরিয়ম তাই ঘরের ভেতর থেকে পান সেজে এনে একটা পান নিজে খায়, অন্য খিলিটা মতিনকে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

বাড়িয়ে ধরে। মতিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাতে। পান খাওয়া একেবারে স্বাভাবিক ঘটনা বাংলার গ্রামীণ জীবনের পরিসরে। কিন্তু দম্পতির টুকরো অভিমানের পরেই পানের প্রসঙ্গ তীব্র জীবন সংরাগের আবেশ প্রেক্ষিত তৈরি করেছে।

অতঃপর সাবিনা নুন, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে বোনাইকে কাঁচা আম খাওয়াবে বলে রান্নাঘরে ছুটে এসেছে। এসেই সে মাকে জিজ্ঞাসা করেছে —'ও মা চাচা এল?' প্রথমটায় ভালো করে কান না দিলেও যখন মরিয়ম জানতে পারল বোম্বের 'নিশার চাচা'—র কথা, তখন মরিয়মের খুশিতে ভরে যায়। তাদের পাশের বাড়ির মরিয়মের চাচাতো দেওর। বোম্বেতে দর্জি লাইনে কাজ করে। প্রায় আটমাস পরে ফিরল। বুকের ভেতরটা মরিয়মের কেমন ধক করে উঠেছে এই নিশার ফিরে আমার আসার সংবাদে।

এই নিশার—এর সঙ্গ—সাহচর্য ও প্রসঙ্গের ভিত্তিতে মরিয়নের অন্য একটি পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। মরিয়মের যে শূন্য জীবন অনেকখানি ফাঁকা থাকে, তার অনেকখানি জুড়ে থাকে নিশার। কথকের উচ্চারণে :

'এই দেওরটাকে কতদিন না দেখে তাকে থাকতে হয়। আর এই দেওরটার সঙ্গে মরিয়মের ভাব। বম্বে থেকে ফিরলে সারাক্ষণ এখানেই কাটায়। মাঝে মাঝে চা করে দেয় আর পান খাওয়ায়। মরিয়ম সংসার কী করল, এসব গল্প শোনাতে ভালোবাসে।'[৩]

—মরিয়ম একাই শুধু শোনায় না। নিশারও নানা গল্প শোনায় মরিয়মকে। বোম্বে থেকে ফিরে এলে নিশারের সঙ্গে গল্প করে বেশ কাটে মরিয়মের। লেখক এর বর্ণনায়: —

'মরিয়মের মনের ভেতরটা আনন্দে ছেয়ে যায়। বেশ ফুরফুরে হয়ে ওঠে। মনটা ভেতরে ভেতরে ছটফট করে। নিশারের সঙ্গে তার কোনো খারাপ সম্পর্ক নেই। কথা বলার সম্পর্ক। আসলে সঙ্গ পেতে ভালোবাসে মরিয়ম। অনেক সময় যেমন মতিনের সঙ্গ পেতে ভালবাসে মরিয়ম। মরিয়মের চাওয়াটা মরিয়মের উপর নির্ভর করে।'[৪]

—উপরে উদ্ধৃতি দুটো একটু অভিনিবেশ সহ অনুধাবন করলে দেওর ভাবির মনোজগৎ বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে আমাদের কাছে। এই নিশারকে কত দিন না দেখে মরিয়মকে থাকতে হয়। অর্থাৎ শারীরিকভাবে দূরে — বম্বে থাকে বলে মরিয়ম দেখতে পায় না নিশারকে। যদি সম্ভব হত নিয়ত দেখার সুযোগ, তাহলে প্রতিদিন সর্বক্ষণ দেখতো তাকে। যেমন বোম্বে থেকে ফিরে এলে নিশার পড়ে থাকে মোরিয়মদের বাড়িতে। নিশার বিবাহিত। তার বউ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় মরিয়মদের বাড়ি নিশার থাকাকালীন। মরিয়ামের মনের ভেতরটা নিশারের উপস্থিতিতে আনন্দে ছেয়ে যায়। ফুরফুরে হয়ে ওঠে। এই সম্পর্কটাকে তাহলে কোন বিশেষণে আখ্যাত করা যায়? সম্পর্কটাকে চিহ্নিত করার আগে লেখকের একটি কথার দিকে আমাদের মন আটকে যায়। আমরা কি জানতে চেয়েছি

নিশারের সঙ্গে মরিয়মের কোন খারাপ সম্পর্ক আছে কি না? আর খারাপ সম্পর্ক বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

সম্পর্ক আসলে খুব গভীর। কেননা আমরা জানি —'ভালোবাসা মানে শরীর বিস্মৃত ঘুম পাশাপাশি।' দাম্পত্য চার্যার ভালোবাসা। এবং সাধারণীকৃত শব্দ ভালোবাসা—দুয়ের মধ্যে ব্যবধান দ্বিমেরুর বিষম। মানুষ স্বভাবত সঙ্গ কাতর। তার মনের গভীরে রয়ে গেছে সঙ্গ-যাপনের চিরন্তন আকুতি। সঙ্গ মনের মধ্যে জন্ম দেয় বন্ধুতার অনুভবের। সেই অনুভব ধীরে ধীরে পারস্পরিক উপলব্ধিতে প্রেমে উত্তীর্ণ হয়। মরিয়মের সঙ্গে যদি তেমন সম্পর্ক নিশার না থাকত তাহলে লেখককে উপযাচক হয়ে বলে দিতে হত না দুজনের কোন খারাপ সম্পর্ক নেই। এ যেন ঠাকুর ঘরে কে, এবং আমি তো কলা খাইনি বাস্তবতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু মুসলমান সমাজ এ গল্পের প্রেক্ষিত, এবং মতিনের মতো স্বামী যে মরিয়মের, সেখানে ভালোবাসার কথা বলা কিংবা একেবারে চুপ করে যাওয়াও বা মৌন থাকা—যা স্বীকৃতির নামান্তর। সে কারণে লেখককে একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সাহস দেখাতে পারেননি। তা না হলে এ কথাটির কী মানে দাঁড়ায়?

'অনেক সময় এমন মতিনের সঙ্গ চায় মরিয়ম। একটু আগে যেমন চাইছিল, চাওয়ার মন সে পেতে রেখেছিল।'

আর তাছাড়া, — 'সংসারে সকলের সাক্ষাতেই তাদের কথা চলে, ঘন্টার পর ঘন্টা' ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কি কথা থাকতে পারে? কত কথা থাকতে পারে? দুজন মানব-মানবী কীসের আকর্ষণে এমন অনবিচ্ছিন্নভাবে দুজনের সঙ্গ দিতে পারে?

খারাপ সম্পর্ক বলতে আফসার আমেদ কী বোঝাতে চেয়েছেন? প্রেম? যৌনতা? যদি ধরেও নিই তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে হয় প্রেম খারাপ সে কথা কে বলবে? পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত যে সম্পর্কের বন্ধনগুলো রয়ে গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন প্রেমের বন্ধন। সে স্বকীয়া হোক কিংবা পরকীয়া। প্রেমই সেই আশ্চর্য সম্পদ, ক্ষয়হীন আশা, মৃত্যুহীন মর্যাদা, যা যুগ যুগ ধরে সভ্যতাকে সচল রেখেছে। আর যদি পরকীয়া হয় তবে আমরা এ উপলব্ধিকে মিলিয়ে নিতে পারি কবি জয় গোস্বামীর 'কলঙ্কের আমি কাজলের' কবিতার সঙ্গে —

'কলঙ্ক, আমি কাজলের ঘরে থাকি
কাজল আমাকে বলে সমস্ত কথা
কলঙ্ক আমি চোট লেগে যাওয়া পাখি
বুঝিনা অবৈধতা।'

আর যদি খারাপ সম্পর্ক বলতে যৌনতাকে বুঝি, তাহলে এখানেও জিজ্ঞাসা আছে আমাদের। যৌনতার বিষয়টা সব সময় পবিত্র ও শুদ্ধ; তা যদি দুটি মনের পূর্ণ সমর্থনে ঘটে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

থাকে। কেননা জীবের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে যৌনতা অপরিহার্য। সেই যৌনতা পবিত্রতায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় যদি দুজন তা সে যে কোন বয়সের পূর্ণ নর—নারী হয়। প্রসঙ্গত মনে পড়বে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে বোল্যয়র—এর কথা। ----'শুধু তা-ই পবিত্র যা ব্যক্তিগত।'

নিশারকে আলাদাভাবে বসতে দেবার মতো ঘর নেই মরিয়মদের, সংসারের নানা কথা মরিয়মের পেটের ভেতর ফুটছে। নিশারেরও সব কথা জমা আছে। মেয়ে জামাই থাকলে অবসরে তাদের তো কথা বলার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। আর তাছাড়া যখন তারা কথা বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে। তাদের সে কথা মেয়েরা শুনে যায়। বউরা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে যায়। পাড়ার লোকের নানা কাণ্ডকারখানার খবর মরিয়ম দেবে। তাতে মরিয়মের চমৎকার মন ভালো থাকবে। কিন্তু নিশার জন্য মরিয়মের ভেতর অস্থির হয়ে ওঠে। সারাক্ষণ তোলপাড় হয়ে চলেছে মন। নিশার প্রতিবারই বোম্বে থেকে চেহারায় অন্যরকম হয়ে ফিরে। হয় চুলের ধরন বদলায়। স্বাস্থ্য ভাল হয় না হয় রোগা হয়। এই মুহূর্তে নিশারকে দেখার জন্য তাই মরিয়মের মন আকুলি—বিকুলি করে ওঠে। তারপরেই কথাকার জানান মরিয়মের সম্পর্কে —

'হাঁড়িতে চামচ অস্থির ভাবে নাড়ে। হাতের অস্থিরতায় থালাবাসন ঝনঝন করে পড়ে যায়। বুকের ভেতর ভারি নিঃশ্বাস ধাক্কায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য—এর এই কথাগুলো আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে পড়ে না কি? —'আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। / বাঁশির শবদে মোর আউলাইন রান্ধন।' তিরিশ বছর মতিনের সংসার ঘর করার পরও মরিয়মের নিশার সম্পর্কে অনুভূতি এমন, তাতে প্রেম ছাড়া কীই বা বলা যেতে পারে?'

একটু যে উঠে জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে নিশারদের আঙিনায় চোখ রাখবে তার অবকাশ নেই মরিয়মের। কেননা, সে তরকারি কষছে। একটু সরে গেলে পুড়ে যাবে তরকারি। শব্দটা লক্ষ্য করার মতো।

'পুড়ে 'যাবে', পুড়ে যেতে পারে' বলেননি কথক। অর্থাৎ একবার জানলার ঘুলঘুলিতে চোখ রাখলেই এমনই আবিষ্ট হয়ে পড়বে মরিয়ম তরকারি দিকে তার খেয়াল থাকবে না। তার সমস্ত চিন্তা চেতনার জগৎজুড়ে অধিকার করে আছে নিশার। কিন্তু মরিয়ম তা করেনা। সে জানে সংসার কী কঠিন জায়গা।

কচি কচি ছেলেপুলে নিয়ে, নিজের গতরের জোরে সে সংসার চালিয়ে এসেছে এতদিন। মতিন সংসারের কাজে কোনদিনই লাগেনি----

'ঝোড়া চুবড়ি বুনে, তলায় পাটি বুনে, জ্বালুন কুটো কুড়িয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছে নিজেই মরিয়ম। নিশার জানে, তখন থেকেই নিশারের সঙ্গে কথা বলে মনে সুখ পেয়েছে মরিয়ম। এখন সংসার ভরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। ছেলেরা বড় হয়ে রোজগার করছে।'

নিশার—এর সঙ্গে মরিয়মের এই সঙ্গ—সম্পর্ক অনেক দিনের। এই নিশারই তার

অনিঃশেষ দুঃখময় নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গের পরশ দিয়ে সুখী করে রেখেছে। আজ মরিয়মের মনে প্রশ্ন জেগেছে — 'সে ভাল শাড়ি পরে নেই; গায়ে বাস সাবান মাখেনি কতদিন? এখন তার মনে হয় তার মন ভালো থাকার জন্য নিয়মিত গায়ে বাস সাবান মাখার দরকার। নিশার এসেছে বলে নয়। ভালো শাড়ি পরলেও মন ভাল থাকে। মনকে যত্নে রাখার কত কথা উদয় হয় মরিয়মের মনে। মন একটু গুছনো না থাকলে চলে!'

মরিয়ম একা খেটে, বুদ্ধি দিয়ে সংসারকে আজ দাঁড় করিয়েছে। এতদিন নিজের সখ-আহ্লাদের দিকে তাকাবার সুযোগ ছিল না। ছেলেরা বড় হয়ে রোজগার করছে। এই সময়ে প্রায় আট মাস পরে ফির দেওর নিশার। এখন তার ইচ্ছে হয়েছে একটু বিলাসিতা করার। সারা জীবন তো যেমন তেমনভাবে কাটিয়েছে। এবার মরিয়ম নিজের দিকে তাকাবার কথা ভাবতে শুরু করেছে। গায়ে বাস সাবান, নিজে একটু গুছনো থাকা ইত্যাদি। সংগত কারণে প্রশ্ন জাগে আজ এতদিন পর এ বাসনার উদয় কেন হল মরিয়মের মনে? এমতো পরিস্থিতিতে পিছন ফিরে আঁতকে উঠতে গিয়ে থেমে যায় মরিয়ম। গায়ের কাছে চুপিসাড়ে এসে মতিন বসেছিল। মরিয়ম জানতে চায় —

"তুমি আমার গায়ের কাছে এসে বসলে কেন?"

"খেতে দিবি যে? গোসল করে এনু?"

"এখন? এখন তোমাকে খেতে দেব? রান্না শেষ হয়নি, জামাইকে খেতে দিইনি, তোমাকে আগে খেতে দেব?" "এখানে আর একবেলা থাকলে ত, তোর রান্না ভাত খান নি? খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়ব খানাকুল।"

"তাই যেও।" রাগত স্বরে দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে মরিয়ম।'

নিপুণ, মর্যাদাময় শাশুড়ি হিসেবে জামাইকে খেতে না দিয়ে আগে স্বামী মতিনকে খেতে দিতে চাইনি মরিয়ম। তাতে তার স্বাভাবিক যুক্তিবোধ স্পষ্ট হয়েছে। আত্মীয়কে আগে তোয়াজ ভক্তি করা বাংলা সনাতন রীতি। সেদিক থেকে মরিয়ম অন্যথা করতে চায়নি। কিন্তু মরিয়মের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করায় মরিয়মের রাগ হয়েছে বুঝে মতিন অভ্যাসমতো বসে বসে পা ঘসে। এতদিন মতিন রাগ দেখালে মরিয়ম তাকে আটকাতে চেয়েছে। কিন্তু আজ মরিয়ম রাগ প্রশমিত করলো না। ফলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মতিন।

এখন আর মতিনের অত অভিমান বোঝার ইচ্ছে মরিয়মের নেই। যেটুকু পারে তা হলে এক্ষুনি তাকে খেতে দিতে। তাই রান্না শেষ না করে মতিনের জন্য ভাত বাড়তে থাকে। এমন সময় সাবিনা এসে মরিয়ম এর পেছনে এসে দাঁড়ায়। বলে —

"মা, আব্বা খানাকুলের চলে যাবে বলে ব্যাগ গুছুচ্ছে।"

"ভাত বেড়ে দিয়েছি, খেতে দাও গে যাও।"

"মা আব্বা চলে যাবে?"

"জানি নি আমি কিছু।"

এরপর সাবিনা ভাত নিয়ে চলে যায়।

অবশেষে হাতের কাজ শেষ হয় মরিয়মের। একটু পরেই সে পুকুর ঘাটে যাবে। সঙ্গে নেবে এক ডেলা বাস সাবান আর একটা তোলা করা শাড়ি। কথাকার এরপর জানান, — "পুকুরের জলের জন্য শরীরটা ছটফট করছে।"

— গল্পের শেষ বাক্যটা আশ্চর্য দ্যোতনামন্ডিত। মরিয়মের শরীর পুকুরের জলের জন্য ছটফট করছে। কেন না, আজকে সে নিশ্চিন্তে পুকুরের জলে নেমে ইচ্ছে মতো বাস সাবান মাখবে গায়ে। গা থেকে সুগন্ধি বেরোলে মনটাও তাজা হয়ে উঠবে। আর স্নান সেরে গায়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে নিয়ে সে পরবে বগলদাবা করে নিয়ে যাওয়া তোলা করা শাড়ি।

এই অংশে এসে সংগতভাবে আমাদের দায় থাকে কৈফয়ত দেবার। মরিয়মের এই রূপান্তরের নেপথ্য চালক কে? নিঃসংশায়িত ভাবে আমরা বলতে পারি নিশার। নিশারের ফিরে আসা থেকে আমরা লক্ষ করেছি তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য মরিয়মের মনের মধ্যে কী অধীর আগ্রহ। শুধু তাই নয়, তার সামনে নিজেকে সাজিয়ে—গুছিয়ে, সুবাসিত অঙ্গ সৌরভ নিয়ে মরিয়ম উপস্থিত হতে চেয়েছে। কিশোরসুলভ এই উদ্বিগ্নতা ও চঞ্চলতা কাদের মধ্যে দেখা দেয় আমাদের বুঝতে বাকি থাকেনা। তিরিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে যে সঙ্গ কোনদিন পায়নি মরিয়ম, আজ সেই সঙ্গ পাওয়ার জন্য সে উন্মুখ। বয়স কোনো বাধা নয়।

সর্বোপরি একথা সত্য যে প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি থাকা, পরস্পরকে বোঝা এবং উভয়ের জন্য পথ চেয়ে থাকবে এবং সময় দেবে। গল্পে নিশার আর মরিয়ম পরস্পরকে সময় দিয়েছে, প্রতীক্ষা করেছে। এমনকী বৈষ্ণব পদাবলীর বালিকা রাধার মতো মরিয়ম প্রেমিকের জন্য নিজেকে সুগন্ধি সাবান দিয়ে তাজা করেছে, মন ভালো করার জন্য তোলা শাড়ী পড়েছে। একে প্রমানুভব ছাড়া আর কোন অভিধায় চিহ্নিত করা যেতে পারে?

বস্তুত, প্রেমেই, পরকীয়া প্রেমই গল্পের শেষে কথাকার আফসার আমেদ অন্তঃপুরবাসিনী মরিয়মের মধ্য দিয়ে ফোটাতে চেয়েছেন। কিন্তু সময়টা যেহেতু আজ থেকে সাতাশ বছর আগেকার সময়, তাই এ গল্পের নাম "সঙ্গ"—ই রাখতে হয় তাঁকে। আর তাতেই অন্য মাত্রায় ভাষা নারীর পায় অন্তঃপুরের উদ্ভাস।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। চক্রবর্তী, সৌমিতা, সৃষ্টি—স্বাতন্ত্র্যে নজরুল, পুস্তক বিপণি, মে, ২০০৭। ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, ৯, পৃ. ৫৮

২। আমেদ আফসার, শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৮, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

৩। তদেব

৪। তদেব।

বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা : ধর্মমোহ জনশ্রুতি ও মুসলমান সমাজের অন্তরমহল

চিত্তরঞ্জন নস্কর

বিশ শতকের আট-নয়ের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁরা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ (১৯৫৯ - ২০১৮) তাঁদের অন্যতম। মূলত মুসলমান জীবনের কথাকার তিনি। তাদের ধর্ম - ভাষা — সংস্কৃতি, তাদের নরনারীর প্রেম, তাদের ধর্মীয় জীবন — রীতি - নীতি - ধর্মের বিরোধ তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। তিনি নিজেই বলেছেন —

'মুসলমান সমাজ নিয়ে কাজ করেছি, যা অনালোচিত ও অনালোকিত - এই চেষ্টার পথশ্রমটুকু সাক্ষী হয়ে থাক'। (দ্র. 'গাধা'- সম্পাদক - মলয় সরকার)

হ্যাঁ। এই মুসলিম সমাজের বহুবর্ণ মানচিত্র আফসার আমেদের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখি পাখির 'কিস্‌সা' (১৯৯৫)। 'কিস্‌সা' অর্থাৎ কাহিনি - কুৎসামূলক গল্প। গল্পের কথাবৃত্ত অনুসারে আমরা জানতে পারি- ভাসুরঝি নাহারকে নিয়ে তিনি পুকুরে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে গা থেকে শাড়ী খসে যায় জাহানের। খুঁজে না-পাওয়ায় শায়া-ব্লাউজ পরেই বাড়ি আসে জানান। কেউ না দেখলেও মুশুল্লি নাসিম এই ব্যাপারটি ঘোরতর অন্যায় হিসেবে দেখে এবং রাতে ঝগড়ার পর জাহানকে চড় মারে, - 'শুয়োরের বাচ্চি' বলে। ভোরবেলা জাহান নাসিমকে ছেড়ে ফজরের আগেই চকমধু থেকে পাঁচ কিমি দূরে সজনেতলায় বাবার বাড়িতে পৌঁছায়। ফাল্গুন মাসের চন্দ্রালোকিত ভোরে ঘর ছাড়ে জাহান।

এরপর উপন্যাস এগিয়েছে নাসিম-এর চিন্তাভাবনার সূত্রে - তার শারীরী আলিঙ্গন-কামনার প্রার্থনায়। মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে মৌলবী ইমাম আজমত আলির সঙ্গে দেখা হয়। কথা প্রসঙ্গে আজমত আলি তার স্ত্রীর চলে যাওয়ার কথা জানতে পারে। সরল বুদ্ধির, মোটা বুদ্ধির নাসিমাকে নিজের জালে জড়াতে শয়তানি চাল চালে আজমত। জাহান চলে যেতে নাসিম এক 'অজ্ঞেয় বিপন্নতার শিকার হয়'। সরল গ্রামীণ মুসলমান ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে ভাবতে থাকে 'জিন পরীর খপ্পরে পড়েছে নিশ্চয়'। আজমত তার লোক বিশ্বাস থেকে নাসিমকে ভয়ার্ত করে তোলে - 'কুনু নারী তোমার দিকে তাক্কে হাসে নাকি ? ... পরে হাসবে তক্কে তক্কে। ভুলাবে। মহব্বৎ কত্তে চাইবে। জেনা করতে চাইবে। তুমাকে তিনদিন পর জানাব, খোয়াবনামা দেখে। যাও ছোট মিঞা'।

অজানিত এক বিপদের আশঙ্কায় শিহরিত হয় নাসিম। তার পক্ষে বিবিকে ছেড়ে থাকা খুবই দুঃসাধ্য। অসহনীয়। বড়ো ভাবি রাবেয়াকে জানায় তার কষ্টের কথা। এমনকী দুঃস্বপ্নের কথাও — 'নিদে নিদে স্বপ্ন দেখি, বদ। আমি নিজে খারাপ হতে চাইবুনি, আমারে

কেউ খারাপ করতে আসতেছে'। - এই কথাটা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়।

ঠিক এই সময় মসজিদতলার পথে একটা নূপুর কুড়িয়ে পায় নাসিম। শনাক্ত করে বুঝতে পারে তা তার যুবতী দাদি হুসনা আরার। কিন্তু তার পক্ষে অপবিত্র হওয়া সম্ভব নয়, —'এই হাত ছুঁয়েছে জাহানের মুখ / এই হাতে কি কোনো পাপ কাজ মানায়, তাই নূপুরটা সে দিতে যায় না। হুসনা আরা চলে আসে তার বাড়িতে। সে নিজেকে সংযত রাখে। মনের মাঝে শুধু জাহান'।

—সময় বয়ে চলে। নাসিম প্রতীক্ষায় থাকে জাহান একদিন না একদিন ফিরবে। সে তো জাহানকে তালাক দেয়নি। তাই তার দৃঢ় প্রত্যয় জাহানকে ফিরতেই হবে।

এদিকে রোমিও ভিডিও হলের গাজি প্রচার করে দেয় দুজন সাক্ষী রেখে নাসিম তার বউকে তালাক দিয়েছে। কথাটা চায়ের দোকান থেকে কানা বেগুনওয়ালা হয়ে চুড়িওয়ালার মারফৎ সারা বাজারসুদ্ধু লোক জেনে যায়। চুড়িওয়ালার কাছ থেকে জাহান শোনে — 'ছোটমিঞা তোমাকে তালাক দিয়াছে হলুদ পাখি শুনে প্রাণ ত্যাগ করেছে'।

নাসিম শুধু স্থির থাকে বিবিকে সে তালাক দেয়নি। তবু তালাক দেওয়াটাই সবাই বিশ্বাস করে নেয়।

আসলে উপন্যাস মানুষের বাস্তবজীবনের শিল্প নির্মাণ। সময়ের প্রবহমানতায় সমাজ বাস্তবতা বদলে যায় - সময়ের চরিত্র বদলে যায়, বদলায় না 'কেতাবের ইসলাম'। ধর্মীয় পরিসরের কাঠামোটি। তাই মুসলিম সমাজে নারীত্বের অপমানের সবচেয়ে বড়ো বিষয় 'তালাক'ই হয়ে উঠল এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভারকেন্দ্র। সঙ্গে জুড়ে গেল - পেয়ারা গাছ। হলুদ পাখি। পেঁপে গাছ। পরাবাস্তবতার আবছা আবহ। আচার সর্বস্ব বাহ্যিক ধর্মের চাপে হৃদয়ধর্ম বারবার মাথা ঠুকে মরে - নতি স্বীকার করতে বাধ্য করায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী কখনও কখনও পুরুষও বা বাধ্য হন। প্রতিরোধ প্রয়াস সেখানে মৃত্যুরই নামান্তর। অতন্দ্র প্রহরী সেখানে মৌলবী।

যে কথাটা বলছিলাম। একুশ পর্বে বা পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যা স্পষ্ট করেছেন তা হল—

ক. জনশ্রুতি বনাম কিস্‌সা। খ. কিস্‌সা বনাম জনশ্রুতি। গ. সত্য বনাম জনশ্রুতি।
ঘ. সত্য বনাম সত্য। ঙ. সত্য বনাম মিথ্যা। চ. মিথ্যা — সত্য - অস্তিত্বের সংকট।
ছ. মুসলিম জনজীবনের অন্দরমহল।

আশপাশের চেনা মানুষ অচেনারূপে দেখা দিচ্ছে বারবার। জাহানের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই — সারাজীবন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে সে — বারবার তাঁর স্বামী বদল হয়। তাকে অমর্যাদা করতে সমান্তরাল গল্প তৈরি হয় হলুদ পাখির। বৃহত্তর নিরক্ষর মুসলিম মানসে গড়ে তোলা হয় গুনাহ-ধর্মের বেড়াজাল। ভিতরে ভিতরে সমাজ-ধর্ম শাসিত নৈতিকতা আর অবচেতনে আসছে নৈতিকতা অতিক্রমকারী শরীরী চাহিদার কথা। তা না হলে কেন

সবাই ঘুর ঘুর করে জাহান-এর বাড়ির চারপাশে ?

আসলে ধর্মের দোহাই দিয়ে দাম্পত্যকে প্রতিনিয়ত আঘাত করা হয়েছে। তাই তালাক না দেওয়া সত্ত্বেও তালাক দেওয়া হয়েছে। ধর্মের চোখ রাঙানি শোনান — মৌলবি, অনেকেই পাগল প্রতিপন্ন করতে চান, নিজে ভুল ব্লাউজ নিয়ে এসে বুকের দুধ লাগিয়ে ফেরৎ দিয়ে আসে রশিদের বউ বলে আসে দু চার কথা। রটনার এমনই ক্ষমতা ! সবচেয়ে আশ্চর্যের যে আজমতের উচিত ছিল নাসিমকে সাহায্য করা, সেই আজমত নিয়েছে অন্য ভূমিকা। উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয় আজমত বুঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসের হোসেন মিয়ার জাতভাই ! আসলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সব যুগে সব সমাজে এ ধরণের মানুষের দেখা মেলে। যারা মানুষের দুর্বলতাকে বুঝে নিয়ে সেইখানে আঘাত করে তাকে তার অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দী করে পুড়িয়ে মারে। নিজের শুদ্ধতা বজায় রাখতে — কুচিন্তায় যে 'তওবা তওবা' করে তাকে ভুল বুঝিয়ে তাবিজ দেয় ইমাম; গোপনবাসনা মনে রেখে নাসিমকে ধমকায়। নাসিম যতই বলে — 'মওলানাসাহেব, আমি আমার বিবিরে তালাক দিইনি', ইমাম ততই বলে — 'ইমান নষ্ট কোরো না ছোট মিঞা, ছিঃ তুমি না আলিম। একটা মেইয়াছেলার জন্য ইমান নষ্ট করার কি আছে ছোটমিঞা। বউ গেলে বউ পাবে, ইমান গেলে পাবে না। ছোট মিঞা। তালাক দেওয়া বিবি হারাম দোজখে ঠাঁই হবে তোমার'। - সে যে তালাক দেয়নি ইমামকে বিশ্বাস করানো গেল না। যাবে কী করে ? ইমামের যে গোপন অভিসন্ধি আছে! ইমাম তাই সুচতুরভাবে খেলে যায়।

আর নাসিম জনবিবিক্ত হতে হতে পুতুলনাচের ইতিকথার শশীর মতো ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়। একাকীত্বের জালে গুটিয়ে নেয়।

বাউড়িয়া-সাঁকরাইলের চকমধু থেকে সজনেতলা মাত্র পাঁচকিমি পথ। নাসিম ইচ্ছে করলে সেখানে গিয়ে সত্য প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে মার খাওয়ার ভয়ে আর নিজের ধর্মভয়ে সে সজনেতলায় যায় না। কিস্‌সা-র কথা শোনে। মৌলবির কথা ভাবে আর উদাস হয়ে পেয়ারাগাছের দিকে তাকায়।- 'প্রাণ থাকতে সরাতে পারবে না বিবিকে'।

জনশ্রুতিতে জাহান-এর হলুদ পাখিটা জাহান-এর শোকে মারা যায়। কেউ কেউ দুটো বিবি থাকা সত্ত্বেও জাহানকে নিকা করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। আর লটারির মাধ্যমে চুড়িওয়ালা মৃত হলুদ পাখিটা পায়, তিনসের মধুর মধ্যে বয়েমে করে রেখে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেরে চকমধুর বাজারে বিক্রি বেড়ে যায়। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর 'বিশাল ডানাওয়ালা থুত্থুরে বুড়ো'র মতো — পাখিটি বাজারে ভিড় বাড়ায়। দোকানদারদের বিক্রি বাড়তেই থাকে। পাখিটাই রহস্যের। জাহানকে তালাক দেওয়া হল না অথবা তালাকের প্রতিক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে — কিস্‌সা-র কী জোর রে বাবা ! কাসেম বলে 'তালাক দেওয়া বিবিকে নিয়ে ঘর করবি ? হারামজাদা শুয়োর ? তোর কবরে আগুন জ্বলবে'। জাহানের চিন্তায় বিভোর নাসিম। নদীর তীরে বোরখা পরা ইমাম বিবিকে দেখে জাহান বলে। রটে যায় সে

কু প্রস্তাব দিয়েছে। একদিকে তালাক দেওয়া হয়নি অথচ তালাক দেওয়া হয়েছে বলে রটনায় অন্যদিকে তার ধর্ম নিয়ে মিথ্যা বদনাম —এ নাসিম হাঁপিয়ে ওঠে। তখন সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে তার সমাজের অন্তরমহলের যাপনচিত্র। অনুমান করতে পারে তালাকের বিবি আর না — তালাকের বিবির মধ্যের তফাৎটা।

কানাঘুষো জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুরগির সুরুয়া আর পরোটা খাইয়ে চুড়িওয়ালার সঙ্গে জাহান-এর নিকা হয়। জাহান-এর নতুন জীবন শুরু হয়। হাঁসুলিবাঁকের উপকথার সুচাঁদ এর মতো আবির্ভাব হয় নানির। কিস্‌সা-কথক নানি। তফাৎ এই সুচাঁদ একটা এলাকার ধর্মীয় মিথকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল নানি পাখির কিস্‌সাকে জনমানসে সঞ্চার করে। এদিকে চুড়িওয়ালা প্রতিদিন সারারাত জাগার জন্য বাজারে বসে বসে ঘুমোয় — তার ব্যবসায় ক্ষতি হতে থাকে। চুড়িওয়ালা তালাক দেয় জাহানকে। বেগুনওয়ালাকে নিকা করে জাহান। যে মুহূর্তে চুড়িওয়ালা জাহানকে তালাক দেয় সেই মুহূর্তে জাহানের ভাবনায় আসে — 'সে যেন খেলনার মতো। কারুর ভালো লাগলে খেলে, তারপর ফেলে দেয়। অন্য একজন আবার খেলে। সে খেলার প্রয়োজনের খেলনা'।

- জাহান যখন নিজের নারীত্বের অধিকার — পাওনা নিয়ে ভাবছে ঠিক তখন কানাবেগুনওয়ালা বয়েম ভেঙে ভিতরের পাখিটা নিয়ে চলে যায়, জাহান ভাবে — 'পাখিটা যার হাতে গেছে তারই হবে সে'। পাখি যায় — কিস্‌সা নতুন রূপ নেয় — জাহানের অবস্থান বদলে যায়। এভাবে কিস্‌সা আর জাহান একে অপরের বিপ্রতীপে থেকেও সমকোণে মিলে যায়।

তারাশঙ্করের 'বেদেনি' গল্পের শম্ভুই যেন কানাবেগুনওয়ালা। 'কুসুম' — এর নতুন সংস্করণ হুসনা আরা মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দিয়ে যায় নাসিমকে। শশীর মতো সেও বলতে পারত — 'তোমার মন নাই হুসনা আরা'।

তবু কাহিনির কিস্‌সা এগোয় — 'বিবির বয়স কত' — এর উত্তরে যখন শোনা যায় — 'এই উনিশ কুড়ি' —তখন আরও কামার্ত হয়ে ওঠে আজমত। যাকে নিকা করার জন্য অষ্টপ্রহর লোভার্ত হয়ে থাকে সেই জাহানের পেছন পেছন ঘুরঘুর করে ইমাম। মাঝে মাঝে জাহান অতীতে ফেরে। অনাদি অতীত কথা কয়ে ওঠে, বর্তমান জীবনকে ধিক্কার দেয়। - 'খুব অন্যায় করেছে তাকে ছোটমিঞা'। 'সত্য মৌলবির' জন্য তার ভাবনা হয়। কখনও সে স্বাধীনতা পায়নি, তার যে মন আছে, মতামত আছে - একথা কখনও মান্য করা হয়নি। তাই বেগুনওয়ালার সঙ্গে সে অদ্ভুত এক জীবন বেছে নেয়। ধর্ষিত হতে হতে ঘণ্টা দুই —এর স্বাধীনতার সময় চেয়ে নেয়। চকমধু থেকে সজনেতলার পরিসরে সে আটকে থাকে তবু 'ঘণ্টা দুই অবাস্তবতার মধ্যে জাহান চলে যায় নাসিমের কাছে'। ছাইগাদার মৃত পাখির পালকগুলি বাতাসের ছোঁয়ায়ও আকাশের উদারতায় একটা হলুদ পাখি হয়ে যায়। আবার

পাখি গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়। আবার কিস্‌সা তৈরি হয়। পুরানো গল্পের সঙ্গে তাকে গুঁজে দেওয়া হয়।।

পোশাক বদলে কানাবেগুনওয়ালার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় মৌলবি। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় মৌলবি অসফল হয়। জাহানাকে ভোগ করা হয় না। জাহান তার মুক্তি মেলে ধরতে প্রতি সন্ধ্যায় পরীর মতো দাঁড়ায় চালের ওপর। তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে পূর্বস্বামী ছোটোমিঞার সামনে দাঁড়ানোর কথা ভাবে। তা কি অবাস্তব হবে ? "কেমন তার অবাস্তবতা এটা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে জাহানা। নিজের থেকেই উঠে এসেছিল, পুনর্বার তার শোয়া হয়নি"। - পূর্ব — স্বামীর উদ্দেশে চলতে শুরু করে জাহান।

নাসিমের প্রথম স্ত্রী হিসেবে সে ফিরছে — 'যেহেতু ঘণ্টা দুই পুরো অবাস্তবতার মধ্যে চলে যায়'। তাই অবাস্তব সাক্ষাতে সে 'নবীন' 'ধার্মিক' 'মুশুল্লি'-র কাছে যায়। 'অবাস্তবতার ছোটমিঞা'কে প্রশ্ন করে জাহান — 'জাহান এলে তাকে নিয়ে শুতে' ?

- হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে না।
- জাহান পরস্ত্রী নয় কেন ?
- কেননা আমি তালাক দিইনি।
- তোমার কাছে জাহান ও পরস্ত্রী এক ?
- না। জাহান আমার বিবি। তুমি পরস্ত্রী।

-অর্থাৎ শুরু থেকে চরিত্রগত শুদ্ধতা বজায় রেখেছে নাসিম — তার বিশ্বাস জাহান যদি তার বিবি হয় তো সে ফিরবে। তাই সে অধর্ম করতে পারেনি — 'তার পক্ষে অধর্ম করা কঠিন'।

চলমান কিস্‌সা কথক নানি রোজ রাতে এক এক বাড়িতে সেই হলুদ পাখির কিস্‌সা রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করে। গল্প বলার সময় নানির সামনে একটা কাঠের হলুদ পাখি রাখা হয়। উপকথার কথক সুচাঁদের মতো কিস্‌সা কথক নানি ধমকে-ঠমকে শ্রোতাদের শান্ত রাখে। ইমামকে সামনে বসিয়ে ইমামের ভবিষ্যত কিস্‌সা কী ঘটতে পারে তা স্পষ্ট করে দেয়। ইমামিত্বের জোর খাটিয়ে আর ভয় দেখিয়ে কানা বেগুনওয়ালার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে আজমত। নানি ধরতে পারে 'জাহানের নসিব নিয়ে খেলছে' — ইমাম। তাই তাকে গাল দেয় 'ঢ্যামনা' বলে। বহুদর্শী নানি জানে সব। তাই কিস্‌সার আড়ালে সব বলে দেওয়ার কথা বলে। মুখোশ খুলে দেওয়ার কথা। মৌলবি জাহানকে কুমন্ত্রণা দেয় কীভাবে কানা বেগুনওয়ালার কাছ থেকে তালাক পাওয়া যেতে পারে। জাহান স্পষ্ট জানায় — 'আমি আপনার কোনোদিন বিবি হব না, প্রতিজ্ঞা করছি'। বাড়ি বাড়ি কিস্‌সার আসর দেখে জাহানের প্রতীতি হয় — 'সে কিস্‌সার বিবি হয়ে যেতে পারবে শুধু। যে কিস্‌সার বিবি পুরুষগুলোর কামনার হাতে চলে যায়'।

বেগুনওয়ালা ছদ্মবেশী ইমামের মাথা থেকে টুপিটা নিয়ে যায় জাহান। টুপি মাথায়

থাকলে কোনও বদনাম তাকে ছুঁতে পারবে না, তাই টুপিটার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মৌলবি। - 'মানুষ কৌতুহলী হয়ে ওঠে ইমাম কীভাবে জাহানবিবিকে পাবে, সে কিস্‌সা শোনার জন্য'।

কিস্‌সার ছোটো ছোটো বৃত্ত বেড়ে গিয়ে বড়ো বৃত্তে পরিণত হয়। তাই সন্ধ্যার শুরুতেই সাত-তাড়াতাড়ি ছোটোমিঞাদের বাড়িতে কিস্‌সা বসায় নানি। লক্ষ্মীর কিস্‌সার শুরু ছোটমিঞার বাড়িতে, আর শেষ কিস্‌সা অনেক ঘটনাঋদ্ধ হয়ে উপস্থিত হল সেই একই জায়গায়। ধর্মের মধ্যে অধর্ম বেশি ঢুকলে, মিথ্যা বেশি ঢুকলে — কিস্‌সার কলেবর এমন করেই বেড়ে যায়। অথচ কিস্‌সা না বসালেও নাসিম জানতেই পারত আজমত নিকা না করে প্রথম থেকেই কীভাবে ছিঁড়ে খেতে চেয়েছিল জাহানকে। জনশ্রুতি — ধর্মমোহ 'তারই ধর্ম দিয়ে তাকে মারে'। আর সুস্থ মানুষ 'পাগল অভিধা পেলে সেই অধর্ম ঠেকানো মুসকিল হয়'। - ঠেকানো যায়নি নাসিমের ক্ষেত্রেও। কাদম্বিনীকে মরে প্রমাণ দিতে হয়েছিল 'সে মরে নাই', অধর্মকে ঠেকাতে ধর্মমোহকে রুখতে নাসিমকে পাগল-বনে থাকতেই হল। 'কিন্তু ধর্মের বিশ্বাস সে কিছুতেই ত্যাগ করে না, তাতেই তার পরিতৃপ্তি'।

কথামানবীর কথাকার মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছিলেন — 'পুরুষে পুরুষে যুদ্ধ প্রতিশোধ রমনীর শ্লীলতাহানিতে'। এই উপন্যাসের 'কিস্‌সা' শেষ হচ্ছে জাহানের অত্যাচারিত হওয়ায় কথনে। - নানি জাহানের বুকে ও উরুতে নখের আঁচড় দেখাচ্ছে। বাতাসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই নখরাঘাতের মুদ্রা তৈরি করে নানি। কীভাবে যেন জাহানকে পেয়ে যায় ইমাম। দীর্ঘদিনের লোভ চরিতার্থ হয় মৌলবির। যে মৌলবির কাছে জাহান শুধুমাত্র 'একটা মেয়ে মানুষ'।

পুরো উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে আছে মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ রীতিকে অবলম্বন করে। উপন্যাসে তাই মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ, তাদের ধর্মসম্পৃক্ত শব্দ — আচার — আচরণীয় শব্দবন্ধ ঘুরে ফিরে এসেছে। সত্য কাহিনির মধ্যে মিথ্যা কিস্‌সা জুড়ে তা আরও মুখরোচক হয়ে জনশ্রুতির রূপ নিয়েছে। কথাকার চিনিয়ে দিয়েছেন সেই বিশেষ সমাজের অন্তরমহলের ছবিও। এখানেই উপন্যাসটির কাহিনির আখ্যান কথনের অভিনবত্ব। যা একমাত্র আফসার আমেদ — এরই পক্ষে সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আফসার আমেদ, 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাব ১৯৯৫
২. দেবেশ রায়, 'উপন্যাসে নতুন ধরনের খোঁজে', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাব ২০০৫
৩. সত্যবতী গিরি, সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', তৃতীয় সং, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৩।

স্থির পৃথিবীর খোঁজ : বদলি বসত

দীপঙ্কর আরশ

একটি মানুষ সময়ের বুকে হামাগুড়ি দিয়েই বড় হয়, জীবনের ইতি টানে। সেই মানুষটি যদি হয় শিল্পী তাহলে 'সেই সময়' তাঁর ইজেলে ছবি হয়ে ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। অন্তত সৎ শিল্পীর কাছে সেটা প্রত্যাশিত। সেই হিসাবে কথাশিল্পী সোহারাব হোসেন (১৯৬৬-২০১৮) প্রত্যাশা অনেকটাই পূরণ করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে সময়ের এক উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়েছে। তিনি যে সময়-সচেতন একজন শিল্পী এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস পাঠে খুব স্পষ্টভাবে এই সত্য অনুধাবন করা যায়। দেখা যায়, নিজস্ব সমাজে তথা সময়ের থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজে 'নষ্ট শশা' ও 'পচা চাল কুমড়ো'র মতো রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব, সমসাময়িক সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, মাওবাদী সমস্যা, তৃতীয় বিশ্বের উপর পণ্যায়নের থাবা, ভোগবাদ, বিকৃত যৌন-লালসা—এরকম বহু বিষয় তাঁর রচনায় ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশ শতকের ন'য়ের দশক থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সেইসব বিষয়গুলিকে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং শিল্পরূপ দিয়েছেন।

সময়ের উপর এই নজরদারির অনেকগুলি সৃষ্টির মধ্যে একটি 'বদলি বসত' (২০০৯)। যৌনতা-পোকার সন্ধানে এই উপন্যাসে লেখক রূপ দিয়েছেন একগামিতা ও বহুগামিতার দ্বন্দ্বকে। সেখানে স্পষ্ট হয়েছে লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শন। কেবল যৌনতাকেন্দ্রিক মানবমনের জটিল চিত্ররূপ বড় কথা নয়, সেখানে একটা স্থির পৃথিবীর খোঁজ তিনি করেছেন। উপন্যাসটি যদি কেবল ছবিমাত্র হত তাহলে হয়তো পাঠকের কাছে ততটা সমাদরের দাবি করতে পারতো না। বাহ্যকে ছাড়িয়ে বক্তব্য গভীরে পৌঁছাতে পারার কারণেই উপন্যাসটি পাঠকের কাছে সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে বক্তব্যের উপস্থাপন। ফলে এর গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে সোহারাবের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ কথাসাহিত্যিক রক্তিম ইসলাম, যিনি বহু স্থানেই সোহারাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং যাঁর কথামতোই সোহারাব 'বর্তমান' পত্রিকার সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে পড়া ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তিনি এই উপন্যাসের প্রশংসার পাশাপাশি অপূর্ণতা সম্বন্ধে বলেছেন "ডালপালার বিস্তার নেই বলে বৃক্ষটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারল না।"[১]

কিন্তু 'বদলি বসত' উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য খুব বেশি গ্রহণীয় নয়। কারণ, 'বদলি বসত' উপন্যাস হিসেবে পরিচিত হলেও এটি আসলে একটি নভলেট। বড়ো গল্প ও উপন্যাসের

মাঝামাঝি এর অবস্থান। ফলত কাহিনির ডালপালা এখানে আশা করা যায় না। নভলেট আসলে কী, লেখক তা এই গ্রন্থের ভূমিকাংশেই স্পষ্ট করেছেন। সেখানে মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে তিনি কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ফর্মকে তুলনা করেছেন "অনুগল্প — অপূর্ণাঙ্গ বীজাকারে থাকা ভ্রূণ, ছোটগল্প — পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ, বড়ো গল্প — ভূমিষ্ঠ শিশু থেকে বালক-কিশোর, নভলেট — অবিবাহিত তরুণ যুবা এবং উপন্যাস গু প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পূর্ণ মানুষের আচার-প্রকৃতি-ধর্মকেই বুঝে থাকি।"[২] তিনি আরও জানিয়েছেন 'নভলেটে প্রাপ্ত ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো বহুপল্লবিত বৃক্ষ-বিস্তার থাকে না ঠিকই তবে খনন ও দায় থাকে।'[৩]

নভলেটের ধর্ম মেনেই লেখক 'বদলি বসত' এ হাজির করেছেন গল্পের ভিতরে গল্প এবং তারও গভীরে গল্প। উপন্যাসে মূল কাহিনি অর্ণব ও স্রোতস্বিনীর। তাদের গল্পের সমান্তরালে রয়েছে আলোক ও অপর্ণার কাহিনি এবং রূপক-প্রতীকের আড়ালে হাজির হয়েছে বাঘ-শেয়াল হরিণের রূপকথার গল্প। মূল গল্পের পাশাপাশি উপকাহিনি বা এপিসোড নয় অন্য গল্প দুটি। মানবজীবনের চিরকালীন এক সত্য ধর্মকে, তার সঙ্কটকে এবং নিজস্ব জীবনদর্শনকে রূপায়িত করতে অর্ণব ও স্রোতস্বিনীর গল্পেরই অংশ অন্য দুটি। তিনটি কাহিনিবৃত্তকে একসাথে গেঁথে লেখক একগামিতা ও বহুগামিতার দ্বন্দ্বপ্রবাহটিকে এবং স্থির পৃথিবীর অন্বেষণকে শিল্পসম্মত রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

আদর্শগত দিক থেকে বহু মানুষই একগামিতার পক্ষে সওয়াল করেন। বস্তুত তার মধ্যেও যে কত মিথ্যা লুকিয়ে রয়েছে-- বহুগামিতার বীজ নিহিত, সোহারাব হোসেন সেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। মানবজীবনের গূঢ় রহস্যকে দাম্পত্য সম্পর্কের উপর ছুরি কাঁচি চালিয়ে বের করে এনে পাঠকের সামনে নগ্নভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক বিশ্বাসী একগামিতায়। বহুগামিতা ও একগামিতার দ্বন্দ্বে সে স্ত্রী স্রোতস্বিনীকে জানিয়েছে, 'আমি অ্যাখনও প্রেমের অ্যাকমুখীনতায় বিশ্বাস করি। যতোই মানুষ ভোগের পথে ম্যারাথনে নামুক-না-ক্যানো প্রেমের স্থির প্লেটে তাকে বসবাস কোরতেই হবে।"[৪] অন্যদিকে স্রোতস্বিনী মনে করে একনিষ্ঠ প্রেমের যুগ আর নেই, "প্রেম অ্যাখন ছেলেমেয়েদের বুক পকেটের কার্ড। পছন্দ হলে পকেট থেকে তুলে অন্যের পকেটে জমা দ্যায়। না-হলে টুপ-কোরে তুলে নেয়, ফের আর অ্যাকজনের পকেটে জমা রাখে। কোথায় প্রেম?"[৫] আত্মপক্ষ সমর্থনে সে কখনো ত্রিশ শতাংশ স্বামী-স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের সমীক্ষার কথা তুলে ধরেছে, আবার পুরুষের অন্য নারীকে কল্পনা করে সহবাস বা হস্ত-মৈথুনের বিকৃতির কথা জানিয়েছে। তার মতে, বস্তুত মানুষ আর পশুর মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নেই। জন্মের পর থেকে মানুষ এই পশু-স্বভাবকে জয় করতে থাকে। যে যতটুকু জয় করে সে ততটুকু মানুষ। আর বহুগামিতার পাঁক গায়ে মেখেই সত্যিকার প্রেমপদ্ম ফুটে ওঠে।

প্রাথমিক পর্যায়ে সনাতনী আদর্শে বিশ্বাসী অর্ণব স্ত্রীর কথা কোনোভাবেই মেনে নিতে

পারেনি, মেনে নেয়নি। বারবার আঁকড়ে ধরেছে একগামিতার শিকড়কে। তার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছে। সুলেখার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবে স্ত্রীকে চড় মেরেছে। তার মনে হয়েছে বসত বদলের সুখ পেতেই হয়তোবা স্রোতস্বিনী তাকে বহুগামিতার রাস্তায় ঠেলে দিতে চাইছে।

একগামিতায় কট্টর বিশ্বাসী এই অর্ণবের বিশ্বাসের ভাঙন ও বহুগামিতায় আত্মবিসর্জনকে শৈল্পিক নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সোহারাব হোসেন। প্রেম-পীড়িত সুলেখার সঙ্গে মিলনের বারংবার হাতছানিতে শেষ পর্যন্ত সে সনাতনী একগামিতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। 'বউ চেনা' নামক মজার খেলায় জয়লাভ করে যে গৌরব সে অর্জন করেছিল তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। এখন সে স্রোতস্বিনীর মতোই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে 'মানুষ বস্তুত বহু বসতের কারবারি। আশ্চর্যের হলেও এই বিশ্বাস, অ্যাখন, তাকে সুখী করে। আনন্দ দেয়।'[৬]

বহুগামিতার সাথে একগামিতার দ্বন্দ্বে একগামিতার পরাজয়ের ছবির মধ্যেই যদি বিষয়টা সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে লেখকের শিল্পদক্ষতা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন চিহ্ন উঠত। কারণ এই যৌনতা এবং যৌন-মনস্তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যে নতুন কোনো বিষয় নয়। চর্যাপদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই যৌনতা, যৌনতাকেন্দ্রিক নারী-পুরুষের মনোভূমি ও ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিকভাবেই চলে আসছে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব-পদাবলি, মঙ্গলকাব্য--প্রাচীন-মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যধারায় আনাচে-কানাচে এর অস্তিত্ব সহজলক্ষ্য। আধুনিককালের সৃষ্টি কথাসাহিত্যেও জন্মলগ্ন থেকে স্থান পেয়েছে যৌনমনস্তত্ত্বের কথা। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চোখের বালি, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি ইত্যাদি বহু উপন্যাসের নাম করা যায় যেখানে মানব-মনের ও দেহের বহুগামী ধর্ম অনেকসময়ই চরিত্রগুলির নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে। সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ', অচিন্ত্যকুমারের 'কলঙ্ক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কান্ডারী', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' ও 'কন্যা', গৌরকিশোর ঘোষের 'জবানবন্দি' অতি পরিচিত এসব গল্পের কেন্দ্রে কোন সংকট স্থান পেয়েছে আমরা জানি। অর্থাৎ, শুধু একগামিতা বহুগামিতার দ্বন্দ্ব ও একগামিতার পরাজয়ের ছবির মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি আলোচ্য হয়ে ওঠার কোনো দাবিই রাখতে পারে না। দাবিটা কোথায় পূর্বেই সে উল্লেখ আছে। এখন কাজ হল নভলেটির পাতার ভাঁজে সেই সত্যতার প্রমাণ খোঁজা।

লেখক অস্থির পৃথিবীর পথ-পরিক্রমায় স্থির পৃথিবীর খোঁজ করেছেন অর্ণবের ডায়েরীর পাতায় 'আলোক-অপর্ণার' কাহিনির মধ্যে। যেখানে অপর্ণা মৃত্যু পথযাত্রী স্বামী আলোকের চোখে দেখতে পেয়েছে জলের উপর ভাসমান তিন চারটি স্থির প্লেট। সেই প্লেটের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী। এই পৃথিবী সবুজ অরণ্য ও শস্যক্ষেত্রে ভরা। 'সংযমের পর্বত' ও 'উদার নদী-সাগর'। সর্বত্র শান্ত, মনোরম একটা পরিবেশ। সে দেখতে পেয়েছে গ্রামঘেরা একটা শস্যক্ষেত। তার একপাশে টলমলে এক জলের বিল। সেই বিলের ধারে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি"আকাশের নীল আর সবুজের ঝিনুকপাল্লার মাঝখানে অ্যাকটা মুক্তোর মতন দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। পাটকিলে মেঘের পর্দায় য্যানো বক-সাদা রঙের বাড়িটাকে ছবির মতো এঁকে রেখেছে কোনও মহৎ জীবনশিল্পী।"[৭] এই বাড়িটাকেই অপর্ণার মনে হয়েছে নিজের নীড়। আলোক অপর্ণাকে বলেছে, "যাকেই জীবনসঙ্গী করো-না-ক্যানো তার চোখে এই পৃথিবীটাকে, স্থির এই পৃথিবীটাকে, দেখে নেবে...যে পৃথিবী অস্থির তার কোলে মানুষ বাস কোরতে পারে না অপর্ণাএটা জেনে রেখো।"[৮] অর্ণব-স্রোতস্বিনীর কাহিনির সমান্তরালে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় এই কাহিনি। এখানে লেখক কিন্তু চার দেওয়াল বিশিষ্ট কোনো বাংলোর কথা বলেননি। চার দেওয়ালের মধ্যে বাস করলেই নীড় যে নিজের হয় না এবং স্থির হয় না বরং তা আরও বিড়ম্বনার, সে দৃষ্টান্তের অভাব কাহিনিতে নেই। আসলে একগামী একনিষ্ঠ প্রেমের অন্বেষণই এখানে প্রধান বক্তব্য। সেই একনিষ্ঠতার সুখের নীড়টিকেই লেখক কাব্যিক বাতাবরণে উপস্থাপন করেছেন।

ঠিক একই প্রয়োজনে লেখক অবতারণা করেছেন 'শেয়াল মহারাজ, বাঘ-বাহাদুর আর হরিণ রানির গল্প'। এই উপকথায় হরিণের মাংস খাওয়ার লোভে নিজ সমাজের রীতিকে উপেক্ষা করে শেয়াল সাত-পাঁচ না ভেবেই চেপে বসেছিল বাঘের পিঠে। তক্কে তক্কে থেকে একদিন হরিণের মাংসও ভক্ষণ করলো সে। সুস্বাদু হরিণমাংস খাওয়ার গৌরব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি শেয়ালের। তার দেহে জড়িয়ে থাকা কস্তুরী গন্ধের কারণে শিকারহীন অভুক্ত বাঘের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হল। কাহিনির অর্ণবও শেষ পর্যন্ত পরাজিত সৈনিকের মতো শেয়ালের রূপ ধারণ করে চেপে বসেছিল কামনারূপ বাঘেরই পিঠে। উপকথার কাহিনিতে মৃত্যু ঘটেছিল বহুগামী স্বভাব-বৈশিষ্ট্য শেয়ালের। সেই মৃত্যুই ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে ধরা দিয়েছে অর্ণবের জীবনে। আবাল্যলালিত তার যে সংস্কার, একগামিতার পক্ষাবলম্বন ও যুক্তিবিস্তার সবকিছুর মৃত্যু ঘটেছে সুলেখার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। স্থির বসতের কারবারি অর্ণব শেষ পর্যন্ত বসত বদল করে অস্থির পৃথিবীর বাসিন্দা হয়েছে। স্রোতস্বিনী অর্ণবের চোখে দেখতে পেয়েছে তিন-তিনটে অস্থির প্লেট, যেগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কায় ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে বসবাসের অযোগ্য পৃথিবীর জন্ম দিয়েছে। এমন বদলি বসত মেনে নিতে পারে না স্রোতস্বিনী। যে স্রোতস্বিনী একসময় বহুগামিতার পক্ষে সওয়াল করেছে, এখন তার স্বামীর বসত বদলে কান্নায় ভেঙে পড়েছেএকগামিতার স্থির পৃথিবীকে ফিরে পেতে চেয়েছে।

লেখক ভূমিকাংশে জানিয়েছেন, "প্রেম নাকি অপ্রেম কার জয়গীত গাইতে হবেএসব হিসেব না-কোরেই পুতুল নাট্যমঞ্চে অভিনিত হওয়া বহুগামিতা বনাম অ্যাকগামিতার লড়াইয়ে নামিয়ে দিয়েছি অ্যাকই মানুষের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকা অ্যাকাধিক সত্তাকে।"[৯] কিন্তু পাঠক বোধ হয় বুঝতে পারেন, প্রেমের জয়গানই লেখকের উদ্দেশ্য। অনুর্বর, ধূসর, রুক্ষ মৃত্তিকায় প্রেমের উর্বর ভূমির খোঁজই এই নভলেটের প্রাণধর্ম। অন্ততপক্ষে অর্ণবের রোগগ্রস্ত পিতা

প্রিতমের মুখে উপকথার গল্প ও অর্ণবের ডায়েরীর আলোক-অপর্ণার কাহিনি সেই বিশ্বাসকেই সুদৃঢ় করে। সেই দিক থেকে সৎ সাহিত্যিকের দায়িত্ব লক্ষণীয় এই নভলেটে।

তবে এই নভলেটের বেশ কিছু অংশ আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষত সুলেখা যেভাবে স্রোতস্বিনীর কাছে অর্ণবের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে বা অনুরাগের পরিচয় দিয়েছে তা আধুনিক সময়কালেও ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুলেখাকে স্রোতস্বিনী বলেছে, "বহুগামিতার বিরুদ্ধে ও যে সব কথা আওড়ায় তা আদর্শের বোলে বোলে যায় না সত্যি-সত্যি বিশ্বাস থেকে বলে সেটা দ্যাখার আছে।"[১০] এটা দেখে নেওয়া, বুঝে নেওয়ার বাসনা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই থাকে। থাকা স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই চায় তার প্রিয় মানুষটি একগামী হোক। স্রোতস্বিনী যতই বলুক 'বহুগামিতার পঙ্ক গায়ে না-মাখলে মানুষের জীবনের সত্যিকার প্রেমের পদ্ম ফোটে না', আসলে এই দর্শনে কতখানি মিথ্যা ছিল তা আমরা কাহিনির অন্তিমে বুঝতে পারি। প্রকৃতপক্ষে সে একগামী স্বামীকেই চায়। সেই কারণেই অর্ণবের পরীক্ষায় সে উদ্যোগী হয়েছে বলে আমার অন্তত মনে হয়েছে। কিন্তু তার ধরণটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেটুকু বাদ দিলে ক্ষুদ্রায়তনের এই উপন্যাস বা নভলেটটি তার 'তীব্র খনন' ও 'দায়'কে বহন করেছে। স্থির পৃথিবীর অন্বেষণ সার্থকতা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। দে অমর(সম্পাদক), গল্পসরণি; কলকাতা; সোহারাব হোসেনের বিশেষ সংখ্যা, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ: বার্ষিক সংকলন ১৪২৫/২০১৯; পৃ. ২২৯।

২। হোসেন সোহারাব, বদলি বসত; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১২; ভূমিকাংশ।

৩। পূর্বোক্ত।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ভূমিকাংশ।

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

জঙ্গলমহলের লোকজীবন ও সংস্কৃতি : প্রসঙ্গ নলিনী বেরার গল্প

উজ্জ্বল প্রামাণিক

'জঙ্গলমহল' নামটি বললেই আমাদের সামনে যে ছবি ভেসে আসে- বিস্তীর্ণ জঙ্গলঘেরা একটি অঞ্চল, যেখানে মানুষ আর প্রকৃতির কোন ব্যবধান নেই। একটি বিস্তৃত বনাঞ্চলই হয়ে উঠে মানুষের অনুকূল বাসস্থান আর জীবন-যাপনের আধার। জঙ্গলমহল হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদনীপুর ঝাড়গ্রাম ও ছোটনাগপুর মালভূমির বন ও পর্বতময় অংশটির নাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে(১৮০৫-১৮৩৩) ব্রিটিশ শাসনাধীন আসার পর এই নাম চালু হয়। ১৮০৫ সালে অষ্টাদশ রেগুলেশন পাশ হওয়ার পর জঙ্গল মহলের মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত অঞ্চলটি জঙ্গল মহল বলেই পরিচিত। সেখানে জীবন ধারণের জন্য মানুষকে লড়াই করতে হয় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে, কখনো খাদ্য, আবার কখনো নিরাপত্তার জন্য। সমাজের মূলস্রোত থেকে তাদের অবস্থান বহুদূরে। এলিট সমাজের বিপ্রতীপে গড়ে ওঠা প্রান্তিকজনের যাপনমালা এক অন্য ভারতবর্ষকে চিনিয়ে দেয়। অনাহার, দারিদ্রতা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তারা লালন করে অন্ধকারময় ভারতবর্ষকে। তবু সভ্য পৃথিবী থেকে দূরত্ব রেখেই এই নিরক্ষর মানুষগুলি গড়ে তোলে তাদের লোকসমাজ ও সংস্কৃতিকে। সাঁওতাল-লোধা-শবর-মাহাত-হাড়ি-ডোম-মুচি-মেথর জঙ্গলমহলের এই প্রান্তিক মানুষগুলি পরিশীলিত সমাজের বাইরে থেকেও নিজেদের জীবন যন্ত্রণার মধ্যেও টিকিয়ে রাখে করম উৎসব, বাঁধনা পরব, ভাদু গান, টুসু গান আর ঝুমুরের আসরকে। তাদের জীবন যাপন এক ভিন্ন সুরে বাঁধা। পাঁচ-হাতি কাপড় পড়ে গ্রামের পুরুষ খালি পায়ে পথ হাঁটে, নারী তার লজ্জা নিবারণের ঠিক ঠাক বস্ত্র টুকু পায় না, অপুষ্টির কারণে তাদের সন্তানরা হয়ে উঠে বিবর্ণ, বিধ্বস্ত। শহুরে মানুষের কাছে এসব নিতান্তই ঘৃণ্য, বিকৃত যৌন রুচির পরিচয় হলেও আসলে এটাই এদের ক্ষেত্রে চরম ও পরম সত্য বলে ঘোষিত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় পেলাম নিম্নবিত্ত প্রান্তিক জনজীবনের কথা। একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিকথা দিয়ে তৈরি হল গল্পসাহিত্যের নতুন ভুবন।

সেই পথ ধরেই বাংলা গল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন প্রান্তজনের কথাকার নলিনী বেরা। নলিনী বেরা সম্পর্কে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য-তিনি "গ্রামজীবনকে, গ্রামের মুনিষ-মাহিন্দরদেরকে, খেত-খামারকে, ঝিউড়ি বাউড়ীদেরকে বাগালদেরকে চিনেছিলেন।"[১] অন্ত্যজ মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি গ্রাম বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন গল্পের মধ্যে।

১.

"নদীর ওপারে গ্রাম বাছুরখোঁইয়ার নাম আটত্রিশ জে এল নম্বর
ঝাড়খন্ডী জঙ্গল মহাল-আঁটারি চুরচু কইম করম গাছে বিদিত ভুবন
... এখানে ললিন নামধেয় দুজন যুবক--বড় ললিন আর ছোট ললিন" (সে জানে শুশনি পাতা-নলিনী বেরা)

এ হল গল্পকারের দেওয়া আত্মপরিচয়। ১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই অধুনা ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী বাছুরখোঁয়ার গ্রামে গল্পকার নলিনী বেরা জন্ম গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তের কাছাকাছি জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামটির এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বেরা। মায়ের নাম ঊর্মিলা দেবী। গ্রামের নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে রোহিণী গ্রামের চৌধুরানী রুক্মিনী দেবী হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞানে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেন। এরপর গ্রামের কিশোরের শহরে যাত্রা। মেদিনীপুর কলেজে বাংলা স্নাতক বিষয় নিয়ে ভর্তি হলেও তিনি কিছুদিনের মধ্যে নকশাল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তখন নিজেকে সমস্ত ঝামেলা থেকে বাঁচাতে বাড়ি পালিয়ে আসেন। এরপর ১৯৭১ সালে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন। তিনি প্রথম চেষ্টাতেই ডব্লিউ বি সি এস পরীক্ষায় 'এ' গ্রুপে উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আধিকারিক হন।

কথাসাহিত্য নয় কবিতা দিয়েই তাঁরা পথচলা শুরু। স্কুল জীবনে থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। 'সে জানে শুশনি পাতা', 'কত দূরে আছো সুবর্ণরেখা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে ভূমিজ অন্ত্যজমানুষের কথা উঠে এসেছে। ১৯৭৯ সালে আগস্ট মাসে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'বাবার স্মৃতি' প্রকাশিত হয়। এরপর 'দেশ' পত্রিকায় ১৪ টি গল্প নিয়ে বের হয় 'এই এই লোকগুলো'। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম 'ভাসান'। অন্যান্য উপন্যাস গুলি হল 'দুই ভুবন', 'চোদ্দমাদল' প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল-'ভূতজ্যোৎস্না', 'শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্ব', 'হোমগার্ডের জামা', 'বর্ষামঙ্গল', 'শতরঞ্জি' প্রভৃতি। ২০০৮ সালে 'শবরচরিত' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রদত্ত 'বঙ্কিম স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার' পান। আশির দশকের প্রথম ভাগে গল্পকার রূপে নলিনী বেরার আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তাঁর গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে সত্তরের উত্তাল সময় পর্বের কথাও। নলিনী বেরার সমসাময়িক গল্পকারদের কথা বলতে গেলে ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘোড়াই প্রমুখের কথায় বলতে হয়। এঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রামীণ জীবনকে প্রতিবিম্বিত করেছেন গল্পশিল্পে। কোথাও যেন একটা সামাজিক দায় রয়ে গেছে এঁদের রক্তে। যাদের মধ্যে কেউ কেউ কর্মসূত্রে গ্রামে এসে সেখানকার মানুষকে নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, আবার অনেকে

গ্রামের ছেলে হয়ে গ্রামকে মজ্জায় মজ্জায় ধারণ করেছেন। নলিনী বেরা দ্বিতীয় বর্গের লেখক। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে সুবর্ণরেখা নদী-তীরবর্তী জঙ্গলমহলের সাঁওতাল- ভূঁইয়া-ভূঁমিজ- লোধা প্রভৃতি প্রান্তিক বর্গের মানুষের কথা। শহুরে বর্ণময় জীবনের হাতছানি থাকা সত্ত্বেও যারা নিজেদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, লোকসংস্কারের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেনি।

অমর মিত্রের গল্পে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমানের ভৌগোলিক আবহে সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথা উঠে আসে। সৈকত রক্ষিতের গল্পেও পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউরি জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যপীড়িত জীবনযাত্রা বাস্তবরূপ পেয়েছে। এই দিক দিয়ে গল্পকার নলিনী বেরা তাঁদের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু নলিনী বেরা সম্পূর্ণ একটি নতুন ঘরানার,সরস-মনোজ্ঞ গল্প উপহার দিলেন বাংলা সাহিত্যকে।

২.

চাকরিসূত্রে গল্পকার নলিনী বেরা দেশ বিদেশের ভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তবু, তিনি গ্রামকে ভুলেননি, নিজের শিকড়কে অস্বীকার করেননি। শবর, লোধাদের খোঁজে তিনি বারবার ফিরে আসেন গ্রামে। 'শবরচরিত' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'শবরচরিত লিখে যেন শবরহারা হলাম'।[২] এই নিম্নশ্রেণির মানুষগুলির জন্যই তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত সর্বদাই। তাই গল্পের কথাবয়ানে ভিড় করেছে সাঁওতাল, লোধা, ভুঞাঁ, ভুমিজ প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষের জীবন। সভ্যতার অগ্রগতির ধারায় শিল্পায়ন হলো, কলকারখানা গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন নগরের পত্তন ঘটল। কিন্তু গ্রামের মানুষগুলি কারো পরিবর্তন হলো না। 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' গল্পে কৃষিজীবি শ্রীকান্তের জীবনের কঠিন লড়াইয়ে জমিটুকুই শেষ সম্বল। কিন্তু মেজোকাকার বেইমানি আর ভাইয়ের পড়াশুনার খরচ চালাতে সেই জমিটুকুও হারাতে হয় তাকে। সে তার চাষের বলদ খুইয়েছে। শহরের রোজগারে ভাই টালির চালওয়ালা কোঠাবাড়ি বানিয়ে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু শ্রীকান্তের মতো মানুষের কাছে সেটাই জীবনের পরমপ্রাপ্তি নয়। শখের ঘরবাড়ির চেয়ে তার মতো প্রান্তিক চাষির কাছে দুটো বলদ অনেকবেশী মূল্যবান। মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত সে তার ভাই নলিনীর কাছে চেয়েছে- 'আমাকে একহাল গরু কিনে দে, দেখবি ওই দিয়ে খেটে ঘরের দরজা জানলা সব আমি করে ফেলব।'[৩] শ্রীকান্তের মতো নিম্নবিত্ত মানুষ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য কৃষি হয়ে উঠে একমাত্র ভিত্তি। 'দু কান কাটা' গল্পে লোধা জনজাতির হতদরিদ্র জীবনের কথা উঠে আসে। তাদের জীবনে সাময়িক সুরাহার জন্য একটি সরকারি প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়। মাইকে ঘোষণা করে ছাগল কেনার পর সেগুলি গ্রামের মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। কিন্তু ছাগল বিতরণ অপেক্ষা সরকারি অফিসারদের এলাহি আয়োজনকে বড় করে দেখানো হয়েছে। ছাগলের 'দুকান কাট'র মধ্যে হাসির খোরাক থকলেও গল্পে লোধাদের অভুক্ত থাকা, অপুষ্টিজনিত যন্ত্রণাকে তুলে ধরা হয়েছে। 'কুসুমতলা' গল্পটি লেখকের কবি

আত্মার নস্ট্যালজিয়া হলেও শৈশবের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। দারিদ্র্যমোচনের জন্য কুসুম গাছে কাগজের টুকরো গুজে নোটের স্বপ্ন দেখার মধ্যে যা স্পষ্ট। গল্পের শেষে দেখা যায় একজন--"এসেই মন্মথদের কুসুমগাছটাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। বিড় বিড় করে কী যেন বললও। বোধহয় দিন-ক্ষণ দেখে এসেছে। তারপর তার উড়নি তলা থেকে কী একটা বের করে গাছের কোটরায় সন্তর্পনে রেখে গেল সে।"[৪] 'আমরা সন্ত্রাসবাদীরা' গল্পে-জঙ্গলমহলের সাধারণ মেহনতি মানুষগুলোর কথা উঠে আসে।

ভদ্রসমাজের বিলাস-বৈভবে মত্ত কতিপয় মানুষের শোষণে শাসনে তারা হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাদী। তারা মাওবাদী তকমা গায়ে পড়েছে বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের নায্য অধিকার বুঝে নিতে। 'ভূতজ্যোৎস্না' যাদুবাস্তবতার মোড়কে গাঁথা হলে অন্ত্যেবাসী মানুষগুলির জীবন সংগ্রাম কোন অংশে কম নয়। তাদের বর্ণনাতেও প্রান্তিক জীবনের ছোঁয়া- 'কারোরই পড়নে কাপড় নেই বললেই চলে, আড়াই হাতেরও কম খেটো গামছায় লেংটির মতো করে কোনমতে কোমরটায় জোড়ানো।[৫] তারা কাদাজলে থাকে। লেখাপড়া না শিখলেও হেমিংওয়ের, আলব্যের কামুর পাঠ মুখস্থ বলে। এর মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধিজীবিদের প্রতি বিদ্রুপ দেখলেও গল্পকার অসলে পড়াশুনা না জানা মানুষগুলির স্বপ্ন দেখাকে প্রশ্রয় দেয়। পাহাড়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের নিয়ে লেখা 'পাহাড়ের নিচে মানুষ' গল্পটি। কুসুমগাঁইয়ের আদিবাসী যুবক মংলু বনে মোষ চড়ায় আবার তিরিয়ো আঁড়বাশি বাজায়। তারা জীবনের সমস্ত দুঃখ ভুলে যায় যখন দল বেঁধে শিকারে যায়। 'ঝাটার কাঁটি' একটি অসাধারণ প্রেমের গল্প। কিন্তু এখানেও আদিবাসী রমণীর প্রতি অবৈধ সঙ্গমকে গল্পকার কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি।

'টি.আই.প্যারেড' মাওবাদের প্রসঙ্গ আসে জঙ্গলমহলের। কিন্তু মাওবাদী জীবন সমস্যার রাজনৈতিক বির্তকে না গিয়ে সংবেদনশীল লেখক উৎসাহিত হন "যে কোন জঙ্গলের রহস্যময় গভীরতা, আখ-পাট-অড়হর খেতের ভিতরের নিস্তব্ধতা যে কোনো যুবকেই বিশেষত এখানকার যুবকদের, উৎসাহিত করে তোলে সে রহস্য সে গোলোক ধাঁধার ঘুলঘুলি ভেদ করে ভিতরে ডুকে পড়তে।"[৬] দীর্ঘদিনের অবহেলা আর বঞ্চনার কারণে নিরন্ন মানুষগুলি হাতে অস্ত্র তুলে নিলেও নলিনী বেরা কখনোই তাকে সন্ত্রাসের আবহে ব্যাখ্যা করেননি। এখানেই প্রান্তিক মানুষদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

৩.

জঙ্গলমহলে আজও নানা কুসংস্কার মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে। নলিনী বেরা এইসব অঞ্চলের ভূতপ্রত, ডাইনি ও নানা কুসংস্কারের ওপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন, যথা-'খবা', 'তিহার গল্প', 'তড়কন ডাঙা', 'ব্যাং-কৌমুদি', 'কহবর

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VII, Issue : XV

লেখা', 'মোরগডাকের অপেক্ষায়', 'বড়াভাজা', 'কটাচোখ ও বঙ্কিম বুধকের গল্প', 'যৌতুক' প্রভৃতি। 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে ডাইনি প্রথার এক নিদারুণ প্রতিভাস। সুনি নামে সাঁওতাল বধূকে ডাইনি সন্দেহে" ঝাঁটার বাড়ী মেরে দুদ্দুর করে খেদিয়ে দিল গ্রাম থেকে।"[৭]

যে সমাজের লোকেরা বহিরাগত সংস্কৃতির দ্বারা তেমনভাবে আলোকিত হয়নি বা তেমনভাবে বিবর্তিত হয়নি, সেই পিছিয়ে পড়া লোকসমাজের কথা নলিনী বেরা তাঁর গল্প বেশি করে তুলে ধরেছেন। গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ মানুষের কথা ,তাদের লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকগাঁথা, লোকভাষা, লোকগান গল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে।

'বর্ষামঙ্গল' গল্পে দেখা যায় বৃষ্টিতে ঘরবন্দি মানুষের যখন কিছুই করার থাকে না তখন নানা লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, রূপকথাকে আশ্রয় করে তারা। যেমন—বৃষ্টির সময় তারা মনে করে হলহলিয়া সাপ আকাশ থেকে নেমে আসে, গভীর রাতে গ্রামে গুড়গুড়িয়াদের আগমন ঘটে, তারা উঠানে দাঁড়িয়ে কারুর নাম ধরে ডাকলে আর তাতে সাড়া দিলে নিশ্চিত মরণ। আবার লোকমতে বৃষ্টি থামানোর উপায় হল— গামছা পরে একটা লাঙল গোবর গাদায় পুঁতে দিতে হবে। পরমেশের ঠাকুমার কথায়-"লাঙল পুঁতলে ঝড়িয়া তো ঝড়িয়া, বছর বছর ধরে হওয়া বৃষ্টিও তোর থেমে যাবে।"[৯]

'ছেঁড়া কুড়চির মালা' তে লোধা-নারী আলোমণির বিবাহ অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। সাঁওতালদের বিবাহের এক বিশেষ লোকাচার হল বিবাহের শেষে বর গাছে উঠে থাকবে। বধূ ভরণ পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিলে তবেই সে গাছ থেকে নামবে এবং সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে। বিবাহ সভায় লোধা নারীরা বিশেষ এক প্রকার গান গায়-

"বাস করি ধুঁধে ঝাঁড়ে ব্যাঙ -উন্দুর মারেঁ খাই
ইটাকে কি বাঁচা বলা যায়?
বলে দেন অ-ভাই কেমন করে কাল কাটাই"[১০]

'পুষ্করা' গল্পে লোকসংস্কার প্রচলিত আছে অপমৃত্যুতে মরলে সে বাড়িতে পুষ্করা বা প্রেতাত্মা লাগে। এই পুষ্করা ছাড়ানোর জন্য গণককে ডাকা হয়। এটিও একটি লোকজীবিকা। এই গণৎকার গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই সব কাজ করে থাকে।

নলিনী বেরার গল্পে উঠে এসেছে পুরুলিয়া, মেদনীপুরের সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকউৎসব মকর বা টুসু উৎসব। সেই টুসু গান লোকসঙ্গীতের অন্যতম অঙ্গ-"ষোল ঘড়ি ষোল পূজা, খাওগো টুসু খই ভাজা"। 'চোদ্দমাদল' গল্প সংকলটির গল্পে আছে বাঁধনা উৎসবের কথা। গোবর লেপা উঠোনে নানারকম আলপনা আঁকা হয় ঢ্যাঁড়শ গাছের হড়হড়ে রসের সঙ্গে চালের গুঁড়ো মিশিয়ে। রাতে সাঁওতাল নরনারীরা মাদল বাজিয়ে গান করতে করতে আসে "গরু জাগরণে হামরা তো যাতেছিলি কুলহি — কুলহি যে বাবু হো/তোরই গিরিহায় দাকিয়েঁ ঘুরল"[১১] 'খোরপোশ' গল্পে সুনা দাঁশাই উৎসবে মুখে কালিঝুলি মেখে সঙ সাজে।

তাঁর গল্পে লোকপ্রবাদ, হেঁয়ালীর, ছড়ার ব্যবহারও অপূর্ব দক্ষতায় কাহিনির অনিবার্য সঙ্গী হয়েছে।

নিছক সাক্ষরতা বা প্রথাসিদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও এইসব প্রান্তিক মানুষেরা জীবন দিয়ে আগলে রাখে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে।

৪.

গল্পের আখ্যানভাগ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ছোটগল্পকারদের অনুসরণের বদলে মঙ্গলকাব্য, পাঁচালীর ঐতিহ্য অনুসরণে ভারতীয় স্বাদ নিয়ে আসেন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে যাদু বাস্তবতা মিশিয়ে মাটি ও মানুষের গল্প লিখলেন গল্পকার নলিনী বেরা। তাঁর গল্পের ভাষা নির্মাণের একটি নিজস্ব শৈলী আছে। সাহিত্য ও মুখের ভাষার তিনি অপূর্ব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। "চিড়কিনডাঙা" গল্পে সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী মানুষের নিজস্ব ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে। মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে এখানকার মানুষ ডাকপাড়ে-'সাঁঙ্গাৎ হে-এ-এ-এ-এ'। তিনি যেহেতু আদিবাসী মুন্ডা শবরদের মুখের কথাকে গল্পে হুবহু তুলে ধরতে চেয়েছেন তাই গল্পে ধ্বন্যাত্মক ও অনুস্বারবহুল শব্দের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। পতনি, কষাফল এমন অনেক আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে গল্পের পরিবেশকে আরো বেশি জীবন্ত এবং আঞ্চলিকতার রঙে রঙীন করে তুলেছেন। চরিত্রের মুখের ভাষা তুলে ধরতে গিয়ে অনেক অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে।

মাঝে মাঝে সুনার মতো আদিবাসী যুবক প্রতিবাদ করে বলে-"এত দিন তুমাদের পালাপোষ করে এসেছি, আজ তুমরা আমাকে খরপুষের লোভ দেখাচ্ছ...বলছ কী, তুমাদের কাছে খড়পুষের ল্যাওড়া দাবি তুলতে।"[১২] গল্পের বর্ণনাগুণে এবং শব্দের সাবলীল প্রয়োগে অশ্লীল শব্দও প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনায় শ্লীল হয়ে ওঠে।

গল্পের বিষয় নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি অতি তুচ্ছ, সাধারণ বিষয়কে তুলে আনলেন। বর্ণনার গুণে যা হয়ে উঠল অতুলনীয়। সংলাপ তাঁর গল্পের আকর্ষণীয় বিষয়। গ্রামের নিরক্ষর নিম্নজীবি মানুষদের দৈনন্দিন কথোপকথনকে বাস্তবসম্মত রূপে গল্পে বিনির্মাণ করাই তাঁর অন্বিষ্ট, এক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর সম্পর্কে সমালোচক অমলেন্দু চক্রবর্তীর যর্থাথ মন্তব্য : "নলিনী বেরার শিল্পী সত্তার সমগ্রতা জুড়েই গ্রাম বা পল্লীপ্রকৃতির সংবৃতি। নির্সগ কোনো স্তব্ধ স্থবিরতা নয়। কিংবা আকাশ মাঠ গাছপালা পশুপাখি নদীনালার দিগন্তপ্রসারে মানুষই তাঁর সৃজন ভাবনার অন্তর্বীজ। সে-মানুষ অশিক্ষায় দারিদ্র্যে স্থবির, অস্বাস্থে ভঙ্গুর।"[১৩]

নলিনী বেরা তাঁর গল্পের মধ্যে একটি সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যে সমাজ পিছিয়ে পড়া শবর, লোধা, সাঁওতালদের, সমাজ। একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের বর্ণনা, সেই অঞ্চলের মানুষের জীবনগাথা তাঁর গল্পের প্রাণ। তাদেরকে নিয়ে তিনি বাংলা গল্পসাহিত্যে এক দেশজ ঘরানার শিল্পী হয়ে উঠেছেন।

সমাজকে পরিবর্তন করা কোন লেখক বা সাহিত্যিকের একার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যিক নিজের চোখে দেখা সমাজবাস্তবতা নির্মাণ করতে পারেন সাহিত্যে। গল্পকার নলিনী বেরা ঠিক সেই কাজটাই করেছেন অবলীলায়। এই জন্য তাঁকে কেউ কেউ আঞ্চলিক কথাকার বলেছেন।

কিন্তু কোন সাহিত্য বা শিল্প আঞ্চলিকতার সীমায় আবদ্ধ থাকে না। নলিনী বেরাও তেমনি গল্পে মেদিনীপুরের জঙ্গল মহলের প্রান্তীয় অঞ্চলের কথা বলার মধ্যে দিয়ে সমগ্র মেদিনীর অসহায় মানুষের কথা বলেছেন। বাংলা গল্পসাহিত্যে নিম্নবর্গের জনজাতির কথা অনেকেই বলেছেন, কিন্তু এত আন্তরিক, মমতায় সহৃদয়তার সঙ্গে কেউ বলেননি।

সূত্রনির্দেশ :

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, "কালেরপুত্তলিকা", দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর১৯৯৫, পৃষ্ঠা৫১১।

২. বেরা, নলিনী, "শবর চরিত"(অখন্ড), করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, ভূমিকা অংশ।

৩. বেরা, নলিনী, "শ্রীকান্ত পঞ্চম পর্ব", শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৩, পৃষ্ঠা৫২।

৪. বেরা, নলিনী, "কুসুমতলা", সেরা পঞ্চাশটি গল্প", দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা৩৬।

৫. বেরা, নলিনী, "ভূতজ্যোৎস্না", সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠ১১।

৬. বেরা ,নলিনী, "টি. আই. প্যারেড", সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫ পৃষ্ঠা ১৮২, ১৮৩।

৭. বেরা, নলিনী, "ঝাঁটার কাঠি", "সেরা পঞ্চাশটি গল্প", দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫ পৃষ্ঠা৫২।

৮. বেরা, নলিনী, "বর্ষামঙ্গল", শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ ২০০৩, পৃষ্ঠা১০৬।

৯. বেরা, নলিনী, "ছেড়া কুড়চির মালা", সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা ২৩৭।

১০. বেরা নলিনী, "খোরপোষ ", সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং,জানুয়ারী ২০০৩,পৃষ্ঠা১০১।

১১. বেরা, নলিনী, "খোরপোষ", "সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০১৫, পৃষ্ঠা১০২।

১৩. বেরা, নলিনী, "শ্রেষ্ঠ গল্প", করুণা প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ ২০০৩, ভূমিকা অংশ।